ভারতী

১৩১২

(বৈশাখ হইতে আশ্বিন)

পূর্ব্বার্দ্ধ।

ভারতী

১৩১২

(বৈশাখ হইতে আশ্বিন)

পূর্ব্বার্দ্ধ।

মাঙ্গলিক।

ললিত—কাওয়ালি।

অসীমে মগন হয়ে
শক্তি লভ সসীম সাধনে!
মহাকালে করি ভর
বাঁধ আয়ু সফল বাঁধনে!

বর্ষ-শেখরে চাহ,
নব ভানুতেজে কর স্নান!
জরা গ্লানি ঘুচে হোক্
অক্ষয় বল-সমাধান!

আমার বাল্যজীবনী।*

আমার সব প্রথম যে নিজেকে মনে পড়ে সে তিনবছরের আমি। সে সময়কার দুইটী ঘটনা মনে মুদ্রিত আছে। দাসীরা একটি দুরন্ত শিশুকে ঘরের মধ্যে স্নান করাইতেছে। বালিকার সাবানপিচ্ছিল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যত তাহারা মর্দ্দন ও ঘর্ষণের দ্বারা ধরিয়া রাখিতে চেষ্টা করিতেছে, তত সেই অধীরা বালিকা তাহাদের হাত ছাড়াইয়া পালাইয়া, তাহার অঙ্গধৌত সফেন জলের গতি অনুসরণ করিবার জন্য গৃহের নর্দ্দমার দিকে ছুটিতেছে। ফেণিল জল গড়াইয়া গড়াইয়া পড়িতেছে কেমন এক কৌতুকরাজ্যে! নর্দ্দামার সামনেটিতে মেঝের উপর উপুড় হইয়া শুইয়া, তার বৃহৎ ছিদ্রের ভিতর দিয়া দেখিলে কেমন মজা দেখা যায়। রুদ্ধ ঘরের অন্ধকারের পর সেখানে হঠাৎ কত আলো। আরও একটি কেমন আশ্চর্য্য জিনিষ সেখান হইতে দেখিবার রহিয়াছে। ঠিক্ সেই সময় তারই মত আর একটি শিশুর স্নানক্রিয়া চলিতেছে। একটা মেম্ তার বাড়ীর উঠানে একটা মোড়ার উপর বসিয়া একটা সাদা ধব্‌ধবে ছেলেকে টবের জলে চুবাইয়া চটকাইতেছে,—ছেলেটা তারস্বরে চেঁচাইতেছে। পয়ঃপ্রণালীর অন্তরালবর্ত্তিনী দর্শকস্থানীয়া অতি ক্ষুদ্র মানবিকাটির ঐ দিব্যি সাদা ছেলেটার আপত্তিসূচক ক্রন্দন ও চীৎকারই সবচেয়ে আমোদজনক লাগিত। তার তিন বছরের সুদীর্ঘ জীবনের বিজ্ঞতায় বুঝি মনে হইত—"কি ছেলেমানুষ! আমি ত কাঁদি না!"

---

* ইহা "বঙ্গবাসী" পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষগণের অনুরোধে প্রথম লিখিতে আরম্ভ করি। তাঁহাদের নিরূপিত সময়ের মধ্যে সমাপন করিয়া উঠিতে না পারায়, ভারতীতে পত্রস্থ করিতেছি।—ভাঃ সং।

নিজের সম্বন্ধে সব প্রথম স্মৃতি আমার ঐ কৌতুকময়ী। তিন বৎসর বয়সের আর একটি মাত্র ঘটনা মনে আছে। শেয়ালদহ ষ্টেসনের লাইনে কখানা খালি রেলগাড়ি পড়িয়া থাকিত। বিকাল বেলা হাওয়া খাওয়াইবার জন্য লইয়া গিয়া কোন কোন দিন চাকররা আমাদের কয় ভাই বোনকে সেই গাড়ীতে চড়াইয়া দিত। এক দিন তাহাতে বসাইয়া হঠাৎ তাহারা গাড়ী টানিতে লাগিল—সেদিন সেই অকস্মাৎ চলন্ত রেলগাড়ীর গতিতে বিস্ময় আনন্দ ভয় ও আগ্রহমিশ্রিত একটা তীব্রভাবের প্রথম নবীন তরঙ্গ শিশুবক্ষে রেখা খেলিয়া গেল।

যখন আমার বয়স পাঁচ ছয় বৎসর, আমার পিতার বিলাতগমন উপলক্ষ্যে, আমরা মাতুলালয়ে ছয় নম্বর যোড়াসাঁকোর বাটীতে দীর্ঘ-কালের জন্য বাস করি। আমার মামা ও মাসিদের ছেলেপিলে গণিয়া আমরা অনেক ভাই বোন। বয়সের ভিন্নতা অনুসারে আমাদের বয়স্যদলের ভিন্ন ভিন্ন থাক ছিল। খুব উঁচু থাকগুলির সবিশেষ খবর রাখি না, কিন্তু আমার দিদি শ্রীমতী হিরণ্ময়ীর বয়স্যদলটি ঠিক আমারই উপরের থাকে ছিল; আর আমার দাদা—শ্রীযুক্ত জ্যোৎস্নানাথের দলটি যদিও ছেলের দল, কিন্তু আমাদের সঙ্গেই তাদের সখ্য বেশী, তাহা প্রায় আমাদেরই দলের আর একটা শাখা ছিল। দিদিদের দল আমাদের উপর মুরুব্বিয়ানা করিতেন, কিন্তু দাদাদের দলের সঙ্গে আমাদের চুলোচুলি কিলোকিলির অদলবদল প্রায়ই হইত।

দলগুলি প্রায়ই তিন তিনজনে গঠিত ছিল। আমার দলের আমি সব চেয়ে কনিষ্ঠা সুতরাং অন্ধভাবে পরিচালিতা ছিলাম। আমাদের দলের যিনি মেজো ছিলেন তাঁকে আমি বড় ভালবাসিতাম, আর যিনি বড় ছিলেন তাঁকে ভয় করিতাম। তিনিই আমাদের পাণ্ডা। তাঁর দাসীদের মহলে ভারি গতিবিধি ছিল, সেই জন্য অনেক বিষয়ে পণ্ডিতা

ছিলেন। প্রতিদিন অনেকটা সময় দাসীদের সঙ্গে যাপন করিয়া আসিয়া, নবনব জ্ঞানে পূরিত হইয়া তিনি আমাদের মধ্যে তাহা বিতরণ করিতেন। আর শুধু দাসীদের কাছে কেন? খুব বড় ভাইদের দল খুব বড় বোনদের দল—কোথায় কোথায় যে তিনি না ঘুরিতেন জানিনা, সর্ব্বত্রই তাঁর অবারিত গতি ছিল, সুতরাং তাঁহার জ্ঞানসঞ্চয়ের আকর বহু ছিল। অশেষ বিষয়ে তিনি আমাদের নেত্রী ও শিক্ষাদাত্রী ছিলেন।

তাঁদের মহলে একটি ছোট কুঠরি ছিল। কোন কোন দিন আমরা তিনটিতে সেইখানে মধ্যাহ্ন যাপন করিতে যাইতাম। সেই কুঠরীর তিন দিক্‌কার দরজা অর্গলবদ্ধ থাকিত, একদিকে শুধু একটি ক্ষুদ্র গবাক্ষ খুলিয়া রাখা হইত। সেদিকটা গোলাবাড়ীর দিক; গবাক্ষের নীচে অনেকখানি খোলা জমি, উপরে খোলা আকাশ।

তিন সখিতে এক দৌড়ে সেই ঘরে আসিয়া, তাড়াতাড়ি কবাট বন্ধ করিয়া—কবাট বন্ধ করার কারণ, পাছে দিদিদের দল বা দাদাদের দল আমাদের বেদখল করিতে আসে—মেঝেয় পাতা ছোট বিছানার উপর যে-যার নিরূপিত স্থানে ঘেঁষাঘেঁষি করিয়া শুইয়া পড়িয়া একটু হাঁফ ছাড়িয়া আসিলে, পণ্ডিতা-দিদি তাঁহার জ্ঞানের ভাণ্ডার উন্মুক্ত করিতেন। সে কতদিন কত অমূল্য তত্ত্ব! আমরা ছোট দুজনে ভক্তিভরে সবিস্ময়ে তাঁর সব কথা উৎকর্ণে শুনিতাম।

একদিন তিনি বলিলেন—"মরবার আগে কি হয় জানিস্?" আমরা বলিলাম—"না ভাই।"

তখন মরণ কি তাই জানিতাম না। আমাদের জ্ঞাতসারে কারও মৃত্যু তখনও সে বাড়ীতে হয় নাই।

তিনি বলিলেন—"মরবার একটু আগে আকাশথেকে দুজন যমদূত নেবে আসে। তারা দেখতে ভয়ঙ্কর, শরীর প্রকাণ্ড, রঙ ঘোর

কালো, গালপাট্টা দাড়ী। তারা জানলা দিয়ে ঘরে ঢুকে যে মরবে তাকে উঠিয়ে নিয়ে চলে যায়।”

আমাদের গা ছম্ ছম্ করিতে লাগিল! আমরা শ্রোত্রী দুটীতে সভয়ে আমাদের ছোট ঘরের একটিমাত্র খোলা জানালার দিকে চাহিলাম। দেখিলাম জানালা অতি ক্ষুদ্র, তার ভিতর দিয়া প্রকাণ্ড-শরীর যমদূতের ঢুকিবার সম্ভাবনা নাই। কিছু আশ্বস্ত, তবুও অনেকটা ভীতভাবে আমার পাশের দিদির আর একটু গা ঘেঁষিয়া সরিয়া আমি বলিলাম—“এ রকম ছোট জানলা দিয়ে ত যমদূত ঢুকতে পারবে না?’

আমাদের তত্ত্ববিদ্যাদায়িনী বলিলেন—“তা কেন পারবে না? যমদূতেরা ইচ্ছে করলেই বড় শরীরকে ছোট ক’রে যেখান সেখান দিয়ে যে সে ঘরে ঢুকতে পারে। যখন ইচ্ছে যাকে তাকে নিয়ে যেতে পারে।”

একটা নিরুপায় অসহায়তার ভাবে আচ্ছন্ন হইলাম। সেদিন যে তারপর কি করিয়া সেই ঘর ছাড়িয়া উঠিয়া গিয়াছিলাম বলিতে পারি না। নড়িতে চড়িতে ভয়, উঠিতে পড়িতে ভয়—জানলার দিকে কেবলই সচকিত চোরা দৃষ্টি—যদি দেখি জানলার ধারে যমদূত আসিয়া পৌঁছিয়াছে! যদি আমরা এ ঘর হইতে বাহির হইতে না হইতে আমাদের চুলের মুঠি ধরিয়া ফেলে!

একদিন বিকালে আমরা বাড়ীর ভিতরের বাগানে খেলা করিতে-ছিলাম। হঠাৎ খুব হাওয়া উঠিল। আমাদের আজ্ঞাকারিনী নেত্রী—ইনি এখন ডিপুটিগৃহিণী—আজ্ঞা করিলেন—“গুড়ি গুড়ি চল্! গুড়ি গুড়ি চল্! এখনি হাওয়ায় উড়িয়ে নিয়ে যাবে।”

আমার মনে মুহূর্ত্তের জন্য অবিশ্বাসের উদয় হইয়াছিল, প্রশ্ন করিবার ইচ্ছা হইয়াছিল—“কেমন করে জান্‌লে?” কিন্তু তখন প্রশ্নাত্মক বিদ্রোহের সময় নাই—কিজানি এখনি যদি হাওয়ায় উড়ে

যাই! সুতরাং আমরা ছোটদুটী আজ্ঞামাত্র তৎক্ষণাৎ বসিয়া পড়িয়া সারা বাগানটা গুড়িগুড়ি চলিলাম, খোলা বাগানের সীমা অতিক্রান্ত হইলে যেখানে আর বায়ু চলাচল নাই, সেখানে পৌঁছিয়া আবার খাড়া হইয়া দাঁড়াইলাম। তখন ভাবী হাকিমগৃহিণী তাঁর হুকুমের পোষকতায়, হাওয়ায় মানুষ উড়িয়া যাওয়া সম্বন্ধে দাসীদের কাছে শ্রুত নানা সত্যমূলক কাহিনী বলিয়া আমাদের চমৎকৃত করিলেন।

পাপপুণ্য ও তার দণ্ড পুরস্কার সম্বন্ধে তাঁর কাছে নানা তথ্য লাভ করিতাম। পুণ্যের কথা কিছু মনে পড়ে না, কিন্তু কথায় কথায় পাপ করিতাম বোধ হয়, কারণ পাপের দণ্ড ভয়টা তিনি প্রায়ই দেখাইতেন। তিনি ঈশ্বরের হইয়া কতকগুলি নিজস্ব দণ্ডবিধি আবিষ্কার করিয়াছিলেন, যার এক আধটির ভিতর বাস্তবিকই ভারি দক্ষতা ও ভয়ানকতা আছে। কিন্তু তাহা সম্পূর্ণই তাঁহার নিজের, মানবধর্ম্মশাস্ত্রে তাহা লেখে না, যদিও মানবধর্ম্মের প্রতি তাহা অতিশয় সূক্ষ্মদৃষ্টিসম্পন্ন।

তিনি বলিতেন, কোন পাপ—যেমন বড়দের কথা না শোনা ঝগড়া করা বা মিথ্যা কথা বলা—একবার আচরিত হইলে তার জন্ম ঈশ্বর ভবিষ্যজীবনে প্রথমে স্থূল রকম অল্প শাস্তি বিধান করিয়া রাখিয়াছেন। অল্প শাস্তি—যেমন কিনা, সাধারণ শাস্ত্রে সচরাচর যাহা পাওয়া গিয়া থাকে,—নরকের আগুনে পোড়া, নরকের ভূতেদের দ্বারা প্রহারিত হওয়া ইত্যাদি। কিন্তু পাপ যত বেশী করিতে থাকিবে, শাস্তির মাত্রা তত বাড়িতে থাকিবে। পাপের চূড়ান্ত শাস্তির কথা তিনি আমাদের কাছে যা ব্যাখ্যা করিতেন সেইটিই তাঁর স্বকীয় বিশেষ শাস্ত্রের ব্যবস্থা। তিনি শাসাইয়া বলিতেন,—"খুব যদি পাপ করিস্ তবে সব্ব চেয়ে ভয়ঙ্কর শাস্তি এই হবে যে ব্রহ্মাণ্ডশুদ্ধ সবাই মরে যাবে, তুই একা বেঁচে থাকবি।"

এই কথা বলিয়া আমাদের সবে-মাত্র সংসারে আসা কচি মনে একটা ভয়ানক শূন্যতাময় উদাস কল্পরাজ্যের সৃষ্টি করিয়া দিতেন।

আমি এক দিন তাঁর কথা মনে করিয়া, তেতালার ছাদে উঠিয়া দিগন্তরেখার চারিদিকে চাহিয়া চাহিয়া সেই চরম শাস্তির দিন কল্পনায় দেখিলাম। যেন কেহ কোথাও নাই, আকাশে পাখী নাই, চিল নাই, বাহিরের তেতালায় বড়মামা নাই; বাড়ীভিতরের তেতালায় সেজ-মামীরা নাই, সেখানে আমার দিদি দাদা নাই, মঙ্গলা দাসী নাই রাজি দাই নাই;—বাড়ীর কোথাও কেহ নাই—নীচের অন্ধকার ঘরগুলার কোন কোণেও কেহ লুকাইয়া বাঁচিয়া নাই, ইন্দুরও নাই একটা পিঁপড়াও নাই; সামনে যে খোট্টাদের বাড়ী দেখা যায় তাদের ওখানেও কেহ নাই;—ব্রহ্মাণ্ড শূন্য, আমি একা রহিয়াছি।

কিন্তু আশ্চর্য্য, আমার একেবারে নিঃসঙ্গ মনে হইল না। আকাশ যেন সঙ্গী রহিয়াছে, আলো যেন সঙ্গী রহিয়াছে; আর থাকিয়া থাকিয়া মনে মনে একটা অনুভব হইতে লাগিল আমার যিনি শাস্তি-বিধাতা ঈশ্বর তিনিও যে কোন্ এক জায়গায় রহিয়াছেন, আকাশে সিঁড়ি লাগাইলেই যেন তাঁর কাছে পৌঁছান যাইবে। কিন্তু সে জন্য কোন আগ্রহ অনুভব করিলাম না, শাস্তি দাতার প্রতি কিছুই হৃদ্যতা বোধ হয় নাই; তিনি আছেন ত আছেন! অথচ তন্মুহূর্ত্তের জন্য একটা এই উপলব্ধি হইয়াছিল তিনি আর আমি কি এক ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ! শুধু আমার সত্তা আছে, আর তাঁর সত্তা আছে, ব্রহ্মাণ্ডে আর কিছুই নাই। ইহাতে তাঁর উপর রাগও হইয়াছিল, কেমন একটা একাত্মবোধও হইয়াছিল।

ঈশ্বর কিরাতবেশে অর্জ্জুনের পথরোধ করিয়াছিলেন। অর্জ্জুন তাঁর স্বরূপ না জানিয়া তাঁকে স্পর্দ্ধা করিয়া তাঁর উপর বিজয়ী হইয়াছিলেন। আমি ভাবি, অর্জ্জুন যদি প্রথমেই জানিতে পারিতেন তাঁর পথরোধক

কে, তবে কি করিতেন? কবি কি তাঁহার হস্তকে অপটু করিয়া ফেলিতেন, না তাহাতে বেশী বল দিতেন?

ছয় বৎসর বয়সে ব্রহ্মাণ্ডে একা অজ্ঞ আমি, শত্রুরূপী ব্রহ্মাণ্ড-পতির সম্মুখীন হইয়া তাঁহা হইতে ভীত হইলাম না, তাঁহার শরণাগতও হইলাম না। তাঁর তথাশ্রুত কঠোরতম বিধানকে ফাঁকি দিবার ফন্দিই আমার অনুদ্ভিন্ন মস্তিষ্কে ঘুরিতে থাকিল। তাঁর পয়গম্বরস্বরূপিনীকে আমি এক দিন বলিলাম—"আমি কেমন করে একা বাঁচব? কি খেয়ে থাক্‌ব? আর কেউ যদি না বেঁচে থাকে আমাকে খাওয়াবে কে? তাহলে ত আমিও মরে যাব।"—ভাবটা ঈশ্বর ত তবে নিজের ফাঁদে নিজে ধরা পড়িবেন! কিন্তু আমার সেই দিদিটির মুখে দ্যুলোক ভূলোকের অধিষ্ঠাতা, সর্ব্বজীবের অগোচর, আমার ন্যায় পাপীর প্রতি দয়ালেশহীন বিধাতা বলিলেন—"তা হবে না। খাবার জিনিষ পত্তর সব থাকবে। তোকে রোজ নিজে রেঁধে বেড়ে খেতেই হবে। বাঁচতেই হবে।"

কি নিষ্ঠুর বিধান!

ভাবিতে ভাবিতে আর এক দিন আর একটা ফাঁকির পন্থা মনে মনে উদ্ভব করিলাম। স্বপ্রণীত উদ্ভিজ্জ শাস্ত্রে বিদুষী উক্ত দিদিরই কাছে শিক্ষালাভ করিয়াছিলাম গোলাপজামের বীচি বিষে ভরা, খাইতে নাই, খেলেই লোকে মরিয়া যায়। আমি তাঁর কাছে গিয়া বলিলাম—"ঈশ্বর যদি ব্রহ্মাণ্ডের সব্বাইকে মেরে ফেলে আমাকে একলা বাঁচিয়ে রেখে শাস্তি দেন, আমি সেদিন গোলাপজামের বীচি খাব, তাহলে ত আমিও মরে যাব।" আমাদেব ভয়ঙ্করী গুরু-ঠাকুরাণী ক্ষণমাত্র দ্বিধা না করিয়াই উত্তর দিলেন—"সেদিন গোলাপজামের বীচিতে আর বিষ থাকবে না। তুই কিছুতেই মরতে পারবিনে।"

আমার উপায়কুশলতা সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত মানিল। এমন অমোঘতার সঙ্গে কে লড়িতে পারে?

৺বিবেকানন্দ স্বামী একবার বলিতেছিলেন—"আমাদের দেশে শৈশব হইতে শিশুকে ভয়ের দ্বারা ও ঈশ্বর নামক এক কল্পনার প্রতি নির্ভরপরায়ণতায় ঘিরিয়া দেওয়া হয়, তাহাতে ভারি ক্ষতি হয়। ইহার প্রতিবিধানেচ্ছু হইয়া বেদান্তবাদী একটি শ্বেতদম্পতী আলমোরায় বেদান্তাশ্রম খুলিয়া সেখানে হিন্দু শিশুদের বেদান্তসঙ্গত আত্মনির্ভরের ভাবে মানুষ করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন"।

বিবেকানন্দের অভিযোগ শুনিয়া আমার নিজের শৈশবের ঘটনা মনে পড়িয়াছিল, মানিয়াছিলাম সত্যই আমাদের কেবলই ভয়সমাকুল করিয়া রাখা হয়।

কিন্তু সেই অতি শৈশবে যে দিন ছাদের উপর উঠিয়া প্রাণীশূন্য বিশ্বকে দেখিয়া আমি নির্ভীক ছিলাম, যেদিন আমার মন যেন শিশুর কলকণ্ঠে গাহিয়া উঠিয়াছিল,—

"শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ
বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং
* * * *
দর্শম্ নু বিশ্বদর্শতম্!"

সেদিন আমার মনের সেই স্বাবলম্বন কোথা হইতে আসিল তাই ভাবি। বোধ হয় তাহা সহজাত হইবে, শিক্ষালব্ধ নয়।

রামচন্দ্রের দৈবী অস্ত্রের ন্যায়, এই সহজ স্বাবলম্বন প্রয়োজনের সময় স্মরণমাত্র আজীবন আমার সহায়তা করিয়াছে। ইহা মহদ্ভয়ে অভয়, শোকে সান্ত্বনা, দৈন্যে অভ্যুদয়, তাপে তাপহরণরূপে আমার সেবা করিয়াছে। যখনি লতার মত লুটাইয়া পড়িয়াছি, দলিত ধ্বস্ত হইবার সম্ভাবনায় নিপতিত হইয়াছি, তখনি আবির্ভূত হইয়া আমায়

তুলিয়াছে, জড়াইয়াছে, রক্ষা করিয়াছে। সংসারের ঘাতপ্রতিঘাতে চিত্ত যতই কেন বিক্ষুব্ধ হউক না, কেমন করিয়া অচিরে ধ্যানস্থ যোগযুক্ত করিয়া সকল ক্ষোভের প্রশান্তি করিয়া দিয়াছে। আমার এই ঐশ্বরী দানের অংশ যদি আমার দেশের সকল বালকবালিকার মধ্যে বণ্টন করিতে পারিতাম কৃতার্থ হইতাম।

আমাদের পরিবারে শিশুরা সর্ব্বদাই ঈশ্বরের নাম লইয়া নাড়াচাড়া করিত। সর্ব্বদাই যে ভীতিজনকতায় তাঁর সঙ্গে আড়ি করিয়া থাকিতাম তাহা নয়। কখন তাঁকে রুদ্রমূর্ত্তিতে দেখিতাম, আবার কখন কখন তাঁর সঙ্গে বেশ ভাব হইয়া যাইত, তাঁকে অন্তরঙ্গ সখাও মনে হইত।

শৈশবে স্বকৃত ছুটী লজ্জারাঙা আচরণ আমার মনে ছাঁকা দিয়া দিয়াছিল। স্মৃতির গায়ে এখনও তাদের দাগ খুঁজিয়া পাওয়া যায়। আমাদের দলটির মধ্যে যিনি মেজো, তাঁকে আমি ভারি ভাল বাসিতাম বলিয়াছি। তিনি আমার প্রায় সমবয়সী ছিলেন—অর্থাৎ ছুই-এক বৎসরের মাত্র বড়, (দলপতি-দিদিটি বছর চারেকের বড় ছিলেন,) এঁরই সঙ্গে বেশী মিল ছিল। বাহির বাড়ীতে আমাদের পড়ার ঘর ও তাঁদের পড়ার ঘর পাশাপাশি ছিল, বাড়ীর ভিতরেও আমাদের ও তাঁদের মহল কাছাকাছি ছিল, তাঁর দাদারা আর আমার দাদা বয়স্য ছিলেন। আমরা অনেক সময় দাসীদের পাহারা এড়াইয়া এ-উঁহার ঘরে নিজেদের পাথরের রেকাবীভরা জলখাবার লইয়া গিয়া খাইতাম। আমাদের আলুভাজির সহিত উঁহাদের আখের গুড়ের সম্মিলন হইলেই তবে রসনা বেশী তৃপ্তি লাভ করিত।

ভোর হইতে না হইতে সব ভাইবোনরা মিলিয়া ও-বাড়ীর বাগানে শিউলিফুল তুলিতে যাইতে হইবে। তাই যে যে দিন আগে উঠিত সে অপরদের জাগাইয়া দিত। আমি এক দিন আগে উঠিয়া উঁহাদের

তুলিতে গেলাম: লম্বা দুই তক্তপোষে উহাঁরা চারিটি ভাইবোনে শুইয়া আছেন, মধ্যে মধ্যে একজন দাসী আছে। তখনও ঘর অন্ধকার, সকলে নিদ্রিত। আমি মশারি খুলিয়া, বিছানায় ঢুকিয়া আন্দাজে আন্দাজে দিদির দিকটাতে গেলাম। মনে মনে মৎলব করিয়া আসিয়াছিলাম, দিদি যদি ঘুমাইয়া থাকেন, তাঁর গালে চুপিচুপি একটি চুমু খাইয়া তাঁকে জাগাইয়া দিব। অন্ধকারে আন্দাজে হাতড়াইয়া হাতড়াইয়া দিদিকে যখন পাইলাম, তাঁর গালে ধীরে ধীরে ভারি ভালবাসার সঙ্গে একটি চুমু খাইলাম।—"কে গা! কে গা!"—ক্যাঁক্ ক্যাঁক্ করিয়া একটা আওয়াজ হইল। ওমা আমি করিয়াছি কি? দিদি ভাবিয়া বুড়ী তিনকড়ি দাসীর কুঞ্চিতচর্ম্ম, বলিত, অপরিষ্কৃত গণ্ডে চুমু খাইয়াছি। সকলেই জাগিল, এবং সকলেই আমার এই কুকীর্ত্তি টের পাইয়া হাস্য করিয়া উঠিল। আমি যতটুকু ছিলাম লজ্জায় তার চেয়েও আরও ছোট হইয়া গেলাম। এমন গলদ! তিনকড়ি দাসীকে চুমু খাওয়া! সেই লোল শ্লথ মাংসপিণ্ডকে ভালবাসিয়া আদর করা! বৃদ্ধা অতিশয় কর্কশ প্রকৃতির ছিল, তাকে আমরা শিশুরা কেহই ভালবাসিতাম না। কিন্তু সেদিন একটী ক্ষুদ্র বালিকার ভুলকৃত স্নেহব্যবহারে তার প্রাণের কোন্ একটি তন্ত্রীতে বোধ হয় মুহূর্ত্তের জন্য ঘা পড়িল, সে আমাকে কোলে টানিয়া—"কে? তুমি? এস মা এস"—বলিয়া আদর করিতে গেল। আমি তার এই আদরের জ্বালায় সকলের বিদ্রূপ ভয়ে আরও অস্থির হইলাম। তার পর সকাল হইতে না হইতে সব দলের মধ্যে রটিয়া গেল আমি আজ ভোরে তিনকড়িকে চুমু খাইয়াছিলাম। দাদাদের দল আমার প্রতি অত্যন্ত ঘৃণা প্রকাশ করিতে লাগিলেন, দিদিদের দল সময় অসময়ে তিনকড়িকে দেখাইয়া আমাকে ঠাট্টা করিতে লাগিলেন। আমি যে অনবধানতাবশতঃ কতবড় দুষ্কর্ম্ম করিয়াছি হাড়ে হাড়ে বুঝিতে লাগিলাম। তার পর হইতে তিনকড়ি

বুড়ীটার যাবজ্জীবন তাকে দেখিলেই আমার সর্ব্বাঙ্গ লজ্জায় ম্রিয়মাণ হইয়া যাইত।

আর একবার একটা গুরুতর অপরাধ করিয়াছিলাম। তখনও মৃত্যুতত্ত্ব ভাল বুঝিতাম না। এই পর্য্যন্ত জানিতাম যে কারও বাপ মা মরিয়া যাওয়ার মানে এই যে সে বাপ মার কাছে না থাকিয়া আর কাহারও কাছে থাকে। তাই আমি এক দিন আমার প্রিয় সঙ্গিনীকে বলিলাম—"তোমার যদি ভাই বাপ মা মরে যান, আর তুমি আমাদের ঘরে সারাদিন থাক, সে বেশ হয়।"

আমাদের দলপতিদিদির কর্ণকুহরে আমার এই নির্ব্বোধ মন্তব্যটি যেমন পঁহুছিল, তিনি হুঙ্কারিয়া উঠিলেন—"কি বলছিস্? দাঁড়া বলে দিচ্ছি সবাইকে।"

তিনি করিলেন কি, তৎক্ষণাৎ গিয়া ঘরে ঘরে সব অভিভাবকদের জানাইয়া আসিলেন। ঘরে ঘরে বড়দের বিচারাসনের তলে আমার তলব পড়িল। সকলে আমাকে গঞ্জনা দিলেন, লজ্জা দিলেন, ভর্ৎসনা করিলেন—এমন কথা মুখে আনে!—এমন দুষ্ট মেয়ে! আমি নিতান্ত লজ্জাপীড়িত ও মর্ম্মাহত হইলাম। শিশুর অস্ফুট মনের কাতরতা বড়রা বুঝিতে পারিলেন না। দিদিকে ভারি ভালবাসি, সেই কথাটি প্রকারান্তরে ব্যক্ত করিয়াছি মাত্র, তাহাতে অন্যায়টা কোথায় হইয়াছে তাহা ঠিক তলাইতে না পারিলেও, যখন ভর্ৎসিত হইতেছি তখন ভয়ানক একটা কিছু অন্যায় যে নিশ্চয়ই করিয়াছি তাহা বুঝিলাম। সেই পর্য্যন্ত নিজের অসাধুত্ব ও দীনতা সম্বন্ধে একটা তপ্ত জ্ঞানের অঙ্কুর বালিকার মনে উপ্ত হইয়া রহিল।

শ্রীসরলা দেবী।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ।

সার আলফ্রেড ক্রফট্ একবার বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশন সভায় বলিয়াছিলেন—"The University which was set up in our midst a generation ago has only just touched the surface of society and has not yet created an atmosphere favourable to learning or research * * * What then has his University training done for him? [i. e., the student]? It has sharpened his faculties and given his greater aptitude for mastering whatever practical work he may set his hand to, it has made him perhaps a ready writer or a fluent speaker,—but as to the higher life, the divine spark, all that we mean by the flower and the fruit of liberal education,—of that there is but little trace"—

কথাগুলা বড় শক্ত কথা; এরূপ শক্ত কথা শুনিতে শুনিতে আজ কাল আমাদের কাণ ঝালাপালা হইয়া গেল; এক এক বার অসহিষ্ণু হইয়া উত্তর গাহিতে ইচ্ছা হয়। তোমরা আমাদিগকে শিখাইয়াছ কি যে, আমাদের নিকট ইহা অপেক্ষা অধিক প্রত্যাশা কর। তোমাদের এই যে একটা নির্জীব চালুনি-যন্ত্র—যাহার নাম দিয়াছ বিশ্ববিদ্যালয়—তাহা পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া কেবল মোটা বিদ্যা আর সরু বিদ্যা ছাঁকিয়া আসিতেছে মাত্র। ঐ জড় পদার্থ হইতে কি "divine spark" জন্মায়? আর জাপানের সহিত তুলনা করিয়া আমাদিগকে ধিক্কার দিবার পূর্ব্বে উচ্চশিক্ষায় জাপানী

কত টাকা খরচ করে ও কি বন্দোবস্ত খরচ করে, তাহার সঙ্গে একবার আমাদের খরচের ও বন্দোবস্তের তুলনা করিয়া দেখা উচিত হয় না কি ?

কিন্তু সে উত্তর গাহিয়া বিশেষ ফল নাই। পরে আমাদিগকে তুলিবে না বলিয়া আমরা চিরকাল শুইয়াই থাকিব, এরূপ প্রতিজ্ঞাটা আমাদের পক্ষে শুভ নহে। আর আমাদেরও কি লজ্জার কথা নাই ? আমাদের ক্ষমতা কম, হাতে পায়ে শিকল, বুকে জাঁতা, গলা টিপিয়া শ্বাসরোধের ব্যবস্থা ; তবু উহারই মধ্যে একটু রক্ত চলাচলের নিদর্শন দেখান না চলে এমন নহে। সার্ আলফ্রেডের পরবর্ত্তী অনুযোগের উত্তর দেওয়া কঠিন :—

"In such subjects as general physics and mathematics, it is true, workers in India have no special advantages, indeed they are to that extent handicapped by the volume of scientific knowledge existing in the world and by the rate at which it progresses—a rate which they can hardly hope to overtake. But there are other subjects in which Indian students varying enjoy unique and ample opportunities. To take a single example. It has been said that on the fundamental question of the origin of the Indian people, European scholarship is at a standstill for want of local Indian research. * * * Europe waits for a body of Indian workers to enter this utmost limitless field but it looks for them as yet in vain."

একথাটাও সত্য কথা। আমার স্বদেশীকে জিজ্ঞাসা করিতে পারি আমাদের নিজের ইতিহাস অনুসন্ধানে আমরা এমন অক্ষম কেন ?

ভারতবর্ষের জাতিতত্ত্ব অনুসন্ধান করেন রিজলি ভারতবর্ষের ভাষাতত্ত্ব অনুসন্ধান করেন বীম্‌স্‌, হর্‌নলী গ্রিয়ার্স। এখানে ভারতবাসীর নাম দেখি না কেন?

উত্তর দেওয়া হইবে, সাহেবদের, বিশেষতঃ উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারীর, এই সকল সংগ্রহে যে সুবিধা আছে, তাহা আমাদের নাই। ঠিক কথা। একজন মোটা সাহেব কল টিপিলেই ভারতগবর্ণমেণ্ট সিমলা হইতে মাথা নাড়া দেন। সমুদয় ভারতবর্ষে বৈজ্ঞানিক গবেষণার আন্দোলন উপস্থিত হয়। পাড়ায় পাড়ায় চৌকিদারগণ সমাজ তত্ত্বের অনুসন্ধান করেন, কন্‌ষ্টেবলেরা ভাষাতত্ত্বের আলোচনায় প্রবৃত্ত হন, ডেপুটিবর্গ comparative mythology বিষয়ে সিদ্ধান্ত লিখিতে বসেন; সদরের সেরেস্তায় সমুদয় সরঞ্জাম সংগৃহীত হইয়া সরকারি মুদ্রাযন্ত্রে সরকারী খরচে ভীমাকৃতি গ্রন্থে পরিণত হয়। আমাদের সে অর্থবল, লোকবল, তোড়জোড়, যন্ত্রতন্ত্র নাই। আমরা একায়েক এই বিপুল ভারতবর্ষের এক কোণে বসিয়া কতটুকু কাজ করিব?

ঠিক্‌ কথা, সেই ক্ষুদ্র কতটুকুর বেশী কাজ করিবার আমাদের সামর্থ্য নাই। কিন্তু সেই ক্ষুদ্র কতটুকুই বা করি না কেন? কাঠবিড়ালীর সাগর বাঁধার গল্প ত আমাদের মধ্যেই আছে। কাজটা যদি কর্ত্তব্য হয়, তবে, এতটুকুর বেশী পারি না—অতএব কিছুই করি না—এই সাফাই গাহিলে ধর্ম্মের দুয়ারে খালাস পাইব না।

কিন্তু বাস্তবিকই কি এ স্থলেও আমরা এতটুকুর বেশী কাজ পারি না? সহস্র অসুবিধা সত্ত্বেও আমাদের নিজের ইতিহাস সঙ্কলনে আমাদের যতটুকু সামর্থ্য আছে, তাহা মোটা সাহেবদের নাই, তাহা সিমলাশৈলবাসী ভারতগবর্ণমেণ্টের নাই। অন্ততঃ চৌকিদারের ও ডেপুটির চেয়ে বেশী কাজ করিবার আমাদের সামর্থ্য আছে। নাই বলিলে মিথ্যা বলা হইবে—পাপ হইবে।

সাহেবেরা আমাদের ভাষা বোঝেন না, আমাদের চরিত্র বুঝেন না ; লর্ড কর্জ্জনের ভাষায় এসিয়াটিকের চরিত্রই সাহেবের দুরধিগম্য। একপক্ষে আমাদের অসুবিধা সহস্র দিকে, অন্যপক্ষে সাহেবদের অসুবিধা লক্ষ দিকে। অতএব এ ওজর চলিবে না।

বলা হইবে, সাহেবেরা যাহা বলিয়াছেন ও লিখিয়াছেন, তাহা ভুল। ভুল হইবারই কথা। তাহাতে বিস্ময়ের কিছুমাত্র কারণ নাই। সাহেবেরা এত উর্দ্ধে অবস্থান করেন, যে দূরবীণ যোগেও তাঁহারা আমাদের কার্য্যকলাপ ঠিক্ দেখিতে পান না। তাহার উপর আমাদের গায়ের গন্ধ এত বিকট যে, তাঁহারা আত্মরক্ষার জন্য বহু উর্দ্ধে থাকিতে বাধ্য। তথাপি তাঁহারা যে দুটা কথা লেখেন ও বলেন, তাহা তাঁহাদের অনুগ্রহ ও বাহাদুরি। তাহার নিন্দা করা উচিত নহে।

স্বীকার করিলাম, তাঁহারা ভুল বলেন। কিন্তু আমরাই বা সে ভুল সংশোধনের কি চেষ্টা করিলাম। কেবল ঘরে বসিয়া হাসিলে সে হাস্য শ্বেতশরীরে কলঙ্কলেপ করিবে না। আমরা আমাদের সম্বন্ধে কয়টা নির্ভুল কথা জানি বা জানিবার চেষ্টা করিয়াছি?

অথচ কথা জানিবার আছে। এ যে অতুল বারিধি—ইহার পার নাই ; ইহার জলতলে কত রত্ন আছে, তাহার ইয়ত্তা নাই ; কেহ কি একবার সেই রত্নের জন্য জাল ফেলিবে না? এই ঔদাস্য, এই অশ্রদ্ধা মার্জ্জনীয় নহে। ইহা মহাপাতক।

মাতর্জন্মভূমি, তোমার কোলে শুইয়া, তোমার স্তন্যে লালিত হইয়া আমরা এই জড়দেহ ধারণ করিয়াছি, তোমাকে আমরা চিনিতে চাহি না—তুমি কে, তাহা জানিবার আমাদের প্রবৃত্তি নাই। কোন্ কালে তোমার কি মূর্ত্তি ছিল, আমরা তাহা দেখিতে চাহি না,—কবে তুমি কেমন ছিলে, কেন তুমি এমন হইলে, তাহা অনুসন্ধানের কোন

প্রয়োজন বুঝি না। তোমার পূর্ব্বতন সন্তানগণ কেমন ছিল, কি করিয়াছিল, আমাদিগের জন্য কি রাখিয়া গিয়াছে, তাহা জানিবার জন্য আমাদিগের ব্যাকুলতা নাই। ঋষিঋণ ও পিতৃঋণ স্কন্ধে লইয়া আমরা ভূমিষ্ঠ হইয়াছি; সেই ঋণশোধে আমাদের প্রবৃত্তি নাই। ধিক্ আমাদের শিক্ষিত-সম্প্রদায়কে! প্রাচীনেরা ইতিহাসের গৌরব বুঝিতেন না, তাঁহারা দেশের ইতিহাস লেখিয়া যান নাই। আমরা বৎসর বৎসর ইতিহাসে পাণ্ডিত্যের উপাধি লাভ করিতেছি, আমরা ইতিহাসের গৌরব বুঝিয়াছি!

এরূপ তর্কও শুনিয়াছি—ভারতবর্ষের ইতিহাসে আবার কি আছে যে, তাহার আলোচনা করিব? অরে হতভাগ্য,—বিদেশী আসিয়া যখন ভারতবর্ষের ইতিহাস লিখিয়া দিবে, তখন তাহা অধ্যয়ন করিয়া পাণ্ডিত্যের উপাধি লইবে! অরে পাপিষ্ঠ!

আবার এমন তর্কও না শুনিয়াছি এমন নহে—শঙ্করাচার্য্য বা চৈতন্যদেব যাহা উপদেশ দিয়া গিয়াছেন, যাহা শিখাইয়া গিয়াছেন, তাহার ফলভোগ করিতেছি, জীবনে তাহা কাজে লাগাইয়া জীবনকে উন্নত করিতেছি, তাঁহারা কোন্ তারিখে জন্মিয়াছিলেন, কোন্ তারিখে দেহ ত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহা জানিয়া কি লাভ? অরে চতুর! কেবল্ ঋণ গ্রহণ করিব—তাহার পরিশোধের জন্য ভাবিব না! ইতিহাস আলোচনা—উহা অতীতের উপাসনা—উহা পিতৃপুরুষের নিকট ঋণমোচনের একটা উপায়।

প্রাচীনেরা ইতিহাস আলোচনা করেন নাই; তাঁহারা এই ঋণ-দায়ে বদ্ধ হইয়া গিয়াছেন—তাঁহারা কি ধর্ম্মে পতিত হইয়া গিয়াছেন? সে কথা তুলিয়া কাজ নাই। পিতৃপুরুষের কর্ম্মের সমালোচনার ফল নাই, সে অনেক কথা—তাহাতে পুঁথি বাড়িবে, তাঁহারা যদি ধর্ম্মে পতিত হইয়া থাকেন, তবে জ্ঞাতসারে হন নাই! আমরা জ্ঞানকৃত পাপে পাপী হইতেছি।

বিজ্ঞান—বিজ্ঞান—আমরা বিজ্ঞান চর্চ্চা করিব। যেনপদার্থ বিদ্যা আর রসায়ন শাস্ত্র আর দেহতত্ত্ব লইয়াই বিজ্ঞান—যেন কলের গাড়ীতে আর টিনের কানিস্তারেই বিজ্ঞান সীমাবদ্ধ—মানবতত্ত্ব যেন বিজ্ঞানের পরিধির বাহিরে—ইতিহাসালোচনা যেন বিজ্ঞানের সীমার বহির্গত!

বিজ্ঞান—বিশেষ জ্ঞান। যাহা কিছু জ্ঞানের বিষয়—তাহা বিজ্ঞানের—বিষয় আব্রহ্মস্তম্ভ পর্য্যন্ত।

আমাদের ইতিহাস আমাদিগকেই লিখিতে হইবে। পরের উপর নির্ভর করিয়া থাকিলে চলিবে না—তাহার জন্য যে পরিশ্রম আবশ্যক—তার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। নতুবা আমরা আমাদিগকে চিনিব না—আমাদের ধাতুতে, মজ্জায় কি বল আছে তাহা জানিব না—আমরা নিজের পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইতে সাহসী হইব না। আমাদের স্নায়ুযন্ত্র শিথিল থাকিবে, আমরা ভূপৃষ্ঠে দাঁড়াইয়া শবদেহ লইয়া পূতিগন্ধ উৎপাদন করিব।

নতুবা আমরা আমাদের জননী মাতৃভূমিকে চিনিব না—আমাদের মাতৃভক্তি জন্মিবে না—সেই ভক্তি মহাভাবে পরিণত হইবে না—যে মহাভাব আমাদিকে মহৎ কার্য্যে প্রেরিত করিবে—যাহার বলে আমরা জয়শীল হইব—যাহার বলে আমরা লজ্জা হইতে ও অপমান হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিব। একমাত্র পন্থা;—অনেক ভাবিয়া দেখিয়াছি, অন্য পন্থা আমাদের নাই;—আর সকল পথ বিপথ ও কুপথ। ইহাই এখন আমাদের কর্ম্ম—ইহাই আমাদের যুগধর্ম্ম।

এতগুলা লম্বা চৌড়া কথায় অসংযত লেখনীর চালনা করিয়া ফেলিলাম; বর্ত্তমান প্রবন্ধের শীর্ষভাগে লিখিত 'বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ' নামক ক্ষুদ্র সমাজটির সহিত তাহার সম্বন্ধ কি, একটুকু বুঝিয়া বলা আবশ্যক। ঐ ক্ষুদ্র সমাজের ক্ষুদ্র জীবনের ক্ষুদ্র কার্য্য স্বদেশের তত্ত্বের আলোচনা, উহার ক্ষুদ্র চেষ্টার ফল নিরতিশয় ক্ষুদ্র। উহা কাঠ-

বিড়ালীর সাগরবন্ধনচেষ্টার মত ক্ষুদ্র ফল উৎপাদন করিয়াছে ও সম্ভবতঃ করিবে; কিন্তু উহা কর্ত্তব্যের পথে চলিয়াছে, অথবা চলিবে আশা করি বলিয়াই আজ এই ক্ষুদ্র লেখনীর চালনা করিতে বসিয়াছি।

একটা কথা বলিয়া রাখি—ঐ সমাজের সহিত উপস্থিত লেখকের বর্ত্তমান বৎসরে একটু বিশেষ সম্পর্ক আছে; উহা অস্থায়ী সম্পর্ক। ঐ সমাজের কৃত বা কর্ত্তব্য কর্ম্মের সম্বন্ধে যাহা কিছু বলিব, তাহা আমার সম্পাদকীয় উক্তি বলিয়া যেন গণ্য না হয়। উহা আমার ব্যক্তিগত কথা; উহার ফলাফলের জন্য ঐ সমাজ বা সমাজের সংসৃষ্ট অন্য কোন ব্যক্তি নহেন।

সাহিত্যপরিষদের জীবনের এগার বৎসর পূর্ণ হইতে চলিল। উহা এই এগার বৎসরে কি করিয়াছে একবার দেখা আবশ্যক।

আমি যতদূর জানি, প্রথমে যখন উহার উৎপত্তি হয়, তখন উহার উদ্দেশ্য কি তাহার সম্বন্ধে অতি অস্ফুট ধারণা ছিল। পরিষৎ স্বয়ং ঠিক জানিতেন না, তিনি কি কাজের জন্য অকস্মাৎ ধরাধামে অবতীর্ণ হইলেন।

"বঙ্গ ভাষার ও বঙ্গ সাহিত্যের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধন"—এইরূপ একটা দীর্ঘছন্দের কথা উহার নিয়মাবলীর প্রথমপৃষ্ঠে মুদ্রিত আছে, কিন্তু ঐ সুদীর্ঘ-পদসমষ্টির তাৎপর্য্য কতটুকু, তাহা ভাল করিয়া বুঝিবার উপায় ছিল না।

কেহ আশা করিয়াছিলেন যে, অসদ্‌গ্রন্থকে সম্মার্জ্জনী প্রহারে সাহিত্য-রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া সাহিত্যপরিষৎ বঙ্গীয় সাহিত্যচন্দ্রকে নিষ্কলঙ্ক শশধরে পরিণত করিবে। ভাগ্যে পরিষৎ সেই সম্মার্জ্জনী ধারণ করেন নাই। ইংরেজের রাজ্যে স্বাধীন মুদ্রাযন্ত্রের দিনে আবর্জ্জনা পরিষ্কার মনুষ্যের অসাধ্য; ইংরেজের আইনে অসৎকে অসৎ

বলিলে "আইনের আমলে আসতে হয়। ঐ ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইলে এতদিন পরিষদের সভ্যগণের পরস্পর সম্মার্জ্জনী প্রহারে প্রভাস যজ্ঞের পুনরভিনয় হইত মাত্র।

কেহ আশা করিয়াছিলেন, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ একটা রমণীয় ভীমকান্ত স্বরূপ সর্ব্বদোষবিমুক্ত বিশুদ্ধ আদর্শ বাঙ্গালা ভাষা গঠন করিয়া ফেলিবে; তাহতে গ্রাম্যতা দোষ থাকিবে না, তাহাতে শ্রুতিকটু শব্দ প্রয়োগ থাকিবে না, তাহাতে বিদেশী গন্ধ থাকিবেনা, তাহা পরমপবিত্র সর্ব্বজনসেব্য বাঙ্গালা ভাষা হইবে; সাহিত্যপরিষৎ তাহাও করিলেন না, বা করিবার চেষ্টা করিলেন না। কেননা দুষ্ট সরস্বতী মানবের রসনায় আবির্ভূত হইয়া মানবকে দুর্ভাষা ব্যবহার করান, সে দেবতাকে সংযত করিবার কোন উপায়ই সাহিত্য পরিষদের-হস্তে নাই। আর যাঁহারা সাহিত্যপরিষদের নৌকাখানির কর্ণধার, তাঁহারাই বিজ্ঞজনের মতে দুষ্ট সরস্বতীর প্রধান সেবক। সুতরাং তাঁহাদিগের উপর শাসনদণ্ড সঞ্চালনের কোন উপায় নাই।

কেহ মনে করিয়াছিলেন, সাহিত্যপরিষৎ রাশি রাশি সদ্‌গ্রন্থের প্রকাশ করিয়া বাঙ্গালাসাহিত্যকে একবারে উন্নতির পরাকাষ্ঠায় উপনীত করিবে। কিন্তু সদ্‌গ্রন্থ প্রকাশের জন্য সদ্‌গ্রন্থ প্রণেতার আবশ্যক এবং সদ্‌গ্রন্থ প্রণেতার প্রসবের ভার সম্প্রতি বঙ্গমাতার উপর—সাহিত্যপরিষৎ এ বিষয়ে বঙ্গমাতাকে অব্যাহতি দিতে সম্প্রতি অক্ষম। অতএব এই উদ্দেশ্যও চলিল না।

কেহ প্রার্থনা করিয়াছিলেন, দুঃস্থ সাহিত্যসেবীদের সাহায্য করিয়া তাঁহাদিগের সাহিত্যসেবার সফলত্ববিধান পরিষদের প্রধান কর্ত্তব্য হওয়া উচিত। কিন্তু বর্ত্তমানকালে সাহিত্যপরিষৎ স্বয়ং ভিক্ষাভাণ্ড হস্তে গৃহস্থের দ্বারদেশে দণ্ডায়মান; সেই ভিক্ষাজীবীর অন্নে সাহিত্য-সেবীর পোষণ অসাধ্য।

একবার একজন সভ্য নীতিগ্রন্থ রচনা করিয়া সন্নীতির প্রচারের জন্য সাহিত্যপরিষৎকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন। বুদ্ধদেব ও যীশুখ্রীষ্ট যাহাতে সম্যক্ কৃতকার্য্য হন নাই, সাহিত্যপরিষৎ তাহাতে হস্তক্ষেপে সাহস করেন নাই।

এইরূপে নানাজনে সাহিত্যপরিষদের উদ্দেশ্য ও অভিসন্ধি সম্বন্ধে নানা কথা তুলিয়াছিলেন। ঐ সকল উদ্দেশ্য যে সাহিত্য-পরিষদের লক্ষ্যের বহির্ভূত, তাহা বলিতে পারি না। প্রস্তাবমাত্রই সাধু এবং সাধুসঙ্কল্পের সিদ্ধিতে যত্নবান্ হওয়াই উচিত;—সাহিত্য-পরিষদেরও উচিত।

প্রথমে যখন সাহিত্য পরিষদের সৃষ্টি হয়, তখন সুবিখ্যাত ফরাসী আক্লাডেমির আদর্শ অনেকের মনে ছিল। এমন কি সাহিত্য পরিষদের ইংরেজি নাম—Bengal Acadamy of Literature—সেই আদর্শেই প্রস্তুত হইয়াছিল। ফরাসী আকাডেমি যে উদ্দেশ্য লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই উদ্দেশ্য সাধনে কতদূর সফল হইয়াছেন, ঠিক্ জানি না। হইয়া থাকিলেও হাতীর অনুকরণ মূষিকের পক্ষে বিজ্ঞানুমোদিত নহে।

উদ্দেশ্য যাহাই হউক, বঙ্গসাহিত্যের উন্নতিসাধনার্থ সাহিত্য-পরিষৎ এ পর্য্যন্ত যে কাজ করিয়াছিলেন, তাহাতে দৃষ্টি রাখিয়া উক্ত সভাকে নিম্নোক্তস্বরূপ প্রশংসাপত্র দেওয়া যাইতে পারে। প্রথম সাহিত্য পরিষৎ কলিকাতার সাহিত্যসেবীদিগের ও বাঙ্গালা সাহিত্যে অনুরাগী ব্যক্তিদিগের প্রধান সম্মিলন স্থান। এইখানে তাঁহারা প্রতি মাসে অন্ততঃ একবার উপস্থিত হইয়া পরস্পর আলাপ পরিচয় করেন, কাব্য দর্শন, ইতিহাস, ব্যাকরণ ইত্যাদি নানা শাস্ত্রের আলোচনা করিয়া থাকেন। বলা বাহুল্য এইরূপ একটি সাহিত্যিক আড্ডা নানা কারণে বিশেষ বাঞ্ছনীয়। সাহিত্যসেবীদের সমাজে পরস্পর প্রীতি-

বন্ধনের ইহা একটা সমীচীন উপায়। উদ্দেশ্য মহৎ। দ্বিতীয়, এ দেশের ইংরেজি, সংস্কৃত ও বাঙ্গালা শিক্ষাপ্রণালীর সঙ্গে বাঙ্গালা সাহিত্যের সম্বন্ধ অতি নিকট। গবর্ণমেণ্ট ও বিশ্ববিদ্যালয় এই শিক্ষাপ্রণালীর পরিচালক। সাহিত্য পরিষৎ গবর্ণমেণ্টের ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা-নীতির উপর চক্ষু রাখিয়া বসিয়া আছেন। সাহিত্যপরিষদের চেষ্টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট বাঙ্গালা শিক্ষার কিঞ্চিৎ আদর হইয়াছে, সাহিত্য-পরিষদের প্রার্থিত শিক্ষা সংস্কার অনেক স্থলে গবর্ণমেণ্টের অনুমোদিত হইয়াছে। তৃতীয়, সাহিত্যপরিষৎ বাঙ্গালীর পরিচালিত একমাত্র বৈজ্ঞানিক সভা; এবং বর্ত্তমান কালে উহার উপযোগিতা ও আবশ্যকতা সাধারণকে একটু স্পষ্ট করিয়া বুঝান আবশ্যক।

একমাত্র বৈজ্ঞানিক সভা বলিলে প্রথমেই ডাক্তার সরকারের প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞান সভার কথা মনে আসে। উক্ত মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞান সভা পদার্থবিদ্যা, রসায়নশাস্ত্র, শারীরতত্ত্ব প্রভৃতি বিজ্ঞানের আলোচনা করেন। আলোচনা সম্প্রতি ছাত্রবর্গকে তত্তৎ বিষয়ে উপদেশদানে পরিণত, বিজ্ঞান চর্চ্চা বা বিজ্ঞানশাস্ত্রের অনুশীলন বিজ্ঞান সভার প্রতিষ্ঠাতার অভীপ্সিত থাকিলেও উহা অর্থাভাবে কার্য্যে পরিণত হয় নাই। সাহিত্যপরিষৎ পদার্থবিদ্যা বা তৎশ্রেণিস্থ বিজ্ঞানের অনুশীলন করেন না। কিন্তু স্বদেশের ভাষা স্বদেশের সাহিত্য ও স্বদেশের ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ের বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে অনুশীলন করিয়া থাকেন। এ বিষয়ে সাহিত্য পরিষদের আদর্শ অনেকটা বাঙ্গলার এশিয়াটিক সোসাইটির মত। ঐ প্রাচীন সোসাইটি এশিয়ার ভূতত্ত্ব ও উদ্ভিৎতত্ত্বের আলোচনা করিয়া থাকেন, মাঝে মাঝে এক আধটা রসায়ন শাস্ত্রের বা গণিত শাস্ত্রের প্রবন্ধ বাহির করিয়া আমোদ বোধ করেন, কিন্তু এশিয়া মহাদেশের এবং মুখ্যতঃ ভারতবর্ষের সমাজতত্ত্ব, ইতিহাস, পুরাতত্ত্ব, সাহিত্য ও ভাষার অনুশীলন করিয়া

এশিয়াটিক সোসাইটি পণ্ডিতসমাজে প্রতিষ্ঠা ও কীর্ত্তি অক্ষয় করিয়াছেন। সোসাইটির পত্রিকায় যে সকল ব্যাঙের ও ফড়িঙের কথা প্রকাশিত হয়, তাহা বিজ্ঞানশাস্ত্রে বড় একটা বিস্ময় উৎপাদন করে নাই ; কিন্তু সার উইলিয়াম জোনস্ ও কোলব্রুক ও প্রিন্সেপ প্রভৃতির কীর্ত্তিকথা পৃথিবী ব্যাপিয়া ঘোষিত হইয়াছে।

এসিয়াটিক সোসাইটি মুখ্যতঃ ভারতবর্ষের জন্য, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ মুখ্যতঃ বাঙ্গালার জন্য আপনার চেষ্টা আবদ্ধ রাখিয়াছেন। ভারতবর্ষের সাহিত্য ইতিহাস ও সমাজতত্ত্ব বৃহৎ ব্যাপার ; উহাতে হস্তক্ষেপে যে ক্ষমতার প্রয়োজন, তাহা সাহিত্য পরিষদের নাই। কাজেই সাহিত্য পরিষদের এই সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রেই আবদ্ধ থাকা উচিত মনে করি। আবার এসিয়াটিক সোসাইটি তাঁহার বৃহৎ কারখানা লইয়াই এত ব্যস্ত, যে ক্ষুদ্র বাঙ্গালার ইতিহাস, বাঙ্গালার সাহিত্য, বাঙ্গালার ভাষা অদ্যাপি সম্যক্‌রূপে আলোচনা করিতে সমর্থ হয় নাই। সাহিত্য পরিষদের মত একটা স্বতন্ত্র সমাজ ইহা লইয়া নিযুক্ত থাকেন, ইহা বাঞ্ছনীয়।

বাঙ্গালায় আলোচনার কি আছে? কি নাই? বাঙ্গলার ইতিহাসের আমরা কি জানি? বাঙ্গালীজাতির কিরূপে উৎপত্তি হইল, কে বলিতে পারে? ইহার কতটুকু আর্য্য, কতটুকু অনার্য্য, কে বলিতে পারে? বঙ্গে আর্য্যসভ্যতার বিস্তার কবে আরম্ভ, কিরূপে আরম্ভ, কে বলিতে পারে? বাঙ্গালা ভাষার উৎপত্তি কবে, কিরূপে হইল? লক্ষ্মণ সেনের সময় বাঙ্গালা ভাষা কিরূপ ছিল, জানিবার উপায় আছে কি? বাঙ্গালা ভাষায় অনার্য্য শব্দ কত প্রবেশ করিয়াছে, তাহা কে বলিতে পারে? যেসকল অনার্য্য জাতি এই শব্দসম্পত্তি ভাষায় দিয়াছে, তাহারা গেল কোথায়? তাহাদের বংশধর কোথায়? বাঙ্গালার আচার ব্যবহার পূজা পার্ব্বণ পশ্চিম হইতে

কতটুকু বিভিন্ন—কেন বিভিন্ন— কবে হইতে বিভিন্ন, ইহা কে বলিতে পারেন?

একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। বাঙ্গালী হিন্দুর জাতীয় উৎসব দুর্গোৎসব। এখন আশ্বিনে অম্বিকা পূজা প্রতি ঘরে ঘরে—এই পূজা কোন্ দিন কিরূপে বাঙ্গালায় প্রচলিত হইল? জরাসন্ধের সময়ে ছিল কি? অশোকের সময়ে ইহা ছিল কি? পালরাজার ও সেনরাজার সময়ে এই মহামহোৎসব কি সম্পাদিত হইত? যাঁহারা 'রাবণস্য বধার্থায়' শ্লোক তুলিয়া দুর্গোৎসবকে ত্রেতাযুগের আবিষ্কৃত পূজা বলিয়া নিশ্চিন্ত হইবার চেষ্টা করেন, তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে পারি, এই ত্রেতাযুগের পূজা সমস্ত ভারতবর্ষ ত্যাগ করিয়া এই বাঙ্গালার কোণ আশ্রয় করিল কেন?

ইতিহাস আলোচনার দিকে আমাদের মতি একটু আকৃষ্ট হইয়াছে আনন্দের বিষয়। ৺রজনীকান্ত গুপ্ত স্বাধীনভাবে সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাস আরম্ভ করেন; তাঁহার সম্বল ছিল কিন্তু ইংরেজের লেখা বহি। তার পর অক্ষয় বাবু, নিখিল বাবু, কালীপ্রসন্ন বাবু, কেবল ইংরেজের বহির উপর নির্ভর না করিয়া তাহার মূল অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন; কিন্তু এই ইতিহাস ইংরেজ শাসনের ইতিহাস ও মুসলমানের শাসনের ইতিহাস। ইহার মূল্য আছে; কিন্তু উহা আমাদের জাতীয় ইতিহাস নহে। আমাদের জাতীয় ইতিহাস এখনও আলোচিত হয় নাই। নগেন্দ্র বাবু কিঞ্চিৎ সূত্রপাত করিয়াছেন মাত্র। আশা করি, তিনি দীর্ঘজীবী হইয়া সিদ্ধিলাভ করুন। দীনেশ বাবু আমাদের সাহিত্যের ইতিহাস লিখিয়াছেন বলিলে ভুল হয়, তিনি আমাদের প্রাচীন সাহিত্যের খনি আবিষ্কার করিয়াছেন বলাই সঙ্গত। এখন সেই খনি হইতে বিবিধ মণিরত্ন, কয়লা প্রস্তর সংগৃহীত হইতেছে মাত্র। সাহিত্য-পরিষৎ এই সংগ্রহ কার্য্য প্রধান ব্রত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন

সাহিত্যপরিষদের এই মহৎ ব্রতে কৃচ্ছ্র সাধন আবশ্যক। সাধনা সিদ্ধির পথে অগ্রসর হউক। এই সাহিত্যের খনি হইতে যাহা বাহির হইবে, তাহা অবলম্বন করিয়া বাঙ্গালা ভাষার উৎপত্তি ও বৃদ্ধির ইতিহাস ভবিষ্যতে লিখিত হইবে।

বাঙ্গালা দেশের এই ভাষার ইতিহাস, সাহিত্যের ইতিহাস, সমাজের ইতিহাস, আমোদের ইতিহাস, ধর্ম্মের ইতিহাস সঙ্কলন সাহিত্য পরিষদের মুখ্য উদ্দেশ্য হওয়া উচিত, ইহাই আমার ধারণা। এ স্থানে কার্য্যক্ষেত্র বিস্তীর্ণ—এখানে এখন দাঁড়াইয়া সীমা দেখিতে পাই না। খাটিবার জন্য লোক চাই—উচিত সংখ্যক লোক দেখিতে পাই না। যাহা হউক, মজুর খাটা আরম্ভ হইয়াছে, ইহার আবশ্যকতা অনেকে বুঝিয়াছেন, ইহাই আপাততঃ পরম লাভ বিবেচনা করি।

সাহিত্য পরিষৎ অন্য কাজ করুন, তাহাতে ক্ষতি নাই। পদার্থ-বিদ্যা রসায়ন জ্যোতিষ বেদ বেদান্ত সম্বন্ধে প্রবন্ধ পড়িয়া চিত্তবিনোদন করুন, আপত্তি নাই। কিন্তু ঐ সকল ক্ষেত্র সাহিত্যপরিষদের নিজের নহে। পরিষৎ যেন নিজের কাজ না ভুলিয়া যান, ইহাই প্রার্থনা করি।

চাই এখন বঙ্গবাসীর সহানুভূতি—লোকবল চাই, আর অর্থবল চাই। গরিবের দেশের গরিব সভা ভিক্ষার ঝুলি স্কন্ধে করিয়া স্বদেশীর নিকট দাঁড়াইয়াছে; বাঙ্গালা ভাষায় যাঁহার অনুরাগ আছে, বাঙ্গালা সাহিত্যে যাঁহার শ্রদ্ধা আছে, বাঙ্গালীর ইতিহাস যিনি জানিতে চাহেন, তিনি সেই ঝুলিতে তাঁহার মুষ্টিভিক্ষা অর্পণ করুন। পরিষৎ সকলকেই সমাদরে আহ্বান করিবে। ভিক্ষাভাণ্ডে মাসে মাসে আট আনা প্রদান করিয়া তাঁহারা সাহিত্যপরিষদের সাধু সঙ্কল্পে সহায়তা করুন।

যাঁহারা এই ভিক্ষাদানে অসমর্থ, তাঁহারাও পরিশ্রম দিয়া সাহায্য

করিতে পারেন। পুরাতন পুঁথি সংগ্রহ করিয়া দিন; প্রাদেশিক শব্দ সংগ্রহ করিয়া, ব্রতকথা, গ্রাম্য কবিতা, গ্রাম্য গান, ছেলেভুলান গল্প, গ্রাম নগর পীঠস্থান দেবস্থান প্রভৃতির বিবরণ দেবস্থানীয় ইতিহাসের টুকরা, কিংবদন্তীর ভগ্নাংশ, যাহা কিছু দুই চোখে দেখিতে পান, দুই হাতে কুড়াইয়া পান, পরিষদের কার্য্যালয় লক্ষ্য করিয়া সবেগে নিক্ষেপ করিতে থাকুন। পরিষৎ ভিক্ষুক, পরিষৎ তাঁহাদিগকে বেতন দিবার ক্ষমতা রাখেন না, তাঁহারা দয়া করিয়া পরিষৎকে ভিক্ষা দিন। ভারতীর আশীর্ব্বাণী তাঁহাদের পুরস্কার হইবে।

উপসংহারে একবার ক্ষণেকের মত সম্পাদকীয় সাজ গ্রহণ করিয়া বঙ্গবাসীকে বঙ্গসাহিত্যের সেবার জন্য আহ্বান করিতেছি—নিতান্ত সম্পাদকোচিত ভাষায় তাঁহাকে জানাইতেছি যে, বঙ্গীয়সাহিত্যপরিষদের কার্য্যস্থান ১৩৭।১ কর্ণোয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ও ভিক্ষাপাত্র হস্তে লইয়া তত্র উপবিষ্ট সম্পাদক—

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।

কংগ্রেস ও স্বায়ত্তশাসন।

কিছুকাল ধরিয়া দেশের সুসন্তানদের মনে একটা আবেগ উপস্থিত হইয়াছে—কি যেন হওয়া উচিত, কি যেন হইতেছে না,—কি না জানি করা যায়, কি জানি করিতে পারি?

"নিউ ইণ্ডিয়া" পত্রিকায় কয়েক মাস ধরিয়া প্রথমে এইরূপ একটা আবেগের, সন্দেহের ও দ্বিধার ধারা মৃদুস্বরে প্রবাহিত হইতে থাকে। মৃদুস্বরে বলিতেছি, কেন না বহুশ্রুত নহে; "নিউ ইণ্ডিয়া"র কতিপয়

গ্রাহক ও অনুগ্রাহকগণের মধ্যেই তাহা স্বল্প মাত্র ঝঙ্কার করিয়া মিলাইয়া গিয়াছিল। গতবৎসর বর্দ্ধমানে প্রাদেশিক সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী সেই ধারাটা সম্বন্ধে বহুলোকের শ্রুতি-গোচরে প্রবাহিত করাইয়াছিলেন।

তার পর বহুলোকের পক্ষপাতিতায় বহুবাদবিতণ্ডায় পুষ্ট সেই ধারাটি পুনরায় রবীন্দ্রনাথের "স্বদেশী সমাজ"-এর রূপ ধারণ করিয়া আরও প্রত্যক্ষভাবে দেশের সকলের সম্মুখে উপস্থিত হইল। সাপ্তাহিকের লেখক যাহা পারেন নাই, ব্যবহারজীবী যাহা পারেন নাই, কবির তুলিকা তাহা সাধন করিল। ভাষার লালিত্যে, বর্ণের বৈচিত্র্যে, ভাবের প্রাচুর্য্যে বিষয়টি আবালবৃদ্ধবনিতার মর্ম্মস্পর্শ করিল—এতদিন যাহা শুধু মস্তিষ্কের কোটরজাত ছিল, আজ তাহা হৃদয়কন্দরে নীড় রচনা করিল।

কবির কল্পনার বিরুদ্ধেও বাদি-বিবাদি-বিসম্বাদি-দলের অভাব হয় নাই। কিন্তু সব কেজো তর্কযুক্তির পরেও একটুখানি অবশেষ ভাব লোকের মনে রহিয়া গিয়াছে যে কবির কল্পনাটার কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে নানা গলদ থাকিলেও উহার ভিতর কিছু খাঁটি কথা আছে, সেটুকু খাঁটি সোণার মত, ফেলা যায় না। সেটুকু কি? ভাষার মোহন স্তূপ ভাঙ্গিয়া ঝাড়িয়া বাছিয়া সে সোনাটুকু তুলিয়া লইলে দেখা যায় উহা সেই পূর্ব্বেরই আবেগ—যেমনটি চলিতেছে তাহা অচল—ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ—সর্ব্বং আত্মবশং সুখং, সর্ব্বং পরবশং দুঃখং—এই তত্ত্বটি।

দ্বিধার আবর্ত্তে তরঙ্গিত হইয়া নানা লোকে নানা তীর খুঁজিতেছিলেন। তার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ যে তীর্থ দেখাইয়া দিয়াছিলেন, তাহার প্রতিষ্ঠা তখনও অবাস্তবরাজ্যে—সে তীর্থের একখানি ইটও এপর্য্যন্ত প্রস্তুত নাই। মাটি ছাঁচে ঢালা হইবে, পাঁজায় ইট পুড়িবে, এক

একখানি করিয়া ইট গাঁথা হইবে, তবে ঘাট প্রস্তুত হইবে; এবং তবে সে ঘাট সকলের ব্যবহারে আসিবে।

জাতীয় জীবনে এরূপ হওয়া অসম্ভব নহে। তবে প্রয়োজন বুঝিয়া নতূন গাঁথনিতে শক্তি ও কালক্ষয় করিতে হইবে। যদি বুঝি পুরাতন কোন গাঁথনিকে গড়িয়া পিটিয়া লইলে একই কাজ এমন কি বেশী কাজ হইতে পারে—তবে নতূনে শক্তির শ্রাদ্ধ করিতে কাহারও মন উঠিবে না।

পূর্ব্বেই জানাইয়াছিলাম আমার মতে কংগ্রেস আমাদের সেইরূপ একখানি পুরাতন গাঁথনি। ইহাকেই কাজে লাগাইয়া লওয়া হউক—ইহার উপর অনেকটা জাতীয় শক্তি উদ্যম ও প্রীতি ব্যয়িত হইয়াছে—সেটা বাজে খরচ করিতে পারা যায় না। শুধু নতূনত্বের খাতিরে নতূন পথে ছুটিলে ফললাভের সম্ভাবনা অল্প। কোন্ পথটা আমাদের জাতীয় জীবনের বিশবৎসরের শিক্ষা ও অভ্যাসের অনুকূল তাহাই দেখা যাউক—সেই পথে গেলেই আমরা অধিকতর সফিল্য লাভ করিব—প্রাকৃতিক নিয়মের অবশ্যম্ভাবী ফল ফলিবে।

আমার মত অনেকেই এইরূপ ভাবিয়াছিলেন। ভারতের সকল জাতির রক্তেমাংসে গড়া কংগ্রেসের মায়া তাঁহারা ত্যাগ করিতে পারিতেছিলেন না, এবং তাহা ত্যাগ করা অব্যবহারিকের কাজ মনে করিতেছিলেন। এই দলীয় কোন বিজ্ঞ বন্ধুর সহিত আলোচনা ক্রমে, কংগ্রেস-রূপ তৈরি যন্ত্রটির দ্বারা আমরা দেশের কতটা কাজ বাহির করিয়া লইতে পারি, সে সম্বন্ধে একটি সাঙ্গ-কল্পনায় উপনীত হওয় গেল। এ কল্পনাটির উদ্‌যাতা বন্ধুবর, আমি কেবল তাহা সাধারণ্যে প্রকাশের ভার গ্রহণ করিয়াছি।

এ সম্বন্ধে গত ভাদ্রের ভারতীতে আমি লিখিয়াছিলাম, "কনগ্রেসের সফলতা যেখানে, প্রকৃত হিসাবী হইয়া তাহারও প্রতি

দৃষ্টি রাখিয়া কাজ আদায় করিয়া লইতে হইবে। কংগ্রেস আমাদের একটি অনেক দিনের অনেক আয়োজনে তৈরি রথ,—চলিতেছে বিপথে ইহার উপর চড়িয়া সারথি হইয়া ইহাকে ঠিক পথে চালানর চেষ্টা হউক—রথখানা একবারে বিসর্জ্জন করা পাকা গৃহস্থের কাজ হইবে না।"

এখন সেই সারথ্য কিরূপে করিতে হইবে তাহাই আজিকার প্রস্তাবের বর্ণনীয় বিষয়। কংগ্রেসের উদ্দেশ্য দুইটি, তাহা সকলেরই স্বীকার্য্য। এক এই যে,—যেটা আমি বলি প্রধান—দেশের সমস্ত লোককে একত্রীকৃত করা, ভারতবর্ষের সকলকে একটা সাধারণ মিলন-ক্ষেত্রে দাঁড় করা, ঐকমতের সূত্রে সকলকে বাঁধিয়া ফেলা। দ্বিতীয় এই যে, সেই ঐকমত্যের চাপে সরকারকে নূতন বিধির প্রবর্ত্তন, কিম্বা প্রাচীন বিধির পরিবর্ত্তন—অথবা কোন বিশেষ রাজনীতির হেরফেরে প্রবৃত্ত করান।

কংগ্রেসের বর্ত্তমান পাণ্ডারা হয়ত দ্বিতীয়টিকেই তাঁহাদের মুখ্য কাজ বলিয়া ঘোষণা করিবেন, কিন্তু ফলের পরিচয়ে আমি উহাকে মুখ্য বলিয়া গণ্য করিতে পারিলাম না। দ্বিতীয় উদ্দেশ্যটি সম্বন্ধে কংগ্রেসের চেষ্টা ফলবতী হইয়াছে বলিয়াআমার ধারণা নহে। অনেকে হয়ত বলিবেন, কতকগুলি রাজবিধি কংগ্রেসের চেষ্টায় পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, যেমন সিবিল সার্ব্বিসের বয়স বৃদ্ধি ও লবণের ট্যাক্স কমান। কিন্তু তলাইয়া দেখিলেই দেখা যাইবে, গবর্ণমেণ্ট এ পর্য্যন্ত কংগ্রেসের কোন প্রার্থনায় ভ্রূক্ষেপ করেন নাই, আর এই দুইটা সম্বন্ধেও এমন কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না যে, কংগ্রেসের উত্তেজনাতেই গভর্ণমেণ্ট একার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন। আয় ব্যয়ের অবস্থা অনুকূল হইলে লবণের ট্যাক্স হ্রাস করা হইবে, গভর্ণমেণ্ট সর্ব্বদা একথা বলিয়া আসিয়াছেন। আর সিবিল সার্ব্বিসের বয়স কখনও বাড়িয়াছে, কখনও

কমিয়াছে—এ সম্বন্ধে এতবার এত অদলবদল হইয়াছে যে, তাহাতে কংগ্রেসের কোন হাত আছে মনে করার অপেক্ষা ভিতরে ভিতরে অন্য কোন গূঢ় কারণ ছিল তাহাই মনে করা সঙ্গত। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, কংগ্রেসের দ্বিতীয় উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কংগ্রেসকে অকৃতকার্য্যই বলিতে হইবে।

আর এক কথা; এক এক করিয়া যদি ধরা যায় তাহা হইলে আমরা দেখিতে পাইব, যতগুলি বড় বড় আন্দোলন হইয়াছে —তাহা দেশের সর্ব্বসাধারণেই করিয়াছে; কাগজ পত্রে ঘোরতর আন্দোলন আগে হইয়া থাকে, পরে তাহার সারাংশটুকু কংগ্রেসের প্রস্তাবে প্রতিবিম্বিত হয়; আন্দোলনের কার্য্য কংগ্রেস কিছুই করেন না, সেটা জনসাধারণেরই কার্য্য। উদাহরণস্বরূপ বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ, মিউনিসিপাল বিল প্রভৃতির উল্লেখ করা যাইতে পারে। জনসাধারণের আন্দোলনে যেখানে কিছু হয় না, সেখানে কংগ্রেসের আন্দোলনে যে কিছু কখন হইয়াছে ইহা আমরা দেখি নাই। আর ইহাই স্বাভাবিক। কংগ্রেস বৎসরে তিনটি দিনমাত্র বসে, সেই তিন দিনের মধ্যে সম্বৎসরের সাধারণ আলোচনার সারটুকু শুকনো কাটছাঁটাভাবে রেজলুসনের ছাঁচে ফেলিতে হয়। কংগ্রেসের যেটুকু প্রাণ, তাহা যথার্থ এই তিন দিনের,—আশ্বিনের দুর্গাপ্রতিমার মত; যদিও সেই তিন দিনের জন্য সমস্ত বৎসর ধরিয়া অনেকটা আয়োজন করিতে হয়। অর্থাৎ কংগ্রেসের হাত পা প্রভৃতি যতগুলি অবয়ব—প্রাদেশিক সমিতির বৈঠক, জেনারেল মিটিং প্রভৃতি—তাহাদের একমাত্র কাজ—এই তিন দিনের জন্য কংগ্রেসকে জীবন্ত করা। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, এই যে দেশজোড় কংগ্রেস যন্ত্রখানা খাড়া রহিয়াছে, তার সার্থকতা অতি অল্প। কংগ্রেসের শাখাসমিতি সম্বন্ধেও উপরোক্ত কথাগুলি প্রযুজ্য।

কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সাধারণ লোকের যে সকল অভিযোগ আছে—যথা ইহার আভ্যন্তরীণ প্রণালী ভাল নহে, প্রতিনিধি মনোনীত করিবার রীতি যথাযথ নহে, ইত্যাদি—সে সব সম্বন্ধে আমার এখানে কিছু বক্তব্য নাই। আমরা ধরিয়া লইতেছি যে, হয় এসব কাজ সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়, না হয় প্রয়োজনীয় সংশোধন করা যাইতে পারে এবং করা হইবে। আমরা কেবল কংগ্রেসের কার্য্যপ্রণালী যদি সম্পূর্ণ আদর্শানুযায়ীও হয়, তাহা হইলেও তাহার ফলাফল কতটুকু তাহাই আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি।

কংগ্রেসের বর্ত্তমান লক্ষ্য এবং কার্য্যের রীতি বজায় রাখিলে ইহার যে আদর্শ অবস্থা আমরা দেখিতে পাইতেছি তাহা এই যে, ভারতবর্ষের সমস্ত জাতির সমবেত চেষ্টা ও শক্তি গভর্ণমেণ্টের কাছে আবেদন করার জন্য নিয়োগ করা। আমরা পূর্ব্বেই আলোচনা করিয়া দেখিলাম, সেইরূপ আবেদন এক প্রকার নিষ্ফল। তবে কি হতাশ-ভাবে কংগ্রেস উঠাইয়া দেওয়ার প্রস্তাব করাই সঙ্গত? তাহা নহে। আমরা প্রথমেই বলিয়া রাখিয়াছি যে, কংগ্রেসের দুইটি উদ্দেশ্য, দ্বিতীয় উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আমরা এতক্ষণ আলোচনা করিলাম; কিন্তু প্রথম উদ্দেশ্যটির সম্বন্ধে—যেটি আমাদের মতে প্রধান উদ্দেশ্য—আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, কংগ্রেস আশাতীত কৃতকার্য্যতা লাভ করিয়াছেন। বিশ বৎসরের আগেকার লোকের কাছে শুনিতে পাই, এখন তাঁহারা সমগ্র ভারতবাসীর মধ্যে যে ঐক্যবোধ প্রত্যক্ষ করিতেছেন, কংগ্রেসের পূর্ব্বে তাহা তাঁহারা কল্পনা করিতেও ভরসা পাইতেন না। তাহা হইলে দেখিতেছি যে, দেশে একটা বিরাট শক্তির উদ্রেক হইয়াছে। এই কংগ্রেসের দরুণ অন্ততঃ এইটুকু হইয়াছে যে, আজ ভারতবর্ষের সমস্তজাতি এক সঙ্গে মিলিয়া এক উদ্দেশ্যে কাজ করিতে পারে,—ইহাই একটা মহাশক্তি। এই

শক্তি যখন আমাদের আসিয়াছে, তার দ্বারা কতকগুলি সাধনের সম্ভাবনাও জাগিয়াছে—কিন্তু কাজে কিছুই করা হইতেছে না, সুতরাং সেই-শক্তিটা বাজে খরচে যাইতেছে। এখন কিরূপে এই শক্তিটা ব্যর্থ না হয়, কিরূপে তাহাকে ফলবতী করা যাইতে পারে, তাহাই আমাদের আলোচ্য।

পৃথিবীতে অনেক জিনিষ আছে যাহা আমাদের স্বায়ত্ত। আত্মনির্ভর, উত্তমশীলতা, উচ্চ লক্ষ্যে শক্তি নিয়োগ প্রভৃতি গুণ আদৌ গভর্ণমেণ্টের সাহায্যের উপর নির্ভর করে না; এবং নিজেদের ও নিজেদের দেশের উন্নতির জন্য আমরা এসকল গুণ এমন অনেক বিষয়ে ব্যবহার করিতে পারি, যাহার সঙ্গে গভর্ণমেণ্টের কোন যোগাযোগ নাই বা যোগাযোগ থাকিবার প্রয়োজন নাই। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে, আমরা নিজেদের ইউনিভার্সিটি করিতে পারি, বিদেশে ছাত্র পাঠাইতে পারি, লোক শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে পারি, গ্রাম্য সমিতি স্থাপন করিয়া জল কষ্ট, পথকষ্ট প্রভৃতি নিবারণ করিতে পারি। আমরা ট্যাক্স ধার্য্য করিয়া দেশীয় শিল্পকে রক্ষা করিতে না পারিলেও ঘর হইতে bounty দিতে পারি, শিল্পশালা খুলিয়া শিল্প শিখাইবার ব্যবস্থা করিতে পারি। অনেক সময় সাধ্যানুসারে আমাদের মধ্যে কেহ কেহ ব্যক্তিগত ভাবে কিম্বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায় গঠন করিয়া এই সকল বিষয়ে চেষ্টা করিয়াও থাকি। কিন্তু আমরা সর্ব্বতোভাবে দুর্ব্বল জাতি; আমাদের অর্থবল, মনোবল, উদ্যমের বল এ সকলই নিতান্ত ক্ষীণ। আমরা আরম্ভ করিয়া শেষ করিয়া উঠিতে পারি না। কিন্তু আমাদের সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শক্তি যদি একটা কেন্দ্রস্থ করিয়া কাজ করিতে পারা যায়, তাহা হইলে কৃতকার্য্য হওয়ার কতকটা সম্ভাবনা থাকে।—যেমন ছোট ছোট নদী বর্ষাকালে কিছু কালের জন্য স্ফীত হইয়া গ্রীষ্মের দিন পড়িলেই শুকাইয়া যায়, কিন্তু সেইরূপ

অনেকগুলি ছোট নদী মিলিত হইয়া যখন একটি বড় নদীতে পরিণত হয়, তখন সে বড় নদী চিরকালই স্রোতস্বতী থাকে। আমাদের ব্যক্তিগত বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায়বিশেষের যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চেষ্টা তার প্রাণ বেশী দিন থাকে না, ইহা ক্রমাগতই দেখিয়া আসিতেছি ;—এবং ইহাও দেখিতেছি যে, এইরূপে অনেকটা শক্তি ক্রমাগত বৃথা খরচ হইয়া যাইতেছে। আমরা প্রত্যেকেই দুই একবার আরম্ভ করিয়া অকৃতকার্য্য হইলেই স্বভাবতঃ নিরুৎসাহ হইয়া হাল ছাড়িয়া বসিয়া থাকি। কিন্তু যদি আমাদের সকলের শক্তি একত্র মিলাইয়া কাজ আরম্ভ হয়, তবে শীঘ্র হাত গুটান যাইবে না।

এখন সকলকে মিলাইয়া কাজ করিবার একটা যন্ত্র আমাদের হাতের কাছেই আছে, সেই যন্ত্র কংগ্রেস। তবে কোন একটা যন্ত্রকে যেমন নূতন কাজে লাগাইতে হইলে কখনও তার দুই এক অংশ বদল করিবার প্রয়োজন হইতে পারে, সেইরূপ হয়ত কংগ্রেসের উপর কোন নূতন কার্য্য চাপাইতে হইলে তাহারও দুই এক স্থানের একটু পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক হইবে।

এখন দেখা যাউক কংগ্রেস কি প্রকারের কার্য্য হাতে লইতে পারে এবং তাহা কিরূপে চালাইতে পারে। প্রথমতঃ কোন কিছুতেই হাত দিলে টাকার দরকার, সেই টাকা কংগ্রেস কিরূপে পাইবে আর কি প্রকারে তাহা খাটাইবে? টাকা কি প্রকারে পাওয়া যাইবে তাহা পরে বলিব। এখন দেখা যাক্ টাকা যদি তাঁহাদের হস্তগত হয় তাহা হইলে তাঁহারা কি করিতে পারেন। আর যাহা করিতে পারেন তার কি পর্য্যন্ত সার্থকতা—অর্থাৎ লক্ষ্যের দিকে অগ্রসরতা।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, অনেক বিষয় আছে যাহা আমাদের নিজেদের আয়ত্তের অধীন। সেই সকল কাজ কংগ্রেসের যন্ত্রের দ্বারা করিতে পারিলে সবচেয়ে কৃতকার্য্য হওয়ার সম্ভাবনা। কংগ্রেস যদি

সেই সকল কাজ নিজের হাতে গ্রহণ করিয়া চালান, তাহা হইলে আমাদের যথার্থ স্বায়ত্তশাসন হইবে, আত্মোন্নতি বিষয়ে তাহা হইলে আমরা একটি ছোট খাট রিপাব্লিক হইয়া দাঁড়াইব। এই স্বায়ত্ত-শাসনের সঙ্গে গবর্ণমেণ্টের কোন যোগাযোগ থাকিবে না, কোন সংঘর্ষও থাকিবে না; এই সাধারণতন্ত্রের ইম্পিরিয়াল গবর্ণমেণ্ট হইবে কংগ্রেস; তার প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট প্রাদেশিক সমিতিগুলি। প্রাদে-শিক সমিতির অধীনে জেলা-সমিতি জেলার উন্নতি বিধানের ভার গ্রহণ করিবেন, এবং জেলা-সমিতির নীচে কতকগুলি পল্লী লইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখা সমিতি গঠিত হইতে পারে, আরও যদি বিস্তৃত করা যায়, তবে গ্রাম্য পঞ্চায়ৎ পর্য্যন্ত আমরা পৌঁছিব। ইম্পিরিয়াল গবর্ণমেণ্ট যেরূপ প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টগুলিকে স্বীয় ভাণ্ডার হইতে প্রাদেশিক অনুষ্ঠানের জন্য রাজস্বের অংশ নির্দ্ধারিত করিয়া দেন, কংগ্রেসও সেইরূপ প্রাদেশিক সমিতির হাতে তার ইম্পিরিয়াল ফণ্ড হইতে কিছু কিছু অংশ নির্দ্ধারিত করিয়া দিতে পারে, প্রাদেশিক সমিতি-গুলিও আবশ্যক অনুসারে অধীনস্থ শাখাগুলির প্রতি সেইরূপ ব্যবস্থা করিতে পারে। সংক্ষেপে ইহাই কার্য্য প্রণালী। কিরূপ কার্য্য এই প্রণালীর দ্বারা চালিত হইবে, তাহার আভাসও পূর্ব্বে দিয়াছি। সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্যের মধ্যে নয়।

এখন আমরা মোটামুটি পাইলাম, শাসনকর্ত্তা ও শাসনতন্ত্র। এখন প্রজা কোথায় আর রাজকোষ কোথায়? এইরূপ স্বেচ্ছাতন্ত্রের স্বেচ্ছা প্রজা হইতে হইবে। প্রথমতঃ জেলায় জেলায় তালিকা প্রস্তুত করা আবশ্যক—কাঁহারা কাঁহারা স্বেচ্ছায় এইরূপ সমাজের উপর আত্মসমর্পণ করিতে পারেন। এই প্রজারা ডিষ্ট্রিক্ট কাউন্সিল বা জেলাসমিতির সদস্য নির্ব্বাচন করিবেন। ডিষ্ট্রিক্ট কাউন্সিলসগুলি প্রভিন্সল কাউন্সিল বা প্রাদেশিক সমিতির এবং প্রভিন্সল কাউন্সিলস-

গুলি ইম্পিরিয়াল কাউন্সিল অথবা কংগ্রেসের সদস্য নির্ব্বাচনা করিবেন। এই সমস্ত স্বেচ্ছাপ্রণোদিত প্রজারা স্বীকার করিবেন যে, কংগ্রেস যে হারে আমাদের এই রিপাব্লিকের ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য কর নির্দ্ধারণ করেন, তাঁহারা সেই হারে কর দিবেন। আয়ের উপর শতকরা মাত্র আট আনা করিয়া যদি কর নির্দ্ধারণ করা হয়, তাহা হইলেও মোটের উপর যদি সমস্ত ভারতবর্ষে শুধু ত্রিশ হাজার মাত্র প্রজা থাকে এবং যদি গড়ে তাহাদের প্রত্যেকের পঞ্চাশ টাকা করিয়াও আয় হয়, তাহা হইলেও কংগ্রেসের আয় হইবে বাৎসরিক ৯০,০০০৲ টাকা। কিন্তু যাহা ধরা গিয়াছে তাহা এত অল্প, যে আশা করা যায় ফলে ইহার অপেক্ষা অনেক বেশী আয় দাঁড়াইবে, এবং এই আয় হইতে কংগ্রেস অনেক কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন।

এইত গেল কল্পনাটি। এখন অনেকে আশঙ্কা করিতে পারেন যে ইহা কার্য্যে পরিণত করা কঠিন হইবে, স্বেচ্ছানুগত প্রজাদের নিকট স্বেচ্ছাধীন কর আদায় করা দুঃসাধ্য হইবে, এবং অবশেষে এই ভাবের অন্যান্য প্রস্তাব যেরূপ কল্পিত হইয়া নিরর্থক হইয়া গিয়াছে এটিও সেইরূপ হইবে। এই আশঙ্কার বিরুদ্ধে আমার শুধু এইটুকু মাত্র বলিবার আছে যে, এখন আমরা ছোট ছোট নানা কার্য্যে ক্রমাগত শক্তি ও অর্থ বিক্ষিপ্ত করিয়া বিরক্তি ছাড়া আর কোন লাভ পাই না। কখন্ কোথায় পাঁচ জন কি দশ জন মিলিয়া এক নূতন সভা স্থাপন করিয়া, আমাদের কাছে চাঁদার খাতা লইয়া উপস্থিত হয়, তার কিছু স্থিরতা নাই, কাজেই চাঁদার খাতা দেখিলে পলাইবার চেষ্টা ছাড়া উপায় নাই। কিন্তু যখন একটা বড়, দেশব্যাপী অনুষ্ঠান—স্বতঃপ্রবৃত্ত কার্য্যে উদ্যোগী দেখিতে পাইব, তখন যৎসামান্য কর দিতে বোধ হয় অনেকেই কুণ্ঠা অনুভব করিবেন না। এবং এরূপ একটা বৃহৎ কার্য্যের সহযোগিতায়—পুঞ্জীভূত শক্তির সহিত ব্যক্তিগত

উদ্যম ও শক্তিও যোগ দিতে আকাঙ্ক্ষিত হইবে। আর যদি এই ভাবের একটা বিরাট অনুষ্ঠানের দ্বারাও আমরা সফল না হই, তবে ছোট ছোট অনুষ্ঠানে সফলতার আশা আরো অল্প, অতএব একেবারে হতাশ হইয়া সমস্ত উদ্যম পরিত্যাগ করা ভিন্ন উপায়ান্তর থাকে না।

অন্যদিকে দেখিতে হইবে, আমরা কৃতকার্য্য হইলে কতদূর ফল ফলিবে। প্রথমতঃ স্বায়ত্ত শাসন আমরা দানস্বরূপ না পাইয়া নিজের উদ্যমে নিজের জোরে যথার্থরূপে অধিকার করিব। এক রকমে গভর্ণমেণ্টের সহযোগী এবং সমকক্ষ হইব। আর ইহাতে যদি আমরা যথার্থ যোগ্যতা দেখাইতে পারি, তাহা হইলে কয়েক বৎসর পরে অন্যান্য বিষয়েও নূতন নূতন অধিকার আমরা সজোরে দাবী করিতে পারিব। অক্ষমতার অছিলা করিয়া গভর্ণমেণ্ট আমাদের দাবী আর উপেক্ষা করিতে পারিবেন না। জোর যার মুলুক তার। যেদিন আমাদের একযোগে কাজের নৈতিক জোর পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইবে, সেদিন গভর্ণমেণ্টের একতরফা ব্যবস্থারও পরিবর্ত্তন হইবে।

একটি কথা বলিতে বাকী রহিয়া গেল। এ শাসনতন্ত্রে দণ্ডের ব্যবস্থাটা কিরূপ? সামাজিক জীবের যাহা শাস্তি—নামকাটা, দল-চ্যুতি এবং তাহার ঘোষণা ছাড়া আপাততঃ আর কিছু নহে। ক্রমে যদি এই রিপ্লাবিক গবর্ণমেণ্টের সহযোগী হইয়া উঠিতে পারে, তবে স্বীয় অস্তিত্বের স্থায়িত্ব বিধায়ে কতকগুলি বিশেষ বিধি প্রচলনের ব্যবস্থাও আদায় করিয়া লইবে।

শ্রীসরলা দেবী।

অমোঘ বজ্র।

(বৌদ্ধ প্রচারক—খৃঃ অব্দ ৭০৪-৭৭৪)

প্রতমসাচ্ছন্ন সংসারে জ্ঞানালোক বিতরণ করাই বৌদ্ধধর্ম্ম-প্রচারকগণের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ছিল। তাঁহারা এই লক্ষ্য-সিদ্ধির নিমিত্ত ভারতের নানা স্থানে বিচরণ করিয়া বেড়াইতেন এবং সময়ে সময়ে ভারতের বহিঃপ্রদেশে গমন করিয়া তথায় বুদ্ধের ধর্ম্ম প্রচার করিতেন। উদ্যান, খোটান, খাসগড় তুরস্ক, তিব্বত, মঙ্গোলিয়া, চীন, জাপান, ব্রহ্ম, শ্যাম, সিংহল, যাব প্রভৃতি স্থানসমূহে বৌদ্ধধর্ম্ম এইরূপেই প্রচারলাভ করিয়াছিল। কুমারজীব, বুদ্ধঘোষ, অনুরুদ্ধ স্থবির, রামচন্দ্র কবিভারতী প্রভৃতির জীবনচরিতে ইহার সুস্পষ্ট উদাহরণ প্রদর্শিত হইয়াছে। অদ্য যে মহাত্মার জীবনবৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ হইতেছে, তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্র চীনদেশ। এই মহাত্মার নাম অমোঘবজ্র।

অমোঘবজ্র জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন। ৭০৪ খৃষ্টাব্দে উত্তরভারতে* তাঁহার জন্ম হয়। তিনি স্বীয় গুরু বজ্রবোধির পদাঙ্কানুসরণ করিয়া ৭১৯ খৃষ্টাব্দে চীনদেশে উপস্থিত হন। বজ্রবোধি চীনদেশে বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন; কিন্তু ৭৩২ খৃষ্টাব্দে তিনি অত্যন্ত কঠিন রোগে আক্রান্ত হইয়া আসন্নমৃত্যু হন। ইহাতে তদানীন্তন চীন সম্রাট সাতিশয় উদ্বিগ্ন হন। বজ্রবোধির মৃত্যু হইলে চীন দেশে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব কমিয়া যাইবে, এই আশঙ্কা করিয়া চীন সম্রাট্ বৌদ্ধ পুস্তক সংগ্রহ করিবার জন্য অমোঘবজ্রকে ভারতবর্ষ ও সিংহলে প্রেরণ করেন। বহু গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া অমোঘবজ্র ৭৪৬ খৃষ্টাব্দে চীন-রাজধানীতে ফিরিয়া যান। ইহাতে চীনরাজ (হুয়েন্ চুঙ্) অতীব সন্তুষ্ট হইয়া

* Eitel ও Mayers বলেন অমোঘবজ্রের জন্মস্থান সিংহল। কিন্তু এই মত নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক।

তাঁহাকে "প্রজ্ঞাকোশ" এই উপাধি প্রদান করেন। ৭৪৯ খৃষ্টাব্দে তিনি স্বদেশে প্রত্যাগমন করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হন। কিন্তু তিনি দক্ষিণসমুদ্রের সন্নিহিত প্রদেশে আগমন করিতে না করিতেই চীনরাজ তাঁহাকে আরও কিছুকাল চীনে অবস্থান করিবার আদেশ করেন। তদনুসারে তাঁহাকে কয়েক বৎসর দক্ষিণ চীনে অপেক্ষা করিতে হয়। ৭৫৬ খৃষ্টাব্দে সম্রাটের অদেশে তিনি চীনের রাজধানীতে ফিরিয়া যান। ৭৬৫ খৃষ্টাব্দে তদানীন্তন চীন সম্রাট্ তাইচুঙের জন্ম-মহোৎসব হয়। এই উৎসব উপলক্ষে অমোঘবজ্র সম্রাটের নিকট হইতে "ত্রিপিটকভদন্ত" এই উপাধি লাভ করেন। ইহার পূর্ব্বেই অমোঘবজ্র অনেক সংস্কৃত গ্রন্থ চীনভাষায় অনুবাদিত করিয়াছিলেন। এই সময়ে তিনি স্বানুবাদিত কতিপয় গ্রন্থ সম্রাটের ধর্ম্মাধিকরণে উপস্থিত করেন। অনুবাদ-গ্রন্থের ভূমিকায় অমোঘবজ্র নিম্নলিখিত ভাবে আত্মপরিচয় প্রদান করিয়াছেন। ৭১৯ খৃষ্টাব্দে আমি চীনদেশে আগমন করিয়াছি। ৭১৯ হইতে ৭৩২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ১৪ বৎসর কাল আমি স্বীয় গুরু বজ্রবোধির সেবা করিয়াছি। বজ্রবোধির সমীপে যোগসম্বন্ধে আমার অনেক শিক্ষালাভ হইয়াছে। তদনন্তর ৭৩২ খৃষ্টাব্দে সম্রাটের আদেশে আমি ভারতে পঞ্চ প্রদেশে গমন করিয়া তথা হইতে অন্যূন ৫০০ বৌদ্ধ গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়াছি। ইহার পূর্ব্বে এই সকল গ্রন্থ কখনও চীনদেশে আনীত হয় নাই। ৭৪৬ খৃষ্টাব্দে ভারত হইতে আমি চীনদেশে ফিরিয়া আসিয়াছি। সেই সময় হইতে আজ পর্য্যন্ত কাল মধ্যে আমি অনেক সংস্কৃত গ্রন্থ চীনভাষায় অনুবাদিত করিয়াছি।

বস্তুতঃ ৭৪৬ খৃষ্টাব্দ হইতে ৭৭১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ২৫ বৎসর কাল মধ্যে অমোঘবজ্র ৭৭ খানি সংস্কৃত পুস্তক চীনভাষায় অনুবাদিত করিয়াছিলেন। ইহার পর আরও অনেক পুস্তক অনুবাদিত করিয়া ৭৭৪ খৃষ্টাব্দে ৭০ বৎসর বয়ঃক্রমকালে তিনি চীনরাজধানীতে দেহ

ত্যাগ করেন। এই বৎসর সম্রাট্ তাঁহাকে "রাজমন্ত্রী" ও "পরিশুদ্ধ-বিপুল-প্রজ্ঞ মহাবক্তা" এই উপাধিদ্বয় প্রদান করেন। এইরূপে আঙ্ বংশের রাজত্বকালে তিনি চীন দেশে বহু সম্মান ভোগ করিয়াছিলেন। তাঁহারই উদ্যোগে তান্ত্রিক মত সর্ব্বপ্রথম চীনদেশে প্রচার লাভ করে।* চীন ত্রিপিটকে তাঁহার অনুবাদিত সর্ব্বশুদ্ধ ১০৮ খানি পুস্তক পাওয়া যায়। ঐ সকল গ্রন্থের নাম নিম্নে লিখিত হইল :—

শ্রীসতীশ চন্দ্র বিদ্যাভূষণ।

---

* ১। মহামায়ূরী বিদ্যারাজ্ঞী, ২। চুন্দীদেবী ধারণী, ৩। মারীচ দেবী পুষ্পমালা-সূত্র, ৪। মরীচীধারণী, ৫। জাতানন্তমুখপাধারণী, ৬। সর্ব্বতথাগতাধিষ্ঠানহৃদয় গুহ্যধাতুকরণ্ডমুদ্রাধারণী, ৭। মহাশ্রীসূত্র, ৮। মহাশ্রীদেবী-দ্বাদশবন্ধনাষ্টশতনাম বিমল মহাযানসূত্র, ৯। জঙ্গলী বিদ্যা, ১০। রত্নমেঘধারিণী, ১১। শালিসম্ভবসূত্র, ১২। রাষ্ট্রপালপ্রজ্ঞাপারমিতা, ১৩। মহামেঘসূত্র, ১৪। ঘনব্যূহসূত্র, ১৫। পর্ণশবরী-টারিণী, ১৬। বৈশ্রবণ দিব্যরাজসূত্র, ১৭। মঞ্জুশ্রীপরিপৃচ্ছাসূত্র-অক্ষমমাতৃকাধ্যায়, ১৮। পঞ্চত্রিংশদ বদ্ধনাম পূজাস্বীকার লেখ, ১৯। অবলোকিতেশ্বর বোধিসত্ত্ব নির্দেশ সমন্তভদ্রধারণী, ২০। অষ্টমণ্ডলক-সূত্র, ২১। চক্ষুর্বিশোধনবিদ্যাধারণী, ২২। সর্ব্বরোগপ্রশমনধারণী, ২৩। জ্বালাপ্রশমনধারণী, ২৪। যোগসংগ্রমহার্থ-আনন্দপরিত্রাণ-ধারণী-জ্বাল-বক্তৃ-কল্প-সূত্র, ২৫। এক চূড়ার্য্যধারিণী, ২৬। অমোঘ-পাশবৈরোচন বুদ্ধ-মহাভিষিক্ত-প্রভাসমন্ত্র সূত্র, ২৭। নীতিশাস্ত্র সূত্র, ২৮। তেজঃ-প্রভা-মহাবলগুণাপুদ্বিনাশশ্রীধারিণী, ২৯। বজ্রশেখর সর্ব্বতথাগত সত্যসংগ্রহ-সমাধান প্রত্যুৎপন্নাভিসম্বুদ্ধ মহাতন্ত্রসূত্র, ৩০। ও-লি তো-লো (?) ধারণী, ৩১। উষ্ণীষ চক্রাবধারণী, ৩২। বোধিমণ্ডনির্দেশৈকাক্ষরোষ্ণীষচক্রবর্ত্তিরাজ সূত্র, ৩৩। বোধি-মণ্ডব্যূহধারণী, ৩৪। মহামণিবিপুলবিমান-বিশ্বসুপ্রতিষ্ঠিত-গুহ্য-পরমরহস্য-কল্পরাজ-ধারণী, ৩৫। প্রজ্ঞাপারমিতা অর্দ্ধশতিকা, ৩৬। বজ্রশেখর যোগসূত্র, ৩৭। মহা-প্রতিসরা ধারণী, ৩৮। মহাযানযোগবজ্রপ্রকৃতি সাগর মঞ্জুশ্রী-সহস্রবাহ-সহস্রপাত্র-মহাতন্ত্ররাজসূত্র, ৩৯। বজ্রভরসন্নিপাত-বৈপুল্যকল্প-অবলোকিতেশ্বর বোধিসত্ত্ব-ত্রিজাবানুত্তরহৃদয়-বিদ্যারাজসূত্র, ৪০। মহাবৈপুল্য-মঞ্জুশ্রী সূত্র—অবলোকিতেশ্বর-তরবোধিসত্ত্ব কল্পসূত্র, ৪১। যোগবজ্রশেখর সূত্রাক্ষরমাতৃকা-ব্যাখ্যা-বর্গ, ৪২। গরুড়গর্ভরাজতন্ত্র, ৪৩। একাদশমুখ অবলোকিতেশ্বর বোধিসত্ত্ব হৃদয়মন্ত্র অধ্যায় কল্পসূত্র, ৪৪। ত্রিসময়চর্য্য ক্রোধরাজদূতাধ্যায় ধর্ম্ম, ৪৫। বজ্রকুমারতন্ত্র, ৪৬। সমন্তভদ্রপ্রণিধানস্তোত্র, ৪৭। মহাযাননিদান শাস্ত্র, ৪৮। বজ্রশেখরযোগানুত্তর সম্যক্সম্বোধিচিত্তোৎপাদ শাস্ত্র, ৪৯। যোগৈকাক্ষরোষ্ণীষ চক্রসম্রান্ত দান্ডকল্পৈকাক্ষ-

রোষ্ণীষচক্ররাজযোগসূত্র, ৫০। বজ্রশেখরসর্ব্বধাগতসত্যসংগ্রহ মহাযানপ্রত্যুৎপন্নাভিসম্বুদ্ধ মহাতন্ত্ররাজসূত্র, ৫১। মঞ্জুশ্রী বোধিসত্ত্ব সর্ব্ববিনির্দ্দেশ-পুণ্যাপুণ্যকাল-দিবস-নক্ষত্র-তারাসূত্র, ৫২। বজ্রশেখরযোগসহস্রবাহু-সহস্রাক্ষ-অব-লোকিতেশ্বর-বোধিসত্ত্ব-চর্য্যা-কল্পসূত্র, ৫৩। মহাসুখ বজ্রসত্ত্বচর্য্যা সিদ্ধ কল্প, ৫৪। তদ্ধপুণ্ডরীকসূত্ররাজসিদ্ধি-যোগ-ধ্যান-জ্ঞান-কল্প, ৫৫। বজ্রশেখরযোগত্রিভব-বিজয়সিদ্ধিমহাগুহ্যদার, ৫৬। বজ্র-শেখর যোগপরিনির্মিত বশবর্ত্তিসত্যতাপর্ষৎসমস্তভদ্রচর্য্যাধ্যায় কল্প মহাযক্ষমাতৃপুরিয়-পুত্রসিদ্ধি কল্প, ৫৮। অবলোকিতেশ্বর চিন্তামণি-অধ্যায় কল্প, ৫৯। মহাবৈরোচন-সূত্রপাঠ ক্রম, ৬০। শীঘ্র ফলোদয়তেশ্বরদেবভাষিত অবিধ কল্প, ৬১। মহার্যামঞ্জুশ্রী কুমার পঞ্চাক্ষরযোগকল্প, ৬২। মহাবজ্রক্রোধ-উগ্র কল্প, ৬৩। মহামায়ুরী বিদ্যারাজ্ঞী চিত্রপ্রতিবিম্বমণ্ডলকল্প, ৬৪। বজ্রশেখর যোগবজ্র সত্ত্বকল্প, ৬৫। একাক্ষরসুবর্ণচক্ররাজ-বুদ্ধোষ্ণীষ মহার্থ সংক্ষেপাধ্যায় কল্প, ৬৬। অবলোকিতেশ্বর-চিন্তামণি যোগাধ্যায় কল্প, ৬৭। মহার্য্য মহাস্তিরতিদ্বিকায়বিনায়ক কল্প, ৬৮। মহাবৈরোচনসূত্রসংক্ষেপ, ৬৯। পঞ্চাক্ষরধারণী গাথা, ৭০। কারুণিকরাজ প্রজ্ঞাপারমিত ধারণী ব্যাখ্যা, ৭১। মহাসুখ বজ্রমোঘসত্যসময়সূত্রপ্রজ্ঞাপারমিত বুদ্ধি ব্যাখ্যা, ৭২। বজ্ররাজবোধিসত্ত্ব-গুহ্যাধ্যায় কল্প, ৭৩। বজ্রশেখরানুত্তর প্রথমযোগসমন্ত ভদ্রবোধিসত্ত্বাধ্যায় কল্প সূত্র, ৭৪। বজ্রশেখর যোগবজ্রসত্ত্বপঞ্চগুহ্যচর্য্যাধ্যায় কল্প, ৭৫। অমিতায়ুস্তথাগতধ্যান চর্য্যাপূজা কল্প, ৭৬। অমৃতকুণ্ডলীবোধিসত্ত্বপূজাধ্যায় সিদ্ধিকল্প ৭৭। অবলোকিতেশ্বর তারাযোগাধ্যায় কল্প, ৭৮। আর্য্যাবলোকিতেশ্বর বোধিসত্ত্ব হৃদয়মন্ত্র-যোগ ধ্যান চর্য্যা কল্প, ৭৯। মহাকাশগর্ভ বোধিসত্ত্ব অধ্যায়কল্প, ৮০। কারুণিকরাজপ্রজ্ঞাপারমিতধার-কল্প, ৮১। অক্ষোভ্যতথাগত্যাধ্যায়পূজাকল্প, ৮২। সর্ব্বদুর্গতিবুদ্ধোষ্ণীষবিজয়ধার-ণাধ্যায় কল্প, ৮৩। আর্য্যাক্রোধরাজমহর্দ্ধিফলোদয় সিদ্ধাধ্যায় কল্প, ৮৪। মহাযানবৈ-পুল্য মঞ্জুশ্রীবোধিসত্ত্ব-বুদ্ধাবতংসক মূলতন্ত্র, ৮৫। মহাযানবৈপুল্য তন্ত্র, ৮৬। বজ্রশেখর যোগসূত্রমঞ্জুশ্রী বোধিত্বকল্পপূজাধর্ম্ম, ৮৭। যোগ পুণ্ডরীকবর্গধ্যায় কল্প, ৮৮। বজ্র-শেখরসূত্রাবলোকিতেশ্বররাজতথাগতচর্য্যাকল্প, ৮৯। বজ্রপাণি-প্রভাসমূর্দ্ধাভিষিক্ত সূত্রানুত্তর মুদ্রার্য্যাচলমহাক্রোধরাজাধ্যায় কল্প, ৯০। বজ্রশেখরযোগ, ৯১। একাক্ষর-বুদ্ধোষ্ণীষচক্ররাজধ্যায় কল্প, ৯৩। বজ্রশেখরপুণ্ডরীকবর্গহৃদয়াধ্যায়কল্প, ৯৪। সমন্তভদ্র বজ্রসত্ত্বযোগাধ্যায়কল্প, ৯৫। বজ্রশেখরযোগহোলকল্প, ৯৬। মহাকারুণিক হৃদয়-ধারণীচর্য্যাধ্যায়সংক্ষেপকল্প, ৯৭। মঞ্জুশ্রীপঞ্চাক্ষর মন্ত্র, ৯৮। বজ্রশেখরসূত্রযোগমঞ্জুশ্রী বোধিসত্ত্বধর্ম্মৈকবর্গ, ৯৯। অষ্টাদশপরিষদবজ্রশেখর যোগসূত্র, ১০০। হারীতী মাত্রী মন্ত্রকল্প, ১০১। মহাবপুল্য বুদ্ধাবতংসকপত্রধর্ম্মধাত্ববতারাধ্যায়দ্বাচত্বারিংশৎ অক্ষয় ধ্যান, ১০২। প্রজ্ঞাপারমিতা বুদ্ধি সূত্র মহাসুখামোঘসজ্জয় সত্য বজ্রবোধি সত্ত্বাদিসপ্ত-দশর্যামহামণ্ডলব্যাখ্যা, ১০৩। ধারণী নাম সংগ্রহ, ১০৪। বজ্রশেখরপোষসপ্তত্রিংশ-দার্য্য পূজা, ১০৫। বোধি-হৃদয় শীলচর্য্যা, ১০৬। মহার্যামঞ্জুশ্রীবোধিসত্ত্ববুদ্ধিধর্ম্মকায় প্রশংসা পূজা, ১০৭। শত সাহস্রিকমহাসন্নিপাত সূত্র-ক্ষিতিগর্ভ-বোধিসত্ত্ব ধর্ম্মকায়-পরিপৃচ্ছাস্তোত্র, ১০৮। যোগমহার্থ সংগ্রহ-জ্ঞানবজ্র-অন্নদ-কল্প।

মদন-ভস্ম।

গাহিছে অপ্সরাগণ গীতি মনোহর,
তবুও শঙ্কর দেব ধ্যানেতে তৎপর,
যোগিবর আপনি যে আপনার প্রভু—
বিঘ্নশত টলাতে না পারে তাঁরে কভু। ৪০
লতাগৃহদ্বারে নন্দী করি আগমন,
বামকরে হেম বেত্র করিয়া ধারণ,
অধরে তর্জ্জনী রাখি ইঙ্গিত আভাসে,
"থাম্ তোরা থাম্" বলি ভূতগণে শাসে। ৪১
নিষ্কম্প অমনি বৃক্ষ, নিভৃত ভ্রমর,
নীরব বিহঙ্গকুল, শান্ত বনচর,
বলিহারি প্রহরীর এমনি শাসন,
চিত্রলেখা সম ভায় সমস্ত কানন! ৪২
পান্থ যথা যাত্রাকালে শুক্রমুখ করয়ে বর্জ্জন,
নন্দীর দর্শন-পথ পরিহরি তেমনি মদন
মহেশের ধ্যানাশ্রমে সন্তর্পণে উত্তরিল গিয়া,
বিশাল নমেরু শাখা প্রান্তে যার রহে বিস্তারিয়া। ৪৩

কুমার সম্ভব—মদন দহনো নাম তৃতীয়ঃ সর্গঃ।
শ্রুতাপ্সরোগীতিরপি ক্ষণেঽস্মিন্ হরঃ প্রসংখ্যানপরো বভূব,
আত্মেশ্বরাণাং নহি জাতু বিঘ্নাঃ সমাধিভেদপ্রভবো ভবন্তি। ৪০
লতাগৃহদ্বারগতোঽথ নন্দী বামপ্রকোষ্ঠার্পিতহেমবেত্রঃ,
মুখার্পিতৈকাঙ্গুলিসংজ্ঞয়ৈব মা চাপলায়েতি গণান্ ব্যনৈষীৎ। ৪১
নিষ্কম্পবৃক্ষং নিভৃতদ্বিরেফং মূকাণ্ডজং শান্তমৃগপ্রচারং,
তচ্ছাসনাৎ কাননমেব সর্ব্বং চিত্রার্পিতারম্ভমিবাবতস্থে। ৪২
দৃষ্টিপ্রপাতং পরিহৃত্য তস্য কামঃ পুরঃশুক্রমিব প্রয়াণে,
প্রান্তেষু সংসক্তনমেরুশাখং ধ্যানাস্পদং ভূতপতের্বিবেশ। ৪৩

আসন্ন মরণ নাকি তাই স্মর এবে
নিরখিল আসীন সংযমী মহাদেবে,
দেবদারু বেদী পরে ব্যাঘ্র চর্ম্মাবৃত,
পূর্ব্বকায় ঋজু স্থির বীরাসন-ধৃত,
নত দুই স্কন্ধমূল, পাতা করতল
অঙ্কমাঝে অবিকল ফুল্ল শতদল। ৪৪-৪৫
জড়ানো জটাকলাপে ভুজগ বন্ধন
অক্ষমালা দুই ফের কাণেতে বেষ্টন,
গ্রন্থিযুত কৃষ্ণাজিন পরিধান গায়,
হয়েছে বিশেষ নীল কণ্ঠের প্রভায়। ৪৬
স্তিমিত নয়ন তারা কিঞ্চিত প্রকাশ,
ভুরুদ্বয়ে কিছু নাহি বিকার আভাস,
পলক নাহিক নেত্রে, নাহিক স্পন্দন,
অধোদৃষ্টে নাসিকাগ্র করেন দর্শন। ৪৭
অন্তশ্চর প্রাণবায়ু নিরোধ কারণ
বৃষ্টি-পূর্ব্ব জলপূর্ণ জলদ যেমন,
কিম্বা নিস্তরঙ্গ সিন্ধু প্রশান্ত গম্ভীর—
নিবাত-নিষ্কম্প-শিখা, দীপ সম স্থির। ৪৮

স দেবদারুদ্রুমবেদিকায়াং শার্দ্দূলচর্ম্মব্যবধানবত্যাং,
আসীনমাসন্নশরীরপাতস্ত্রিয়ম্বকং সংযমিনং দদর্শ। ৪৪
পর্য্যঙ্কবন্ধস্থিরপূর্ব্বকায়ং ঋজ্বায়তং সন্নমিতোভয়াংসং,
উত্তানপাণিদ্বয়সন্নিবেশাৎ প্রফুল্লরাজীবমিবাঙ্কমধ্যে। ৪৫
ভুজঙ্গমোন্নদ্ধজটাকলাপং কর্ণাবসক্তদ্বিগুণাক্ষসূত্রং,
কণ্ঠপ্রভাসঙ্গবিশেষনীলাং কৃষ্ণত্বচং গ্রন্থিমতীং দধানম্। ৪৬
কিঞ্চিৎপ্রকাশস্তিমিতোগ্রতারৈঃ ভ্রূবিক্রিয়ায়াং বিরতপ্রসঙ্গৈঃ,
নেত্রৈরবিস্পন্দিতপক্ষ্মমালৈঃ লক্ষ্যীকৃতঘ্রাণমধোময়ূখৈঃ। ৪৭
অবৃষ্টিসংরম্ভমিবাম্বুবাহং অপামিবাধারমনুত্তরঙ্গং,
অন্তশ্চরাণাং মরুতাং নিরোধাৎ নিবাতনিষ্কম্পমিব প্রদীপম্। ৪৮

মনেরও অধৃষ্য সেই দেব মহেশ্বর,
অদূরে নিরখি তাঁরে ধ্যানে নিমগন,
ভয়ে মদনের হস্ত কাঁপি থর থর,
ধনুর্ব্বাণ পড়ে খসি,' না জানে কখন। ৫১
হেন কালে গিরি'সুতা আইলেন তথা,
পিছে পিছে সখীদ্বয়, অরণ্য-দেবতা,
কন্দর্পের বীর্য্য ছিল নিভ নিভ প্রায়,
আবার উঠিল জ্বলি রূপের ছটায়। ৫২
"অশোক" সে পদ্মরাগে করে তিরস্কার,
হেমকান্তি কাড়িয়া শোভয়ে "কর্ণিকার,"
"সিন্দুবার" মুক্তারূপে করেন ধারণ,
বসন্ত-কুসুম যত অঙ্গ-আভরণ। ৫৩
স্তন ভারে চারু তনু ঈষৎ নমিত,
তরুণ অরুণ-রাগে বসন রঞ্জিত ;
কুসুম-স্তবক-ভরে কিঞ্চিৎ আনতা,
আহা যেন সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতা! ৫৪
যাঁর রূপরাশি হেরি লাজে মরে রতি,
অকলঙ্ক সে উমারে নিরখিয়া তথি,
জিতেন্দ্রিয় শূলী পরে স্বকার্য্য সাধিতে—
ভরসা জনমে পুন মদনের চিতে। ৫৭

স্মরস্তথাভূতময়ুগ্মনেত্রং পশ্যন্নদূরান্মনসাপ্যধৃষ্যং,
নালক্ষয়ৎ সাধ্বসসন্নহস্তঃ স্রস্তং শরং চাপমপি স্বহস্তাৎ। ৫১
নির্ব্বাণভূয়িষ্ঠমথাস্য বীর্য্যং সন্ধুক্ষয়ন্তীব বপুর্গুণেন,
অনুপ্রয়াতা বনদেবতাভ্যাং অদৃশ্যত স্থাবররাজকন্যা। ৫২
অশোক নির্ভৎসিত পদ্মরাগম্ আকৃষ্ট হেমদ্যুতিকর্ণিকারম্,
মুক্তাকলাপীকৃত সিন্দুবারম্ বসন্ত পুষ্পাভরণং বহন্তী। ৫৩
আবর্জ্জিতা কিঞ্চিদিব স্তনাভ্যাং বাসো বসানা তরুণার্করাগম্,
পর্য্যাপ্তপুষ্পস্তবকাবনম্রা সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতেব। ৫৪
তাং বীক্ষ্য সর্ব্বাবয়বানবদ্যাং রতেরপি হ্রীপদমাদধানাং,
জিতেন্দ্রিয়ে শূলিনি পুষ্পচাপঃ স্বকার্য্যসিদ্ধিং পুনরাশশংস। ৫৭

এমন সময়ে নিজ ভবিষ্যত পতি
মহেশের দ্বারদেশে আইল পার্ব্বতী,
শম্ভুও পরম জ্যোতি পরম আত্মায়
নিরখি হলেন ক্ষান্ত ধ্যান ধারণায়। ৫৮

ধীরে ধীরে প্রাণবায়ু করিয়া মোচন
শিথিলিলা অঙ্কবদ্ধ দৃঢ় বীরাসন,
ভুজঙ্গপতির সেই ফণার উপর
ধরণীর ভার তাহে হল গুরুতর। ৫৯

হর-পদতলে নন্দী প্রণমি তখন
নিবেদিল, সেবার্থে গৌরীর আগমন,
ভ্রূক্ষেপ-ঈঙ্গিত মাত্রে বুঝি অনুমতি
নন্দী গিরিনন্দিনীরে পশাইল তথি। ৬০

উমার সে সখী দুটী প্রণমিয়া শঙ্কর চরণ,
বিছাইলা পুষ্পগুচ্ছ সপল্লব, স্বহস্ত-চয়ন,
উমাও বৃষভধ্বজে প্রণমে যেমতি ভক্তিভরে,
কর্ণ হ'তে পল্লব, অলক হ'তে কর্ণিকার ঝরে। ৬১-৬২

ভবিষ্যতঃ পত্যুরুমা চ শম্ভোঃ সমাসসাদ প্রতিহারভূমিম্,
যোগাৎ স চান্তঃ পরমাত্মসংজ্ঞং দৃষ্ট্বা পরং জ্যোতিরুপাররাম। ৫৮
ততো ভুজঙ্গাধিপতেঃ ফণাগ্রৈরধঃ কথঞ্চিদ্ধৃতভূমিভাগঃ,
শনৈঃ কৃতপ্রাণবিমুক্তিরীশঃ পর্য্যঙ্কবন্ধং নিবিড়ং বিভেদ। ৫৯
তস্মৈ শশংস প্রণিপত্য নন্দী শুশ্রূষয়া শৈলসুতামুপেতাম্,
প্রবেশয়ামাস চ ভর্ত্তুরেনাং ভ্রূক্ষেপমাত্রানুমতপ্রবেশাম্। ৬০
তস্যাঃ সখীভ্যাং প্রণিপাতপূর্ব্বং স্বহস্তলূনঃ শিশিরাত্যয়স্য,
ব্যকীর্য্যত ত্র্যম্বকপাদমূলে পুষ্পোচ্চয়ঃ পল্লবভঙ্গভিন্নঃ। ৬১
উমাপি নীলালকমধ্যশোভি বিস্রংসয়ন্তী নবকর্ণিকারম্,
চকার কর্ণচ্যুতপল্লবেন মূর্দ্ধ্না প্রণামং বৃষভধ্বজায়। ৬২

"অনন্য-ভাজন পতি হোক্ তোর" হরের যে কথা—
অব্যর্থ আশীষ সেই—ঈশ বাক্য না হয় অন্যথা। ৬৩
বহ্নিমুখ-কামী কাম, পতঙ্গ সমান,
অবসর বুঝি করে বাণের সন্ধান,
উমার সমক্ষে ধরি ফুল শরাসন
মুহুর্মুহু ধনুর্গুণ করে আকর্ষণ। ৬৪
হেনকালে গিরিবালা, তাম্রুরুচিপাণি,
মন্দাকিনী পদ্মবীজ মালাগাছি আনি,
(রবিকর-বিশোষিত সেই বীজমালা)
তাপস শঙ্কর করে অরপিলা বালা। ৬৫
ভকত বাৎসল্য হেতু যেমন শঙ্কর
লবেন সে মালাগাছি করিয়া আদর,
অমনি অব্যর্থ বাণ, নাম সম্মোহন,
শরাসনে জুড়িল কুসুম-শরাসন। ৬৬
চন্দ্রোদয়ারম্ভে যথা জলধির জল,
হইল হরের মন ঈষৎ চঞ্চল,
বিম্বাধরা উমা পানে তখনি মহেশ
সমগ্র ত্রিনেত্র তাঁর করিলা নিবেশ। ৬৭

অনন্যভাজং পতিমাপ্নুহীতি সা তথ্যমেবাভিহিতা ভবেন,
ন হীশ্বরব্যাহৃতয়ঃ কদাচিৎ পুষ্ণন্তি লোকে বিপরীতমর্থং। ৬৩
কামস্তু বাণাবসরং প্রতীক্ষ্য পতঙ্গবদ্বহ্নিমুখং বিবিক্ষুঃ,
উমাসমক্ষং হরবদ্ধলক্ষ্যঃ শরাসনজ্যাং মুহুরামমর্শ। ৬৪
অথোপনিন্যে গিরিশায় গৌরী তপস্বিনে তাম্ররুচা করেণ,
বিশোষিতাং ভানুমতো ময়ূখৈর্মন্দাকিনী পুষ্করবীজমালাং। ৬৫
প্রতিগ্রহীতুং প্রণয়ি প্রিয়ত্বাৎ ত্রিলোচনস্তামুপচক্রমে চ,
সম্মোহনং নাম চ পুষ্পধন্বাধনুষ্যমোঘং সমধত্ত বাণম্। ৬৬
হরস্তু কিঞ্চিৎ পরিলুপ্তধৈর্য্যঃ চন্দ্রোদয়ারম্ভ ইবাম্বুরাশিঃ,
উমামুখে বিম্বফলাধরোষ্ঠে ব্যাপারয়ামাস বিলোচনানি। ৬৭

উমাও রাখিতে নারে মনোভাব ঢাকি,
কদম্ব-পুলক-তনু, লজ্জানত আঁখি;
ঈষৎ বাঁকায়ে মুখ রাখে অতঃপর,
তাতে মুখখানি আহা! হল চারুতর। ৬৮
এ হেন ইন্দ্রিয়-ক্ষোভ বশিত্ব প্রভাবে
মুহূর্ত্তে সম্বরি যতী মহাদেব এবে,
বিকারের হেতু কিবা জানিবার তরে,
করিলা নয়ন-পাত দিগ্‌দিগন্তরে। ৬৯
দেখিলেন কামদেব ধনুখানি করি চক্রাকার,
দক্ষিণ অপাঙ্গে মুষ্টিলগ্ন তার, স্কন্ধ নত আর,
আকুঞ্চিয়া বাম পদ স্থিরভাবে করে অবস্থান,
প্রহারে উদ্যত যেন কন্দর্প সদর্পে ফুলবাণ। ৭০
তপোভঙ্গ চেষ্টা হেরি হর-ক্রোধ বিবৃদ্ধ তখন,
ভীষণ ভ্রূভঙ্গে তাঁর হল কিবা দুষ্প্রেক্ষ্য আনন,
তৃতীয় নয়ন হ'তে বহ্নিশিখা সহসা ছুটিল,
"ক্রোধ, প্রভু, সম্বর, সম্বর" বলি আরব উঠিল।
গগনে গগনে হোথা যেমনি উঠিল দৈববাণী,
হর নেত্রানলে হেথা ভস্মশেষ স্মর-তনুখানি। ৭১-৭২

শ্রীসত্যেন্দ্র নাথ ঠাকুর।

বিবৃন্বতী শৈলসুতাপি ভাবং অঙ্গৈঃ স্ফুরদ্বালকদম্বকল্পৈঃ,
সাচীকৃতা চারুতরেণ তস্থৌ মুখেন পর্য্যস্তবিলোচনেন। ৬৮
অথেন্দ্রিয়ক্ষোভময়ুগ্মনেত্রঃ পুনর্বশিত্বাদ্ বলবন্নিগৃহ্য।
হেতুং স্বচেতোবিকৃতের্দিদৃক্ষুঃ দিশামুপান্তেষু সসর্জ দৃষ্টিং। ৬৯
স দক্ষিণাপাঙ্গনিবিষ্টমুষ্টিং নতাংসমাকুঞ্চিতসব্যপাদং
দদর্শ চক্রীকৃতচারুচাপং প্রহর্ত্তুমভ্যুদ্যতমাত্মযোনিং। ৭০
তপঃ পরামর্শবিবৃদ্ধমন্যো-ভ্রূভঙ্গদুষ্প্রেক্ষ্যমুখস্য তস্য,
স্ফুরন্নুদর্চ্চিঃ সহসা তৃতীয়া-দক্ষ্ণঃ কৃশানুঃ কিল নিষ্পপাত। ৭১
ক্রোধং প্রভো সংহর সংহরেতি যাবদ্গিরঃ খে মরুতাং চরন্তি,
তাবৎ স বহ্নির্ভবনেত্রজন্মা ভস্মাবশেষং মদনং চকার। ৭২

ইম্পীরিয়লিজ্‌ম্‌।

বিলাতে ইম্পীরিয়ালিজ্‌মের একটা নেশা ধরিয়াছে। অধীনদেশ ও উপনিবেশ প্রভৃতি জড়াইয়া ইংরেজসাম্রাজ্যকে একটা বৃহৎ উপসর্গ করিয়া তুলিবার ধ্যানে সে দেশে অনেকে নিযুক্ত আছেন। বিশ্বামিত্র একটা নূতন জগৎসৃষ্টি করিবার উদ্যোগ করিয়াছিলেন, বাইবল্‌-প্রথিত কোনো রাজা স্বর্গের প্রতি স্পর্দ্ধা করিয়া এক স্তম্ভ তুলিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, স্বয়ং দশাননের সম্বন্ধেও এরূপ একটা জনশ্রুতি প্রচলিত আছে।

দেখা যাইতেছে এইরূপ বড় বড় মৎলব পৃথিবীতে অনেক সময়ে অনেক লোকে মনে মনে আঁটিয়াছে। এসকল মৎলব টেঁকেনা—কিন্তু নষ্ট হইবার পূর্ব্বে পৃথিবীতে কিছু অমঙ্গল না সাধিয়া যায় না।

তাঁহাদের দেশের এই খেয়ালের ঢেউ লর্ড কার্জ্জনের মনের মধ্যেও যে তোলপাড় করিতেছে সে দিনকার এক অলক্ষণে' বক্তৃতায় তিনি তাহার আভাস দিয়াছেন। দেখিয়াছি আমাদের দেশের কোনো কোনো খবরের কাগজ কখনো কখনো এই বিষয়টাতে একটু উৎসাহ প্রকাশ করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন, বেশ কথা, ভারতবর্ষকে ব্রিটিশ "এম্পায়ারে" অধিকার দাওনা।

কথার ছল ধরিয়া-ত কোনো অধিকার পাওয়া যায় না—এমন কি, লেখাপড়া পাকা কাগজে হইলেও দুর্ব্বল লোকের পক্ষে নিজের স্বত্ব উদ্ধার করা শক্ত। এই কারণে যখন দেখিতে পাই যাঁহারা আমাদের উপরওয়ালা, তাঁহারা ইম্পীরিয়ালবায়ুগ্রস্ত, তখন মনের মধ্যে স্বস্তিবোধ করি না।

পাঠকরা বলিতে পারেন, তোমার অত ভয় করিবার প্রয়োজন কি, যাহার হাতে ক্ষমতা আছে সে ব্যক্তি ইম্পীরিয়ালিজমের বুলি আওড়াক্ বা নাই আওড়াক্ তোমার মন্দ করিতে ইচ্ছা করিলে সে ত অনায়াসে করিতে পারে।

অনায়াসে করিতে পারে না। কেন না হাজার হইলেও দয়ামায়া একেবারে ছাড়া কঠিন। কিন্তু একটা বড়গোছের বুলি যদি কাহাকেও পাইয়া বসে, তবে তাহার পক্ষে নিষ্ঠুরতা ও অন্যায় সহজ হইয়া উঠে।

অনেক লোকে জন্তুকে শুধু শুধু কষ্ট দিতে পীড়া বোধ করে। কিন্তু কষ্ট দেওয়ার একটা নাম যদি দেওয়া যায় "শিকার" তবে সে আনন্দের সহিত হত আহত নিরীহ পাখীর তালিকা বৃদ্ধি করিয়া গৌরব বোধ করে। নিশ্চয়ই, বিনা উপলক্ষ্যে যে ব্যক্তি পাখীর ডানা ভাঙ্গিয়া দেয়, সে ব্যক্তি শিকারীর চেয়ে বেশি নিষ্ঠুর, কিন্তু পাখীর তাহাতে বিশেষ সান্ত্বনা নাই। বরঞ্চ, অসহায় পক্ষিকুলের পক্ষে স্বভাবনিষ্ঠুরের চেয়ে শিকারীর দল অনেক বেশি নিদারুণ।

যাঁহারা ইম্পীরিয়লিজমের খেয়ালে আছেন, তাঁহারা দুর্ব্বলের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ও অধিকার সম্বন্ধে অকাতরে নির্ম্মম হইতে পারেন এবিষয়ে সন্দেহ নাই, পৃথিবীর নানাদিকেই তাহার দৃষ্টান্ত দেখা যাইতেছে।

রাশিয়া, ফিন্‌ল্যাণ্ড পোলাণ্ডকে নিজের বিপুল কলেবরের সহিত একেবারে বেমালুম মিশাইয়া লইবার জন্য যে কি পর্য্যন্ত চাপ দিতেছে, তাহা সকলেই জানেন। এতদূর পর্য্যন্ত কখনই সম্ভব হইত না যদি না রাশিয়া মনে করিত, তাহার অধীন দেশের স্বাভাবিক বৈষম্যগুলি জবরদস্তির সহিত দূর করিয়া দেওয়াই ইম্পীরিয়ালিজ্‌ম্ নামক একটা সর্ব্বাঙ্গীন বৃহৎ স্বার্থের পক্ষে প্রয়োজনীয়। এই স্বার্থকে রাশিয়া পোলাণ্ড ফিন্‌ল্যাণ্ডেরও স্বার্থ বলিয়া গণ্য করে।

লর্ড কর্জ্জনও সেই ভাবেই বলিতেছেন, জাতীয়তার কথা ভুলিয়া এম্পায়ারের স্বার্থকে তোমাদের নিজের স্বার্থ করিয়া তোল।

কোনো শক্তিমানের কাণে একথা বলিলে তাহার ভয় পাইবার কারণ নাই; কেন না, শুধু কথায় সে ভুলিবে না। বস্তুতই তাহার স্বার্থ কড়ায় গণ্ডায় সপ্রমাণ হওয়া চাই। অর্থাৎ সে স্থলে তাহাকে দলে টানিতে গেলে নিজের স্বার্থও যথেষ্ট পরিমাণে বিসর্জ্জন না দিলে তাহার মন পাওয়া যাইবে না। অতএব, সেখানে অনেক মধু ঢালিতে হয়, অনেক তেল খরচ না করিয়া চলে না।

ইংলণ্ডের উপনিবেশগুলি তাহার দৃষ্টান্ত। ইংরেজ ক্রমাগতই তাহাদের কাণে মন্ত্র আওড়াইতেছে "যদেতৎহৃদয়ং মম তদস্তু হৃদয়ং তব," কিন্তু তাহারা শুধু মন্ত্রে ভুলিবার নয়—পণের টাকা গণিয়া দেখিতেছে।

কিন্তু হতভাগ্য আমাদের বেলায় মন্ত্রেও কোনো প্রয়োজন নাই, পণের কড়িত দূরে থাক্‌।

আমাদের বেলায় বিচার্য্য এই যে, বিদেশীয়ের সহিত ভেদবুদ্ধি জাতীয়তার পক্ষে আবশ্যক; কিন্তু ইম্পীরিয়ালিজমের পক্ষে প্রতিকূল, অতএব সেই ভেদবুদ্ধির যে সকল কারণ আছে, সেগুলাকে উৎপাটন করা কর্ত্তব্য।

কিন্তু সেটা করিতে গেলে দেশের ভিন্ন ভিন্ন অংশের মধ্যে যে একটা ঐক্য জমিয়া উঠিতেছে, সেটাকে কোনোমতে জমিতে না দেওয়াই শ্রেয়। সে যদি খণ্ড খণ্ড চূর্ণ চূর্ণ অবস্থাতেই থাকে, তবে তাহাকে আত্মসাৎ করা সহজ।

ভারতবর্ষের মত এত বড় দেশকে এক করিয়া তোলার মধ্যে একটা গৌরব আছে। ইহাকে চেষ্টা করিয়া বিচ্ছিন্ন রাখা ইংরেজের মত অভিমানী জাতির পক্ষে লজ্জার কথা।

কিন্তু ইম্পীরিয়ালিজ্‌ম্‌ মন্ত্রে এই লজ্জা দূর হয়। ব্রিটিশ

এম্পায়ারের মধ্যে এক হইয়া যাওয়াই ভারতবর্ষের পক্ষে যখন পরমার্থলাভ, তখন সেই মহদুদ্দেশ্যে ইহাকে জাঁতায় পিষিয়া বিশ্লিষ্ট করাই "হিয়ুম্যানিটি!"

ভারতবর্ষের কোন স্থানে তাহার স্বাধীন শক্তিকে সঞ্চিত হইতে না দেওয়া ইংরাজসভ্যনীতি অনুসারে নিশ্চয়ই লজ্জাকর; কিন্তু যদি বলা যায় "ইম্পীরিয়লিজম্" তবে যাহা মনুষ্যত্বের পক্ষে একান্ত লজ্জা তাহা রাষ্ট্রনীতিকতার পক্ষে চূড়ান্ত গৌরব হইয়া উঠিতে পারে।

নিজেদের নিশ্চিন্ত একাধিপত্যের জন্য একটি বৃহৎ দেশের অসংখ্য লোককে নিরস্ত্র করিয়া তাহাদিগকে চিরকালের জন্য পৃথিবীর জন-সমাজে সম্পূর্ণ নিঃস্বত্ব নিরুপায় করিয়া তোলা যে কত বড় অধর্ম্ম, কি প্রকাণ্ড নিষ্ঠুরতা, তাহা ব্যাখ্যা করিবার প্রয়োজন নাই; কিন্তু এই অধর্ম্মের গ্লানি হইতে আপনার মনকে বাঁচাইতে হইলে একটা বড় বুলির ছায়া লইতে হয়।

সেসিল্ রোডস্ একজন ইম্পীরিয়াল্ বায়ুগ্রস্ত লোক ছিলেন; সেইজন্য দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে বোয়ারদের স্বাতন্ত্র্যলোপ করিবার জন্য তাঁহাদের দলের লোকের কিরূপ আগ্রহ ছিল, তাহা সকলেই জানেন।

ব্যক্তিগত ব্যবহারে যে সকল কাজকে চৌর্য্য, মিথ্যাচার বলে, যাহাকে জাল, খুন, ডাকাতি নাম দেয়, একটা এজম্-প্রত্যয়যুক্ত শব্দে তাহাকে শোধন করিয়া কতদূর গৌরবের বিষয় করিয়া তোলে, বিলাতি ইতিহাসের মান্যব্যক্তিদের চরিত হইতে তাহার ভুরি ভুরি প্রমাণ পাওয়া যায়।

এই জন্য আমাদের কর্ত্তাদের মুখ হইতে ইম্পীরিয়ালিজ্‌মের আভাস পাইলে আমরা সুস্থির হইতে পারি না। এতবড় রথের চাকার তলে যদি আমাদের মর্ম্মস্থান পিষ্ট হয়, তবে ধর্ম্মের দোহাই

দিলে কাহারো কর্ণগোচর হইবে না। কারণ, পাছে কাজ ভণ্ডুল করিয়া দেয়, এই ভয়ে মানুষ তাহার বৃহৎ ব্যাপারগুলিতে ধর্ম্মকে আমল দিতে চাহে না।

প্রাচীন গ্রীসে প্রবল এথীনিয়ান্‌গণ যখন দুর্ব্বল মেলিয়ানদের দ্বীপটী অন্যায় নিষ্ঠুরতার সহিত গ্রহণ করিবার উপক্রম করিয়াছিল, তখন উভয় পক্ষে কিরূপ বাদানুবাদ হইয়াছিল, গ্রীক্ ইতিহাসবেত্তা থুকিদিদীস্ তাহার একটা নমুনা দিয়াছিলেন। তাহা হইতে নিম্নে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম—ইহা হইতে পাঠকেরা বুঝিতে পারিবেন, ইম্পীরিয়ালিজ্‌মতত্ত্ব য়ুরোপে কত প্রাচীন—এবং যে পলিটিক্‌সের ভিত্তির উপরে য়ুরোপীয় সভ্যতা গঠিত, তাহার মধ্যে কিরূপ নিদারুণ ক্রূরতা প্রচ্ছন্ন আছে।

Athenians. But you and we should say what we really think, and aim only at what is possible, for we both alike know that into the discussion of human affairs the question of justice only enters where the pressure of necessity is equal, and that the powerful exact what they can, and the weak grant what they must. * * And we will now endeavour to show that we have come in the interests of our empire, and that in what we are about to say we are only seeking the preservation of your city. For we want to make you ours with the least trouble to ourselves and it is for the interest of us both that you should not be destroyed.

Mel. It may be your interest to be our masters, but how can it be ours to be your slaves?

Ath. To you the gain will be that by submission you will avert the worst; and we shall be all the richer for your preservation.

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

আলেখ্য।

হিন্দুস্থানের বাদশা জাহান্‌গীর একদিন ইংলণ্ডেশ্বর প্রথম জেম্‌সের রাজদূত রো সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন "সাহেব, ফিরিঙ্গির মুল্লুক আমার হিন্দুস্থানের কাছে কোন্ বিষয়ে বড়" ?

সাহেব তখন অনেক দিন এদেশে কাটাইয়াছেন ; হিন্দুস্থান সম্বন্ধে যে ভুল বিশ্বাসটুকু লইয়া তিনি প্রথমে এখানে আসিয়াছিলেন, দিল্লীর চাঁদনী চোকে এবং বাদসাহের খাস্‌মজ্‌লিসে দুই একবার যাতায়াত করিয়াই তাঁহার সে ভুল ভাঙ্গিয়াছিল। এদেশের সোনার তঞ্জাম, হাতির হল্‌কা, শিকারী চিতাবাঘ প্রভৃতি দেখিয়া বাদশাহকে ইংলণ্ডেশ্বরের নিকট হইতে একটা ফিটন্ গাড়ি এবং এক জোড়া ভাল কুত্তা উপহার দিতে তাঁহাকে যে সবিশেষ লজ্জা পাইতে হইয়াছিল, একথাও তিনি মুক্তকণ্ঠে প্রকাশ করিয়াছিলেন ; কিন্তু তবু এদেশের কাছে বেলাত কিছুতেই হার মানিতে চাহিল না ! সাহেব কোটের পকেট হইতে একখানি মেমের ছবি বাদশার সম্মুখে ধরিয়া দিয়া বলিলেন, "এমন তস্‌বীর হিন্দুস্থানে যতদিন না পাওয়া যায়, ততদিন বিলাতেরই জিৎ রহিল"।

খাস্ দরবারের এই ঘটনায় সমস্ত দিল্লীসহর যে প্রকার বিচলিত হইয়া উঠিয়াছিল, কাবুল থেকে হঠাৎ একটা বিদ্রোহের সংবাদ আসিলেও সেরূপটা হইত কিনা সন্দেহ। আজ সহরে লোকের মুখে আর অন্য কথা নাই ! ঘরে বাহিরে, চৌরাস্তার মোড়ে, গলি ঘুঁজিতে সর্ব্বত্র সেই একই কথা। পানের দোকানের সামনে সৌখিন লোকেরা সেই বিলাতি ছবিরই কথা পেড়েছে, আমির ওমরাহের মজলীসে সেই কথারই তর্ক উঠেছে, রাস্তার চুড়িওয়ালী এক্কার গাড়ওয়ান এমন কি জলের ভিস্তিরা পর্য্যন্ত ফিরিঙ্গীর এই স্পর্দ্ধার কথা নিয়ে বলাবলি করিতেছে। যে

দিল্লীর তস্‌বীর জগদ্বিখ্যাত, তার সঙ্গে ফিরিঙ্গী সাহেব টক্কর দিতে চায়? মহাল থেকে মহল্লায় মহল্লায় জাহান্‌গীর বাদশার পেয়াদা ছুটিল; দিল্লীর ছোট বড় নক্সাওয়ালা, ওস্তাদ, কারিগর, নামজাদা তস্‌বীরওয়ালা মিণা বাজারে একত্র হ'লে বাদশা তাদের মাঝে সেই বিলাতি ছবিখানা ফেলে দিয়ে নকল করিবার হুকুম দিলেন,—আসলের সঙ্গে যেন তিল তফাৎ না হয়—হিন্দুস্থানের পঁচিশ জন প্রসিদ্ধ কারিগর একমাস ধরে সেই তসবীরের নকল ওঠাইতে লাগিল। দিনের পর দিন, অল্পে অল্পে ক্রমে ক্রমে বিলাতের সেই দুধে আল্‌তায় সুন্দর রং সোণার তারের মত চিকণ কেশ ফরাসী ছিটের লতাপাতা ওস্তাদের কলমের মুখে গজদন্তের পটের উপরে অবিকল ফুটে উঠিল, কেবল সমুদ্রের মত নীল চোখের তারা দুটির কাছে সমস্ত কারিগরের সব কৌশল ব্যর্থ হল! তসবীরের চোখ কোনটার হল তামড়া আভা, কোনটার কালো, কোনটার বা ফিরোজার মত নীল। বাদশা মহা ক্ষাপ্পা হয়ে উঠিলেন, কারিগরদের উপর ধমক, সোরসরাবত চলিতে লাগিল। যে বিলাতী ছবির জন্যে এতটা কাণ্ড, জগতের জ্যোতি নূরজাহান বেগম সে বিলাতী ছবিটা একবার অন্দর মহলে আনিয়ে দেখিলেন, তার পরে বাদসাকে বলিলেন—"লাহোরে সরিফ ওস্তাদ বলে এক তসবীরওয়ালা আছে, সে একদিন ইচ্ছা করলে এ ছবির অবিকল নকল ওঠাতে পারে।" বাদশার কাজে সরিফ ওস্তাদ দিল্লীর দরবারে হাজির হল; বাদশা তাকে ডেকে বল্লেন—এ তসবীর তুমি কতদিনের মধ্যে নকল করে দিতে পার;—ওস্তাদ বল্লে—জাহাঁপানা তিন রোজ, কিন্তু খোদাবন্দ বুড়ো হয়েছি চোখের আর তেজ নাই কি জানি চুক্ হতে পারে! উজীর সাহেবের ঘরে এক ছোকরী আমার কাছে তসবীরের কাম্ অনেক দিন ধরে শিখেছিল, এখন তার জোয়ান বয়েস, সেই অবিকল এই তসবীরের নকল ওঠাতে পারে। তার হাতও যেমন দোরস্ত, আঁখেরও তেমনি তেজ আছে।—বাদশা আবার নূরজাহানের শরণাপন্ন হইলেন। বেগম বলিলেন—আমার বাপের বাড়ির এক ছোকরী এই কাম জানে বটে; কিন্তু এখন সে বড়লোকের

ঘরে বাঁদি হয়েছে। সে যে তসবীর ওঠাতে রাজি হয়, এমন তো বোধ হয় না, দেখি চেষ্টা করে।

বেগমের কাছে আশ্বাস পেয়ে জাহান্‌গীর অনেকটা নিশ্চিন্ত হইলেন। তিন দিন পরে বাদশার হুকুম তামিল হল। ছবির নকল প্রস্তুত, এবার নকলে আসলে একটুও প্রভেদ নাই। সেই চোখ, সেই রং। এবার সাহেবের হার হল, বাদসা যখন দরবারের মাঝে হাজার হাজার আমির ওমরাহ নক্সাওয়ালা কারিগর লোকলস্করের সামনে সাহেবের দুই হাতে দুইখানি ছবি দিয়ে বলিলেন "তোমার কোনটা চিনে লও" সাহেব উত্তর দিলেন, জগজ্জয়ী জাহান্‌গীর যখন আমার বিপক্ষে তখন জয়ের আশা তো ছিলই না, এখন জগজ্জ্যোতি নুরজাহানের কৃপা ভিন্ন আসলে নকলে ভেদ বুঝিবার সাধ্যইবা কাহার?" সাহেব এক ঢিলে দুই পাখি মারিলেন—বাদশা বেগম দুজনকেই খুসি করিয়া দিলেন—তিনি বেশ বুঝিয়াছিলেন যে, মোগল বাদসাহের দরবারে কথার দাম কাঁচা মাথাটার চেয়ে অনেক বেশি—সাহেবকে রীতিমত খেলাত দিয়া জাহান্‌গীর দরবার ভঙ্গ করিলেন।

দিল্লীর ছোট বড় সকলেই যখন হিন্দুস্থানের জয়ে এবং সাহেবের চাটুবাদে উৎফুল্ল হইয়া ঘরে চলিয়াছে, কেল্লার ফটকে নাকরাখান নহবতের বাঁশিটা আজ যেন অন্য দিনের চেয়ে একটু যখন জোরে জোরে বাজিয়া উঠিয়াছে, তখন অন্দর মহলে বাদশার হুজুরে নুরজাহান বেগম দরবার জনাইলেন "খোদাবন্দ বাঁদীর জন্য কিছু বখ্‌শিসের হুকুম হয়"! বাদশা সেই দিনের ছাপা একটি নতুন মোহর বেগমের হাতে দিয়া বলিলেন "বিবি তোমার ইনাম্ এবার এই"! মোহরের একপিঠে অপূর্ব্ব সুন্দরী নুরজাহানের মূর্ত্তি লেখা আছে, আর এক পিঠে লেখা আছে—জগতের জ্যোতি নুরজাহানের সম্পর্কলাভে স্বর্ণের গুণ আজ শতগুণ বৃদ্ধি পাইল।

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

দেশী তাঁত।

ভারতীয় শিল্পের উন্নতি সম্বন্ধে নানা লোকে নানারূপ প্রস্তাব উপস্থিত করিতেছেন। কোন বক্তা হয়তঃ সমস্ত জটিলতা দূর করিবার ভার গ্রহণ করিয়া অতি সহজ ও নিশ্চিন্ত পন্থা আবিষ্কারের বাহাদুরী লইতেছেন,—তাঁহাদের মতে সহসা সায় দেওয়া উচিত হইবে না; কারণ বিষয়টি এত জটিল যে, এক কথায় কেহ ইহার মীমাংসা করিতে চাহিলে তাহা বিশ্বাস করা কঠিন। "যাহা হইতেছে হউক," বলিয়া যাঁহারা স্রোতে গা ঢালিয়া থাকিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের পন্থাও নিরাপদ নহে। এখন সাধারণের পক্ষে এইটি জানা উচিত কোন্ পন্থা অবলম্বন করিলে, কি কুফল উৎপন্ন হইতে পারে। তাঁহারা এ বিষয়ে সাবধান হইলে শেষে বিশেষ বিশেষ উপায় সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞগণের মত লইয়া কাজ করিতে পারিবেন।

কোন দেশের শিল্পোন্নতি সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গেলে সেই দেশে কি কি সামগ্রী উৎপন্ন হয়, সে দেশের জলবায়ু, প্রাকৃতিক সংস্থান, রাজনৈতিক সুবিধা অসুবিধার কথা এবং তথাকার শিল্পিগণের ক্ষমতা প্রভৃতি বিবিধ বিষয় ভাবিয়া দেখা উচিত। ইংলণ্ডের শিল্পোন্নতি কিরূপে হইল, তাহা বুঝিতে হইলে দেখিতে হইবে, ইংলণ্ডের প্রচুর পরিমাণে কয়লা, চিনে মাটি, লৌহ এবং অপরাপর উপকরণ প্রাপ্ত হইবার সুবিধা আছে। ইংরেজগণ সমস্ত জগতে স্বীয় শিল্প দ্রব্য চালাইবার উপায় উদ্ভাবন করিতে পারেন, এবং শিল্পের নানারূপ বৈজ্ঞানিক উন্নতি সাধন সম্বন্ধেও তাঁহারা অগ্রগণ্য। দেশের স্বাভাবিক অবস্থা ও দেশজ উপকরণ সম্বন্ধে ভারতের ভাণ্ডার সমৃদ্ধ। ইহার রাজনৈতিক অবস্থাও অনুকূল। কারণ, দেশের সর্ব্বত্র শান্তি সুপ্রতিষ্ঠিত এবং

ন্যায়ের অধিকার বিদ্যমান। এইরূপ শান্তির সময় স্বভাবতঃ দেশের শিল্প বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি হইয়া থাকে। গত দুই শত বৎসরে ভারতবর্ষ শিল্প সম্বন্ধে ইহার জগদ্‌ব্যাপী প্রতিষ্ঠা হারাইয়াছে,—তাহার কারণ ভারতের শিল্পিগণ উদ্ভাবনী-শক্তির প্রতিযোগিতায় আত্মরক্ষা করিতে পারে নাই।

এখনও শিল্পসম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক উপায়গুলি ভারতীয় লোক আয়ত্ত করিতে পারেন নাই। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কতকগুলি সূত্র মুখস্থ করা ছাড় বিজ্ঞান সম্বন্ধে হাতে খড়ি হয় নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না,—যন্ত্রাদি সম্বন্ধে জ্ঞান হইতে সর্ব্বত্র একটু সময়ের আবশ্যক হয়। প্রথমতঃ সাধারণ সূত্রগুলি জানিয়া লোকের এই পথে আকৃষ্ট হওয়া দরকার, এখন তাহাই হইতেছে। ভারতবর্ষের লোকেরা বৈজ্ঞানিক ভাবে কারবার পরিচালনার জন্য মূলধন খাটাইতে দ্বিধা বোধ করিয়া থাকেন। এখনও তাঁহারা এ পথটি অর্থ লাভের নিশ্চিত উপায় মনে করেন না,—পূর্ব্বাপর যে সকল বিষয়ে মূলধন খাটাইতে তাঁহারা অভ্যস্ত, তদ্‌বহির্ভূত বিষয়ে অগ্রসর হইতে তাঁহারা সাহসী নহেন। ইহাতে তাঁহাদের দোষ দেওয়া যায় না, কারণ পাশ্চাত্য জগতের কারবারে বৈজ্ঞানিক প্রণালী যতটা সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং তথাকার লোকেরা এসম্বন্ধে স্বাবলম্বন ও উদ্যোগ অধ্যবসায়ে যতটা অভ্যস্ত হইয়াছেন, ভারতবাসীদের তাহা হইতে সময়সাপেক্ষ। এ সম্বন্ধে গভর্ণমেণ্টের আর একটু অনুকূলতা প্রদর্শন করা উচিত; কারণ য়ুরোপীয় অধিকাংশ স্থানে এবং আমেরিকায় গভর্ণমেণ্টকে ব্যক্তিগত চেষ্টার সম্বন্ধে শিল্পবাণিজ্যের যতটা উৎসাহ দিতে দেখা যায়,—ভারতীয় গভর্ণমেণ্ট এখনও ততটা অগ্রসর হন নাই।

বস্ত্রবয়নে ভারতীয় তন্তুবায়ের যে জগদ্‌ব্যাপী প্রতিষ্ঠা ছিল, তাহা গত দুই শত বৎসরে অনেকটা লোপ পাওয়ার মধ্যে। বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদি সাহায্যে বলসম্পন্ন বিদেশী প্রতিযোগিতাই ভারতীয় শিল্পের অবনতির

কারণ। এজন্য অধিকাংশ লোকে মনে করেন, জগদ্ব্যাপী বৈজ্ঞানিক-শিল্পের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় ভারতবাসীদের একটা স্থান করিয়া দেওয়াই ইহাদিগকে রক্ষা করিবার একমাত্র উপায়; বহুযুগ-প্রতিষ্ঠিত স্বীয় জাতীয় ব্যবসায় উঠাইয়া দিয়া পল্লীগুলিকে মিলের ধূম্রে অন্ধকার করিয়া ফেলা এবং হাতের শিল্প বিসর্জ্জনপূর্ব্বক যন্ত্রাদি প্রতিষ্ঠিত করাই ভারত-লক্ষ্মীকে বাঁধিয়া রাখিবার একমাত্র উপায়। তাঁহারা মনে করেন, য়ুরোপে যে সকল পন্থা অবলম্বিত হইয়াছে, ভারতের ইতিহাসে তাহাই অনুকরণীয়। এই প্রথা অবলম্বিত হইলে ভারতের পল্লীগুলি উজাড় হইয়া যাইবে। নগরগুলি অতিরিক্ত মাত্রায় লোকাকীর্ণ হইবে, এবং অর্থবান্ ও দরিদ্রের মধ্যে কলহ প্রধূমিত হইয়া উঠিবে। এই অসম প্রতিযোগিতার কুফল য়ুরোপ এবং আমেরিকায় ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। ভারতবাসীর প্রকৃতি এই প্রকার প্রতিদ্বন্দ্বিতার অনুকূল নহে। জাপানের লোকেরা অনেকটা স্বাবলম্বনপ্রিয়; বিদেশীভাব সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত ও শিল্প সম্বন্ধে উদ্ভাবনী শক্তি প্রদর্শন করিতে ইহারা অধিকতর দক্ষ,—এজন্য ভারতবাসীদের সঙ্গে এ সম্বন্ধে তাহাদের তুলনা হয় না। প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে পরিণামে ভারতীয় শিল্পীকে জাপানী ও চিনের শিল্পী হইতেই অধিকতর বেগ পাইতে হইতে পারে।

কিন্তু বিদেশীয় ক্ষেত্রে ভারতশিল্প পুনরায় প্রতিষ্ঠা পাওয়ার চেষ্টা করিবার পূর্ব্বে স্বগৃহের অভাব পূরণকরা তাঁহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। বিদেশীয় অভাব ও রুচি তাঁহাদের সম্পূর্ণরূপে অপরিজ্ঞাত, বিদেশের প্রতিদ্বন্দ্বী হওয়ার যোগ্যতা দূরপরাহত।—দেখা যাইতেছে ত্রিশ কোটি ক্রেতা ভারতের দ্বারস্থ, ইহাদের অভাব দূর করিবার চেষ্টাই এখন মুখ্য উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। প্রথমতঃ স্বদেশের নষ্ট-বাণিজ্যের উদ্ধার করা হউক, তৎপর বিদেশের প্রতিদ্বন্দ্বিতা সম্ভবপর হইলেও হইতে পারে। কিন্তু প্রশ্ন হইতে পারে, বিলাতী বৈজ্ঞানিক

কলকরখানার অনুকরণ না করিলে বিদেশী প্রতিযোগিতার মুখ হইতে স্বীয় নষ্ট ব্যবসায় উদ্ধার করা কি সম্ভবপর হইতে পারে? এই বিষয়টি ধীরভাবে বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত।

আমার বিবেচনায় ভারতবর্ষে হস্তের প্রস্তুত শিল্প দ্রব্যাদির উন্নতি ও তদ্দ্বারা যথেষ্ট লাভবান্ হওয়ার যে বিরাট সম্ভাবনা আছে, তাহা উপেক্ষা করা কোন ক্রমেই সঙ্গত নহে। গত ৫০ বৎসরে বিলাতী কল কারখানা এদেশে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য যে অর্থ ব্যয় হইয়াছে, তাহা দেশীয় হস্ত-নির্ম্মিত শিল্পের কল্যাণে ব্যয় হইলে ঢের বেশী উপকার হইত।

প্রথমতঃ ভারতবর্ষে শিল্পীর সংখ্যা অসম্ভবরূপে প্রচুর, তাহাদিগের উপর যে ব্যয় হয়, অন্য দেশের তুলনায় তাহা অত্যল্প। এই দুইটি অনুকূল অবস্থার মধ্যে ভারতের ঐশ্বর্য্য-ভাণ্ডার লুক্কায়িত আছে। কেহ কেহ বলেন, যন্ত্রাদির ব্যবহার না শিখাইয়া হস্তের কার্য্যে শিল্পীদিগকে নিযুক্ত রাখিলে তাহারা চিরকালই কুলী হইয়া থাকিবে। এরূপ আশঙ্কা কল্পনামূলক।

এখন দেখা যাইতেছে, হাতের তাঁত আবহমান কাল হইতে এদেশে একভাবেই আছে—কিন্তু ইহার উন্নতি-বিধান অতি সহজ। ধরুন, যদি ইহার উন্নতি করিয়া কার্য্যের শক্তি ১৫ গুণ বৃদ্ধি করা যায়, তবে তাহার অর্থ এই যে বিদেশীয় দ্রব্যাদির উপর শতকরা ১৫ টাকা হারে ট্যাক্স স্থাপিত হইবে। এরূপ হইলে বিদেশীয় প্রতিযোগিতা সত্ত্বেও দেশীয় শিল্পী অনেক পরিমাণে ইহার নষ্ট স্থান উদ্ধার করিতে পারিবে। কিন্তু ভারতীয় হাতের তাঁতের কার্য্যশক্তি শুধু ১৫ গুণ নহে, চেষ্টা করিলে ১০০ শত গুণ পর্য্যন্ত বৃদ্ধি করা যায়,—এখনও এদেশে অতি সামান্য আদিম অবস্থোচিত তাঁত হইতে আরম্ভ করিয়া কাশীর সূক্ষ্ম নৈপুণ্যের পরিচায়ক তাঁতের যন্ত্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই তাঁত গুলির উন্নতি সাধন অতি সহজ।

য়ুরোপে যদিও কলের প্রতি অতিরিক্ত অনুরাগের জন্য অনেকদিন হাতের শিল্প একবারে উপেক্ষিত হইত, এখন ক্রমশঃ তথাকার উর্দ্ধতন সম্প্রদায় তাঁহাদের ভ্রম বুঝিতে পারিয়া হস্তের কর্ম্মের জন্য শিল্পীর সন্ধান করিতেছেন। কলের কাজ হইতে উৎকৃষ্ট শিল্পীর হাতের কাজ ঢের ভাল হয়; ইটালীতে রেসমের হাতের কাজ এখনও হইয়া থাকে, ও তাহা য়ুরোপে সর্ব্বত্র প্রশংসিত। স্কাণ্ডানেভিয়াতে স্ত্রীলোকেরা এখনও তাহাদের পরিবার কাপড় এমন কি সূতা পর্য্যন্ত নিজেরা বয়ন করিয়া থাকে। খাস্ ইংলণ্ডে যেখানে যন্ত্রের প্রতাপ দেশময় ছাইয়া পড়িয়াছে, তথায়ও এখন নানাস্থানে হাতের শিল্পের কারখানা খোলা হইতেছে,—লোকেরা কলের বস্ত্র হইতে হাতে তৈরি কাপড় বেশী পছন্দ করিয়া থাকে এবং অনেক স্থলে কল উঠাইয়া হাতের কাজের কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। বাজারে শিল্পীর যেরূপ সংখ্যায় প্রয়োজন, সেরূপ সংখ্যায় তাহারা জুটিতেছে না। এ সম্বন্ধে লণ্ডনের শিল্পসমিতিতে মিস্ ক্লাইভ বেলি যে বৃত্তান্ত পাঠ করিয়াছিলেন, তাহা হইতে কতকাংশ উদ্ধৃত করা যাইতেছে;—"রেশমের কারবারের জন্য শিল্পীর চতুর্দ্দিক হইতে প্রয়োজন উপলব্ধি হইতেছে—বহুলোকাকীর্ণ বড় বড় নগরী হইতে সুদূরে সাফোক্, এসেক্স, ইপস্উইচ, ব্রেনট্রি, সাদবাড়ী প্রভৃতি পল্লীর মুক্তবায়ুতে হস্তশিল্পের কেন্দ্রস্থান প্রতিষ্ঠিত হইতেছে, তথায় ইহা অসামান্যরূপ শ্রীবৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে।"

যদি উৎকৃষ্ট তাঁতি পাওয়া যায়, তবে কলের কাপড় দ্বারা যে পরিমাণে লাভ পাওয়া যায়, হাতের তাঁতে তদপেক্ষা অল্প লাভ হয় না—কলে যেরূপ মূলধন খাটাইতে হয়, হাতের তাঁতের ব্যবসায়ের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সে তুলনায় নগণ্য। কল আনিয়া প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাহার সাজসজ্জা সর্ব্বাঙ্গীণ ভাবে সম্পূর্ণ করিতে বিস্তর সময় নষ্ট হয়,—সূক্ষ্ম কারুকার্য্য সুদক্ষ শিল্পীর হস্তে যেরূপ হয়, কল হইতে সেরূপ

প্রত্যাশা করা যায় না। হাতের কলে কারবার ফেল হওয়ার আশঙ্কা খুব কম, কলে তাহা বেশী।"

ইংলণ্ডের সঙ্গে তুলনায় ভারতবর্ষে ঢের বেশী পরিমাণে সুদক্ষ শিল্পী পাওয়া যাইতে পারে,—শিল্পীর বেতনও এদেশে ঢের অল্প, এমতাবস্থায় ইংলণ্ডের যখন হাতের শিল্প কলের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া সফল হইতেছে—তখন ভারতবর্ষের এসম্বন্ধে কৃতকার্য্যতা বিষয়ে আর কোন দ্বিধা থাকিতে পারে না। দেশীয় শিল্পের নানা বিভাগে যে কতকটা উন্নতি সাধন করা যাইতে পারে, তাহার দৃষ্টান্ত স্থলে দেশীয় কাঁসার কাজের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। এখন কাঁসার কোনরূপ দীপাধার বা পাত্র তৈরি করিতে হইলে কারিকরগণ ছাঁচ মোমে ঢালিয়া নির্ম্মাণ করে, মোমে ছাঁচে একটি বই জিনিষ তৈরি হয় না, এবং অনেক সময় ও সামগ্রী ক্ষতি হইয়া যায়, কিন্তু মোমের ছাঁচ নির্ম্মাণ না করিয়া কাঠ কিম্বা কোন ধাতুনির্ম্মিত বালুর ছাঁচ তৈরি করিবার একটি সহজ উপায় আছে। ইহাতে ছাঁচ নষ্ট হয় না, একটি ছাঁচ দ্বারা অনেক জিনিষ প্রস্তুত হইতে পারে এবং অনেক সময় বাঁচিয়া যায়।

আমি মাদ্রাজের শিল্প বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিবার অব্যবহিত পূর্ব্বে—ধাতব দ্রব্য নির্ম্মাণ বিভাগে এই উপায়টির প্রবর্ত্তন করিয়াছিলাম, কিন্তু উহা কিছুদিনের জন্য পরিত্যক্ত হইয়াছিল। শুনিয়া সুখী হইলাম, সম্প্রতি আবার উক্ত বিদ্যালয়ের প্রধান অধ্যাপক চ্যাটারটন সাহেব প্রথাটি অবলম্বন করিয়াছেন। যদি প্রতি জেলার মিউনিসিপালিটি ও বোর্ড ঐই সকল বিষয়ে শিক্ষিত কারিগর দেশের শিল্পের কেন্দ্রস্থান গুলিতে পাঠাইয়া দেশীয় লোকদিগকে শিক্ষা দান করেন, তবে প্রভূত উপকার হইতে পারে।

আর একটি কথা এই যে, এ দেশের লোকের শিল্প সম্বন্ধে রুচি অনেকটা বিকৃত হইয়া পড়িয়াছে। এদেশে অট্টালিকা নির্ম্মাণে বিস্তার

উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল,—প্রাচীন অট্টালিকা ও মন্দির সমূহে এদেশে স্থাপত্য বিদ্যার বিচিত্র নিদর্শন রহিয়াছে। বিগত ১৫০ বৎসরে বিলাতে অট্টালিকা নির্ম্মাণে একরূপ বিকৃত রুচি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। সৌভাগ্যের বিষয়, এদেশে উজ্জ্বল ও মহিমান্বিত স্থাপত্য বিদ্যার নিদর্শন অসংখ্য,—সেই গুলির ভালরূপ জ্ঞান হইলে জাতীয় শিল্প নূতন প্রাণ পাইবে। এদেশের সরকারী আফিস সমূহ বিকৃত বিলাতি শিল্পের আদর্শে রচিত হওয়াতে দেশীয় লোকের রুচি বিগড়াইয়া গিয়াছে। আমি নিশ্চিত বলিতে পারি, যদি এদেশীয় প্রাচীন শিল্পের পুনরুদ্ধার কল্পে ভারতবাসীরা যত্ন করেন, তবে গভর্ণমেণ্ট নিশ্চয়ই এই ব্যাপারে উৎসাহ ও সাহায্য প্রদান করিবেন। দেশীয় কারিকরগণ দেশীয় রাজন্যবর্গ কর্ত্তৃক উপেক্ষিত হইতেছে; কিন্তু স্বয়ং মহারাণী ভিক্টোরিয়া ভারতবর্ষীয় কারিকরগণের দ্বারা তাঁহার অস্‌বারণের প্রাসাদ সজ্জিত করিয়াছিলেন। দেশীয় রাজন্যবর্গ তাঁহাদের দেশের উৎকৃষ্ট স্থাপত্যাদর্শ বিদ্যমান থাকিতে স্বীয় প্রাসাদগুলি কেন যে বিকৃত বিলাতী আদর্শের অনুকরণে শ্রীহীন করিতেছেন, তাহা ভাবিয়া পাওয়া যায় না।

দেশীয় তাঁতের উৎকর্ষ সাধিত করিলে তাহা নিশ্চয়ই সুফল উৎপাদন করিবে। শিল্প-সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত রায় পার্ব্বতী শঙ্কর চৌধুরী মহাশয় বলিতেছেন—ফরিদপুর এবং পাবনা সম্বন্ধে তাঁহার যে অভিজ্ঞতা আছে, তাহাতে তিনি প্রমাণ করিতে পারেন, উক্ত জেলা দুইটির অনেক স্থলে নূতন ধরণের হাতের তাঁত ব্যবহৃত হওয়াতে শিল্পিগণ পূর্ব্বে যেস্থলে মাসিক ২।৩ টাকা উপায় করিত, এখন সেইস্থলে ৪।৫, টাকা অর্জ্জন করিতেছে। কুষ্টিয়াতে পার্ব্বতী বাবু আরও সুফল দেখিয়াছেন, তথায় নবপ্রবর্ত্তিত তাঁতের দ্বারা কারিগরগণ মাসিক, ৫৲ টাকার স্থলে ১০৲ টাকা অর্জ্জন করিতেছে।

ভারতবর্ষের অনেক স্থলে এখন হাতের তাঁত চলিতেছে,—শ্রীরাম

পুরের তাঁত পল্লীর তন্তুবায়গণের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। প্রচলিত তাঁতকে একটু নূতনভাবে তৈরি করিয়া লইলে এখনকার আয় হইতে দ্বিগুণ আয় দাঁড়াইবে অথচ এই নূতন সংযোগকার্য্যে প্রতি তাঁতে ১২৲ হইতে ১৫৲ টাকার বেশী খরচ নাই। সূতা যত সূক্ষ্ম ব্যবহৃত হইবে, শিল্পীর হস্ত সেই পরিমাণে নিপুণ হওয়ার আবশ্যক।

বিজাপুরে শ্রীরামপুরের তাঁত হাতের তৈরি সূতায় চলিতেছে—ইহাতে খুব সুফল দেখা গিয়াছে। বঙ্গদেশে যন্ত্রপ্রস্তুত সূতাই আজকাল সর্ব্বদা ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

মিঃ পি, এন্, দের নিকট চিনসুরার এবং শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র দের নিকট শ্রীরামপুরের তাঁতের সরঞ্জাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। জাপানী তাঁত অমৃতসরের মিঃ এস, এম, সাফি—তাঁহার কারখানায় ব্যবহার করিতেছেন, ইহা হাতে না চালাইয়া পায়ে চালাইতে হয়,—ইহাতে অনেক বেশী পরিমাণ বস্ত্র অল্প সময়ের মধ্যে বয়ন করা যায়। কিন্তু ব্যয় বেশী পড়ে। ইহা কাঠ এবং লৌহ নির্ম্মিত এবং তৈরি করিতে সরঞ্জাম ও মজুরী শুদ্ধ ৫০৲ টাকার মধ্যে পড়িবে। কলিকাতা ৯৩নং ক্লাইভ ষ্ট্রীটে মেসার্স জেসোপ এণ্ড কোম্পানি এইরূপ তাঁত বহু সংখ্যক বাজারে সস্তাদরে বিক্রয়ের জন্য প্রস্তুত করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন। এই তাঁত ৪৫ নং রাধাবাজার ষ্ট্রীটস্থ মেসার্স ক্ষেত্রমোহন দে এবং ১ নং গার্ষ্টন প্লেসস্থ মেসার্স ষ্টুয়ার্ট ম্যাকেঞ্জি স্মিথ জাপান হইতে আমদানী করিয়া থাকেন।

আর এক প্রকার নূতন ধরণের তাঁত আহম্মদনগরের শিল্পবিদ্যালয়ে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। বোম্বাই গভর্ণমেণ্ট এই তাঁতের ব্যবহার বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতে প্রচলিত করিবার জন্য চেষ্টিত হইয়াছেন।

যাঁহাদের কিছু মূলধন আছে, তাঁহাদের পক্ষে অমৃতসরে মিঃ সাফির প্রবর্ত্তিত জাপানি তাঁতই বোধ হয় সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী।

মেসার্স রবার্ট হলের প্রবর্ত্তিত এক প্রকার হাতের তাঁত আয়র্লণ্ডের অনেক পর্ণকুটীরে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মেসার্স হ্যাটারস্‌লির তাঁত একটু ব্যয়সাধ্য, কিন্তু ব্যবহারের পক্ষে উৎকৃষ্ট,—উহা য়ুরোপের রোমানিয়া প্রভৃতি স্থলে অত্যন্ত কৃতকার্য্যতার সহিত পরিচালিত হইতেছে। এই তাঁত কায়রো এবং আণ্ডামান প্রভৃতি স্থানেও ব্যবহৃত হইয়া আশাতীত সুফল উৎপন্ন করিয়াছে। ইংলণ্ডে মেসার্স হ্যাটরস্‌লির তাঁত ম্যাঞ্চেষ্টারের বার্লিন এবং কো এবং ভারতবর্ষে কলিকাতার ষ্ট্রাণ্ডরোডের মেসার্স শ, ওয়ালেস এণ্ড কোং সরবরাহ করিয়া থাকেন।

ম্যাঞ্চেষ্টারের জলডন ষ্ট্রীটের র‍্যাফেল এণ্ড কোং নূতন একরূপ তাঁত উদ্ভাবিত করিয়াছেন। তাঁহারা বলিতেছেন,—তাঁহাদের তাঁত ভারতবর্ষের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। এই তাঁত খুব সহজ উপায়ে নির্ম্মিত এবং খুব মজবুত।

তাঁতচালান্ শিক্ষার ব্যবস্থা।

শ্রীরামপুরের তাঁত পরিচালনা সম্বন্ধে সমস্ত জ্ঞাতব্য উপদেশ চিন্‌সুরাতে শ্রীযুক্ত পি, এন্ দে দিয়া থাকেন। ভারতবর্ষের যে কোন স্থানে প্রয়োজন হয়,—তিনি তাঁহার অধীনস্থ তন্তুবায় পাঠাইয়া তাঁত পরিচালনা করিবার ভার লইতে প্রস্তুত আছেন। জাপানি পদ-চালিত তাঁতের ব্যবহার সম্বন্ধে উপদেশ অমৃতসরে মিঃ সাফির নিকট পাওয়া যাইতে পারে। মহীসূরের রাজা স্বীয় অধিকারে তাঁতের ছোট ছোট কারখানা খুলিয়াছেন। নর্সিপুরের কারখানা খুব জাঁকালো হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ত্রিবাঙ্কুরের রাজা ত্রিবন্দ্রাম সহরে সম্প্রতি একটি কারখানা খুলিয়াছেন। বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট কলিকাতার সন্নিহিত কোন স্থানে তাঁত চালনা শিখাইবার বিদ্যালয় শীঘ্র খুলিতে উদ্যত হইয়াছেন। তথায় সুদক্ষ ইংরেজ শিক্ষক তাঁতিদিগকে শিক্ষাদান

করিবেন। এই উদ্দেশ্যে জেলায় জেলায় শাখা বিদ্যালয় স্থাপিত হইবার ব্যবস্থা হইতেছে।

বরোদার মহারাজাও তাঁহার অধিকারে এইরূপ বিদ্যালয় স্থাপন করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছেন। বোম্বাই প্রেসিডেন্সীতে আহম্মদ নগরের শিল্প-বিদ্যালয়ে তাঁতের শিক্ষা পরিচালনা প্রদত্ত হইয়া থাকে। কলিকাতার শ, ওয়ালেস এণ্ড কোং হ্যাটার্সলির তাঁত চালাইতে উপদেশ ও শিক্ষা দিতে প্রস্তুত আছেন। জাপানে টোকিও নগরীর শিল্প-বিদ্যালয়ে তাঁত সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। বিলাতে এতৎসম্বন্ধে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যালয় ইয়র্কসায়ারের লিড্‌স নগরীতে প্রতিষ্ঠিত আছে। *

ই, বি, হাভেল।

কর্ম্মফল।

(১)

বাল্যেই আমার মাতৃবিয়োগ হয়। আমার পিতা দরিদ্র ছিলেন। আমার সেবার জন্য যে একজন দাসী নিযুক্ত করেন, এমন ক্ষমতা তাঁহার ছিলনা। গৃহে অপর আত্মীয়ারও অভাব। বাধ্য হইয়া তাঁহাকেই আমার পালনের ভার লইতে হয়।

তবে তাঁহার পালনটা আমার পক্ষে বড় প্রীতিকর হইল না। প্রকৃতির একটু অস্বাভাবিক উগ্রতা, তাঁহার অন্য সমস্ত গুণকে নিমজ্জিত করিয়াছিল। আমরা ভাল কুলীন—ফুলে বিষ্ণুঠাকুরের

* এই প্রবন্ধ হাভেল সাহেব "ভারতীর" জন্য ইংরাজীতে লেখেন। আমরা বঙ্গানুবাদ করিয়া লইয়াছি। ভাঃ সং।

সন্তান। সমস্ত গ্রামের মধ্যে আমাদের সমকক্ষ কুলীন কেহ ছিল না। পিতার এই কৌলীন্যগর্ব্ব অবস্থাহীনতার সহিত মিশিয়া এমনই বিকৃতভাব ধারণ করিয়াছিল যে, গ্রামের মধ্যে কেহই তাঁহাকে প্রীতিচক্ষে নিরীক্ষণ করিতে পারিত না! বংশমর্য্যাদায় অপেক্ষাকৃত হীন বলিয়া, পিতাও গ্রামস্থ সকলকে একরূপ অবজ্ঞার চক্ষে দেখিতেন। এমন কি গ্রামের জমীদার দেশহিতৈষী বদান্য বাবু রাধাপ্রসাদ চক্রবর্ত্তীও তাঁহার নিকটে প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারেন নাই। জমীদার বাবুর অপরাধ, তিনি একদিন কোন ক্রিয়া উপলক্ষে তাঁহাদের পুর্ব্বপুরুষ কর্ত্তৃক গললগ্নীকৃতবাসে আহূত, আনীত, ও বহুমানে স্বগ্রামে প্রতিষ্ঠিত, রামধন মুখোপাধ্যায়ের এই প্রপৌত্রকে লোকদিয়া নিমন্ত্রন করিয়াছিলেন—নিজে আসিতে পারেন নাই। গ্রামবাসীর অপরাধ তাহারা সেই শিবহীন যজ্ঞে নিমন্ত্রন রক্ষা করিতে গিয়াছিল।

অবশ্য কাহার কি দোষ, আমার বুঝিবার তখন শক্তি ছিল না। কিন্তু ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে দেশে এখন এত শীঘ্র শীঘ্র সামাজিক পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছে যে, পিতার কৌলীন্যগর্ব্ব সে সময়েও যে লোকেরই পক্ষে অসহনীয় হইয়াছিল, ইহা বিচিত্র নয়।

ফলে কিন্তু একা আমাকে, সেই অল্পবয়সেই, নিঃসঙ্গ উগ্রপ্রকৃতিক পিতার সমস্ত ক্রোধের ভার বহন করিয়া বহুদিন যাপন করিতে হইয়াছে। সাত বৎসর বয়স পর্য্যন্ত মায়ের মমতায় পুষ্ট হইয়াছিলাম এখন পিতৃতাড়নায় তাহা হৃদয়ের অন্তস্তম কক্ষে লুক্কায়িত ও ঘনীভূত হইয়া, নিষ্পীড়নে আমাকে দিন দিন ক্ষীণ করিতে লাগিল। এমন পিতার যে মমতা থাকিতে পারে, ইহা আমি স্বপ্নেও কোন দিন ভাবিতে পারি নাই।

(২)

আমাদের গ্রামের পার্শ্ব দিয়া ভৈরব নদ বহিয়া যাইত। মা যখন

জীবিত ছিলেন, তখন তাঁহার সঙ্গে মাঝে মাঝে ভৈরবে স্নান করিতে যাইতাম। আমার বেশ মনে পড়ে মা যখন জলে নামিতেন, তখন আমি তীরে বসিয়া, পরপারের খেজুর বনের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিতাম। নিদাঘে—তাহাদের পীতাভ হরিদ্বর্ণের মাথাগুলা যখন ভৈরবের স্বচ্ছজলে প্রতিবিম্বিত হইত, তখন মনে করিতাম বুঝি, তাহারাও স্নান করিতে জলে নামিয়াছে। সেই ছায়াগুলার অবিরাম কম্পন, জলকেলি মনে করিয়া, তাহাদের সঙ্গে খেলিবার আগ্রহে অন্যমনস্কে জলে নামিতাম। পৃষ্ঠদেশে মাতৃপ্রদত্ত চপেটাঘাত ঔষধে যখন শৈশব কল্পনা দূরে পলাইত, তখন জননীর অঞ্চলের সহিত কলহ করিতে করিতে গৃহে ফিরিতাম। এখন সে ভৈরবও নাই আমারও সে মা নাই—সুতরাং ভৈরবতীরে বসিয়া, তাহার গভীর জলাভ্যন্তরে সেই মায়িক উদ্যানের অনুসন্ধানে জলালোড়নেরও উপায় নাই। কয়েক বৎসর হইতে ভৈরবের মোহানা বন্ধ হইতে আরম্ভ হইয়াছে—ছোট ছোট নৌকাগুলি মাথায় লইয়া, সেই স্বচ্ছ শুভ্রসলিলপ্রবাহ উভয়তীরের শ্যামতরুচ্ছায়াকীর্ণ গ্রামগুলির মধ্য দিয়া, এখন আর গ্রামবধূর মেখলার ন্যায় পড়িয়া থাকে না। এখন ভৈরব শৈবাল সমাচ্ছন্ন, স্থানে স্থানে শুষ্ক। সেখানে প্রতিসন্ধ্যায় একবার করিয়া যাই বটে, কিন্তু শৈবালাচ্ছন্ন নদে আর অবগাহন করিতে সাহস করি না। পিতার পানার্থ কেবল এক কলসী জল লইয়া চলিয়া আসি।

(৩)

ক্রমে জল পঙ্কিল দুর্গন্ধময় কীটবহুল—সর্ব্বতোভাবে অপেয় হইয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে, এক সময়ের স্বাস্থ্যকর স্থান ম্যালেরিয়া, কলেরার আবাসভূমি হইল। দলে দলে লোক মরিতে লাগিল। চিতা-নির্ব্বাপনের জল যোগাইতে ভৈরব বিশীর্ণ ও মলিন হইয়া গেল। বিজ্ঞগণ বুঝিলেন, এরূপভাবে লোকক্ষয় হইলে, দুই চারিবৎসরের মধ্যেই

গ্রাম জনশূন্য হইবে। রাধাপ্রসাদ বাবু এই বিষম বিপদে লোকরক্ষার জন্য একটী বৃহৎ জলাশয় খনন করাইলেন। লোকে তাহার জলমাত্র ব্যবহার করিবার অনুমতি পাইল। পানীয় জলের বিশুদ্ধি রক্ষার্থ রাধাপ্রসাদ বাবু আদেশ দিলেন যে, কেহ তাহাতে স্নানাদি কার্য্য করিতে পারিবে না। গ্রামবাসী সেই জলে বহু উপকার পাইল।

আমার ভাগ্যে কিন্তু সে জল লওয়া ঘটিয়া উঠিল না। সে সরোবর-তীরে যাইতে পিতার নিষেধ ছিল। কাজেই, গ্রামের মধ্যে আমি একাই ভৈরবের দুঃসময়ের সঙ্গী—প্রতি সন্ধ্যায় কলসীমুখপ্রেরিত তাহার দুই চারিটা ধন্যবাদ শুনিতে অবশিষ্ট রহিলাম।

কিন্তু এরূপ করিয়া কয়দিন যাইব? গ্রামস্থ আবালবৃদ্ধবনিতার ব্যবহৃত, সেই সুপেয়সলিলের আধার পশ্চাতে রাখিয়া, একাকী সেই দুরন্ত ভৈরবের নিকট যাইতে আমার মন সরিত না। বিশেষতঃ প্রতিদিন এক সময়ে আমি সেখানে যাইতে পারিতাম না। কোন কোন দিন পৌঁছিতে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া যাইত। সেদিন মৃত্যুচ্ছায়া-সমাকীর্ণ, অনতিদূরের, ক্ষুধিতচিতাভূমি জলশূন্য কলসীগুলার অন্ধকার-ময় কোটরপ্রবিষ্ট চক্ষুদিয়া আমার পানে যেন চাহিয়া থাকিত। আমি জল লইতে লইতে হস্তস্থিত কলসীমুখের শব্দে শিহরিয়া উঠিতাম।

(৪)

একদিন বৃহস্পতিবার। পিতার আদেশে বারবেলা অতিক্রম করিয়া, ভরাসন্ধ্যায় আমি জল আনিতে চলিয়াছি। পিতা একটু বেলা থাকিতে আমাকে এই নিত্যকর্ম্ম সম্পন্ন করিতে বলিয়াছিলেন। কিন্তু আমি দুর্ব্বুদ্ধি বশতঃ পথে একটু খেলা করিয়া সময় নষ্ট করিয়া ছিলাম। তার ফলে এই শাস্তি।

ভীতিভরাবসন্নদেহে চলিতে চলিতে আমি বড়ালদের বাড়ীর সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছি, এমন সময় রামরূপ বড়ালের মেয়ে ভাগীরথী, কোথা

হইতে আসিয়া আমার পথ আগুলিয়া দাঁড়াইল। দেখিলাম, তাহারও কাঁকে একটী ছোট কলসী।

ভাগীরথী জিজ্ঞাসা করিল—"বাণীকণ্ঠ দাদা! কোথায় চলেছ?" এরূপ প্রশ্ন করা ভাগীরথীর সর্ব্বতোভাবেই অবিধেয় হইয়াছিল আমার কাঁধের কলসী, এই সন্ধ্যার আধা অন্ধকারেই সে যদি দেখিতে না পায়, তাহা হইলে তাহার অতবড় দুইটা উজ্জ্বল চক্ষু থাকিয়া লাভ কি হইল! আর কলসী দেখিয়াও, বৃথাপ্রশ্নে পথ আগুলিয়া সে যদি আমার সময় নষ্ট করে, তাহা হইলে তাহার উপর ক্রোধ হইলে, কেহই তাহাতে ন্যায়সঙ্গত আপত্তি করিতে পারেন না। নিতান্ত ছেলেমানুষ নয়, দশ এগার বৎসর বয়স হইতে চলিল, এই এতকাল তাহাদের বাড়ীর সুমুখদিয়া যাতায়াত করিতেছি, সেওত প্রায়ই দেখিতেছে, তাহার যে বুদ্ধি নাই, তাই বা কেমন করিয়া বলিব।

মনে মনে আমার বড়ই রাগ হইল। মনে করিলাম বলি—"চুলোয় চলেছি—সঙ্গে যাবে?"

কিন্তু উত্তরাধিকার সূত্রে পিতার শুদ্ধমাত্র ক্রোধটা আয়ত্ত করিয়া, আমিও কি পিতার ন্যায় লোকের অপ্রিয় হইব! তাই আত্মসংযত হইয়া বলিলাম—"কোথায় যাইতেছি, তুমি কি জান না?"

ভাগীরথী ঈষৎ ঘাড় নাড়িয়া মৃদু হাসিয়া বলিল—"জানি। সেই জন্যই এসেছি। তুমি এই অন্ধকারে জল আন্‌তে চলেছ দেখ্‌তে পেয়ে মা আমাকে দিয়ে তোমায় নিষেধ করতে পাঠিয়েছেন।"

"তার পর?"

"আমি তোমার হয়ে জল আনি। সেই জন্য কলসী এনেছি।"

"কোথাথেকে আনবে?"

"যেখানথেকে বল। তোমার অতবড় কলসী আমি তুলতে পারবো না। বল আমার কলসী দিয়ে দুইবারে এনেদি।"

"আমি যদি ভৈরবতীরে এসময় যাবার যোগ্য নই, তুমি যাবে কেমন করে?"

"কেন বাবুদের পুকুর থেকে জল আন্‌তে দোষ কি? তোমাকেত যেতে হবে না। তুমি পথে দাঁড়িয়ে থেকো।"

কি জানি কোন নীতিশাস্ত্রোপদেশে আমিও বুঝিলাম "দোষ কি?" আমি ভাগীরথীর সঙ্গে চলিলাম।

(৫)

যাহারা জল লইবার, তাহারা সকলেই লইয়া গিয়াছিল। বাবুদের ঘাট নির্জ্জন, পথও নির্জ্জন। আমি কেবল পথে একা দাঁড়াইয়া, ভাগীরথী আধ কলসী জল দিয়া গিয়াছে, আমি আর আধ কলসীর প্রতীক্ষা করিতেছি। যে সিপাই পুকুরটা পাহারা দেয়—সে পুকুরের পাড়ের পর্ণকুটীরে বসিয়া, একটা ঢোল লইয়া, চক্ষু মুদিয়া, বাদ্যের তালে বেতালে, ঝঙ্কারে ঝঙ্কারে—

"রামচঁদরপদ ভজত মূরত কাহে জাগিয়া বাঁশরি।
আখিকা গুরি, গুরিকা চেনি, চেনিকা মিছুরি বনাই দিয়ারে।
রামা-আ-আ"—

গান ধরিয়াছে। আমি বাধ্য হইয়া এই জলজ বৈতালিকের অলক্ষ্যে তৎপ্রেরিত, "রামার" সৃষ্ট এই মিছুরির চোটা কর্ণাধঃকরণ করিতেছি।

ভাগীরথী দ্বিতীয়বার ফিরিতে যে বড়ই বিলম্ব করিল! সুতরাং বাধ্য হইয়া আমাকে সরোবরতীরে যাইতে হইল। গিয়া দেখি, বালিকা সরোবর সোপানে অধোমুখী, পায়ের উপর পা রাখিয়া—অর্দ্ধ-ধৌত অলক্তকরাগে বারম্বার অঞ্জলি পূর্ণ জলনিষেক করিতেছে। বুঝিলাম, আমার জন্যই আজ বালিকার পায়ের আল্‌তা ধুইয়া গেল।

কিন্তু রাত্রি হইতে চলিল, আর তাহার অন্যমনস্ক হইয়া থাকিলেও চলিবে না! তাই ডাকিলাম—"ভাগীরথী!"

ভাগীরথী সুপ্তোত্থিতার ন্যায় একবার চমকিয়া আমার পানে চাহিল। তার পর অনাধরসম্বদ্ধ হাস্যে আমাকে বলিল—"কেমন এনেছি ত ?"

বালিকার দুষ্টামি বুঝিয়া আমি অপ্রতিভ হইলাম। একটা অনির্ব্বচনীয় আনন্দস্রোতও সেই সঙ্গে আমার হৃদয় প্রদেশ দিয়া সর্ব্ব-শরীরে প্রবাহিত হইয়া গেল। আমি বলিলাম,—তাতো আনলে, কিন্তু কলসী ? বিস্মৃত বালিকা পশ্চাতে চাহিয়া দেখিল, কলসী মাঝ সরোবরে ভাসিতেছে।

"তাহলে কি হবে ?"

"কি আর হবে, আমি জলে নামিব।"

"এ জলে যে কাউকে নামিতে দেয় না।"

"এখন আর কে দেখিতে আসিতেছে।"

আমি জলে নামিলাম, সঙ্গে সঙ্গে সিপাহীর গানবাদ্য বন্ধ হইয়া গেল। নিঃশব্দে সাঁতারিয়া কলসী ধরিলাম। ফিরিয়া দেখি, ভাগী-রথী নাই। সর্ব্বোচ্চ সোপান মঞ্চে আরোহণ করিয়া চারিদিক চাহিয়া অনুচ্চকণ্ঠে ডাকিলাম—"ভাগীরথী !"

মঞ্চপার্শ্বস্থ বেদীর অন্তরাল হইতে সিপাহী বাহির হইয়া, দেখিতে দেখিতে আমার কাণ ধরিল। আর অতি রুক্ষকণ্ঠে বলিল—"ভাগীরথী মেরা পাশ্ হ্যায়।"

সবলে সে আমার কাণ আকর্ষণ করিয়া, কুটীরাভিমুখে লইয়া চলিল। অপমানে, কর্ণবেদনায় আমার চক্ষে জল ছুটিল।

আমাকে যাঁহার সম্মুখে লইয়া লইয়া গেল, তিনি রাধাপ্রসাদ বাবুর একমাত্র পুত্র মাধব বাবু। নিকটে উপস্থিত করিবামাত্র, তিনি রুক্ষস্বরে বলিলেন—'এপুকুরে কাহারও নামিবার হুকুম নেই তা জান ?"

তখন সিপাহী কাণ ধরিয়াছিল। আমি মাথা তুলিয়া কথা কহিবার

সুবিধা পাইলাম না। মাথা হেঁট করিয়াই বলিলাম—"আমি আর কখনও আসি নাই।"

"তবে কি নিমিত্ত কুলীনপুত্রের, সহসা আজ আমাদের প্রতি অনুগ্রহ হইল।" আমি আর উত্তর দিলাম না। তিনি দয়া করিয়া, সিপাহীকে দিয়া আমার কাণ মলিয়া ছাড়িয়া দিলেন।

আঘাতের উপর আঘাতে আমার মর্ম্মটি যেন পিশিয়া গেল।

সিপাহী, প্রভুর আদেশে আমার হাত হইতে কলসীটা কাড়িয়া ভাগীরথীদের দিতে গেল।

আমি একবারমাত্র বলিলাম—আপনি নিজে আমাকে শাস্তি দিলেন না কেন? একটা নীচ ভৃত্য আমার অপমান করিল?

বাবু উত্তর দিল—"কি করিব—তোমার কর্ম্মফল।"

আমি আমার অর্দ্ধপূর্ণ কলসীটা এক হস্তে লইয়া, অপর হস্তে চোখের জল মুছিতে মুছিতে বাটী ফিরিলাম।

(৬)

পিতা তখন স্বায়ংসন্ধ্যায় নিযুক্ত ছিলেন। নহিলে সিক্ত বস্ত্রে ফিরিতে দেখিলে, তখনই তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিতেন। সদুত্তর দিতে কি আমার সাহস হইত! আমি অবকাশ পাইয়া তাঁহার অলক্ষ্যে বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া ফেলিলাম। তৎপরে একটা প্রদীপ লইয়া দাওয়ায় বসিয়া একখানা পুঁথি খুলিয়া নীরবে পড়িতে লাগিলাম। পিতার কাছে তিরস্কৃত হইবার ভয়ে, আমি মাধববাবু কৃত অপমান ভুলিবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম। কিন্তু শতচেষ্টায়ও হৃদয়ের একটা দুর্দ্দম আবেগ আমার দীর্ঘ নিশ্বাস কম্পিত করিয়া বাহির হইতেছিল।

সন্ধ্যাবন্দনাদি সমাপন করিয়া পিতা গৃহের বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, আমি পাঠে নিবিষ্টচিত্ত। দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়া তিনি বলিলেন—"বেশ, শাস্ত্রকে সহচর কর। তাহা হইলে তোমাকে আর ইহজীবনে

সঙ্গীর অভাব অনুভব করিতে হইবে না। এই বলিয়া একটী শ্লোক আওড়াইলেন—

অনেক সংশয়চ্ছেদি পরোক্ষার্থস্য দর্শনং।
সর্ব্বস্য লোচনং শাস্ত্রং যস্য নাস্ত্যন্ধ এব সঃ॥

প্রতিদিন এই সময়ে, আমি তাঁহার কিঞ্চিৎ জলযোগের ব্যবস্থা করি। আজ আর তাহা করিতে হইল না। তিনি নিজেই তাহার ব্যবস্থা করিতে আবার গৃহে প্রবেশ করিলেন। ইত্যবসরে আমি পুঁথিখানা দেখিয়া লইলাম—হিতোপদেশ।

একটা শ্লোকে চক্ষুস্থাপিত করিলাম। দেখিলাম—"অনেক সংশয়চ্ছেদি—"ইত্যাদি। পিতা কি অন্তর্য্যামী! কি জানি কেন হৃদয়টা কাঁপিয়া উঠিল।

সহসা গৃহমধ্য হইতে প্রশ্ন উঠিল—"জল আজ এত কম হইল কেন?" আমি উত্তর দিলাম না—নীরবে মধুসূদন স্মরণ করিলাম।

মুহূর্ত্ত পরেই পিতা রুদ্রমূর্ত্তিতে গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন, এবং অতি রুক্ষস্বরে আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"জল কোথা হইতে আনিলি?"

ভয়কম্পিত কণ্ঠে উত্তর দিলাম—"ভৈরব—"

"মিথ্যাবাদী! আমার সমস্ত শাস্ত্র পণ্ড করিতেছ! ভৈরব হইলে তাঁহার চরণামৃতের পবিত্র গন্ধ অনুভব করিতেছিনা কেন?"
বলিয়াই প্রহার করিবার জন্য সবলে সেই প্রহরিধৃত কর্ণটীকেই আকৃষ্ট করিলেন। ষোল বৎসর উত্তীর্ণ হইবার পর তিনি আর আমার প্রতি এরূপ অসদাচরণ করেন নাই, দোষ দেখিলে, মুখেই তিরস্কার করিতেন।

কর্ণে পূর্ব্বেই যথেষ্ট বেদনা অনুভব করিতেছিলাম, পিতার কঠোর আকর্ষণে তাহা অসহ্য হইয়া হইয়া পড়িল। আমি তাঁহার পদধারণ করিয়া বলিলাম—"ক্ষমা করুন—আমি বলিতেছি।"

কর্ণ হইতে হস্ত লইয়াই পিতা বলিলেন—"তোর কি কাণে ঘা ছিল ?" মাথা তুলিয়া দেখি তাঁহার আঙ্গুল রুধিরে রঞ্জিত।

সমস্ত ঘটনা তাঁহার কাছে প্রকাশ করিলাম।

একটিমাত্র দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া পিতা বলিলেন—"মাধব ঠিক বলিয়াছে—তোমার কর্ম্মফল।"

(৭)

কর্ণবেদনায় সারারাত্রি আমার ঘুম হইল না। তথাপি সে দিন আমার সুখের দিন! আমার উগ্র প্রকৃতিক পিতার প্রাণে এত মমতা! সারা রাত্রি আমার শয্যার পার্শ্বে বসিয়া তিনি আমার শুশ্রূষায় নিযুক্ত রহিলেন। শুশ্রূষারত শীতল করের ক্ষণেক অপসারণে এক ফোঁটা উষ্ণ জল আমার গণ্ডে পতিত হইল। আমি বুঝিলাম পিতা রোদন করিতেছেন। মরুভূমি রীতিমত খনিত হইলে, তাহা হইতেও উৎস উৎসারিত হয়, প্রেমপ্লাবিনী-প্রসবিনী পাথরের হৃদয় ভেদ করিয়াই প্রবাহিত হইয়া থাকে।

বেদনায় আমি বালিশে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতেছিলাম, আনন্দের আকস্মিক আবেগে, ভরা গাঙ্গে যেন বান ডাকিল। বহুদিন হইতে লুকায়িত অমৃতভাণ্ড হাতে পাইয়া উদর পূর্ণ করিয়া পিপাসা মিটাইতে আমার সাহস হইল না।

বলিলাম—আপনি নিদ্রা যান্।

অশ্রুগদগদকণ্ঠে পিতা বলিলেন—"নিদ্রা!—বাণীকণ্ঠ! মাধব তোমার কর্ণে আঘাত করে নাই, সে আমার কর্ণমর্দ্দিত করিয়াছে। আমি বেদনা অনুভব করিতেছি। কিন্তু ইহা আমারও কর্ম্মফল। দরিদ্র আপনারই উদরান্ন সংগ্রহে অসমর্থ—আমার সংসারী হইতে এত সাধ হইল কেন? সংসার করিলাম, কিন্তু রাখিতেই বা পারিলাম কই?

"আমার কর্ণে আর বেদনা নাই।"

"তোমার না থাকিতে পারে ; কিন্তু আমার আছে। তীব্র জ্বালায় জ্বলিতেছে। যতদিন ইহার ঔষধ না পাই, ততদিন উত্তরোত্তর বাড়িবে।" কথাটা বুঝিতে পারিলাম না। বুঝিবার চেষ্টায়, সমস্ত রাত্রির অনিদ্রামথিত চক্ষে, নানা জাতীয় স্বপ্ন আসিয়া, আমাকে সংজ্ঞাহীন করিয়া ফেলিল। আমি দেখিলাম—পিতা একটা অত্যুচ্চ অচলের শিখরে উঠিয়া, কি ভীষণ অন্ধকারময় গৃহমাঝে, কোন্ যক্ষ কর্ত্তৃক কত কাল হইতে রক্ষিত রত্নভাণ্ডারের অন্বেষণ করিতেছেন—তীব্র দৃষ্টি অন্ধকার ভেদ করিয়া অচলের বজ্র কঠোর বক্ষও কাঁপাইয়া তুলিয়াছে। সেই কম্পিত হৃদয়চ্যুত রত্নধারা একটী স্নিগ্ধ সলিলরূপিণী স্রোতস্বিনীর মূর্ত্তি ধরিয়া প্রবল তরঙ্গে অচল পাদমূলে চলিয়া গ্রাম নগর দেশ ভাসাইয়া আমার কুটীর সমীপে আসিয়া উপস্থিত হইল। কি জানি কি অপূর্ব্ব আনন্দে আমি স্রোতজলে গা ঢালিতে গৃহ ত্যাগ করিলাম। বাহিরে যাইয়া দেখি কোথায় স্রোতস্বিনী! মধুর কলতরঙ্গ কণ্ঠে নিবিষ্ট করিয়া গৃহ পার্শ্বস্থ কুঞ্জ হইতে কে বলিল—"কেমন এনেছিত'! চাহিয়া দেখিলাম ভাগীরথী।

মনের অতি আবেগে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। শয্যা ত্যাগ করিয়া দেখি, চালের ছিদ্র দিয়া মধ্যাহ্ন গগণের সূর্য্যরশ্মি আমার ঘরের ভিতর প্রবেশ করিতেছে।

ঘরের বাহিরে আসিয়া পিতাকে দেখিতে পাইলাম না। তৎপরিবর্ত্তে দেখিলাম পিতার বৃদ্ধ কৃষক প্রজা হরিহর, আমার স্নান ও ফলাহারের ব্যবস্থা করিয়া, প্রাঙ্গণে বসিয়া আমার জাগরণের অপেক্ষা করিতেছে।

(৮)

তিন বৎসর আমি গ্রামান্তরে এক দূর সম্পর্কীয়া মাতৃস্বসার গৃহে মমতাময় পিতার পুনরাগমনের প্রতীক্ষা করিতেছি।

মাসীমা নিঃসন্তান, পুত্রাধিক আদরে আমার প্রতিপালন করিতে-ছেন। মাঝে মাঝে হরিহর ফলটা পাকড়টা হাতে করিয়া আমার তত্ত্ব লইতে আসে।

আমাদের গ্রাম এ স্থান হইতে প্রায় এক দিবসের পথ। আসিলে হরিহরকে দুই এক দিন অপেক্ষা করিতে হইত। সে যখনই আসিত তখনই গ্রামের কোন না কোন একটা নূতন সংবাদ আমাকে শুনাইত।

একবার শুনিলাম, মাধব বাবুর সঙ্গে ভাগীরথীর বিবাহের সম্বন্ধ হইতেছে। দ্বিতীয়বার শুনিলাম, বিবাহের বিশেষ আয়োজন। রাধাপ্রসাদ বাবু বহু সমারোহের আয়োজন করিতেছেন।

আগামী মাঘের একটা নির্দ্দিষ্ট দিবসের সন্ধ্যায় চণ্ডীমণ্ডপে একা বসিয়া, আমি একটা অননুভূত বেদনার সহিত, মাধব বাবুর বিবাহের একটা ছবি দেখিতেছি, এমন সময় হরিহর আসিয়া সংবাদ দিল, নীলকুঠীর সাহেবে সঙ্গে রাধাপ্রসাদ বাবুর একটা বিষম ফৌজদারীমোকদ্দমা বাধিয়াছে। একটা দাঙ্গায় উভয় পক্ষের বহুলোক জখম হইয়াছে। সেইজন্য বিবাহ কিছুদিনের জন্য স্থগিত রহিয়া গেল।

হৃদয়ের কোন নিভৃত প্রদেশে কতকাল হইতে আবদ্ধ একটা নিশ্বাস ফেলিয়া আমি যেন নিশ্চিন্ত হইলাম।

ইহার পর এক বৎসরের মধ্যে হরিহর আর একদিনের জন্যও আমার তত্ত্ব লইতে আসিল না! প্রথম প্রথম কয়দিন আগ্রহসহকারে প্রতীক্ষা, পরে বর্ষশেষে তাহার অনাগমন কামনা করিয়া, আমি একদিন নিরুদ্দিষ্ট পিতার উদ্দেশে দুই একবিন্দু অশ্রুপাত করিতেছি, এমন সময় ষোলটা বেহারা ও দুইখানা পাল্কী লইয়া এক দ্বারবান আমাদের গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইল।

(৯)

নূতন বেশে সজ্জিত হইয়া, বাহকদিগের ঐক্যতান গানের সহিত আমার শতমুখী চিন্তার সুর মিলাইয়া রাত্রির অন্ধকারে, কত মাঠ, কত গ্রাম, কত জলা জঙ্গল অতিক্রম করিলাম!

নিশীথে মাতৃস্বসার সহিত এক নবনির্ম্মিত অট্টালিকার দ্বারে উপস্থিত হইয়াছি।

"মাসীমা! এ কোথায় আসিলাম ?"

মাসীমা পাল্কী হইতে অবরোহণ করিয়া, আমাকে বলিলেন "চল না দেখি।"

আমার অবরোহনের সঙ্গে নহবৎ বাজিয়া উঠিল। বাহির হইয়া দেখি, আমার সম্মুখে নববেশ পরিহিত, হুঁকা হাতে হাস্যময় হরিহর।

"এ কোথায় আসিয়াছি হরিহর ?"

"কেন বাবু! তোমার বাড়ী!"

"হরিহর! রহস্য করিয়ো না।"

"তবে বাবু! আমার মায়ের বাড়ী। মা ঠাকরুণ একটী খানসামা চেয়েছেন, তাই আমি তোমাকে আনিয়াছি।"

চারি দিক চাহিয়া দেখিলাম। বিস্ময়ে আমার হৃদয় পূর্ণ হইয়া গেল। "তাইত হরিহর! আমার কুটীর ?"

"বাণীকণ্ঠ!"

পশ্চাতে ফিরিয়া দেখিলাম, পিতা। ছুটিয়া পিতার পদপ্রান্তে লুণ্ঠিত হইলাম।

সপ্তাহমধ্যে আমার সুসজ্জিত অট্টালিকার প্রাণ প্রতিষ্ঠা হইল। মহাসমারোহে পিতা, ভাগীরথীকে পুত্রবধূরূপে গৃহে আনিলেন।

(১০)

মর্ম্মাহত পিতা আমার জন্য ধন আনিতে বিদেশ গিয়াছিলেন। ফিরিতে তাঁহার প্রায় চারি বৎসর অতীত হইয়াছে। এই চারি

বৎসরে গ্রামের কতই না অবস্থান্তর ঘটিয়াছে! কুঠিয়ালদের সহিত মোকদ্দমায় রাধাপ্রসাদ বাবু সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছেন। তাঁহার জমীদারী ঋণজালে আবদ্ধ হইয়াছে। এদিকে এই চারি বৎসর মধ্যে, আমার পিতা ধনাঢ্য হইয়া দেশে ফিরিয়াছেন। দেশের মধ্যে আমরাই এখন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধনী।

পাকস্পর্শের দিবসে দেখি রাধাপ্রসাদ বাবু মাধবকে সঙ্গে লইয়া নিমন্ত্রণ রাখিতে আসিয়াছেন। অবগুণ্ঠনবতী ভাগীরথী অন্ন ব্যঞ্জনের থালা লইয়া যখন পিতাপুত্রের সম্মুখে ন্যস্ত করিল, সেই সঙ্গে একখানি দলিল রাধাপ্রসাদ বাবুর পদপ্রান্তে রাখিয়া দিল।

ভোজনের পূর্ব্বে তিনি দলীলখানি একবার খুলিয়া পাঠ করিলেন। পিতা ভাগীরথীর পার্শ্বে দাঁড়াইয়াছিলেন। রাধাপ্রসাদ বাবু তাঁহার দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিলেন—"না জানিয়া, তবে কি আমি আপনার কাছেই ঋণ করিয়াছি?"

পিতা উত্তর দিলেন—"আমরা আপনাদের কর্ত্তৃক আনীত। আপনাদের প্রদত্ত অন্নেই এতকাল প্রতিপালিত হইয়া আসিতেছি। আমাদিগকে আপনারাই সম্পত্তি মনে করুন। ঋণ মনে করিতেছেন কেন?"

"কিন্তু এই এক লক্ষ টাকা আমি যে আজকাল দিতে পারি, এমন শক্তি ত আমার নাই।"

"নব দম্পতীকে আশীর্ব্বাদ দান করুন। সুদে আসলে তাহাদের প্রাপ্য আদায় হইয়া যাইবে।"

পিতার আদেশে ভাগীরথী ও আমি রাধাপ্রসাদ বাবুকে প্রণাম করিলাম মাধব বাবু মাথা হেঁট করিয়া রহিলেন। রাধাপ্রসাদ বাবুর চক্ষু হইতে উৎস প্রবাহিত হইল। "মুখুয্যে মহাশয়! মূর্খ আমি, আভিজাত্যের মর্ম্ম কি বুঝিব। আমার পিতৃপিতামহ বুঝিতেন, তাই

বহু সাধনায় এরূপ দেবতার আহ্বান করিয়াছিলেন।" পিতা উত্তর দিলেন—"আপনারা বনিয়াদী বংশ। অর্থ গৌরবেই কেবল আপনাদের প্রতিষ্ঠা নয়। আপনার এই পুত্রকে বুঝাইবেন—ধনের আভিজাত্য মাসের মধ্যে ত্রিশ দিন বিচলিত হয়, তার জন্য কোন যুগযুগান্তর হইতে আগত আভিজাত্য ত্যাগ করিব কেন? যাহাদের জন্য এই নব আভিজাত্যের সৃষ্টি, তাহারাও আমাদের সহিত একাসনে বসিতে ঘৃণা বোধ করে।"

মাধব বাবুর মস্তক ভাগীরথী প্রদত্ত অন্নব্যঞ্জনে সংলগ্নপ্রায় হইল। অমি মনে মনে বলিলাম—"তোমার কর্ম্মফল।"

শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ।

সোনার তরী।

ভারতীর খেয়াল।

আদি অন্ত হারিয়ে ফেলে,
শাদা কালো আসন মেলে,
পড়ে আছে আকাশটা খোষ্-খেয়ালি ;
আমরা যে সব রাশি রাশি
মেঘের পুঞ্জ ভেসে আসি,
আমরা তারি খেয়াল তারি হেঁয়ালি।
মোদের কিছু ঠিক-ঠিকানা নাই,
আমরা আসি আমরা চলে যাই।

ঐ যে সকল জ্যোতির মালা,
গ্রহতারা রবির ডালা,
জুড়ে আছে নিত্যকালের পসরা ;
ওদের হিসেব পাকা খাতায়
আলোর লেখা কালো পাতায়,
মোদের তরে আছে মাত্র খসড়া ;
রং বেরঙের কলম দিয়ে এঁকে
যেমন খুসি মোছে আবার লেখে।

আমরা কভু বিনা কাজে
ডাক দিয়ে যাই মাঝে মাঝে
অকারণে মুচ্‌কে হাসি হামেসা।
তাই বলে সব মিথ্যে না কি ?
বৃষ্টি সে ত নয়কো ফাঁকি,
বজ্রটা ত নিতান্ত নয় তামাসা।
শুধু আমরা থাকিনে কেউ, ভাই,
হাওয়ায় আসি হাওয়ায় ভেসে যাই !

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

খেয়াল খাতা।

(১)

শ্রীমতী ভারতীসম্পাদিকা নূতন বৎসরের প্রথম দিন হতে ভারতীর জন্য একটী খেয়াল খাতা খুল্‌বেন, এই অভিপ্রায়ে, যাঁরা লেখেন, কিম্বা লিখতে পারেন, কিম্বা যাঁদের লেখা উচিত, কিম্বা লিখ্‌তে পারা উচিত, এমন অনেক লোকের কাছে দু' এক কলম লেখার নিমন্ত্রণ পাঠিয়েছেন। উপরোক্ত চারটি দলের মধ্যে আমি যে ঠিক কোথায় আছি তা জানিনে। তবুও ভারতীসম্পাদিকার সাদর নিমন্ত্রণ রক্ষা করা কর্ত্তব্য বিবেচনায় দু'চার ছত্র রচনা করতে উদ্যত হয়েছি। ভারতীসম্পাদিকা ভরসা দিয়েছেন যে, যা' খুসী লিখ্‌লেই হবে, কোন বিশেষ বিষয়ের অবতারণা কিম্বা আলোচনা করবার দরকার নেই। এ প্রস্তাবে অপরের কি হয় বল্‌তে পারিনে, আমার ত ভরসার চাইতে ভয় বেশী হয়। আমাদের মন সহজে এবং শিক্ষার গুণে এতটা বৈষয়িক, যে বিষয়ের অবলম্বন ছেড়ে দিলে আমাদের মনের ক্রিয়া বন্ধ হয়, বল্‌বার কথা আর কিছু থাকে না। হাওয়ার উপর চলা যত সহজ, ফাঁকার উপর লেখাও তত সহজ। গণিতশাস্ত্রে যাই হক্‌, সাহিত্যে শূন্যের উপর শূন্য চাপিয়ে কোন কথারই গুণবৃদ্ধি করা যায় না। বিনি সূতার মালার ফরমাস দেওয়া যত সহজ, গাঁথা তত সহজ নয়। ও বিদ্যের সন্ধান শতেকে জনেক জানে। আসল কথা, আমরা সকলেই গভীর নিদ্রামগ্ন, শুধু কেউ কেউ স্বপ্ন দেখি। ভারতীসম্পাদিকার ইচ্ছা এই শেষোক্ত দলের একটু বক্‌বার সুবিধে করে' দেওয়া।

(২)

এ খেয়াল খাতা ভারতীর চাঁদার খাতা। স্বেচ্ছায় স্বচ্ছন্দচিত্তে যিনি যা দেবেন তা' সাদরে গ্রহণ করা হবে। আধুলি সিকি দুয়ানি কিছুই ফেরৎ যাবে না, শুধু ঘসা পয়সা ও মেকি চল্‌বে না। কথা যতই ছোট হোক্‌, খাঁটি হওয়া চাই, তার উপর চক্‌চকে হ'লেত কথাই নেই। যে ভাব হাজার হাতে ফিরেছে, যার চেহারা বলে' জিনিষটে লুপ্তপ্রায় হয়েছে, অতি পরিচিত বলে' যা' আর কারো নজরে পড়ে না, সে ভাব এ খেয়াল খাতার স্থান পাবে না। নিতান্ত পুরাণো চিন্তা পুরাণো ভাবের প্রকাশের জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা আছে, আর্টিকেল লেখা। আমাদের কাজের কথায় যখন কোন ফল ধরে না, তখন বাজে কথার ফুলের চাষ করলে হানি কি? যখন আমাদের ক্ষুধা নিবৃত্তি করবার কোন উপায় করতে পারছিনে, তখন দিন থাকতে

সথ মিটিয়ে নেবার চেষ্টা করাটা আবশ্যক। আর একথা বলা বাহুল্য, যেখানে কেনাবেচার কোন সম্বন্ধ নেই, ব্যাপারটা হচ্ছে শুধু দান ও গ্রহণের, সে স্থলে কোন ভদ্র সন্তান, মসীজীবী হ'লেও, যে কথায় নিজে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করেন না, কিম্বা ঝুটো বলে' জানেন, তা' চালাতে চেষ্টা করবেন না। আমরা কার্য্য জগতে যখন সাচ্চা হতে পারিনে, তখন আশা করা যায় কল্পনাজগতে অলীকতার চর্চ্চা করব না। এই কারণেই বল্‌ছি ঘসা পয়সা ও মেকি চল্‌বে না।

(৩)

খেয়ালী লেখা বড় দুষ্প্রাপ্য জিনিষ। কারণ সংসারে বদ্ খেয়ালী লোকের কিছু কম্‌তি নেই, কিন্তু খেয়ালী লোকের বড়ই অভাব। অধিকাংশ মানুষ যা' করে তা' আয়াসসাধ্য। সাধারণ লোকের পক্ষে একটুখানি ভাব অনেকখানি ভাবনার ফল। মানুষের পক্ষে চেষ্টা করাটাই স্বাভাবিক, সুতরাং সহজ। স্বতঃ উচ্ছ্বসিত চিন্তা কিম্বা ভাব শুধু দু'এক জনের নিজ প্রকৃতিগুণে হয়। যা' আপনি হয় তা' এতই শ্রেষ্ঠ ও এতই আশ্চর্য্যজনক, যে তার মূলে আমরা দৈবশক্তি আরোপ করি। এ জগতসৃষ্টি ভগবানের লীলা বলেই এত প্রশস্ত, এবং আমাদের হাতে গড়া জিনিষ কষ্টসাধ্য বলেই এত সঙ্কীর্ণ। তবে আমাদের সকলেরই মনে বিনা ইচ্ছাতেও যে নানাপ্রকার ভাবনাচিন্তার উদয় হয়, এ কথা অস্বীকার করবার যো নেই। কিন্তু সে ভাবনাচিন্তার কারণ স্পষ্ট এবং রূপ অস্পষ্ট। রোগ শোক দারিদ্র্য প্রভৃতি নানা স্পষ্ট সাংসারিক কারণে আমাদের ভাবনা হয়, কিন্তু সে ভাবনা এতই এলোমেলো যে, অন্যে পরে কা কথা, আমরা নিজেরাই তার খেই খুঁজে পাইনে। যা নিজে ধরতে পারিনে তা অন্যের কাছে ধরে দেওয়া অসম্ভব, যে ভাব আমরা প্রকাশ করতে পারিনে, তাকে খেয়াল বলা যায় না। খেয়াল অনির্দ্দিষ্ট কারণে মনের মধ্যে দিব্য একটি সুস্পষ্ট সুসম্বদ্ধ চেহারা নিয়ে উপস্থিত হয়। খেয়াল রূপবিশিষ্ট, দুশ্চিন্তা তা নয়।

(৪)

খেয়াল অভ্যাস কর্‌বার পূর্ব্বে খেয়ালের রূপনির্ণয় করাটা আবশ্যক, কারণ স্বরূপ জান্‌লে অনধিকারীরা এ বিষয়ের বৃথা চর্চ্চা কর্‌বেন না। আমাদের লিখিত শাস্ত্রে খেয়ালের বড় উদাহরণ পাওয়া যায় না, সুতরাং সঙ্গীত শাস্ত্র হতে এর আদর্শ নিতে হবে। এক কথায় বল্‌তে গেলে ধ্রুপদের অধীনতা হতে মুক্ত হবার বাসনাই খেয়ালের উৎপত্তির কারণ। ধ্রুপদের ধীর গম্ভীর শুদ্ধ শান্ত রূপ ছাড়াও পৃথিবীতে ভাবের

অঙ্গ অনেক রূপ আছে। বিলম্বিত লয়ের সাহায্যে মনের সকল স্ফূর্ত্তি সকল আক্ষেপ প্রকাশ করা যায় না। সুতরাং ধ্রুপদের কড়া শাসনের মধ্যে যার স্থান নেই, যথা তান গিট্‌কিরি ইত্যাদি, তাই নিয়েই খেয়ালের আসল কারবার। কিন্তু খেয়ালের স্বাধীন ভাব উচ্ছৃঙ্খল হলেও যথেচ্ছাচারী নয়। খেয়ালী যতই কার্দ্দানী করুন্ না কেন, তালচ্যুত কিম্বা রাগভ্রষ্ট হবার অধিকার তাঁর নেই। জড় যেমন চৈতন্যের আধার, দেহ যেমন রূপের আশ্রয়ভূমি, রাগও তেমনি খেয়ালের অবলম্বন। বর্ণ ও অলঙ্কার বিন্যাসের উদ্দেশ্য রূপ ফুটিয়ে তোলা, লুকিয়ে ফেলা নয়। খেয়ালের চাল ধ্রুপদের মত সরল নয় বলেই মাতালের মত আঁকাবাঁকা নয়, নর্ত্তকীর মত বিচিত্র। খেয়াল ধ্রুপদের বন্ধন যতই ছাড়িয়ে যাক্ না কেন, সুরের বন্ধন ছাড়ায় না, তার গতি সময়ে সময়ে অতিশয় দ্রুতলঘু হ'লেও ছন্দঃপতন হয় না। গানও যে নিয়মাধীন, লেখাও সেই নিয়মাধীন। যার মন সিধে পথ ভিন্ন চল্‌তে জানে না, যাঁর কল্পনা আপনা হ'তেই খেলে না, যিনি আপনাকে সম্পূর্ণ ছেড়ে দিতে পারেন না, অথবা ছেড়ে দিলে আর নিজবশে রাখতে পারবেন না, তাঁর খেয়াল লেখার চেষ্টা না করাই ভাল। তা'তে তাঁর শুধু গৌরবের লাঘব হবে। কৃশদেহ পুষ্ট করবার চেষ্টা অনেক সময়ে ব্যর্থ হ'লেও কখনই ক্ষতিকর নয়, কিন্তু স্থূলদেহকে সূক্ষ্ম করবার চেষ্টায় প্রাণসংশয় উপস্থিত হয়। ইঙ্গিতজ্ঞ লোক মাত্রেই উপরোক্ত কথা ক'টির সার্থকতা বুঝতে পারবেন।

(৫)

আমার কথার ভাবেই বুঝতে পারছেন, যে আমি খেয়াল বিষয়ে একটু হাল্কা অঙ্গের জিনিষের পক্ষপাতী। চুট্‌কিও আমার অতি আদরের সামগ্রী, যদি সুর খাঁটি থাকে ও ঢং ওস্তাদি হয়। আমার বিশ্বাস আমাদের দেশের আজ কাল প্রধান অভাব গুণপনাযুক্ত ছিব্‌লেমী। এসম্বন্ধে কৈফিয়ৎ-স্বরূপে দু'এক কথা বলা প্রয়োজন। কোন ব্যক্তি কিম্বা জাতিবিশেষ যখন অবস্থাবিপর্য্যয়ে সকল অধিকার হতে বিচ্যুত হয়, তখন তার দু'টি অধিকার অবশিষ্ট থাকে, কাঁদ্‌বার ও হাস্‌বার। আমরা আমাদের সেই কাঁদ্‌বার অধিকার ষোল আনা বুঝে নিয়েছি, এবং নিত্য কাজে লাগাচ্ছি। আমরা কাঁদ্‌তে পেলে যত খুসী থাকি, এমন আর কিছুতেই নয়। আমরা লেখায় কাঁদি, বক্তৃতায় কাঁদি। আমরা দেশে কেঁদেই সন্তুষ্ট থাকিনে, চাঁদা তুলে বিদেশে গিয়ে কাঁদি। আমাদের স্বজাতীয়দের মধ্যে যাঁরা স্থানে অস্থানে এমন কি

অরণ্যে পর্য্যন্ত রোদন করতে শিক্ষা দেন, তাঁরাই দেশের জ্ঞানী গুণী বুদ্ধিমান ও প্রধান লোক বলে' গণ্য এবং মান্য। যেখানে ফোঁস করা উচিত, সেথানে ফোঁস্ ফোঁস্ করলেই আমরা বলিহারি পাই। আমাদের এই কান্না দেখে কারও মন ভেজে না, অনেকের মন চটে। আমাদের নূতন সভ্যযুগের অপূর্ব্ব সৃষ্টি ন্যাশনাল কংগ্রেস, অপর সদ্যজাত শিশুর মত ভূমিষ্ঠ হয়েই কান্না সুরু করে দিলে। আজ যদিও তার সাবালক হবার বয়স উত্তীর্ণ হয়েছে, তবুও বৎসরে ৩৬২ দিন কুম্ভকর্ণের মত নিদ্রা দিয়ে, তার পর জেগে উঠেই তিন দিন ধরে, কোকিয়ে কান্না সমান চলছে। যদি কেউ বলে, ছি! অত কাঁদ কেন, একটু কাজ কর না,— তাহলে তার উপর আবার চোখ রাঙিয়ে উঠে। বয়সের গুণে শুধু ঐটুক উন্নতি হয়েছে। মনের দুঃখের কান্নাও অতিরিক্ত হ'লে কারও মায়া হয় না। কিন্তু কান্না ব্যাপারটাকে একটা কর্ত্তব্য কর্ম্ম করে তোলা শুধু আমাদের দেশেই সম্ভব হয়েছে। আমরা সমস্ত দিন গৃহকর্ম্ম করে বিকেলে গা ধুয়ে চুল বেঁধে পা ছড়িয়ে যথন পুরাতন মাতৃবিয়োগের জন্য নিয়মিত এক ঘণ্টা ধরে' ইনিয়ে বিনিয়ে কাঁদতে থাকি, তখন পৃথিবীর পুরুষ মানুষদের হাসিও পায়, রাগও ধরে। সকলেই জানেন যে কান্না ব্যাপাটারও নানা পদ্ধতি আছে, যথা, রোল কান্না, মড়া কান্না, ফুঁপিয়ে কান্না, ফুলে ফুলে কান্না ইত্যাদি, কিন্তু আমরা শুধু অভ্যাস করেছি নাকে কান্না। এবং একথাও বোধ হয় সকলেই জানেন যে সদারঙ্গ বলে' গেছেন যে খেয়ালে সব সুর লাগে, সুধু নাকী সুর লাগে না। এই সব কারণেই আমার মতে এখন সাহিত্যের সুর বদলানো প্রয়োজন। করুণরসে ভারতবর্ষ স্যাঁৎসেঁতে হয়ে উঠেছে. আমাদের সুখের জন্য না হোক্ স্বাস্থ্যের জন্যও হাস্যরসের আলোক দেশময় ছড়িয়ে দেওয়া নিতান্ত আবশ্যক হয়ে পড়েছে। যদি কেউ বলে আমাদের এই দুর্দ্দিনে হাসি কি শোভা পায়? তার উত্তর ঘোর মেঘাচ্ছন্ন অমাবস্যার রাত্রিতেও বিদ্যুৎ কি দেখা দেয় না, কিম্বা শোভা পায় না? আমাদের এই অবিরতধারা অশ্রুবৃষ্টির মধ্যে কেহ কেহ যদি বিদ্যুৎ সৃষ্টি করতে পারেন, তা হলে আমাদের ভাগ্যাকাশ পরিষ্কার হবার একটী সম্ভাবনা জন্মায়।

বীরবল।

খেয়ালের চৌহদ্দি।

সম্পাদিকার নিমন্ত্রণে 'ভারতীর' খেয়াল-খাতার দেউরিতে গুণীজনাগ্রগণ্য বীরবল মহাশয় সান্ত্রীর খেয়ালে চাপিয়া আসিয়া যজ্ঞের আয়োজনকারিণীকে সন্ত্রস্ত করিয়াছেন। তিনি কাকে রাখেন, কাকে মারেন! অতএব সম্পাদকীয় পরিমাপে "খেয়াল" এর চৌহদ্দির একটা নিষ্পত্তি করিয়া ফেলা আবশ্যক হইয়াছে।

আলঙ্কারিকেরা বলেন, "কাব্যং হি রসাত্মকং বাক্যং"। আমি বলি, 'খেয়াল রসাত্মক কল্পনা'—শুধু বাক্যেই নহে, বিবিধ নামরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে; যেমন বড়লাটের "দরবারী খেয়াল," চেম্বার্লেনের "শাহী খেয়াল।"

খেয়াল আমিরী হইতে পারে, গরিবীও হইতে পারে; মজাদারী হইতে পারে, দুনিয়াদারীও হইতে পারে; চুটকি হালকিও হইতে পারে, জমাট ভারিক্কিও হইতে পারে। বাজে খেয়াল বিনোদন করে, কেজো খেয়াল কাজে উদ্রিক্ত করে। মানুষকে হাসির খেয়ালে যেমন পায়, কান্নার খেয়ালেও তেমন চাপে। প্রপঞ্চকে মনের কোন্ পরকলাখানা দিয়া কখন দেখা যায় তার উপর খেয়ালের রকম সকম আকার প্রকার নির্ভর করে। অতএব ভারতীর "খেয়াল খাতায়" সকল জাতীয় খেয়ালেরই আসন ও মর্য্যাদা নির্দ্দিষ্ট আছে। খেয়ালী গুণীসাধারণের প্রতি নিমন্ত্রণকারিণীর এই সবিনয় অভয় নিবেদন।

সম্পাদিকা।

রায়-মহিষ-কাহিনী।

(সত্য ঘটনা অবলম্বনে লিখিত।)

দার্জ্জিলিং নামে পুরী পর্ব্বতশিখরে
মুকুতা মুকুট সম হিমাচল শিরে।
ত্যজি মর্ত্ত্য লোক যথা নরনারীগণ,
স্বর্গের সোপানে যেন করে বিচরণ।
সহসা মহিষ মত্ত কালরূপী প্রায়,
ছুটে আসি আক্রমিল স্পেন্সর বালায়!
ত্যজি অন্য সর্ব্ব লোক বজ্রসম শৃঙ্গে,
বিদারিল পরিচ্ছদ বালিকার অঙ্গে।
প্রাণে কি বধিতে চাস্?—আরে কি করিস্!
জানিস্ না কে আছে কাছে পাষণ্ড মহিষ?
সাপটি ধরিল তার বক্র শৃঙ্গ দ্বয়,
লম্ববাহু মহাবীর মিষ্টার রায়।
সুগঠিত দেহ তার—সুকৃশও হ'লে—
বেলের মোরব্বা ভাত মৎস্যের ঝোলে।
মাথা-নাড়া দিল বীর, পড়ে শিরস্ত্রাণ,
রণে ভঙ্গ দিয়া পশু করিল প্রস্থান।
বাঁচিল বালিকা প্রাণ গগনে অমনি
দেব যক্ষ রক্ষ সবে দিল হুলুধ্বনি।
পালাল মহিষাসুর অবারিত গতি,
মারিল বিষম ঢুঁ "কেরী" ধাত্রী প্রতি
যত আক্রমণ তোর অবলা উপরে,
পাইলি পাপের শাস্তি খাদে পড়ে' মরে'॥

শ্রীবিহারী লাল গুপ্ত।

সৌন্দর্য্য ।

সৌন্দর্য্য সকলকেই পাগল করিয়া তোলে, তাহার ভিতরকার নিগূঢ় তত্ত্ব জানা বড়ই দরকার। পর্দ্দার আড়ালে কি আছে তাহা একবার উঁকি দিয়া দেখা আবশ্যক। লোকে বলে, আপনি না মাতিলে অন্যকে মাতানো যায় না, কিন্তু গোলাপ ফুল তো অন্যকে বেশ মাতায়—আপনি তো কখনও মাতে না ; একজন সুন্দরী ললনা সভার মাঝখান দিয়া চলিয়া গেলে—ঠিক যেন একটা ষ্টীমার গঙ্গার মাঝখান দিয়া চলিয়া যায়—ক্ষণপরেই গঙ্গার দোধারি তরঙ্গে হুল স্থুল হইয়া উঠে ; কিন্তু ষ্টীমার তো একটুও হেলে না দোলে না। মাতানোটাই তো সর্ব্বদা চক্ষে পড়ে ; কিন্তু মাতা-কোন্ খানে ? কোন সুরসিক ব্যক্তি ইহার একটা সদুত্তর প্রদান করিয়া বাধিত করিবেন।

শ্রীদ্বিজেন্দ্র নাথঠাকুর।

রেণু।

অতি শিশুকালে আমরা কিছু মনে করে রাখতে পারিনে, কিন্তু হাতের কাছে যে টুকু পাই সে টুকু এম্নি জোরে আঁকড়ে ধরি যে ছাড়িয়ে নেওয়া কঠিন হয়। বড় হলে আমরা হাতের কাছের জিনিষ ছেড়ে বুকের কাছে যা পাওয়া যায় তাও ধরে রাখতে পারিনে, তখন কেবল সবই মনে করে রাখি।

সুখ চলে গেলে তার স্মৃতিটুকুই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট—কিন্তু প্রিয়জন চলে গেলে শুধু স্মৃতি নিয়ে জীবন চলে না। সুখ আমাদের জীবনের অংশ মাত্র, প্রিয়জন জীবনের সর্ব্বস্ব।

নীলাকাশ শূন্য, কিন্তু তারি মধ্যে কত লক্ষ লক্ষ গ্রহ তারকা লুকিয়ে আছে—শিশুর শূন্য দৃষ্টিটুকুও নীল, কিন্তু তারি মধ্যে ভবিষ্যৎ জীবনের কত চিন্তা কত লক্ষ্য কত প্রকাশ অপরিস্ফুট ভাবে সঙ্গোপনে নিহিত থাকে।

অমাবস্যার পরদিনকে প্রতিপদ বলা হয়, পূর্ণিমার পর দিনকেও প্রতিপদ বলি; সুখের হাসিও হাসি, দুঃখের হাসিও হাসি; কিন্তু দুয়ে প্রভেদ কত? একটি আশার বিকাশ, অপরটি আশার অবসান।

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

সহানুভূতি ও সহমর্ম্মিতা।

ইংরাজি Sympathyর প্রতিশব্দ "সহানুভূতি" আমাদের ভাষায় অনেকটা প্রচলিত হইয়াছে। কিন্তু এই শব্দ প্রয়োগে কতকটা অসুবিধা হয়, Sympathiserএর অনুবাদ কি করিবে? সহানুভূতি-কারী? বড় বদ শুনায়। সহানুভূতির পরিবর্ত্তে আমরা যদি সহ-মর্ম্মিতা শব্দ ব্যবহার করি, তাহা হইলে ওই অভাব ঘুচিতে পারে। এই শব্দের প্রসার অপেক্ষাকৃত বেশী। Sympathiserএর অনুবাদে আমরা সহমর্ম্মী বলিতে পারি,—শুনিতে খারাপ শুনায় না। যেমন সহধর্ম্মী, সেইরূপ সহমর্ম্মী, এই শব্দ প্রয়োগে ভাষার মর্ম্মও বজায় থাকে—তাহার বিরোধী হয় না। বিদ্যাপতির এক স্থানে আছে,—

"যদি বা না কহ লোকের লাজে,
মরমী জনার মরম বাজে।"

এখানে মরমী Sympatheticএর অর্থে ব্যবহৃত স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। আর একটা কথা এই—Sympathise শব্দ যেমন কি ভাব কি বুদ্ধি উভয় সম্পর্কেই ব্যবহার হয়, সেইরূপ মর্ম্ম শব্দটীও আমাদের ভাষায় ব্যবহার হয়; "কথার মর্ম্ম বোঝা"—"প্রস্তাবের মর্ম্ম বোঝা" এইরূপ প্রয়োগও প্রচলিত আছে। ইংরাজিতে শুধু ব্যক্তি বিশেষের সহিত সুখ দুঃখ প্রকাশ করিতে গেলে Sympathise শব্দ ব্যবহার হয় না। কোন উদ্দেশ্যেরও—Object—সহিত Sympathise করা যায়,—উহাতে একটু বুদ্ধির উপকরণ আছে। কিন্তু অনুভূতি শব্দে কেবল ভাব অনুভব করা বুঝায়, অতএব আমরা কোন উদ্দেশ্যেরও মর্ম্মগ্রাহী হইয়া সহমর্ম্মিতা প্রকাশ করিতে পারি।

পুনশ্চ—কিন্তু এখন আমার মনে হইতেছে, সহানুভূতি শব্দ যে ত্যাগ করা যায় না—লিখিবার সময়, দেখা যায়, কোন কোন স্থলে সহানুভূতি ব্যতীত আর কোন শব্দ ঠিক্ উপযোগী হয় না—"মমতা" অনেক স্থলে ব্যবহার করা যাইতে পারে—জীব সমাজে জীবনের যুঝা-যুঝিতে যোগ্যতমরাই যেরূপ উত্তরজীবিতা লাভ, করে, সেইরূপ ভাষাতেও যোগ্য শব্দ গুলাই থাকিয়া যায়, দেখা যাক্ কে বাঁচে কে মরে?

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বাঙ্গলাভাষা ও বাঙ্গালী চরিত্র।

অনেক সময় দেখা যায় সংস্কৃত শব্দ বাঙ্গলায় রূপান্তরিত হ'য়ে একপ্রকার বিকৃত ভাব প্রকাশ করে। কেমন একরকম ইতর বর্ব্বর আকার ধারণ করে। "ঘৃণা" শব্দের মধ্যে একটা মানসিক ভাব আছে। Aversion, indignation, contempt প্রভৃতি ইংরাজি শব্দ বিভিন্ন স্থল অনুসারে "ঘৃণার" প্রতিশব্দ স্বরূপ ব্যবহৃত হইতে পারে। কিন্তু "ঘেন্না" বল্লেই নাকের কাছে একটা দুর্গন্ধ, চোখের সাম্‌নে একটা বীভৎস দৃশ্য, গায়ের কাছাকাছি একটা মলিন অস্পৃশ্য বস্তু কল্পনায় উদিত হয়। সংস্কৃত "প্রীতি" শব্দের মধ্যে একটা বিমল উদার মানসিক ভাব নিহিত আছে। কিন্তু বাঙ্গলা "পিরিতি" শব্দের মধ্যে সেই বিশুদ্ধ ভাবটুকু নাই। বাঙ্গালায় "স্বামী" "স্ত্রী"র সাধারণ প্রচলিত প্রতিশব্দ ভদ্রসমাজে উচ্চারণ করিতে লজ্জা বোধ হয়। "ভর্ত্তা" এবং তাহার বাঙ্গালা রূপান্তর তুলনা করিয়া দেখিলেই একথা স্পষ্ট হইবে। আমার বোধ হয় সংস্কৃত ভাষায় "লজ্জা" বলিলে যতটা ভাব প্রকাশ করে, বাঙ্গলায় "লজ্জা" ততটা করে না। বাঙ্গলায় "লজ্জা" একপ্রকার প্রথাগত বাহ্যলজ্জা, তাহা modesty নহে। তাহা হ্রী নহে। লজ্জার সহিত শ্রীর একটা যোগ আছে বাঙ্গলা ভাষায় তাহা নাই। সৌন্দর্য্যের প্রতি স্বাভাবিক লক্ষ্য থাকিলে আচারে ব্যবহারে, ভাবভঙ্গীতে ভাষায় কণ্ঠস্বরে সাজসজ্জায় একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ সংযম আসিয়া পড়ে। বাঙ্গালায় লজ্জা বলিতে যাহা বুঝায় তাহা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, তাহাতে বরঞ্চ আচার ব্যবহারের সামঞ্জস্য নষ্ট করে, একটা বাড়াবাড়ি আসিয়া সৌন্দর্য্যের ব্যাঘাত করে। তাহা শরীর মনের সুশোভন সংযম নহে, তাহার অনেকটা কেবল মাত্র শারীরিক অভিভূতি।

গল্প আছে—বিদ্যাসাগর মহাশয় বলেন উলোয় শিব গড়িতে বাঁদর হইয়া দাঁড়ায়, তেমনি বাঙ্গলার মাটির বাঁদর গড়িবার দিকে একটু বিশেষ প্রবণতা আছে। লক্ষ্য শিব এবং পরিণাম বাঁদর ইহা অনেক স্থলেই দেখা যায়। উদার প্রেমের ধর্ম্ম বৈষ্ণব ধর্ম্ম বাঙ্গালাদেশে দেখিতে দেখিত কেমন হইয়া দাঁড়াইল। একটা বৃহৎ ভাবকে জন্ম দিতে যেমন প্রবল মানসিক বীর্য্যের আবশ্যক, তাহাকে পোষণ করিয়া রাখিতেও সেইরূপ বীর্য্যের আবশ্যক। আলস্য এবং জড়তা যেখানে জাতীয় স্বভাব, সেখানে বৃহৎ-ভাব দেখিতে দেখিতে বিকৃত হইয়া যায়। তাহাকে বুঝিবার তাহাকে রক্ষা করিবার এবং তাহার মধ্যে প্রাণসঞ্চার করিয়া দিবার উদ্যম নাই।

আমাদের দেশে সকল জিনিষই যেন একপ্রকার slang হইয়া আসে। আমার তাই এক একবার ভয় হয় পাছে ইংরাজদের বড় ভাব বড় কথা আমাদের দেশে ক্রমে সেইরূপ অনার্য্য ভাব ধারণ করে। দেখিয়াছি বাঙ্গালায় অনেকগুলি গানের সুর কেমন দেখিতে দেখিতে ইতর হইয়া যায়। আমার বোধ হয় সভ্যদেশে যে যে সুর সর্ব্ব-সাধারণের মধ্যে প্রচলিত, তাহার মধ্যে একটা গভীরতা আছে, তাহা তাহাদের national air, তাহাতে তাহাদের জাতীয় আবেগ পরিপূর্ণ-ভাবে ব্যক্ত হয়। যথা Home Sweet Home, Auld lang syne —বাঙ্গলাদেশে সেরূপ সুর কোথায়? এখানকার সাধারণ—প্রচলিত সুরের মধ্যে গাম্ভীর্য্য নাই, স্থায়িত্ব নাই, ব্যাপকতা নাই। সেই জন্য তাহার কোনটাকেই national air বলা যায় না। হিন্দুস্থানীতে যে সকল খাম্বাজ ঝিঁঝিট কাফি প্রভৃতি রাগিণীতে শোভন ভদ্রভাব লক্ষিত হয়, বাঙ্গলায় সেই রাগিণীই কেমন কুৎসিৎ আকার ধারণ করিয়া "বড় লজ্জা করে পাড়ায় যেতে" "কেন বল সখি বিধুমুখী" "একে অবলা সরলা" প্রভৃতি গানে পরিণত হইয়াছে।

কেবল তাহাই নহে এক একবার মনে হয় হিন্দুস্থানী এবং বাঙ্গলার উচ্চারণের মধ্যে এই ভদ্র এবং বর্ব্বর ভাবের প্রভেদ লক্ষিত হয়। হিন্দুস্থানী গান বাঙ্গলায় ভাঙ্গিতে গেলেই তাহা ধরা পড়ে। সুর তাল অবিকল রক্ষিত হইয়াও অনেক সময় বাঙ্গলা গান "রোথো" রকম শুনিতে হয়। হিন্দুস্থানীর polite "আ" উচ্চারণ বাঙ্গলায় vulgar "অ" উচ্চারণে পরিণত হইয়া এই ভাবান্তর সংঘটন করে। "আ" উচ্চারণের মধ্যে একটি বেশ নির্লিপ্ত ভদ্র Suggestive ভাব আছে, আর "অ" উচ্চারণ নিতান্ত গা-ঘেঁসা সঙ্কীর্ণ এবং দরিদ্র। কাশীর সংস্কৃত উচ্চারণ শুনিলে এই প্রভেদ সহজেই উপলব্ধি হয়।

উপরের প্যারাগ্রাফে একস্থলে commonplace শব্দ বাঙ্গলায় ব্যক্ত করিতে গিয়া "রোথো" শব্দ ব্যবহার করিয়াছি। কিন্তু উক্ত শব্দ ব্যবহার করিতে কেমন কুণ্ঠিত বোধ করিতেছিলাম। সকল ভাষাতেই গ্রাম্য ইতর শব্দ আছে। কিন্তু দেখিয়াছি বাঙ্গলায় বিশেষ ভাব-প্রকাশক শব্দ মাত্রই গ্রাম্য। তাহাতে ভাব ছবির মত ব্যক্ত করে বটে কিন্তু সেই শব্দে আরো একটা কি করে যাহা সঙ্কোচজনক। Smile শব্দ বাঙ্গলায় ব্যক্ত করিতে হইলে হয় "মুচ্‌কে হাসি" নয় "ঈষর্দ্ধাস্য" বলিতে হইবে। কিন্তু "মুচ্‌কে-হাসি" সাধারণতঃ মনের মধ্যে যে ছবি আনয়ন করে তাহা বিশুদ্ধ Smile নহে, ঈষদ্ধাস্য কোন ছবি আনয়ন করে কি না সন্দেহ। Peep শব্দকে বাঙ্গালায় "উঁকিমারা" বলিতে হয়। Creep শব্দকে "গুঁড়িমারা" বলিতে হয়। কিন্তু "গুঁড়িমারা" "উঁকিমারা" শব্দ ভাবপ্রকাশক হইলেও সর্ব্বত্র ব্যবহারযোগ্য নহে। কারণ উক্ত শব্দগুলিতে আমাদের মনে এমন সকল ছবি আনয়ন করে যাহার সহিত কোন মহৎ বর্ণনার যোগসাধন করিতে পারা যায় না।

হিন্দুস্থানী বা মুসলমানদের ভিতর একটা আদব-কায়দা আছে। একজন হিন্দুস্থানী বা মুসলমান ভৃত্য দিনের মধ্যে প্রভুর সহিত প্রথম

সাক্ষাৎ হইবা মাত্রই যে সেলাম অথবা নমস্কার করে তাহার কারণ এমন নহে যে তাহাদের মনে বাঙ্গালী ভৃত্যের অপেক্ষা অধিক দাস্যভাব আছে, কিন্তু তাহার কারণ এই যে, সভ্যসমাজের সহস্রবিধ সম্বন্ধের ইতিকর্ত্তব্যতা বিষয়ে তাহার নিরলস ও সতর্ক। প্রভুর নিকটে তাহারা পরিচ্ছন্ন পরিপাটি থাকিবে, মাথায় পাগ্‌ড়ি পরিবে, বিনীত ভাব রক্ষা করিবে। স্বাভাবিক ভাবে থাকা অপেক্ষা ইহাতে অনেক আয়াস ও শিক্ষা আবশ্যক। আমরা অনেক সময়ে যাহাকে স্বাধীন ভাব মনে করি তাহা অশিক্ষিত অসভ্য ভাব। অনেক সময়ে আমাদের এই অশিক্ষিত ও বর্ব্বর ভাব দেখিয়াই ইংরাজেরা আমাদের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়, অথচ আমরা মনে মনে গর্ব্ব করি যেন প্রভুকে যথাযোগ্য সম্মান না দেখাইয়া আমরা ভারি একটা কেল্লা ফতে করিয়া আসিলাম। এই অশিক্ষা ও অনাচারবশতঃ আমাদের দৈনিক ভাষা ও কাজের মধ্যে একটি সুমার্জ্জিত সুষমা একটি শ্রী লক্ষিত হয় না। আমরা কেমন যেন "আট-পৌরে" "গায়েপড়া" "ফেলাছড়া" "ঢিলেঢালা" "নড়বোড়ে" রকমের জাত, পৃথিবীর কাজেও লাগি না, পৃথিবীর শোভাও সাধন করি না।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

জিজ্ঞাসা।

১। জ্যাঠা ছেলে ও আহ্লাদে ছেলে এই দুয়ের মধ্যে কাহাকে বেশী সহ্য করা যায়? এবং কেন?

২। মাকড়সার জালে পতিত হইয়া মক্ষিকা যখন জড়িত বিজড়িত হয়, তখন মক্ষিকার কষ্ট এবং মাকড়সার সুখ এই দুয়ের মধ্যে কোনটার আধিক্য?

কাচিৎ তত্ত্বানুসন্ধিৎসী।

উত্তর।

১। জ্যাঠাছেলে বুদ্ধিমানের নকল—আহ্লাদে ছেলে ভালমানুষের নকল। জ্যাঠাছেলে হাজার খারাপ হইলেও একটু দূরে দূরে থাকে, কিন্তু আহ্লাদে ছেলের স্বভাবই হচ্ছে গায়ে পড়া। সেইজন্য জ্যাঠার চাইতে আহ্লাদে বেশী অসহ্য।

২। মাছি জালে পড়িয়া যে কষ্ট পায় সেটা শারীরিক, সে জালে পড়িবামাত্রই তাহার ভবিষ্যৎ ঠিক হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না ও সেইজন্য মরিবার ভয়রূপ মানসিক কষ্ট ভোগ করিতে হয় না। কিন্তু মাকড়সার সুখটুকু সমস্তই মানসিক সেইজন্যও আমি মাকড়সার সুখকে মাছির কষ্টের চাইতে বেশী বলি।

জ্ঞাততত্ত্ব।

নববর্ষ।

এস নববর্ষরাজ, তোমারে সাজাব আজ
যূথিকা বেলের হার দোলাব গলায়।
নিদাঘে তাপিত কায়, চন্দন মাখাব তায়,
ব্যজনের তরে ধরে' রাখি মলয়ায়॥
বসন্ত যায়নি দূরে উঁকি মারে এসে ঘুরে,
সন্ধ্যার সমীরে মিশে হেসে করে খেলা।
বৈশাখ সুখের মাস, বাতাস বিলায় বাস,
কাননে কাননে বসে কুসুমের মেলা॥
তরুতে লতাতে ফল, ফলের ভিতরে জল,
প্রকৃতি প্রদত্ত নানা পানীয় মধুর।
দেবের সেবার যোগ্য, রসনার উপভোগ্য,
সুরভি রসাল ফল ফলিছে প্রচুর॥
পুণ্যের প্রথম মাসে, ধর্ম্ম উপার্জ্জন-আশে,
যতনে ব্রাহ্মণে দীনে করে' আকিঞ্চন।
পুণ্যবতী পুণ্যবান্, বৈশাখে বিতরে দান,
ফল জল অন্নছত্র বসন কাঞ্চন॥
দেখিয়া তোমার আসা, মনে মনে নানা আশা,
পুষিতেছে জনে জনে কর দরশন।
দেখাবে কি খুলে খাতা, কি নিয়ে এসেছ দাতা,
কার শিরে দেবে ছাতা কারে ধরাসন॥
কাহার হিসাব শেষ, চিতা চড়ে' যাবে দেশ,
কার বা আবার হবে সুরু কারবার।
ক'জন জীবন কূলে, প্রেমের দোকান খুলে,
করে' পণ মূলধন নেবে অংশীদার॥
কার বা ভাঙ্গিবে বাসা, ভেসে যাবে ভালবাসা,
হতাশের শ্বাসে ভারি করিবে বাতাস।
প্রতিদিন কার পর্ব্ব, কার গর্ব্ব হবে খর্ব্ব,
প্রভুপদে আরোহিবে কোন সেবাদাস॥

খসিবে গলার হার, করের কঙ্কন কার,
        অঙ্কের আলোক কার হইবে নির্ব্বাণ।
বল কে সোহাগ ভরে, চরণে ধরাবে বরে,
        গোষাঘরে কে বসিবে কে ভাঙ্গিবে মান॥
কার চক্ষে দেখে জল, কেবা বক্ষে পাবে বল,
        কে কিনিবে হলাহল সংসারে ঢালিতে।
হারায়ে সর্ব্বস্ব কেবা, ব্রত ধরে' পরসেবা,
        অনাথ শিশুরে নেবে কোলেতে পালিতে॥
কে সুরু করিবে পাপ, কার হবে অনুতাপ,
        কেবা পাপে ধাপে ধাপে যাবে অধঃপাতে।
হৃদে ধরে' লক্ষ্মীকান্ত কার প্রাণ হবে শান্ত,
        শাপ দিতে হবে ক্ষান্ত আপন বরাতে॥
কেবা যাবে দূরদেশে, কে হাসিবে ঘরে এসে,
        যাবার রবার কার থাকিবে না ঠাঁই।
সোদরে পাইয়ে জ্বালা, কেবা দিবে দোরে তালা,
        পরে ধরে' ঘরে এনে কে বলিবে ভাই॥
দেখিয়া জ্ঞাতির সুখ, কার বা ফাটিবে বুক,
        অপরের দুঃখে কেবা করিবে রোদন।
দিনে পরধন হরি', কে বলিবে রেতে হরি,
        বসাবে গোবধ করি পূজার বোধন॥
বল বল নববর্ষ, এনেছ হে কত হর্ষ,
        কি ভরসা কত আশা বিমর্ষ বেদন।
সবারে বিলায়ে আগে, যা রবে আমার ভাগে,
        সুখ দুঃখ হরিপদে কোরো নিবেদন।
        দু'য়ের বাঁধন মম হউক ছেদন॥

শ্রীঅমৃতলাল বসু।

সাময়িক কথা।

"শ্রীযুক্ত প্রবোধানন্দ স্বামী"র স্বাক্ষরিত নিম্নলিখিত পত্রখানি আমাদের নিকট আসে।

"প্রায় চারি বৎসর গত হইল, বাঙ্গালা ব্যাকরণ ও বাঙ্গালা ভাষার রীতি পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে প্রস্তাব উপস্থিত হইয়াছে। ইহার পূর্ব্বে বাঙ্গালা ভাষার মধ্যে যে

বঙ্গের ভাষা বিচ্ছেদ।

একটা বর্ণভেদ আছে, এ সংস্কার বোধ হয় অনেকেরই ছিল না, অন্ততঃ আমরা উহার বিন্দুবিসর্গও অবগত ছিলাম না। আমরা জানিতাম চট্টগ্রামের লোকের লিখিত ভাষা যখন বাঁকুড়ায় পঠিত হইতেছে, এবং বরিশালের লোকের লিখিত ভাষা যখন কোচবিহারের বিদ্যালয়ে অধীত হইতেছে, তখন বাঙ্গালা ভাষা এক বই দুই বলিব কি করিয়া? অবশ্য কথিত ভাষায় প্রাদেশিক শব্দের বাহুল্যপ্রযুক্ত ইতরবিশেষ লক্ষিত হয় বটে, কিন্তু বাঙ্গালা ভাষার যেরূপ দ্রুত উন্নতি হইতেছে, তাহাতে কালক্রমে অপ শব্দ বা "স্লাঙ"গুলি লয়প্রাপ্ত হইলে বাঙ্গালা ভাষার প্রদেশভেদে অণুমাত্রও পার্থক্য থাকিবে না। বিশেষ চট্টগ্রাম, শ্রীহট্ট, ময়মনসিংহ, নোয়াখালী প্রভৃতি স্থানের যে সকল ভদ্রলোক দীর্ঘকাল কলিকাতায় বাস করেন, তাঁহাদের কথিত ভাষায়ও অধিক পার্থক্য দৃষ্ট হয় না, সংস্কৃত শব্দের প্রয়োগ বাহুল্যই উহার একমাত্র কারণ।

বর্ত্তমান বাঙ্গালা ব্যাকরণ ও বাঙ্গালা ভাষার রীতি পরিবর্ত্তনের জন্য যাঁহারা বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন তাঁহাদের নেতা অথবা কর্ণধার ছিলেন মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। তাঁহার মতে দীক্ষিত হইয়াছিলেন, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দীনেশচন্দ্র সেন, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ও রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী প্রভৃতি। ইঁহাদের মতের বিরুদ্ধেও কয়েক ব্যক্তি দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের এ বিষয়ে কোন লিখিত প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় নাই। পণ্ডিত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী ও পণ্ডিত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয়, এবিষয়ে কয়েকটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। ভারতীতে ঐ সকল প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। উহা পাঠ করিলে পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন সংস্কৃতের সাহায্য ত্যাগ করিয়া বাঙ্গালা ভাষা মুহূর্ত্তের জন্যও তিষ্ঠিতে পারে না। আর একজন অপশব্দ বা "স্লাঙে"র বিরোধী এবং সংস্কৃতশব্দবহুল ভাষার পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি সুশিক্ষিত জমিদার রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী।

এই ভাষা বিরোধ অল্পে প্রসারিত হয় নাই, দীর্ঘকালের আন্দোলনে বহুলোকে জানিতে পারিয়াছিল। বাঙ্গালা সাহিত্যের বার্ষিক রিপোর্টের সহিত উহা রাজারও কর্ণগোচর না হইয়াছিল, এমন নহে। কিসে কি হইল স্পষ্ট করিয়া বলা অসম্ভব। সম্প্রতি রাজাজ্ঞ আদেশ হইয়াছে, "বিভিন্ন প্রদেশের ভাষা লইয়া বিভিন্ন প্রদেশের শিশুপাঠ্য রচনা করিতে হইবে"। বিভিন্ন প্রদেশের ভাষার অর্থ আমরা বুঝিতে পারি না, বিভিন্ন প্রদেশে প্রচলিত অপশব্দ বা "শ্লাঙ্" ত্যাগ করিলে সমস্তইত এক ভাষা হইয়া পড়ে, অতএব বিভিন্ন পুস্তক রচনার প্রয়োজনীয়তা কি?

সুপণ্ডিত রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় পরিষৎ পত্রিকায় 'বাঙ্গালা ব্যাকরণ' প্রবন্ধে লিখিয়াছিলেন অপভাষা বা গ্রাম্য শব্দের তালিকা সংগ্রহ করিলেই যে উহা প্রয়োগ করিতে হইবে তাহার কারণ কি? কিন্তু এখন তিনি দেখুন উহার ব্যবহারের প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছে কি না? এখন উহাঁরা সকলেই উল্টা সুর ধরিলেন বটে, কিন্তু উহাঁদের নিজেদের দোষেই কি আমাদের এই বিভ্রাট উপস্থিত নয়? বঙ্গের সাহিত্যরথীগণই কি বঙ্গভাষার ঐক্যমূলে কুঠারাঘাতের সূচনা করেন নাই?"

ঐ পত্র লিখিত অভিযোগের উত্তরে শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন স্বদলের হইয়া আমাদের নিকট এই উত্তরটি পাঠাইয়াছেন :—

জবাব।

"শ্রীযুক্ত প্রবোধানন্দ স্বামী মহাশয় বলিতেছেন, যাঁহারা পূর্ব্বে প্রাদেশিক শব্দ-সংগ্রহের জন্য ও বাঙ্গালা ভাষাকে প্রাদেশিকত্বে দীক্ষিত করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছিলেন, এখন তাঁহারা উল্টা গীতি গাহিতেছেন, যে প্রাদেশিকত্বের পক্ষপাতী হইয়া তাঁহারা এতকাল ঝগড়া করিয়া আসিতেছেন, গভর্ণমেণ্ট ত সেই প্রাদেশিকত্বই খাঁটিভাবে ভাষায় চালাইতে চান, গভর্ণমেণ্টও ত তাঁহাদের মতই সংস্কৃতের বিরুদ্ধে আইন জারি করিতে প্রস্তুত, এখন সেই প্রাদেশিক ভাষার পক্ষপাতীদল—চিরানুসৃত পন্থা ছাড়িয়া গভর্ণমেণ্টের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে কলরব করিতেছেন কেন?

লিখিত ভাষা কথিত ভাষার সঙ্গে সম্বন্ধচ্যুত হইলে তাহা প্রাণহীন হইয়া পড়ে, লিখিত ভাষা ও কথিতভাষার মধ্যে একটা প্রভেদ চিরদিন থাকিবে, কিন্তু

শিকড়ের সঙ্গে কাণ্ডের যে সম্বন্ধ উহাদের মধ্যে সেই সম্বন্ধ রক্ষা করা বাঞ্ছনীয়। শিকড় যেরূপ মৃত্তিকার নীচে গুপ্ত থাকিয়া কাণ্ডকে রস প্রদান পূর্ব্বক পুষ্ট রাখে,—কথিত ভাষাও সেইভাবে স্বয়ং অপ্রকাশিত থাকিয়া লিখিত ভাষাকে, পোষণ করে। স্বামীজি এই স্থানে বুঝিতে ভুল করিয়াছেন,—কথিত প্রাদেশিক ভাষার উপকরণ সংগ্রহ করিবার চেষ্টা—লিখিত ভাষাকে সমৃদ্ধ ও বলশালী করিবার জন্য হইয়াছিল। কথিত ভাষাকে উপেক্ষা করিতে গেলে, লিখিত ভাষার প্রকৃত শক্তি নষ্ট হইয়া পড়িবে,—এই কথা যাহারা প্রচার করিয়াছেন তাঁহাদের উদ্দেশ্য নহে যে বাঙ্গলা ভাষারূপ প্রকাণ্ড কাচখণ্ডকে শতধা চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া ফেলিতে হইবে, বরং সমস্ত প্রদেশগুলি হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিয়া সেই ভাষার একত্ব ও শক্তি সম্বর্দ্ধিত করাই তাঁহাদের প্রধান উদ্দেশ্য। নানা প্রাদেশিক ভাষার বিচিত্র বিভক্তি ক্রিয়াপদ ও প্রচলিত কথা সংগ্রহ করিয়া—যাহা অসম তাহা পরিত্যাগ পূর্ব্বক, সাধারণ লক্ষণগুলি গ্রহণ করাই বৈজ্ঞানিক নিয়মানুযায়ী, তাঁহারা সেই চেষ্টা করিয়াছিলে, ও চিরদিনই করিবেন।

বাঙ্গালা ভাষাটাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া লিখিত সাধারণ ভাষাটাকে লোপ করিয়া দেওয়ার প্রস্তাব তাঁহাদের মধ্যে কেহ কি কখন উপস্থিত করিয়াছিলেন?

সংস্কৃত ও বাঙ্গালা ভাষার মধ্যে অনেকটা প্রভেদ আছে; যুবকের অঙ্গাবরণ যেরূপ শিশুর গায়ে মানান সই হইতে পারে না, সংস্কৃতের নিয়মাবলী সেইরূপ বাঙ্গলা ভাষার উপযোগী নহে, বাঙ্গলা ব্যাকরণের সূত্র কথিতভাষার মধ্যে আত্ম প্রকাশ করিয়া আছে,—তাহা সেই স্থান হইতে আবিষ্কার করিতে হইবে। এই কথাটাই বারম্বার বলা হইয়াছে।"

ভারতবর্ষে বিধবা বিবাহ।

অনেকের ধারণা, বিদ্যাসাগর-প্রবর্ত্তিত বিধবাবিবাহ শুধু বিধিবদ্ধ হইয়া আছে, কার্য্যতঃ হিন্দুসমাজ এই সংস্কারের সঙ্গে কোনরূপ সহানুভূতি প্রদর্শন করেন নাই। বিধবাবিবাহ প্রকৃতপক্ষে হিন্দুসমাজে ক্রমশঃ শক্তি-সঞ্চয় করিয়া পুষ্টিলাভ করিতেছে। নিম্নলিখিত তালিকার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই তাহা সকলের হৃদয়ঙ্গম হইবে। গত সাড়ে তিন বৎসরের মধ্যে যে সকল বিধবাবিবাহ হইয়া গিয়াছে, তালিকায় তাহাদের কথা উল্লেখ করা গেল। এখানে বলা আবশ্যক এই তালিকার সকল বিবাহ গুলিই স্বজাতি ও স্ববর্ণের মধ্যে অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

১৯০১ সন।

১। মজঃফরপুরে লালা স্বরূপলাল আগরওয়ালার কন্যার সহিত লালা গোবিন্দ প্রসাদের পরিণয়।

২। লাহোরস্থ বেঙ্গল ব্যাঙ্কের খাজাঞ্চি জিয়ালাল আগরওয়ালা জৈনির কন্যার সহিত লালা শীতলপ্রসাদ জৈনির বিবাহ (মিরাটে)।

৩। বিজনীর জেলা বহপুর লালাভূপ সহায় বৈশ্যের কন্যার বিবাহ।

৪। আগরাতে একটি গৌড় ব্রাহ্মণ কন্যা বাল-বিধবার বিবাহ।

৫। লাহোরে সর্দ্দার বাঘসিংহ বি, এর সহিত এক বাল-বিধবার বিবাহ।

৬। অমৃতসরে লালা নারায়ণ দাস কেরাণীর সহিত শ্রীমতী সরস্বতী দেবীর বিবাহ।

৭। লাহোরে লালা বলরাম কেরাণীর সহিত এক ক্ষত্রী বিধবার।

৮। মুলতাননিবাসী একটি সম্ভ্রান্ত কায়স্থের সহিত ফুল্লোরবাসিনী এক কায়স্থ বিধবার।

৯। লাহোরের আর্য্য সমাজভুক্ত লালা রোসনলালের সহিত লাহোরবাসিনী এক বাল বিধবার।

১০। কোটা নিবাসী হাসপাতালের ডাক্তার গুরুদত্তের সহিত জলন্ধরের এক বাল বিধবার।

১৯০২ সন।

১১। গুজরাটের আহম্মদাবাদে এক ব্রাহ্মণবংশীয় বালবিধবার।

১২। লাহোরের শ্রীমতী ঠাকুর দেবী ক্ষত্রীর বিবাহ।

১৩। জেলা পুণ্ডরী করলালস্থ এক আগরাওয়ালা—বংশীয়া এক বিধবার তাঁহার দেবরের সহিত বিবাহ।

১৪। জেলা মজঃফরপুরে মীরাপুরে একটি সম্ভ্রান্ত বিধবার বিবাহ।

১৫। সাহারণপুরের ষ্টেশন মাষ্টার লালা গণপতরাও আগরওয়ালার কন্যার সহিত আলিগড়ের লালা রোসন সিংহের বিবাহ।

১৬। ফয়জাবাদে বাবু ভগবান দাস কায়স্থের আত্মীয়া বিধবার বিবাহ।

১৭। পেশওয়ারে এক বৈশ্যবংশীয়া একটি বিধবার লালা গোকুল চন্দের সহিত বিবাহ।

১৮। পেশওয়ারে লালা সেড়ুমলের সহিত এক ক্ষত্রীবংশীয়া বিধবার।

১৯। পেশওয়ারে ক্ষত্রী-বংশীয়া একটি বিধবার সহিত তাঁহার দেবর বসন্তরামের

২০। লাহোরে শ্রীমতী জানকী দেবীর পূর্ণানন্দের সহিত বিবাহ।

২১। ঝাঁসী বাসিনী এক ক্ষত্রীবংশীয়া বিধবার লালা গোবিন্দরামের সহিত বিবাহ।

২২। ঢাকায় একটি বাঙ্গালী বালবিধবার বিবাহ।

২৩। স্যালকোটের এক কুলীন ক্ষত্রীবংশীয়া বিধবার বিবাহ।

২৪। স্যলকোটের লালা ভুলিচাঁদ ক্ষত্রীর (মুন্সেফ) কন্যার সহিত লালা লক্ষ্মণদাস বি, এর বিবাহ।

২৫। রবিয়ালে লালা সাবনরাগ আগরওয়ালার ভগিনীর বিবাহ।

২৬। অহম্মদাবাদের এক জৈন বৈশ্যবংশীয়া বাল-বিধবার।

২৭। মান্দ্রাজে একটি বৈষ্ণব বালবিধবার।

২৮। মান্দ্রাজের রাজমহিন্দ্রীতে একটি ব্রাহ্মণ-বংশীয়া বাল বিধবার।

২৯। সাজাহানপুরের শ্রীমতী গোলাবসুন্দরী ক্ষত্রীর আলিগড়বাসী ডাক্তার কৃষ্ণানন্দ ক্ষত্রীর সহিত বিবাহ।

৩০। গড়ওয়ালের ভবানীদত্ত ক্ষত্রীর ভ্রাতুষ্পুত্রের বিবাহ।

৩১। কলিকাতা কালিঘাটের যোগেন্দ্রনাথ ঘোষালের সহিত একটি সভ্রান্ত বংশীয়া বিধবার।

৩২। মুকেরিয়াতে একটি সারস্বত ব্রাহ্মণবংশীয়া বাল বিধবার বিবাহ।

১৯০৩।

৩৩। শ্রীমতী বেশরা দেবী ক্ষত্রীর সহিত লালা হরনাম দাসের বিবাহ।

৩৪। অমৃতসরে সারস্বত ব্রাহ্মণবংশীয়া শ্রীমতী পার্ব্বতী দেবীর সহিত নারায়ণ দত্তের বিবাহ।

৩৫। রাউলপিণ্ডিতে পণ্ডিত দেবীদাসের কন্যার সহিত রবিওয়ালনিবাসী শিবপ্রসাদের বিবাহ।

৩৬। বোম্বাই নগরীতে প্রসিদ্ধ কবিরাজ মণিশঙ্কর গোবিন্দজীর সহিত চঞ্চল-দেবী ব্রাহ্মণীর বিবাহ।

৩৭। বিজনীর নিবাসিনী গৌড় ব্রাহ্মণবংশীয়া শ্রীমতী পূর্ণাদেবীর সহিত কোটার পোষ্ট মাষ্টার শ্রীরাম পণ্ডিতের বিবাহ।

৩৮। লাহোরে শ্রীমতী যশোদা দেবীর বিবাহ।

৩৯। রাউলপিণ্ডীবাসী লালা মুরলীধর আগরওয়ালার কন্যার সহিত বিজনীর-বাসী লালা প্রসাদীলালের বিবাহ।

৪০। লক্ষ্ণৌ সহরে লালা প্রয়াগ প্রসাদ কায়স্থের সহিত জেলের কেরাণী লালা সমসের বাহাদুরের বিবাহ।

৪১। বড়াপুরে (জেলা বিজ্নৌর) লালা ফুলচন্দ বৈশ্যের কন্যার লালা নন্দু-লালের সহিত বিবাহ।

৪২। গুরুদাসপুরে রামনাথ ক্ষত্রীর ক্ষত্রীবংশীয়া এক বিধবার সহিত বিবাহ।

৪৩। লাহোরে শ্রীমতী তপতী দেবীর বিবাহ।

৪৪। অমৃতসরে এক সম্ভ্রান্ত ক্ষত্রীবংশীয়া কুলীন বিধবার।

৪৫। নসিরাতে লালা জগদম্বা প্রসাদের সহিত এক ক্ষত্রীবংশীয়া বিধবার।

৪৬। লাহোরে ব্রাহ্মণবংশীয়া শ্রীমতী শ্যাম দেবীর সহিত রামজীদাসের বিবাহ।

৪৭। অহম্মদাবাদে এক ব্রাহ্মণবংশীয়া বিধবার।

৪৮। একটাবাদের এক ক্ষত্রী বিধবার হরভগবান কুতুরের সহিত।

৪৯। কলিকাতা মানিকতলা নিবাসিনী শ্রীমতী উমাশশী দেবীর সহিত শ্রীযুক্ত কালীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের।

৫০। গুজরাতে ডঙ্গাজেলায় ভগবত ইতরচন্দ্র ক্ষত্রীর শ্যালিকার সহিত ডাক্তার রোশনলালের।

৫১। তরণ তারণে শ্রীমতী কেশবী দেবীর লালা করকতরায় ক্ষত্রীর সহিত।

৫২। লাহোরে শ্রীমতী লক্ষ্মী দেবীর সহিত হাস্পাতাল এ্যাসিষ্টাণ্ট গণেশদাস ক্ষত্রীর।

৫৩। লাহোরে শ্রীমতী পূর্ণ দেবীর সহিত লালচন্দের।

৫৪। দেরা ইস্মাইল খাঁতে একটি ক্ষত্রীবংশীয়া বালবিধবার।

৫৫। মুরদাবাদে বুলচন্দ গৌড় ব্রাহ্মণের কন্যার সহিত শ্রোত্রীয় শঙ্করলালের।

৫৬। অমৃতসরে শ্রীমতী গুরুদেবীর বিবাহ।

১৯০৪।

৫৭। সেরকোটে শ্রীমতী চম্পদেবী ক্ষত্রীর সহিত লালা বলারাম সওদাগরের।

৫৮। ঝাঁসীবাসিনী শ্রীমতী যমুনা দেবীর সহিত পণ্ডিত ঘাসীরামের।

৫৯। উজ্জয়িনী প্রতাপগড়ে সূর্য্যভান তেওয়ারীর কন্যার বিবাহ।

৬০। অমৃতসরে লালা সুখরাম দাসের বিবাহ।

৬১। ভুমড জেলায় জবাহর সিংহ জমিদারের কন্যার বিবাহ।

৬২। কির্থলে (মিরাট) এক গৌড় ব্রাহ্মণবংশীয়া বাল বিধবার।

৬৩। অমৃতসরে পণ্ডিত রাজনারায়ণ কাশ্মীরী ব্রাহ্মণের সহিত তথাকার এক বিধবার।

৬৪। লাহোর শঙ্করপুরে লালা জয়চন্দ্রের কন্যার বিবাহ।

৬৫। শাজীপুরে (লোহার) এক সারস্বত ব্রাহ্মণকন্যার।

৬৬। কাণপুরে মুরারিলাল বৈশ্যের (আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন) ভগিনীর সহিত শিবচরণ লাল বি, এর।

৬৭। দিল্লীর এক সম্ভ্রান্তা আগোরওয়ালা বিধবার সহিত মজঃফরপুর নিবাসী লালা গোবিন্দ প্রসাদের।

৬৮। যোগপুরের শ্রীমতী বিমতা বাইএর বিবাহ।

৬৯। অমৃতসরে অবোধ সমাচারসম্পাদক দীননাথ চতুর্বেদীর সহিত শ্রীমতী সুশীলা দেবীর বিবাহ।

৭০। মজঃফরপুরে এক ক্ষত্রী বিধবার বিবাহ।

৭১। লাহোরে একটি সারস্বত ব্রাহ্মণবংশীয়া বাল বিধবার বিবাহ।

৭২। সাজাহানপুর নিবাসী ব্রাহ্মণ ভবানীপ্রসাদের কন্যার তাঁহার দেবরের সহিত বিবাহ।

৭৩। লাহোরে এক ক্ষত্রী বাল বিধবার।

৭৪। অমৃতসরে ক্ষত্রীবংশীয়া কোন বড় ঘরের একটি বালবিধার।

৭৫। মান্দ্রাজ গণ্টুরে এক ব্রাহ্মণ বালবিধবার।

৭৬। শরকোটে একটি ব্রাহ্মণবংশীয়া বাল বিধবার।

৭৭। অমৃতসরে একটি ক্ষত্রী বাল বিধবার।

৭৮। দেরাগাজি খাঁ জামপুরে শ্রীমতী দেবীবাই ক্ষত্রী বালবিধবার।

৭৯। কর্ণাল (পুণ্ডরী) ভোলানাথ পোষ্টমাষ্টারের কন্যার সহিত লালা শালিগ্রামের বিবাহ।

৮০। লাহোরে শ্রীমতী লক্ষ্মীদেবী ক্ষত্রাণীর সহিত লালা হরমুখরায় মলহোত্রীর।

৮১। বোম্বাই গিরিগামে অদিচ তোলাকিয়া ব্রাহ্মণবংশীয়া শ্রীমতী মণিবাইএর সহিত গুজরাটের "সয়াজিবিজয়" পত্রিকার সহকারী সম্পাদকের বিবাহ।

ইংরাজীতে নিম্নলিখিত জাতীয় সংগীতটি সম্প্রতি কলেজস্কোয়ারে পাঁচ ছয় শত ছাত্রকর্তৃক কিছুদিন যাবৎ প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে গীত হইয়া থাকে, ইহা একটা কৌতুহলোদ্দীপক দৃশ্য, সন্দেহ নাই।

আমরা শুনিয়াছি, এই গান-রচনা করিয়াছেন শ্রীযুক্ত টহলরাম গঙ্গারাম।

গোলদীঘিতে জাতীয় সঙ্গীত।

কলেজস্কোয়ারে বক্তৃতা করার জন্য ইনি দুইবার গুণ্ডার দলের হাতে মার খাইয়াছেন, কিন্তু কিছুতেই নিরস্ত হন নাই, আশ্চর্য্যের বিষয় ইনি খৃষ্টীয় কিম্বা মুসলমান ধর্ম্মের বিরুদ্ধে কিছুই বলেন নাই, তথাপি উক্তসম্প্রদায়ের গুণ্ডার দল ইহাকে কেন তাড়া করিল, তাহার সদুত্তর কেহই দিতে পারিতেছেন না।

ইংরেজী গানটির বঙ্গানুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

আমাদের প্রাচীন হিন্দুস্থানের উপর
ভগবান আশীষ বর্ষণ করুন।
সাগর হইতে সিন্ধু, কুমারী হইতে কাশ্মীর
এই সুবিপুল ভূমি,—গৌরবদৃপ্ত প্রাচীন
হিন্দুস্থানে শান্তি বিরাজিত হউক।
ভগবান্ আমাদের প্রাচীন হিন্দুস্থানের
উপর আশীষ বর্ষণ করুন।
ভারতের সন্ততিবর্গ প্রীতিতে ঐক্য
অনুভব করুন। তাঁহারা যেন
তাঁহাদের কর্ত্তব্যপালনে শিথিল না হন।
তাঁহাদের চিত্ত জ্ঞানে উদ্ভাসিত হউক
এবং তাঁহাদের গুণরাশি উজ্জ্বল হইয়া
প্রকাশিত হউক।
আমাদের পবিত্র মাতৃভূমির উপর
ভগবৎকরুণা বর্ষিত হউক।
মাতৃভূমি আপনাদের
সাহায্য প্রার্থনা করিতেছেন,
তাঁহার প্রার্থনা সমাহিত হইয়া শ্রবণ করুন,
পুনরায় এই দেশে জাতীয় ভাবের উদ্দীপনা করুন,
দেশে তাঁহার জয় প্রচারিত করুন।
ভগবান্ এই শক্তিমান্ দেশের প্রতি
সদয় হউন।
যদিও ভারতবাসী নানা প্রকারে
অযোগ্য হইয়া পড়িয়াছেন,
তথাপি হে তেজপুঞ্জঃ প্রভাবশালী কৃষ্ণ!
হে বরেণ্য, অসমসাহসী রামচন্দ্র!
তোমরা এই দুর্দ্দিনে ভারতবাসীকে
ত্যাগ করিও না,
ভগবান এই নিরাশ্রয় দেশের
উপর সদয় হউন।

বিশ্ববিজয়ী।

স'রে যা' স'রে যা' স'রে যা' তুহারা
কে আছ দাঁড়ায়ে পথে,
বিশ্ব-বিজয়ে বীর বিক্রম
আসিছে ত্বরিত রথে
ঘন ঘোর রবে বাজিছে বিষাণ,
কাঁপিয়া উঠিছে বিশ্ব পরাণ,
পৃথ্বী পৃষ্ঠ হয় শত খান
তীব্র চক্র ঘাতে,
অশ্ব খুরের বিকট বিঘাত
বাজিয়া উঠেছে সাথে।

হিম হিমালয় তাহার শিখরে
ছুটাইছে রথ বীর,
দমিয়া সিন্ধু নাচে তুরঙ্গ
• কাঁপিছে কৃষ্ণ নীর,
রসাতলে গিয়া জাগাইছে ত্রাস,
সকল রাজ্য করিতেছে গ্রাস,
তাহার করাল হস্ত আঘাতে
কেহই নাহিক থির,
সম্ভ্রম সাথে বিজয় পতাকা
বহিছে প্রাসাদ শির।

সুপ্ত সিংহ ছিল সে শয়নে
জাগাইলে তারে সবে,

শত শত শত ভল্ল আঘাতে,
কত সে সহিয়া রবে,
তারো আছে বল বুকে নাহি ভয়,
তাহারি আজি সে দেয় পরিচয়,
দলে ছিলে তারে চরণের তলে
দলিত হ'তেছ এবে,
প্রতিহিংসার বজ্র বহ্নি
জ্বলেছে জ্বালাতে সবে।

কে আছ দাঁড়ায়ে পথের মাঝারে
দূরে দূরে যাও সরি,
অবনত শিরে অবনতি বহি
রহ করযোড় করি,
নতুবা এখনি শাণিত শায়কে
বহাবে হৃদয় রক্ত ঝলকে,
লুটায়ে পড়িবি মুরছি ভূতলে
মরণ অঙ্কোপরি।
ছুটায়েছে রথ বিশ্ববিজয়ী
সবার গর্ব্ব হরি'।

রায়-গৃহিণী।

(১)

"আচ্ছা মেজবৌ, পরের কথা না হলে তুই থাকতে পারিস না—কার গহনা হ'ল কার কাপড় হ'ল সে নিয়ে তোর কাজ কি, তোকে কি তারা কেউ দুএক খানা দেবে?" বোনপো-বৌকে এই বলিয়া ধমক দিয়া রায়-গিন্নি আবার খুতুল কুটিতে আরম্ভ করিলেন। রায়-গিন্নির স্থূল শরীর একটু থল্‌থলে, গৌর বর্ণে বয়স ও পৈত্তিকের গুণে একটু হলদে ছোপ ধরিয়াছে, মেজবৌয়ের মাথা দেখে দেওয়াতো নয়—ধান গুলো অপুচ করা, তা না হলে গিন্নির সামনের দিকে এখনও সাত আট গাছা সাদা চুল দেখা যাচ্ছে কেন? তা যাক্ যে দাঁত চারটী ঠোঁঠে ঢাকা পড়ে নাই, তামাক পোড়ার রঙ্গে সে কয়টিই মিশ্‌মিশ কচ্ছে; কুপালের মধ্যভাগে নাসামূল হতে সিঁথি পর্য্যন্ত লম্বালম্বি একটা সরু খাপ পড়াতে দুই পাশ উনুনের ঝিঁকের মত বেশ একটু উঁচু উঁচু দেখায়; ভ্রূদুটী অতি পরিষ্কার—যেন আঠা দিয়া দাগা হইয়াছিল, চুল বসান হয় নাই; চক্ষু দুটী গোল, কোণে অকৃত্রিম কাজল, উনুন-মাটীর রঙের তারাদুটী ঠিকরে বেরুবে, কি ধরে থাবে স্থির করিতে না পারিয়া ঘুর পাক খাইতেছে; কাণ দুটীতে সারি দিয়া পনেরটী করে মাকড়ী মানিয়ে গিয়াও মধ্যে মধ্যে বাতাস খেলিবার স্থান আছে; নাকটী ঠিক টিয়া পাখীর মত-ই; কিন্তু আগা টুকু নীচের দিকে না নামিয়া উপর পানে ঈষৎ ঘুরিয়া গিয়াছে, তার নীচে ওষ্ঠের উপর যেরূপ ঘন রেখা দিয়াছে, তাহাতে বোধ হয় যে পাঁচ সাত-বার নাপিতের হাতে পড়িলেই বেশ চুক্ চুকে কালো গোঁফ ঝেড়ে ওঠে; স্কন্ধ ও মস্তকের মধ্যে ব্যবধান অতি অল্প; গৃহিণীর গর্ভধারিণী

একদিন অন্তঃসত্ত্বাবস্থায় পাউরুটি খাইয়াছিলেন বলিয়া কন্যার বয়স কালে বাঁ পায়ের উপরটা কতকটা পাউরুটীর মত ফুলে উঠেছে বটে; কিন্তু বক্ষ ও উদর অন্তরাল থাকায় রায় গিন্নি এ অঙ্গবৈভবের শ্রীবৃদ্ধি স্বয়ং কখনও দেখিতে পাইতেন না, আর এই অসীম সৌন্দর্য্যের মর্য্যাদা রক্ষাকারী ভুজযুগ প্রকৃতই মর্ম্মান্তিক প্রেমালিঙ্গনের উপযোগী। গৃহিণী দুলিতেছেন আর ধুতুল কুটিতেছেন; ডালে ফুল দোলে, কাণে দুল দোলে, দাঁড়ে পাখী দোলে, দোলায় খুকী দোলে, কিন্তু গৃহিণীর দোলনে সে হালকা ভাব—সে ছেবলামোর ছায়া পর্য্যন্ত স্পর্শ করে নাই বাসুকীর শিরঃকম্পনে মেদিনী যেমন সময়ে সময়ে মন্দ আন্দোলনে দোলে, বঁটির বাঁট-বাহিনী রায়-গৃহিণীর মন্দার-অঙ্গ তেমনি ধীরভাবে দুলিতেছে, সঙ্গে সঙ্গে তাবিজের পুঁটে দুলছে, গলায় দানা দুলছে কোমরে জিজির দুলছে, নাকে নথ দুলছে। মুক্তা চুনি খুলে নিয়ে নথটী ছোট নাতির গলার হাঁসুলি করিয়া দেবেন মনে করিয়াছিলেন কিন্তু তার অন্নপ্রাশনের সময় উপস্থিত হইলে নাসিকার চিরসহচর শুভপরিণয়ের এই সুদর্শন চক্রটীর মমতা ত্যাগ করিতে পারিলেন না।

গৃহিণীর পশ্চাতে একটী কাঁসার রেকাবিতে পাঁচখানি চাকা চাক বেগুণ, খুব সরু সরু করে' কোটা চারটী আলু, মুটো খানেক কলাই শুঁটির দানা, ও সিকিটা ফুল কপি ছাড়ান রহিয়াছে; এগুলি সপুত্র দম্পতীর রাত্রের শীতলের আয়োজন। কেহ পাছে "দৃষ্টি" দেয় এই ভয়ে তরকারি গুলির উপর অল্প মাত্রায় লবণছিটান আছে। বঁটির বাম ধারে একখানি কালো পাথরের খোরায় ডুমো ডুমো আলু, কাঁচকলা, বিলাতি কুমড়া, ফালি কতক বেগুন, চারটি খানি পালম শাক, ও পূজারীর নিকট চাহিয়া লওয়া গুটিকয়েক প্রসাদী ভিজা ছোলা সাজান আছে; বোনপো, বোনপো বৌ, ভাই, ও দুই একজন বিশেষ অনুগৃহীত পোষ্যের পরিতোষের জন্য এই বন্দোবস্ত। আর বঁটির দক্ষিণে

একটী মেটে খোরায় পালমের গোড়া, ডেঙ্গর ডাঁটা, থোড় কুচান, কুমড়ার বেক্‌লা, ঝিঙে, সবীজ বেগুন, ডুমুর স্থান পাইয়াছে, ধুতুল ছুটো কোটা হইলেই হয়; ভাসুর পো, তার হেঁজল দাগা বৌটা, নিকামাইয়ে দেওর, হিঁসকুড়ি জা প্রভৃতি গাত্রখাদক পোড়া লোকদের ফাঁড় পোরাবার জন্য রাত্রের এই ব্যবস্থা। যেখানে বসিয়া গৃহিণী তরকারি কুটিতে ছিলেন, তাহার দক্ষিণের ঘরের কোণে কাল ও সবুজের মাঝামাঝি কি একটা রং মাখান একটী ছোট লোহার সিন্দুক অন্তর মাখান একটী কাঠের ফ্রেমের উপর বসান রহিয়াছে, সিন্দুকের গায়ে সিন্দুর ও চন্দনের অলকা তিলকা ও গিন্নির জপের মালার থলি, একটী ছেঁড়া শালপাতে কালীঘাটের প্রসাদী ঘৃতসিক্ত সিন্দুর ও একটী ছোট চুপড়ীতে দুইটা মুলা, কয়েকটা নারকলে কুল, পাব্ দুই তিন আক, একখানা শাঁক আলু, ও আধখান কমলালেবু,—তরকারির আঠা লাগিবার ভয়ে সোনার বালা জোড়াটী খুলিয়াও রায়-গিন্নি ঐ সিন্দুকের উপর রাখিয়া দিয়াছেন। সিন্দুকের একটু উপরেই একটী কুলঙ্গী, তাহার উপর একখানি কাচহীন আরসির ফ্রেম, গুটি কয়েক শুষ্ক বিল্বপত্র ও তারকেশ্বরের চরণামৃতের একটী শূন্য ভাণ্ড; রায় গিন্নির যত্ন ও শ্রদ্ধা ভক্তিতে সন্তুষ্ট হইয়া একটা কৃতজ্ঞ মাকড়সা কুলঙ্গীর মুখটী ঢাকিয়া একখানি সুন্দর নেতের পরদা প্রস্তুত করিয়া দিয়াছে; সিন্দুকের পাশে একখানি জল চৌকির উপর, গুটি দুই তিন মাটীর হাঁড়ী ও গুটিচার পাঁচ ভাঁড় কতকগুলি ছোট ছোট পুটলীতে পরিপূর্ণ হইয়া দেয়াল ঠেস দিয়া আরাম করিতেছে, সাম্‌নে একটী কাঁসার গেলাস, একজোড়া সেকেলে বাটা, ও একটী কাঁশীর লোটা, তিনটী তৈজসই সুনীল কলঙ্ক লেখায় শোভিত। চৌকীর পাশেই ছাদে যাইবার ছোট দরজা, দরজার পাশে সর্ব্বাঙ্গে হলুদ মাখা, ললাটে জিরা মরিচের চন্দন চর্চ্চা একখানি শীল বক্ষ পাতিয়া শয়ন করিয়া আছে, উহার

চরণতলে বসিয়া হেঁজল দাগা ভাসুর-পো-বৌছুঁড়ী দুই হাতে একটী নোড়া ধরিয়া শীলাবতীর হৃদয় পেষণ করিতেছেন, মধ্যে মধ্যে দুই কাণে খুড় শাশুড়ীর বকুনি খাইতেছেন, মরিচের হাতে চক্ষের জল মুছিতে গিয়া তথায় প্লাবন উপস্থিত করিতেছেন আর মনে মনে আপনাকে, স্বামীকে, ও বিধাতাকে গালি দিতেছেন। আবার যেমন অসাবধানতা প্রযুক্ত হলুদের ছাপলাগা বক্ষের বসনের উপর দৃষ্টি পড়িতেছে, অমনি "এজীবন তো কেবল একটানা কান্নার কারবারই নয়, একজনকে পায়ে ধরাইয়া তো সকল দাসীপনা শোধ করাইয়া লই"—স্মরণ হওয়াতে আফিম খাবার সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিতেছেন। বৌটীর দক্ষিণ বাহুতে মধ্যে মধ্যে যে দরজার কপাটের আঘাত লাগিতেছে, সেটী সম্মুখে বড় ঘরে যাইবার পথ, তাহার বাম পার্শ্বের কোণে একখানি মাদুর ও এক গাছা ঝাঁটা ঠেসান রহিয়াছে, তারপর একটী খোলা সেল্‌ফ ; তাহার চারটী তাকে মাটীর পুতুল, গ্যাকড়ার পুতুল, কাঠের পুতুল, চিত্রকর, ভাঁড়, ইঁদুর কল, ঘটী তোলা কাঁটা, চাবির থোলো, ভাঙ্গা বাক্সর কল, হরিতকী, আমলকী, সিঁদুর চুপড়ী, সমুদ্রের ফেনা, বড় কড়ী, পেতলের নাড়ু গোপাল ; দুই চারি খান কাঁচের বাসন, গিন্নির চুলের দড়ী প্রভৃতি জগত সংসারের প্রায় সমস্ত দ্রব্যেরই নমুনা আছে। তাকের দুপাশে দুটী ফ্রেক মারা, একটাতে দাঁড়ে বসা সোলার কাকাতুয়া পাখী, অপরটী বাখারির তালমাড়া একটী। সেলফের পাশে একখানি টুলের উপর একটী কালো রংয়ের তেলের ভাঁড়।

সফ্রেম অফ্রেম কয়েকখানি ছবিও ঐ গৃহের দেওয়ালের শোভা সম্পাদন করিতেছে। একখানি কালীঘাটের কালীর ছবি, একখানি আর্ট ইষ্টুডিওর লক্ষ্মী, আর একখানি নলদময়ন্তী। একখানিতে একজন বিপুলনাসা হরিতালবর্ণা সুন্দরী, চেয়ারে উপবিষ্ট একটী জুলফীদার বাবুর চুল ধরিয়া সম্মার্জনী সম্ভাষণ করিতেছেন, অপর একখানিতে

জামাজোড়া পরিধৃত দীর্ঘাকার এক গলদা চিংড়ী খাড়া হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। দেয়ালে দুটী ব্র্যাকেটও আছে, একটী মাটীর অপরটী কাষ্ঠের; মাটীরটীর উপর একটী শুণ্ডশূন্য গণেশ, ও কাষ্ঠেরটীর উপর একটী বিপুল-বপু ঘড়ী, তাহার দুইটা কাঁটা ভ্রাতৃস্নেহে আবদ্ধ হইয়া এক সঙ্গেই চলে, এবং রায়-গিন্নির দাদাশ্বশুর মহাশয় এক সময় আট আনা খরচ করিয়া তৈলের দ্বারা উহার ষটচক্রভেদ করিয়াছিলেন বলিয়া কৃতজ্ঞতার উচ্ছাসে একবার বাজিতে আরম্ভ করিলে আর সহজে ক্ষান্ত হয় না। অনেক সৌখীন বাবুর বৈটকখানায়, অনেক ধনীর শয়ন কক্ষে রকম রকম অনেক ঘড়ী দেখা গেছে বটে, বাবু হ্যাণ্ডনোটে সই করিতেছেন ও ঘড়ী ঘুঘু ডাকিতেছে, তাহাও শুনিয়াছি, কৈ একবারে বারোটার অধিক বাদ্য কোনটীতেই শুনি নাই; কিন্তু গিন্নির ঘড়ী আপনার ভাবে আপনি বিভোর হইয়া সময়ে সময়ে এক শত দেড়শত পর্য্যন্ত বাজিয়া যায়। আবার সে বাদ্যের বোল কি শ্রবণ-রঞ্জন! টুং টাং ঠিং ঠিং ডিং ডিং কি ঢং ঢং নয়, একেবারে পুরা খাম্বাজের গিটকিরি ভরা—ধন্ ধরর্ র্র্র্ র্। বাজনা আরম্ভ হইলেই গিন্নি দুই হাত তুলিয়া সকল কথাবার্ত্তা থামাইয়া দেন, আর সহাস্যে হাঁ করিয়া ঘড়ীর পানে চাহিয়া প্রতি ধন্ ধর্ র্ র্ র্র্ তালে তালে ঘাড় নাড়িতে থাকেন, তাঁহার বিশ্বাস—এমন ঘড়ী লাট সাহেবের বাড়ী তো লাট সাহেবের বাড়ী মনুমেণ্টেও নাই। রায়-গিন্নির প্র-দাদাশ্বশুর মহাশয় এক মার্কিন হাউসে মুচ্ছুদ্দি ছিলেন, সাহেব বিলাত (আমেরিকা) যাইবার সময় এই ঘড়ীটী তাঁহাকে খেলাৎ দিয়া যান। কোন বৌ দেড়পোর বেলায় ঘুম থেকে উঠলো, কোন ঝি বাজারে গিয়ে ৫ ঘণ্টা কাটিয়ে এল, কোন আবাগী রাত না পোয়াতেই ভাতের পাথর নিয়ে বসলো, কোন বেহায়া ছুঁড়ী সন্ধ্যা না হতেই দোরে খিল দিয়ে শুলো, কোন গ্যাদারি গা ধুতে গিয়ে আড়াই ঘণ্টা কল্লে, ঠাকুরপো কবে

দুপুর রাত করে বাড়ী এলো, এই সকলের বিচার গৃহিণী ঐ ঘড়ীর সাহায্যেই করিতেন, এবং ঐ ঘড়ী দেখিয়াই তিনি চারটে রাত্রে উঠিতেন, দু'ঘণ্টা একাসনে বসিয়া সন্ধ্যা পূজা করিতেন, তিনটে বেলায় ছুটী ভাতে বসিতেন আর ছ'টা থেকে ছ'টা পর্য্যন্ত জ্বালিবার জন্য প্রতি প্রদীপে এক পলার হিসাবে তৈল মাপিয়া দিতেন। এই যে গৃহ সজ্জা দেখিলেন ইহা হইতে রায়-গিন্নির পারিপাট্য পরিচ্ছন্নতা ও শ্রমশীলতার পরিচয় পাইতে পারেন কিন্তু তাঁহার ধনৈশ্বর্য্যের যৎকিঞ্চিৎ আভাস পাইতে হইলে পশ্চাতে যে ক্ষুদ্র কুটুরিটী রহিয়াছে একটী প্রদীপ জ্বালিয়া তাহার মধ্যে প্রবেশ করিতে হয়। গিন্নির আফিস ঘরে যে লোহার সিন্ধুকটী রহিয়াছে সেটীতে হাত খরচার টাকা পয়সা নিজের নিত্য ব্যবহারের গহনা ও দু একটা রূপার হালকা গেলাস বাটী মাত্র সর্ব্বদা রক্ষিত হয়। যে ক্ষুদ্র গৃহটীর কথা বলিলাম গৃহিণী যেখানে বসিয়া আছেন, তাহার পশ্চাতেই তাহাতে প্রবেশের দরজা বন্ধ করা রহিয়াছে। কপাটের উপরে মধ্যে নীচে তিনটী জগন্নাথে তালা খুলিয়া তবে সে গৃহে প্রবেশ করিতে হয়, দ্বার খুলিবা মাত্র কারারুদ্ধ পবনদেবের পলায়নের বেগে প্রদীপটী একেবারে নিভিয়া যায়, পুনরায় জ্বালিয়া প্রবেশ করিলে দেখা যায়, সে ক্ষুদ্র গৃহে একটী ক্ষুদ্রতম জানালা আছে বটে, কিন্তু তাহার কপাট খুলিলে এক পল্টন মশা ব্যাণ্ড বাজাইয়া বাহিরে যায় মাত্র, সূর্য্যের আলোক ভিতরে প্রবেশ করে না। কিন্তু যাক এ সব কথা বলিবার প্রয়োজনই নাই, কারণ গৃহিণী ভিন্ন সে গৃহে অন্য কেহ প্রবেশ করে নাই করিবার অনুমতিও নাই, জানলাটীও কস্মিন্‌কালে খোলা হয় না, আর গৃহিণীর প্রদীপ জ্বালিবারও প্রয়োজন হয় না; পূর্ব্বজন্মে মার্জ্জারকে প্রভূত পরিমাণে মৎস্যের কাঁটা খাওয়াইবার পুণ্যে,—লোভ হিংসা, কলহপটুতা, স্বার্থপরতা প্রভৃতি মেনির অন্যান্য গুণের সঙ্গে

অন্ধকারে চক্ষু জ্বালিবার ক্ষমতাও তিনি লাভ করিয়াছিলেন। তবে গ্রন্থ লিখিলেই নাকি অনুভব শক্তির অমানুষিক প্রখরতা জন্মে, তাই ঐ গুপ্তকক্ষ সম্বন্ধে এত কথা বলিতে পারিতেছি। গৃহমধ্যে একটী শালকাঠের সুবৃহৎ বাতাবন্দি সিন্ধুক ছিল, সেই সিন্ধুকে আরোহণ করিয়া রায়-গিন্নি শ্বশুরবাড়ী ঘর বসত করিতে আসিয়াছিলেন, মোটা মোটা কাঠের ঢাকা লাগান ছিল ; পুটলিতে টিকিট লাগান ঢাকাই, শান্তিপুরে, চেলি, তসর, গরদ, বেনারসি, বোম্বাই, ড্রেসপীস, পায়না-পোল প্রভৃতি কাপড়, আলোয়ান, জামিয়ার, শাল, রুমাল, কোট, চোগা, গলাবন্দ, কোমরবন্দ, তাজ, টুপী, পাকড়ী ও নানাবিধ পরিধেয় উত্তরীয় বাস এবং অগণন আরশুলায় সিন্দুকটী পরিপূর্ণ ছিল ; আরশুলা ব্যতীত অন্য সমস্ত দ্রব্যই বন্ধকী। ধর্ম্মে মতি হওয়ায় ঐ আরশুলার দল জীবহিংসা মহাপাপ জ্ঞানে কীট পতঙ্গাদি আমিষ পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক শাল, আলোয়ানাদি টুকিয়াই জীবন ধারণ করিত, অনেক ধর্ম্মপ্রাণ মনুষ্যও এ সংসারে মৎস্য মাংস পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্ধকার গৃহে শাল, আলোয়ান কাটিয়া থাকেন। গিন্নির নিজের এবং বৌ ও ছেলেদের মূল্যবান কাপড় চোপড় একটী ছোট কর্পূরকাষ্ঠের সিন্ধুক ও মাঝারি রকম সেগুণ কাষ্ঠের দেরাজের মধ্যে আবদ্ধ ছিল। বন্ধকী পিতল কাঁসার তৈজস, পাথরের বাসন এবং অন্যান্য ইতর জাতীয় ধাতুনির্ম্মিত দ্রব্যাদি ঐ গৃহস্থিত আর একটী বড় সিন্ধুকের মধ্যে থাকিত। দক্ষিণ কোণে একটী বড় লোহার সিন্ধুক—প্রতিবাসিনী কুলজা ও কুলটাগণের অশ্রু-জলসিক্ত সুবর্ণ, রৌপ্য এবং জহরতের অলঙ্কারে উহা পরিপূর্ণ, বন্ধকী রূপার বাসন গুলিও উহার মধ্যে থাকিত। পারিবারিক মূল্যবান্ অলঙ্কারাদি উত্তর কোণে লোহার সেল্‌ফের মধ্যে সযত্নে রক্ষিত হইত। বেলওয়ারী চুড়ীওয়ালাদিগকে প্রতিপালন করিয়াই বধুগণ বারমাস

এয়োত রক্ষা করিতেন, কেবল তেমন তেমন স্থানে নিমন্ত্রণ যাইবার সময় গৃহিণী ছুই চারিখানা গহনা বাহির করিয়া দিতেন, এবং পাল্কী হইতে নামিবা মাত্র খুলিয়া লইয়া নখিন্দরের বাসর ঘরে আবদ্ধ করিতেন, এই তো গেল অন্ধকুপের ঐশ্বর্য্য ভাণ্ডারের কথা। অন্য অন্য বাড়ীতে তত্ত্ব করিলেও কমবেশী এরূপ অনেক সামগ্রী দেখিতে পাইবার সম্ভাবনা। কিন্তু ঐ অসূর্য্যম্পশ্যা কক্ষসুন্দরীর নিভৃত গর্ভে যে সমস্ত দুষ্প্রাপ্য অদ্ভুত ও আশ্চর্য্য সামগ্রী ছিল, তাহা সাধারণ লোকে প্রায় দেখিতে পায় না! হাঁড়ির উপর হাঁড়ি তার উপর হাঁড়ি তার উপর তার উপর তার উপর এইরূপ কোমর সমান, বুক সমান, গলা সমান হাঁড়ির সারিতে গৃহটীর মেজেয় আর পা বাড়াইবার স্থান ছিল না; গৃহিণী ভিন্ন অপর কেহ সে গোলকধাঁধাঁয় প্রবেশ করিলে হুমড়ি খাইয়া পড়িয়া হাঁড়ির তলায় সমাধিলাভ করিত। দেয়ালে পেতেন তাহাতেও হাঁড়ি, কড়িকাট হইতে দোদুল্যমান সিকার সারী তাহাতেও হাঁড়ার উপর হাঁড়ী। এই হাঁড়ির কুঁড়ার মধ্যে কোনটীতে চালভাজার নাড়ু—গৃহিণীর শাশুড়ী জীবিতকালে স্বহস্তে উহা পাক করিয়াছিলেন; কোনটীতে দাদখানি চাউল—তাঁহার শ্বশুরের অতিশয় পীড়ার সময় ক্রয় করা হয়, কোনটীতে তাঁহার নিজের বিবাহান্তে মেলানি ভারের ফেণী বাতাসা, তাঁহার দিদিশাশুড়ী কাশী হইতে নৌকা পথে পেঁড়া আনিয়াছিলেন, তাহার গুটিচার পাঁচ কোন হাঁড়ীতে আছে; কোনটীতে কর্ত্তার প্রথম ষষ্ঠীবাটার ক্ষীরের ছাঁচ ও চন্দ্রপুলি, বয়স পরিপক হওয়ায় উভয়েরই বর্ণ গাঢ় হরিৎ ও গাত্রে শুভ্র লোমাবলি বাহির হইয়াছে; কোনটীতে পুত্রের ফুলশয্যার চিনির মুড়কী, ছাতু বাবুর পুত্রের বিবাহের সামাজিকের ওলা কোন হাঁড়িতে। বিবাহের জল গায়ে লাগিয়াই কর্ত্তার একবার জ্বর হইয়াছিল। সে সময় সাবুদানা আসে, তাহার এক মুঠাও এক হাঁড়ীর তলায় পড়িয়া আছে,

এইরূপ রলার খিরপুলি, অভয় চরণ মিত্রের বাড়ীর মেঠাই, রাধাকান্ত দেবের শ্রাদ্ধের খাজা, খেলাৎ ঘোষের জন্ম তিথি পূজার গজা, বিশ বছুরে খেজুর, পঁচিশ বছুরে নারিকেল নাড়ু, ঝড়ের বছরের বেদানা, ৬০ সালের পেস্তা, ৭২ সনের খাস্তার কচুরি ইত্যাদি ইত্যাদি বহুবিধ দেবদুর্ল্লভ দ্রব্যে হাঁড়িগুলি পরিপূর্ণ; একটী বড় হাঁড়ায় গুটিকয়েক কমলা লেবু ও আম গৃহিণী একদিন যৌবন কালে তুলিয়া রাখিয়াছিলেন, ইঁদুরমাটীর সাহায্যে তাহা হইতে ২।৪টী গাছ বাহির হইয়াছিল।

(২)

কলিকাতার উপকণ্ঠ সুঁড়ায় গৃহিণীর মাতুলালয় ছিল, কুমারী কালে মধ্যে মধ্যে সেখানে অবস্থান কালে তিনি পুরুষের মত কাপড় পরিয়া বেণী দোলাইয়া সেখানকার রাজাদের বাড়ী খেলা করিতে যাইতেন; কেহ কেহ বলে, ঐ স্থান হইতেই রায়-গিন্নির রুচি প্রত্নতত্ত্বের চর্চ্চায় আকর্ষিত হয়, এবং ঘর বসত করিতে আসিয়াই তিনি গুপ্ত ও প্রাচীন দ্রব্য সংগ্রহে মনোনিবেশ করেন; শাশুড়ী ঠাকুরাণীরও এ বিষয়ে স্বভাব-সিদ্ধ সখ থাকায় গৃহিণী এমন অমূল্য ভাণ্ডার প্রস্তুত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। একবার এক মূষিক-দম্পতি হঠাৎ ঐ গৃহে প্রবেশ করে, আর বাহির হইবার সুযোগ না পাওয়ায় ঐ স্থানেই উহাদিগের বংশ বৃদ্ধি হইতে থাকে, এক্ষণে তাহাদের ভয়ে কোন বিড়াল ঐ গৃহে প্রবেশ করিতে সাহস করে না; গৃহিণী কয়েক-বার কল পাতিয়াছিলেন; কিন্তু সাত আটটী কল ভগ্ন হইবার পর হইতে তিনি মৃগয়ায় ক্ষান্ত দিয়াছেন। এক সময় রায় মহাশয় তাঁহার ভাড়া-টিয়া এক রাস্তাবন্দি সাহেবের নিকট বাকি ভাড়ার দরুণ একখানি বেতের কাজকরা বগি ও একটী হলদে চামড়া মোড়া হার্টের ঘোড়া লইয়া তাহাকে ছাড় দেন; ঘোড়াটী প্রাতঃকালে বাড়ীর ভিতর হইতে

কতকগুলি তরকারীর খোসা ও সায়ংকালে গোশালার ভৃত্যের হস্তের একটী যাব পাইত, রাত্রিকালে অশ্বটীকে বাটীর নিকটবর্ত্তী বাজারে চরিতে দিতেন, ঐ কৃষ্ণের জীবের প্রতি সুনজর রাখিবার জন্য ঘাটির পাহারাওয়ালার একটী করিয়া দোয়ানি মাসহারা বরাদ্দ ছিল ; দিনের বেলা উচ্চৈঃশ্রবা আফিসের আস্তাবলে সাহেবের ঘোড়ার পাশে থাকিবার স্থান পাইত।

একদিন সাহেব নিজের ঘোড়ার টিফিন তদারক করিতে গিয়া দেখিলেন যে, তাঁহার বাবুর বাহন সকরুণনয়নে বাল্‌তির পানে চাহিয়া আছে এবং বিক্রয়াবশিষ্ট যে কয়েকটী পুচ্ছ আছে, তাহার দুর্ব্বল আঘাতে পৃষ্ঠস্থ একখানি ক্ষত হইতে মাছি তাড়াইতেছে। বেচারির টিফিনের কোন বন্দবস্ত নাই জানিয়া সাহেবের দয়া হইল ও আপনার সহিসকে তাঁহার ঘোড়ার দানা হইতে কতক অংশ উহাকে দেওয়াইতে অনুমতি করিলেন ; তোবড়া মুখের কাছে ধরিবামাত্র হর্ষ বিষাদ ও বিস্ময়ের আবেগে অস্থিচর্ম্মসার পীতাশ্ব একবার তোবড়াস্থিত দানার প্রতি, একবার সাহেবের মুখের প্রতি ও একবার সহিসের দিকে শূন্য দৃষ্টিতে চাহিল ; পরে আনত আননে বারেক মাতা বসুমতীকে দেখিয়া লইল, বিপুল উদর ভেদ করিয়া একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ছুটিল, নয়নদ্বয়ে এক এক বিন্দু অশ্রু দেখা দিল, তারপর কে জানে কি ভাবিয়া, পশ্চাতের পা দুখানির উপর ভর দিয়া দাঁড়াইল ও আকাশের দিকে মুখ করিয়া সে হা হা হা হা শব্দে এক বিকট হাসি হাসিয়া একেবারে ধরাশায়ী হইল। সেই অবধি অশ্বরাজ আর চতুষ্পদে দাঁড়ায় নাই, বাখারির আঘাত সহ্য করে নাই, ছেঁড়া বেতের বগী টানে নাই, জাব খায় নাই, তাহার নশ্বর দেহ ধাপায় প্রেরিত হইল, অশ্ব কোন কেরাণী-জননীর জঠোরে প্রবেশ করিবার জন্য লাল দিঘি ঘুরিয়া বাঙ্গালী টোলাভিমুখে চলিল ; স্নেহপরায়ণ প্রভু হিন্দু-কুল-রবি রায় মহাশয়ের

প্রতি কৃতজ্ঞতাস্বরূপ দুর্ব্বল দেহস্থ স্বল্পাবশিষ্ট চর্ব্বি হিন্দুদিগের আহার্য্য ঘৃতে মিশ্রিত করিবার জন্য উইল করিয়া গেল। অশ্বের শোকে স্বামীকে পাগল প্রায় দেখিয়া বুদ্ধিমতী সতী আমাদের গৃহিণী প্রবোধ দিয়া বলিয়াছিলেন যে, তিনি যে কোন প্রকারে হউক তাঁহার ভাণ্ডারস্থ একটী ইঁদুর ধরিয়া কর্ত্তার বগী টানার কার্য্য চালাইয়া দিবেন।

এমন সোণার লক্ষ্মী এতগুলো হাড় জ্বালানে পর লইয়া ঘর করিতেন কি করিয়া, ইহা আপাততঃ আশ্চর্য্যের বিষয় বলিয়া বোধ হইতে পারে বটে, কিন্তু যখন দেখা যায় বাটীর পাট্টাখানি রায় মহাশয়ের প্রপিতামহের নামে এবং কতকটা পৈত্রিক সম্পত্তির জের এখনও তাঁহার জমার খাতায় টানিতে হইতেছে, এবং ভ্রাতৃবংশে গ্রাসাচ্ছাদন এবং তাঁহাদিগের তরফের প্রত্যেক বিবাহ, পঞ্চামৃত, সাধ, সূতিকাগৃহ, আটকৌড়ে, ষষ্ঠী পূজা, অন্ন প্রাশন, বিদ্যার্জ্জন, লোকলৌকিকতা, চিকিৎসা, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ও শ্রাদ্ধে সপিণ্ডী করণের খরচ আপন ইচ্ছায় মুক্তহস্তে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে লিখিয়াও এখনও কিছু ফাজিল বাকি কাটিতে পারেন নাই, তখন আমার ন্যায় পাষণ্ডও গৃহিণীর দূরদৃষ্টি ও বিষয়-বুদ্ধির প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারেন না। কেননা গৃহিণীর মুখে শুনিয়াছেন যে "যত খরচ তো ওদেরই জন্য, আমাদের কটী পেটে আর কত পড়ে! এ সওয়ায় ঠাকুরের দুবেলা ও বার মাসে তের পার্ব্বন আছে, কর্ত্তারা তো আর হাতী ঘোড়া রেখে যান নাই।" বাস্তবিক তাঁহারা হাতী ঘোড়া রেখে যান নাই, সেকেলে মানুষ নগদ টাকা আর সোণা রূপাই ভাল বুঝিতেন তাহাই রাখিয়া গিয়াছিলেন। রায় মহাশয় পরিবারের নিকট তাঁহার স্ত্রীধন কর্জ্জ করিয়া মুচ্ছুদ্দিগিরি লইবার সময় আফিষে সিকিউরিটী জমা দেন, লোক জনে ৩।৪ বার তহবিল ভাঙ্গায়, ঝুঁকি রায় মহাশয়ের ঘাড়ে পড়ে; কাজেই সাহেবেরা ঐ জমার টাকা কাটিয়া কাটিয়া লয়েন, কর্ত্তাও বার বার উক্ত রূপ

কর্জ্জ দ্বারা ডিপজিটের টাকা পূরণ করেন ; আর একবার পাঁচ জনের কুপরামর্শে পাটের কাজ করিতে গিয়া একেবারে গৃহিণীকে ফতুর করিয়া ফেলেন। গরীব স্ত্রীলোকের যে সর্ব্বনাশ করিয়াছেন, তাহার তো আর চারা নাই, এক্ষণে ধর্ম্মের দিকে চাহিয়া আফিষে যে কয়টী টাকা পান মাসে মাসে তাহা অর্দ্ধাঙ্গিণী উত্তমর্ণের হস্তে দিয়া থাকেন। গৃহিণীর পিতা সদাই ঘোষ কন্যার বিবাহের পর জামাতার অধীনে একটী ওজনসরকারি কর্ম্মে ভর্ত্তি হয়েন ; সুতরাং কোন্ আলাদিনের প্রদীপ ঘসিয়া কোন্ দৈত্যের তমোময় ভাণ্ডার হইতে গৃহিণী স্ত্রীধন আনাইতেন তাহা কেহ বুঝিতে পারিত না ; স্বামীকে কর্জ্জ দিবার পূর্ব্বে বা সময়ে সে ধনের কোন রূপ চিহ্নও কেহ দেখে নাই, কখনও তাহার উল্লেখও শুনে নাই ; কিন্তু ঋণ পরিশোধ আরম্ভ হওয়ার পর হইতে ভাড়াটীয়া বাটী কোম্পানির কাগজ তেজারতি ও অলঙ্কারাদিতে তাহা ফুটিয়া পড়িতে লাগিল। এই সমস্ত সম্পত্তির কেনা বেচা আদায় তাগাদার ম্যানেজারি রায় মহাশয়কেই করিতে হইত এবং সেই জন্য সতী হাত তুলিয়া পতিকে নিজ খরচের জন্য কিছু কিছু মাসহারা দিতেন।

(৩)

পিতা বর্ত্তমানে রায় মহাশয়ের জেষ্ঠ্যের মৃত্যু হয় এবং পিতাও পুত্রশোকে অল্পদিন পরেই গঙ্গা লাভ করেন সুতরাং জেষ্ঠ্যের পুত্র ও নিজের কনিষ্ঠ দুইটা নাবালকের ভারই রায় মহাশয়ের উপরেই পড়ে ; প্রগাঢ় স্নেহের আধিক্যে তিনি নাবালক দুটীকে দ্বাদশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত নিজের কাছে রাখিয়া অত্যন্ত আদর দেন, তাহাদিগকে স্কুল পাঠশালা দিয়া অধিক কষ্ট দেন নাই, কাজেই বয়ঃপ্রাপ্তে তাহারা কোন কার্য্যেরই উপযুক্ত হইল না এবং আপনার ভ্রাতা ও ভ্রাতুষ্পুত্রকে একটা ছোট কার্য্যে ভর্ত্তি করিয়া তিনি তাহাদের বা বংশের মর্য্যাদা

হানি করিতে পারেন না। শ্যালক শ্যালীপতি আদি হিসাবে কয়েকটী ভালরূপ লেখাপড়া নাজানা লোক রায় মহাশয়ের অধীনে কোলিয়ারি গুদাম সরকারি প্রভৃতি কার্য্য করিয়া এক রকম দশ টাকা উপার্জ্জন করিত বটে এবং তহবিল তছরুপাতের ব্যাপারটা তাহাদের দ্বারা সুবিধামত সমাধা হইত, কিন্তু তাহারা পর বৈত নয়; তাহাদিগের বেতনাদি তো আর রায় মহাশয়ের ঘরে আসিত না, কিন্তু ভ্রাতা ভ্রাতুষ্পুত্রের ন্যায় আত্মীয়গণকে আপন অধীনে কর্ম্ম দিলে লোকে তাঁহাকে পক্ষপাতী ও অসৎ বলিতে পারে, এইভয়ে তিনি তাহাদিগের উপার্জ্জনের উপায় করিয়া দেন নাই; সুতরাং খাতায় তাহাদের নামে কোন রূপ জমা না পড়িয়া একান্নবর্ত্তী পরিবার বলিয়া দাবী কাটিবার পথটী সুন্দররূপে পরিষ্কার হইয়াছিল। ধর্ম্মপ্রাণা গৃহিণীর সৎপরামর্শে কন্যাভারগ্রস্ত স্ব-জাতির প্রতি কৃপা করিয়া নাবালক দুটীর বিবাহ অতি দীন দরিদ্রের গৃহে দিয়াছিলেন, সুতরাং কুলি পরাইয়া কন্যা বিদায় করিয়াছে, এমন মুরুব্বি শ্বশুরদিগের দ্বারা জামাতাদিগের কোন রূপ উপকার বা তাহাদিগের পক্ষ হইতে মামলা মকোদ্দমার উৎপাত বাধাইবার সম্ভাবনাও ছিল না। এই তো গেল গিন্নির শ্বশুর গোষ্ঠীর উপর করুণার কৈফিয়তী। বোনপো বোনপো বৌ প্রভৃতি পিতৃ-সম্পর্কীয় সম্বন্ধের যে তাঁহার কোন স্নেহের পক্ষপাত ছিল এ অপবাদও কেহ দিতে পারিত না।

বোনপোর পিতা দু হাজার টাকা রাখিয়া যান; ছেলে মানুষ পাইয়া কেউ ঠকাইয়া লইবে বলিয়াও বটে এবং কাগজের সুদের বাজার আজ কাল মাটী এই জন্যও ভারী সুদে খাটাইয়া মূলধন বৃদ্ধি করিয়া দিবার নিমিত্ত গিন্নি নিজের হাতে এ টাকা লয়েন। এই সময় একটা ভারী সুযোগ আসিয়া উপস্থিত হয়; একটা মাগী প্রায় ৭।৮ হাজার টাকার জড়য়া গহনা রাখিয়া টাকায় চার পয়সা সুদে

দুই হাজার টাকা কর্জ্জ করিতে আসে, গৃহিণীর সিন্দুকে টাকা পড়িয়া পচিতেছিল; কিন্তু পিতৃমাতৃহীন বোনপোর হিতৈষিণী মাসী নিজে অমন ভারী স্থদ লাভের লোভ সম্বরণ করিয়া ঐ গচ্ছিত দুই হাজার টাকা দিয়া গহনা গুলি বন্ধক রাখেন। এক বৎসরের মেয়াদ ফুরাইল। কিন্তু সে মাগী নিরুদ্দেশ। স্থদের হিসাবে এক পয়সাও দিল না, গহনাও খালাস করিতে আসিল না। তখন মাসী একদিন সস্নেহে বোনপোকে ডাকিয়া আহ্লাদে আটখানা হইয়া বলিলেন "নিলু তোর বড় বরাতরে বাবা দু হাজার টাকা দিয়ে আট হাজার টাকার উপর মেরে দিলি, আমিই ঠকে গেলুম; কর্ত্তা পাকা লেখা পড়া করিয়ে নিয়েছেন, এখন সে মাগী টাকা দিতে এলেও আমরা নেবনা; তা অত জড়য়া রেখে তুই বা করবি কি যা ওগুলোকে নিয়ে ভাল জায়গা থেকে যাচিয়ে আন; বিক্রি করে নগদ টাকা হলে আবার এই রকম খাটাতে পারবি; এইবার দেখছি তোর বরাত খুললো।" এই বলিয়া মাসী একটী টীনের বাক্স শুদ্ধ গহনা গুলি একখানি একখানি করিয়া নালুকে বোঝাইয়া দিলেন। নীলু জিনিষ গুলি বড়বাজারে তিনটী ভাল দোকানে দেখাইয়া অবশেষে একজন আলাপী লোকের সঙ্গে এক প্রসিদ্ধ জহুরির কুঠিতে গেল, কিন্তু যখন সে জহুরীও বলিল, গহনাগুলি কিছুই নয় সব ঝুঠা, গিল্টি করা পিতলের উপর কাচ ও বাজে পাথর বসান মাত্র, উহার দু দামড়িও দাম হইবে না, তখন একেবারে হতাশ হইয়া জলভরা চখে উর্দ্ধশ্বাসে বাড়ী আসিয়া বাক্সটী মাসীর পায়ের কাছে দিয়া বসিয়া পড়িল। মাসী অবাক্ একেবারে অবাক্—কলির লোকের ব্যবহার দেখিয়া ধর্ম্ম একেবারে পৃথিবী ছাড়িয়া গিয়াছে বুঝিয়া, জগতে এত জুয়াচুরি আছে অথচ তিনি ইহার বাষ্পও জানেন না, ভাবিয়া একেবারে আকাশ হইতে পড়িলেন, "নিলে তোর কি সর্ব্বনাশ করলুম, একেবারে

পথে বসালুম” বলিয়া গগনভেদিস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন, দুই হাতে হাঁটু চাপড়াইতে লাগিলেন, মাথার পাকা পাকা চুল গুলি পড়্ পড়্ করিয়া ওপড়াইয়া ফেলিলেন, পাশে হাঁপানীরোগা বিমল মাসী বসিয়াছিল তাহার পৃষ্ঠে মাথা ঠুকিতে লাগিলেন, বেচারার ফুস্‌ফুস্ শোঁ শোঁ ডাকিয়া উঠিল, অবশেষে “এ প্রাণ আর রাখবোনা আজ রক্ত গঙ্গা হব” বলিয়া দুই হাতে বঁটি তুলিয়া আপনার গলায় হাত খানেক দূরে ঘন ঘন নাড়িতে লাগিলেন। গহনা তো গেছে এখন মাসী বাঁচিলে হয় এই ভাবিয়া হতভম্ব নীলু তখন সজোরে মাসীর হাত হইতে বঁটী কাড়িয়া লইল, টানা টানিতে বেচারার বুড়ো আঙ্গুলের খানিকটা কাটিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল, সে জ্বালা উপেক্ষা করিয়া, টাকার শোকে হৃদয়ের জ্বালা ভুলিয়া গিয়া নীলু মাসীকে সান্ত্বনা করিতে লাগিল। কিন্তু নীলুর দু হাজার টাকা গেছে বৈত নয়, পুরুষের দশ দশা কত আসে কত যায়, বেটা ছেলে বেঁচে থাকলে অমন কত দুহাজার রোজগার করবে, মাসী এমন অপ্রস্তুত এ জীবনে কখন হন নি, তাঁর এ লজ্জা কিছুতেই যাবে না। মেয়ে মানুষ কোথায় কি পাবেন যে গিন্নী ক্ষতি পূরণ করিয়া দিবেন, ধর্ম্মতঃ তাঁরই তো দেওয়া উচিত; কিন্তু পোড়া বিধাতা মন দিয়াছেন ধন দিয়াছেন কৈ; সুতরাং গৃহিণী কোন সান্ত্বনাই শোনেন না, কিছুতেই প্রবোধ মানেন না, তিনি পৃথিবীর সমস্ত মাগীকে গাল দিতে লাগিলেন, জড়োয়া গহনা গুলোকে অধঃপাতে দিলেন, জহুরির নিপাত করিলেন, মধুসূদনের মুখ পোড়াইলেন, ধর্ম্মের মুখে ঝাঁটা মারিলেন, চন্দ্র সূর্য্যকে চুলোয় পাঠাইলেন, টাকা রাখিয়া গিয়াছিল বলিয়া নীলুর বাপকে গালি দিলেন, মরিয়া গিয়াছে বলিয়া তার মাকে সর্ব্বনাশী বলিলেন এবং তাহার হাতে টাকা কেন দিয়াছিল বলিয়া নীলুকে অলপ্পেয়ে হাড়হাবাতে হতচ্ছাড়া প্রভৃতি নানা বিশেষণে বিভূষিত করিলেন; পরিশেষে, রাগে শোকে

অপমানে অন্ধ হইয়া আপনার গালে মুখে চড়াইতে গিয়া নীলের পিঠে চড়্ চড়াচড়্ চড়াইয়া দিলেন ; মাসীমার চম্পকরম্ভাবিনিন্দিত অঙ্গুলী কলার চিহ্নে নীলমণির কৃষ্ণ পৃষ্ঠ তরুণ অরুণের শোভা ধারণ করিল।

ভাগ্যক্রমে রাতারাতি ফাঁপিয়া যাওয়ার আহ্লাদে নীলু ঐ দিন প্রাতে, অবশ্য গহনা যাচাইতে যাইবার পূর্ব্বে, নিজের পয়সা দিয়া বাজার হইতে কয়েকটা মোচা চিংড়ী কিনিয়া আনে, রাত্রি ৯টার পর উহার দুইটা বড় বড় মুড়া চিবাইয়া তবে গৃহিণীর প্রতারিত হইবার শোক কতক শান্ত হয়।

যে স্ত্রীলোক গহনা বন্ধক দিয়া গিয়াছিল, সে কবে কখন কোন স্থান দিয়া আসিয়াছিল তাহা বাটীর অপর কেহ দেখে নাই ; কর্ত্তা লেখা পড়া করিয়া দিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তিনিও কোন স্ত্রীলোককে দেখেন নাই, সুতরাং স্ত্রীলোকটীর কোন সন্ধান কস্মিন কালেও পাইবার সম্ভাবনা রহিল না।

কুলোকে কত কি কানাকানি করিত, বোনপোর টাকা গুলো গিন্নি একটা ফেরারি করে ফাঁকি দিলেন এই রকম নানান কথা বলিত, কিন্তু সে কেবল ভালখাগিরা ভাল লোকের পিছনে লেগে মরে বলে।

নীলুর স্ত্রী একরাত্রি স্বামীকে সোহাগের ভাবে পেয়ে বলেছিল, তুমিও যেমন বোকা মাসীমার কথায় বিশ্বাস করে ভুলে গেলে, ওঁকে আবার কেউ ঝুটো গহনা দিয়ে ঠকিয়ে যাবে! আর এত টাকার গহনা বাঁধা দিয়ে গেল অথচ আমারা এতগুলো লোক বাড়ীর ভিতর আছি কে মানুষটা তা কেউ একদিনও দেখলুম না ; মাসীমার ঘরে অমন আরো গিল্টির গহনা জাওয়ান আছে আমি জানি। নীলু "চুপ চুপ ও কথা আর মুখে এনো না" বলিয়া তাড়াতাড়ি আপনার হাত দিয়া স্ত্রীর মুখ চাপিয়া ধরিল, বৌ মনে মনে ভাবিল, ভাল

বেরসিক স্বামীর হাতে পড়িয়াছি, কথাটাও তলিয়ে বুঝিল না আর যদি ঠোঁট দুখানি চেপে ধরিল—তাও কিনা হাত দিয়ে। আমরা কিন্তু ধর্ম্মের দিকে চাহিয়া কথা কহিব, গৃহিণী সেই ঝুটো জড়োয়া গুলি বোনপো বৌকে ব্যবহার করিতে দিয়া বলিয়াছিলেন যে, আমাদের বাড়ী থেকে যা পরে বেরুবে তাই লোকে সাঁচ্চা বলিবে।

(৪)

এখন বোধ হয় বুঝিতে পারিলেন যে, ঐ দুহাজার টাকা গচ্ছিত রাখা সূত্রেই বোনপো-দম্পতি মাসীমার সংসারে প্রবেশাধিকার লাভ করে। তার পর নীলু স্ত্রীর নারিকেল তৈল, নিজের জল খাবার নাম করিয়া ৩০৲ ত্রিশটী টাকা মাহিনার মধ্যে ২০৲ কুড়িটী টাকা মাসী মার হাতে লুকাইয়া দিত, এবং আঁবের সময় আঁবটা, ইলিস মাছের সময় ইলিশ মাছটা, শীতকালে নলেন গুড় খানা, এই রকম আজ এটা কাল সেটা নিজের পয়সায় কিনিয়া আনিয়া মাসীমার সংসারের সুসার করিত। এদিকে বন্ধ্যা বোনপোবৌটারও দুর্জ্জয় গতর ছিল, সংসারের অর্দ্ধেক কাজ সে আপন হাতে করিত, সে থাকাতে গৃহিণীকে আর রাঁধুনীর বেতন দিতে হইত না; বিশেষতঃ তিনি বাতাক্রান্ত স্থূল-শরীর লইয়া নিজে দেওয়ানখানাই বল আর আফীস ঘরই বল সেই খানেই প্রায় বসিয়া থাকিতেন, উপর নীচে করিয়া বড় নড়িয়া চড়িয়া বেড়াইতে পারিতেন না; কে কি বললে, কে কি খেলে, কে কেমন চোখে চাইলে, কোন জিনিসটা পেয়ে কে মুখ খানা কেমনতর করলে, কে কার সঙ্গে ফিসির ফিসির করেছে, কে স্বামী ভাত খেতে বসলে বাতাস করেছে, কে স্ত্রীর পানে চেয়ে হেঁসেছে ইত্যাদি রাজ্যের মঙ্গলা-মঙ্গল সমস্ত সংবাদ ঐ ধর্ম্মদূত বোনপো বৌটী গোপনে গৃহিণীর কাণে তুলিয়া দিত। মাসশ্বাশুড়ীর প্রতি বধূর হৃদয়ে ভক্তি যে উছলিয়া পড়িত এমন নয়, তবে বেচারা সমস্ত দিন জল ঘাঁটিয়া আগুণ তাতে

বসিয়া খাটিয়া মরিত, তার উপর গর্ভে একটাও হয় নি যে তাকে নিয়ে খানিক অন্যমনস্ক হয়, বাড়ীর ভিতর খোস গল্প কি খেলা ধুলারও বড় একটা চাল ছিল না, আর কেউ রামায়ণ মহাভারত খানা পড়তো না যে, দু'দণ্ড বসে শুনে, সুতরাং বৌ টীর আমোদের মধ্যে যা একটু লাগান ভাঙ্গান ছিল, এর কথা ওর কাছে ওর কথা এর কাছে বলিয়া প্রাণের গরমি টুকু কাটাইয়া রাখিত, প্রাণেশ্বর শয়নকালে বেশ ফুর ফুরে হালকা প্রাণটী পাইতেন। এই রায় সংসাররূপ নেপালে যদিও রাজমুকুট-খানি রায় মহাশয়ের মস্তকে ছিল, তথাপি গৃহিণীই প্রকৃত জঙ্গ বাহাদুর ছিলেন, সুতরাং এরূপ গোয়েন্দায় তাঁর বিশেষ প্রয়োজন ছিল।

বোনপো বৌটী বাড়ীর ভিতরের গোপন সংবাদাদি বহন করিয়া হোম ডিপার্টমেণ্টের ডিটেক্টীভের কার্য্য করিত, আর দুই চারিটী প্রৌঢ়া ও বৃদ্ধা আত্মীয়া প্রতিপালিতা হইতেন, তাঁহারা ফরেন ডিপার্ট-মেণ্টের ডিটেক্টীভ স্বরূপ প্রতিবাসী ও কুটুম্বাদির বাটীর কুচ্ছ কথা গুছাইয়া আনিতেন।

(৫)

পরের গহনার কথা উত্থাপন করায় তিনি ধুতুল কুটিতে কুটিতে বোনপো বৌকে যে ধমকাইয়া উঠিয়াছিলেন, সে তাহার মুখ বন্ধ করাইবার জন্য নয়, বৌটীও তাহা বুঝিত, সে জানিত যে, ঐ সম্পর্কীয় কথার সমস্ত বিষয় আন্দোলন করিবার জন্য উহা শাশুড়ী ঠাকুরাণীর স্বরচিত একটী প্যাটেণ্ট ইসারা মাত্র। পাড়ায় এক ঘর কায়স্থ পরিবার আসিয়া কয়েক বৎসরাবধি বাড়ী ভাড়া করিয়া আছে; তাহাদের বাটীর কর্ত্রী মধ্যে মধ্যে এক আধ খানি গহনা গড়াইতে আরম্ভ করিয়াছেন; নীলুর স্ত্রী মাসশাশুড়ীর সম্মুখে তাহারই কথা তুলিয়া-ছিল এবং ধমকের উৎসাহ পাইয়া হাসিয়া বলিল "তা বাপু যুগী

বৌকে গাঁথতে দিয়েছে সে দেখিয়ে নিয়ে গেল তাই আমি বল্লুম আমার দোষ কি ?" গিন্নি জিজ্ঞাসা করিলেন, তাবিজ কি ডায়মন কাটা ? বৌ একবার নীচের ঠোঁট খানি উল্টাইল, আমি সেখানে থাকিলে তাঁহার মুখের সম্মুখে একখানি আয়না ধরিতাম, যখনি কেহ ঠোঁট উল্টায়, নাসিকা কুঞ্চিত বা অপর কোন রূপ মুখ বিকৃত করে, তখনই আমার ইচ্ছা হয় যে তাহার মুখের উপর একখান আরসি ধরিয়া দেখাই যে, লোকে পরকে বিদ্রূপ করিতে গিয়া নিজের ভগবান-দত্ত সুন্দর মুখগুলি কি কদর্য্যশ্রেণীতে অবনত করে, যাহা হউক সে স্থানে অনুপস্থিতি বিধায় যখন আয়না ধরা হয় নাই, তখন বধূ ঠাকুরাণী স্বচ্ছন্দে নিজের বেগুনিয়া ঠোঁটখানি উল্টাইয়া, তিলক সেবার উপযোগী নাসিকাটী সিটকাইয়া, সুচিত্র ভুরু দুটী কুঞ্চিত করিয়া, সুকোমল হস্ত দু'খানি বক্র করিয়া আনুনাসিক স্বরে বলিল ; "পোড়া দশা আর কি ডায়মন কাটা না হাতী কাটা, ভরি পাঁচ ছয়ের সাদা মাটা জুটেছে—এই ঢের।" গৃহিণীর সনথ বৃহদ্দন্তবিকসিত বদনখানি বিদ্যুৎ বেগে বাতাসে একটা পাক খাইয়া লইয়া বলিল "ওমা সাদা তাবিজ তারি এত জারি।"

বিমল মাসী বসুমতীর উপর হাতের চাটু দুখানির ভর দিয়া বেলা দুইটা হইতে একটুখানি পুরাতন ঘৃতের উমেদারি করিতে বসিয়া বসিয়া ঠোঁট দুখানি বেটুয়া মুখের মত কুঞ্চিত করিয়া সজোরে পায়রা ডাকিতে ছিলেন, এক্ষণে একবার হামাগুড়ি দিয়া, ছাদের দিকে ঘাড় ফিরাইয়া অৰ্দ্ধ প্রহরের সঞ্চিত ঘন মুখামৃত কতকটা নিক্ষেপ করিলেন ; পরে পূর্ব্ববৎ আসন পরিগ্রহ করিয়া বলিলেন ; "তা মা জারি হবে না কেন, এখন যে আধানি লোকেরই গুমরের দিন পড়েছে, কোলকেতায় এসে যত বেটী কাটকুড়ুনীর গায়ে সোণা উঠ্‌লো তা তারা অহঙ্কার রাখে কোথা বল।"

গিন্নি—মিথ্যে নয়, সোনাটা যেন ফেলনা হয়ে পড়েছে ; সে কালে তো শুনেছি বড় বড় জমিদারের ঘরে রূপোর পৈঁছে রূপোর খাড়ু হাতে দিত।

বোন-পো-বৌ—সব বলে শুনেছি, মিন্সে নাকি দুহাতে মুটো মুটো উপরি রোজগার করে, তা তার স্ত্রী সোণা পরবে না কেন বল।

গিন্নি—উপরের দিকে চোখ পড়েছে তো তাহলেই কোন্ দিন কোম্পানীতে হাতে দড়ী দিয়ে সোণা পরিয়ে দেয় দেখ না।

বৌ—না মাসীমা, মিন্সের নাকি সে রকম চরিত্রি নয়, ভারি ধর্ম্মিষ্টি' চুরি করে উপরি রোজগার করে না, মহাজনেরা ওকে হাতে তুলে দেয়, সবার মাল পত্র নাকি যত্ন করে তুলে নাবিয়ে দেয়, কাকেও হাঁটাহাঁটি করায় না, মুখও নাকি খুব মিষ্টি, তাই তারা খুসি হয়ে ওকে বেশ দুপয়সা দেয়, এ পাওনা নাকি সাহেবের জানা।

গিন্নি—মেজবৌ, চুপ করে থাক বল্‌ছি, গেরস্থর বৌ অত বাচাল কেন লা ? মহাজনেরা তোর বাপ খুড়ো কিনা তাই ঝাজুদের পায়ে ধরে মুটো মুটো টাকা দিয়ে আসে।

বৌ—তা বাপু সব বলে সব শুনতে পাই আমি তো আর দেখতে যাইনি।

গিন্নি—যেতে পারিস্‌নি পাকড়ি বেঁধে আপিসে দেখতে ? বলে কে, নীলে বুঝি ? অমন পোড়ার বুদ্ধি না হলে অমন দশা হবে কেন, একটা মেয়ে মানুষে তা না হলে গিন্টির গয়না দিয়ে দু হাজার টাকা ঠকিয়ে নিয়ে যায়। (সেই গহনা সম্বন্ধীয় প্রতারণার সমস্ত অপরাধই ইদানীং গৃহিণী নীলুর

পোড়া অদৃষ্ট ও বুদ্ধির উপর চাপাইতেন) আমার কথা দেখে নিও বেমল মাসী এই বলে রাখলুম—রাজুদের হাতে এই দড়ী পড়ে, পড়ে,—ওর বৌয়ের শতেক খোয়ার হয়, হয়, হয়।

"উঁহোঁঃ তা—তা—উঁহোঁঃ উঁহোঁঃ উঁহোঁ—ভগ্—উঁহোঁঃ—উঁহোঁঃ—উঁহোঁঃ—ভাগবা—উহোঁঃ উঁহোঁঃ হোঁঃহোঁঃ হোঁঃ"—বিমল মাসীর বুকের ভিতরে শত কবুতর একেবারে ডাকিয়া উঠিল, মুখখানি পুঁই মিটুলীর রং ধারণ করিল, জলভারাক্রান্ত চক্ষুর গোলক দুইটী খসিয়া পড়িবার উদ্যোগ করিল, গৃহিণীর প্রস্তাব অনুমোদন করিয়া মাসী আর রাজুদের সর্ব্বনাশের জন্য ভগবানকে আহ্বান করিতে সমর্থ হইলেন না। গৃহিণীর মজলিসে পাড়ার এই নূতন কায়েতদের কথা লইয়া প্রায়ই এই আলোচনা হইত। বধূরাও আপনাদিগকে কর্কশ আলোচনার হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য, কেহ কোনরূপ একটা ছুতা করিয়া ঐ দে পরিবারের সম্বন্ধে একটা কথা তুলিয়া দিত; একবার একটী সূত্র ধরাইয়া দিতে পারিলে সে দিনকার মত নিশ্চিন্ত; অন্য সমস্ত কার্য্য স্থগিত রাখিয়া গৃহিণীর রসনাযন্ত্র গজ্ গজ্ বক্ বক্ শব্দে সেদিন এক দে পরিবারকে পেষণ করিতে থাকিবে। কাশী আসিয়া মাসীর ভগবদভক্তি স্রোতে বাধা দিল বটে কিন্তু গৃহিণীর কর্ণে ভগবানের নাম অর্দ্ধ প্রবেশ করিবা মাত্র তাঁহার প্রেম একেবারে উথলিয়া উঠিল, "ভগবান মরেছে" এইরূপ মঙ্গলোচ্চারণ করিয়া সেই বৈকুণ্ঠবাসী চোখখেগোর যদি বিচার বোধ থাকে তাহা হইলে ঐ দে পরিবারের অহঙ্কার চূর্ণ, শতেক খোয়ার, সর্ব্বনাশ তদ্বির সম্বন্ধে কতদূর তৎপর হওয়া উচিত, সেই বিষয়ে অনর্গল বক্তৃতা করিতে আরম্ভ করিলেন। দে দিগের উপর গৃহিণীর বিরক্তির অনেক কারণ ছিল, উহাদিগের প্রধান অপরাধ অহঙ্কার। প্রথমতঃ রাজু দে পাড়ায় প্রবেশ করিয়াই গৃহিণীর অমন ঠাণ্ডা একতালা বাড়ীটী বাইশ টাকা ভাড়ায় না লইয়া মাসিক আঠার টাকা চুক্তিতে উপরে দুটী কুঠুরী

ওয়ালা একটী বাড়ী ভাড়া লইয়াছিল, একি কম অহঙ্কার। তুই কি এমন মেজিষ্টরী করিস, যে দোতলার উপর না হলে শোয়া হয় না; আর তুই বাড়ী ভাড়া নিবি এই প্রত্যাশায় কি রায় গিন্নি হাত ধুয়ে বসেছিলেন। দ্বিতীয়তঃ গৃহিণী একদিন রাজুর পরিবারকে দেখিবার জন্য তাঁহার বাড়ীতে আসিবার জন্য গয়লানী দিয়া বলিয়া পাঠান, তা উত্তর ক'রে পাঠালে কিনা, বাবুকে জিজ্ঞেস করি, তিনি বল্লেন তো যাবো, আ'মর, বাবুকে'রে—সরকারী চাকরী করে স্বামী তিনি বুঝি আবার বাবু, কলকেতার মাটীতে পা দিলে সবাই বাবু হয় গিন্নি ডেকেছেন আসবি তার আর বাবুকে জিজ্ঞাসা কি। তার পরদিন খবর এল আজ বৃহস্পতিবারের বারবেলা আজ আর যাব না কাল যাব—দেখ একবার অহঙ্কারটা, ভাড়া বাড়ীতে থাকিস তোর আবার দিন ক্ষণ কিরে। তারপর অহঙ্কারের উপর অহঙ্কার, শুক্রবার দিন দুপুর বেলা মাগী কি না এক পাল্কী চড়ে হুম্ হুম্ করে এসে উপস্থিত—পাড়ার ভিতর দুটো বই গলি পার হ'তে হয় না, আর সদর রাস্তার উপর কত টুকুখানিই বা আসতে হয়, এ কিনা পায় হেঁটে আসতে পাল্লেন না, পাল্কী যেন কেউ কখন দেখেনি, তাই পাল্কী দেখাতে এলেন।

পাড়াগেঁয়ে মানুষ কখন পাল্কী চড়েনি এই মনে করে গৃহিণী তাও ক্ষমা ঘৃণা করেছিলেন, ভেবেছিলেন চড়ুক চড়ুক কতদিনই বা ভোগ হবে দুদিন চ'ড়ে নিক্; আর শুধু কি তাই, ঠাট দেখে গিন্নি রাগ করবেন কি হাসিই চেপে রাখতে পাল্লেম না। মাসীর বয়স যেমন করে হোক ছগণ্ডার উপর হয়েছে, পাড়ার ভিতর একখানা যা'তা' পরে এলেই হতো, তানা তিন আঙুল চওড়া মতি পেড়ে শাড়ী পাট ভেঙে পরে আসা হয়েছে; আবার নীচে হাতে বালা, চুড়ী, ওপর হাতে তাগা, গলায় চিক, কোমরে সোনার গোট, কানে মাকড়ি; আ'মর কার বাড়ী তুই গয়না দেখাতে এসেছিস্; আবার লজ্জার কথা বলবো কি ফিরিঙ্গি খোঁপা করে চুল বাঁধা হয়েছিল। এসেই গিন্নিকে ঢিপ করে এক প্রণাম করা হলো, এটি জানান হলো, যে তিনি যেন

ওর চেয়ে বয়সে বড়। বাড়ীতে লোকটা এসেছে তাই গিন্নি আদর করে জিজ্ঞেসা করেছিলেন যে দিদি তোমার নামটী কি ভাই, তা বলা হ'ল "ভবসুন্দরী"; শুধু ভব বললে কেউ যেন বুঝতে পারতো না; আর অহঙ্কারের কথা কত বলব বল, গোটছড়াটী দেখে গিন্নির মনে ধরে ছিল, তাই সাড়ে সাত গণ্ডা টাকা আলাদা তুলে রেখে ছিলেন, তা মাগী কি বজ্জাত একদিনও সে ছড়া বাঁধা দিতে এলো না। ও যেমন মাগী তেমনি মিন্সে, মিন্সে বাজার করে দরজা দিয়ে দেখিয়ে দেখিয়ে নিয়ে যায়, একদিন একটা ভেটকি মাছ, একটা ইলিস, একদিন একটা গর্ভমোচা, একদিন ডিমলো কাঁকড়া, একদিন কুড়ী খানেক লিচু, এই রকম কতদিন কত কি নিয়ে নিয়ে গেছে, গৃহিণী বৈঠক খানার খড়খড়ীর ভিতর দিয়ে এসব দেখেছেন। হায় হায় এত অহঙ্কার করেও মানুষের এতদিন স্বচ্ছলে চলছে, এতদিন এসে বাড়ি ভাড়া করে আছে, এর মধ্যে একদিনও জলের কলসী আগুন রাখাতো হলোনা, এতে যে কলিতে ধর্ম্ম আছে, মুখ পোড়া মধুসূধনের বিচার আছে, তা গৃহিণী কেমন করে বিশ্বাস করেন বল দেখি। তিনি নিজেও তাঁহার স্বামী পুত্রাদি ভিন্ন অপর লোক যে এ পৃথিবীতে বেঁচে আছে, পিতৃপুণ্যে ও নিজঅমানুষিক ধৈর্য্য গুণে গৃহিণী ইহাও কোন মতে সহ্য করে আছেন, কিন্তু তাহার উপর উহার খায়, পরে, কোটা বাড়ীতে বাস করে, গহনা গড়ায়, ছেলে মেয়ের বিবাহ দেয়, বাড়ীতে প্রতিমাটা আসটা আনে, চর্ম্ম চক্ষে এসব গৃহিণী কেমন করে দেখেন বল; গৃহিণীর সাংসারিক সুখের মধ্যে এই গুলি কণ্টক, লক্ষ্মীস্বরূপিণী অবলা এই সব দেখিয়া শুনিয়া দিবারাত্রি হা হুতাশ করেন, থাকিয়া থাকিয়া ওহো হো হোহো হো মধুস্থদন কতদিনে এ যন্ত্রণা যাবে, কবে নিস্তার পাব বলিয়া চিৎকার করিয়া উঠেন, এবং ত্রিসন্ধ্যা ঠাকুর ঘরের চৌকাটে মাথা কুটিয়া কুটিয়া ললাটের মধ্যস্থলে একটী আব প্রস্তুত করিয়া ফেলিয়াছেন। একদিন পাড়ার বারওয়ারী পূজা উপলক্ষে যাত্রা হইতেছিল, পল্লীর প্রায় সমস্ত

লোক সেইখানে সমবেত হইয়া যাত্রা শুনিতেছিল, বালক বৃদ্ধ যুবা সকলেই আমোদ করিতেছিল, অনেক স্ত্রীলোকও আটচালার অন্তরালে বা বারওয়ারী তলার চতুঃস্পার্শস্থ ছাদ হইতে যাত্রা শুনিতেছিলেন। আজকাল দিনেরবেলাই যাত্রা হয়, রায় মহাশয় আফিষে গিয়া রক্ষা পাইয়াছেন, কিন্তু তাঁহার সহধর্ম্মিণীর যমযাতনা উপস্থিত হইল। তিনি গৃহের সমস্ত দরজা জানালা বন্ধ করিয়া দিলেন, তথাপি ঢোল মন্দিরার আওয়াজ গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল, গানের স্থর হাসির হররা, তাঁহার কাণে বাজিতে লাগিল, গৃহিণীর প্রাণ একেবারে ব্যাকুল হইয়া উঠিল, অবশেষে তিনি একপ্রকার উন্মাদের ন্যায় হইয়া আত্মহত্যার মানসে গলায় দড়ী দিবার উদ্যোগ করিলেন; এমন সময় তাঁহার পিতৃপুণ্যে পার্শ্বের গলির ভিতর হইতে অকস্মাৎ একেবারে বহুকণ্ঠে হৃদয়বিদারক রোদন ধ্বনি উঠিল, গৃহিণীর হস্ত হইতে রজ্জু পড়িয়া গেল, তাঁহার কৃষ্ণ দন্তপাতি বিস্ফারিত হইল, বুঝিলেন যে ময়রাদের যে বৌটী সূতিকা পীড়ায় ভুগিতেছিল, তাহার সকল দুঃখের অবসান হইয়া গেল; যেন যৌবনের বলে বলীয়ান হইয়া তিনি সমস্ত দরজা জানালা খুলিয়া দিলেন; ঢোল, মন্দিরা, তানপুরা, বেহালা, হাসির হররা, তুড়ি, বাহবা, বেশ, ছাপাইয়া সর্ব্বনাশঘোষণাকারী আর্ত্তনাদী রোদনরোল সেই ক্ষুদ্র গৃহ খানি ছাইয়া ফেলিল। প্রফুল্ল মুখী রায়গৃহিণী তখন লোহার সিন্দুক খুলিয়া একটী আদলা পয়সা বাহির কারলেন এবং "বিধাতা তুমিই সত্য" এই বলিয়া আদলাটি নিজের কপাল স্পর্শ করাইয়া হরির লুটের বাতাসা কিনিবার জন্য তাকের উপর উঠাইয়া রাখিলেন।

ধান্যের চাষ।

এ দেশে তুলার ও পাটের চাষের উন্নতি হয় হউক; ইক্ষু ও গোলালুর চাষের বিস্তৃতি হয় হউক; রিহা ও আগাভের আঁইশ্ বাহির করার সুব্যবস্থা হয় হউক; গো-চিকিৎসার জন্য স্থানে স্থানে পশু চিকিৎসালয় স্থাপিত হয় হউক; হাড়ের গুঁড়া ও সোরা চাষাদের দ্বারা ব্যবহার করাইবার প্রয়াস পাওয়া হয় হউক; কিন্তু কৃষিকার্য্যের উন্নতি করিতে গেলেই,—সাধারণ কৃষকদিগের অবস্থার পরিবর্ত্তন করিতে হইলেই, ধান-চাষের উন্নতি করা আবশ্যক।

ধান-চাষের কি কি উন্নতি সহজে হইতে পারে, ইহাই দেখান এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

১। ধান কাটা সমাধা করিবার পরেই কাল বিলম্ব না করিয়া 'যো' পাইলেই জমি প্রস্তুত করা আবশ্যক। পৌষ হইতে ফাল্গুন পর্য্যন্ত প্রায়ই দুই একবার বৃষ্টিপাত হইবার পরে জমি কর্ষণোপযোগী হইয়া থাকে। এই সময়ে জমি কর্ষণ না করিয়া যদি ফেলিয়া রাখা হয়, তাহাতে জমির ন্যূনা ক্ষতি হইয়া থাকে, অথচ পৌষ হইতে জ্যৈষ্ঠ মাস পর্য্যন্ত ধানের জমি অকর্ষিত অবস্থায় ফেলিয়া রাখা এদেশের কৃষক-দিগের সাধারণ নিয়ম। উহারা জ্যৈষ্ঠ মাসে বর্ষারম্ভ হইলে জমি কর্ষণ করিয়া বীজ রোপণ করিয়া থাকে। এরূপ তাড়াতাড়ি করিয়া চাষ করিলে জমির মধ্যে যে যে সকল পোকার বাসা ও উদ্ভিদ্-রোগের বীজ লুকায়িত অবস্থায় থাকে, ঐ গুলি নষ্ট হইতে পারে না; জমির আগাছা গুলিও ভাল হইয়া নষ্ট হইতে পায় না, এবং জমি বায়ু হইতে উর্ব্বরতা সংগ্রহ করিবার অবকাশ পায় না। পৌষ, মাঘ বা ফাল্গুন

জমি কর্ষণোপযোগী হইলেই উহা কর্ষণ করা নিতান্ত আবশ্যক। এই সময় হইতে কর্ষিত ভূমি জ্যৈষ্ঠ মাস পর্য্যন্ত শ্লথ অবস্থায় থাকিলে অনেক দিবস ধরিয়া বায়ুর মধ্যে নিহিত যে যে উর্ব্বরতাদায়ক পদার্থ থাকে, ঐ সকল পদার্থ মৃত্তিকার সহিত মিলিত হইবার অবসর পাইয়া থাকে। অম্লজান ও দ্ব্যম্লঙ্গারক বায়ু মৃত্তিকার প্রত্যেক কণার সহিত সহজে মিশ্রিত হইতে পাইলে মৃত্তিকার মধ্যে নানা প্রকার সুন্দর রাসায়নিক ক্রিয়া সম্পাদিত হয় এবং মৃত্তিকা উর্ব্বরতা লাভ করে। কিন্তু মৃত্তিকা ঈষৎ সিক্ত ও সম্পূর্ণ শ্লথ অবস্থায় থাকিলে আর একটী কার্য্য মৃত্তিকার মধ্যে সাধিত হওয়ায় মৃত্তিকা আরও অধিক উর্ব্বর হইয়া থাকে। এই কার্য্যের নাম যাবক্ষারিক কার্য্য বলা যাইতে পারে। মৃত্তিকার মধ্যে যাবক্ষারিক কার্য্য কয়েক জাতীয় ব্যাক্টিরিয়া দ্বারা সাধিত হয়। এই ব্যাক্টিরিয়াগুলি ক্ষুদ্রতম জীবিত উদ্ভিদণু। ইহারা বায়ু, চূণ ও জৈবিক পদার্থের সংস্রবে সিক্ত ভূমিতে সংখ্যায় বর্দ্ধিত হইয়া যায়। ইহাদের একটী প্রধান গুণ এই যে, ইহারা বায়ুর যবক্ষারজাণ গ্রহণ করিয়া আপনাদের শরীরের মধ্যে এল্‌বুমিনয়েড্‌ পদার্থ গঠিত করিতে পারে। এলবুমিনয়েড পদার্থ পিচ্ছিল অণ্ডাভ্যন্তরীণ পদার্থসদৃশ তেজীয়ান পদার্থ। ইহা দ্বারা জমি সারবান্‌ হইয়া থাকে। জমির মধ্যে কিছু চূণের ভাগ সর্ব্বদাই থাকে। যেখানে চূণের ভাগ নিতান্ত কম থাকে, সেখানে ঘুটিং শামুক, বা কোন প্রকার চূণা পাথর, অথবা পুরাতন অর্থাৎ তেজ মরা চূণ ছিটান আবশ্যক। উর্ব্বর জমি ভিন্ন চূণ ব্যবহার করা ভাল নহে, কিন্তু ঘুটিং পাথর অথবা চূণা-পাথর ব্যবহারে ক্ষতি হয় না। সাধারণতঃ সকল জমিতেই যে পরিমাণ চূণের ভাগ ও জৈবিক পদার্থ থাকে, তাহাতে কেবল শীতকালে কর্ষণ মাত্র দ্বারা যাবক্ষারিক ক্রিয়ার উৎকর্ষ সাধন করিতে পারা যায়। অত্যধিক উত্তাপ দ্বারা যাবক্ষারিক ক্রিয়ার ক্ষতি হইয়া থাকে; এ কারণ পৌষ মাস হইতে চৈত্র মাসের

প্রারম্ভ পর্য্যন্ত যাবক্ষারিক ক্রিয়া যেরূপ সহজে নির্বাহিত হয়, অন্য ঋতুতে সেরূপ হয় না। এই হেতু এই কয়েক মাসে জমি শ্লথ অবস্থায় রাখিয়া দেওয়াতে বিশেষ উপকার আছে। চৈত্র—বৈশাখে রাত্রিকালে মৃত্তিকা শিশির দ্বারা সিক্ত হয় না বলিয়া এবং দিবাভাগে সূর্য্যের উত্তাপে মৃত্তিকা অত্যধিক উত্তপ্ত হয় বলিয়া, যাবক্ষারিক ক্রিয়া নির্ব্বাহের জন্য যে পরিমাণ শৈত্য ও উষ্ণতা আবশ্যক তাহার ব্যতিক্রম ঘটে। জ্যৈষ্ঠ হইতে অগ্রহায়ণ পর্য্যন্ত বর্ষার প্রকোপ থাকাতে যাবক্ষারিক ক্রিয়াজনিত যে সকল গলনশীল ও উদ্ভিদের আহারের উপযোগী পদার্থ উদ্ভূত হয়, ঐ সকল ধৌত হইয়া জমির বাহির হইয়া গিয়া অপচয় হওয়া সম্ভব। এ কারণ এই কয়েক মাসে জমি শ্লথ ও কর্ষিত অবস্থায় ফেলিয়া রাখা উচিত নহে। এই সময়ে জমিতে ফসল থাকিলে ঐ সকল পদার্থ ধৌত হইয়া জমি হইতে বহির্গত না হইয়া গিয়া ফসলকে পরিপুষ্ট করে। পৌষ মাস হইতে ফাল্গুন মাস পর্য্যন্ত ঘটনাক্রমে যদি অত্যধিক বৃষ্টি হয়, তাহা হইলেও জমির মধ্যে উদ্ভূত গলনশীল সারবান্ পদার্থ সকল ধৌত হইয়া গিয়া জমির ক্ষতি করিতে পারে, কিন্তু এই সময়ের ভিতর অত্যধিক বৃষ্টিপাত প্রায় হয় না। এই সময়ে মধ্যে মধ্যে যেরূপ বৃষ্টি হইয়া থাকে তাহাতে জমির শৈত্য রক্ষিত হইয়া যাবক্ষারিক ক্রিয়ার সহায়তা করে। এ কারণ পৌষ মাস হইতে চৈত্র মাস পর্য্যন্ত মধ্যে মধ্যে জমিতে লাঙ্গল, মৈ দিতে পারিলে জমির প্রায়ই প্রভূত উপকার হইয়া থাকে। কোন কোন স্থানের চাষারা এ বিষয়ে নিতান্ত অনভিজ্ঞও নহে, তবে তাহাদের ধারণা, শীতকালে জমিতে চাষ দিতে পারিলে জমিকে শীত খাওয়ান হয়, এবং শীত খাওয়াইলে জমির উপকার দর্শে। কিন্তু এই ধারণা দ্বারা চালিত হইয়া শতকরা পাঁচ জন কৃষকও শীতকাল হইতে ধানের জমি প্রস্তুত করিয়া রাখার প্রথা অনুসরণ করে না। এই প্রথা সকল কৃষকেরই অনুসরণ করা নিতান্ত কর্ত্তব্য।

২। যাবক্ষারিক ক্রিয়া যেমন মৃত্তিকার মধ্যে বিশেষ বিশেষ অবস্থায় সুচারুরূপে নির্ব্বাহিত হয়, সেইরূপ এই ক্রিয়ার অনুরূপ আর একটী ক্রিয়া কলাই-জাতীয় উদ্ভিদের মূলে সম্পাদিত হইয়া থাকে। কলাই, ছোলা, চীনাবাদাম, নীল, অড়হর, শণ, ধইঞ্চা, বর্ব্বটী, প্রভৃতি কলাই-জাতীয় গাছ তরুণ অবস্থায় শিকড় শুদ্ধ উঠাইলে দেখা যায় উহাদের শিকড়ে অল্প-বিস্তর স্ফোটক সদৃশ পদার্থ জন্মিয়া আছে ; এই পদার্থকে মূল-গণ্ড বলা যাইতে পারে। এই স্ফোটক বা গণ্ড কোন বিশেষ জাতীয় ব্যাক্টিরিয়া দ্বারা জন্মিয়া থাকে। যেমন মানুষের গাত্রে মশক দংশন দ্বারা স্ফোটক জন্মে, সেইরূপ কলাই জাতীয় গাছের শিকড়ে ব্যাক্টিরিয়া আশ্রয় লইলে শিকড় স্থানে স্থানে স্ফীত হয়। বস্তুতঃ মূল-গণ্ড-গুলি বিশেষ বিশেষ জাতীয় ব্যাক্টিরিয়ার উপনিবেশ। একটীমাত্র গণ্ড শিকড় হইতে খসাইয়া লইয়া, এক হাজার ব্যাস বর্দ্ধিত করিতে পারে এরূপ অনুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা ঐ গণ্ডের মধ্যস্থ পিচ্ছিল পদার্থ পরীক্ষা করিলে সহস্র সহস্র খর্ব্বাকার, সচল সূত্রবৎ ব্যাক্টিরিয়া দেখা যাইবে। এই ব্যাক্টিরিয়া গুলিরও বায়ু হইতে যবক্ষারজান সংগ্রহ করিয়া জটিল যাবক্ষারিক পদার্থ, অর্থাৎ প্রোটোপ্লাস্মে, পরিণত করিবার ক্ষমতা আছে।

যে পিচ্ছিল পদার্থ গণ্ডগুলি পেষণ দ্বারা অনুভূত হয় উহাই প্রোটোপ্লাস্ম্। ব্যাক্টিরিয়াগুলিও প্রোটোপ্লাস্ম্ মাত্র। যে গাছের মূলে যত অধিক পরিমাণে-মূল-গণ্ড থাকে, সেই গাছ তত অধিক পরিমাণে সারবান্ পদার্থ মৃত্তিকায় সঞ্চয় করিয়া থাকে অর্থাৎ বায়ু হইতে সংগ্রহ করিয়া রূপান্তরিত করিয়া মৃত্তিকার সহিত মিশ্রিতাবস্থায় থাকিবার উপযুক্ত করিয়া লয়। ছোলা বা কলাই গাছের মূলে যে পরিমাণ মূল-গণ্ড দেখিতে পাওয়া যায়, তদপেক্ষা অনেক অধিক পরিমাণ মূল-গণ্ড চীনাবাদাম, শণ, অড়হর, ধইঞ্চা ইত্যাদি কয়েক প্রকার

গাছের শিকড়ে দেখিতে পাওয়া যায়। একারণ এই সকল গাছ জন্মানতে মৃত্তিকা অধিক সারবান্ হয়। শণ, অড়হর ও ধইঞ্চা জন্মানর দ্বারা মৃত্তিকা আরও অধিক সারবান্ হইবার একটী বিশেষ কারণ আছে। এগুলি যেমন অপেক্ষাকৃত উচ্চ হইয়া থাকে, সেইরূপ ইহাদের শিকড়ও গভীরতর হয়। গভীর শিকড় দিয়া মৃত্তিকার গভীর প্রদেশ হইতে ফস্ফেট্, পটাশ্, প্রভৃতি সারবান্ পদার্থ ডাল-পাতায় সঞ্চিত করিয়া ক্রমশঃ পত্রস্খলন প্রভৃতি ক্রিয়া দ্বারা মৃত্তিকার উপর স্তর অধিক সারবান্ করিয়া তুলে। অর্থাৎ এই সকল গভীর শিকড়যুক্ত কলাই জাতীয় উদ্ভিদ, বায়ু হইতে যাবক্ষারিক পদার্থের সংগ্রহ দ্বারা এবং মৃত্তিকার গভীর প্রদেশ হইতে ফস্ফেট্, পটাশ্ প্রভৃতি সারবান পদার্থ টানিয়া লইয়া মৃত্তিকার উপরিভাগে বিকীর্ণ করিয়া দিয়া, মৃত্তিকাকে সমধিক ও সম্যক্‌ভাবে উর্ব্বর করিয়া তুলে। শণ ধইঞ্চা ও অড়হর এই তিনটী গাছের মধ্যে শণ ও ধইঞ্চা সত্বর বর্দ্ধিত হইয়া যায় বলিয়া এই দুইটী গাছ-সারপ্রয়োগের জন্য অধিক উপযোগী। বঙ্গদেশের অনেক স্থানে চৈত্র মাস হইতে জ্যৈষ্ঠ মাস পর্য্যন্ত মধ্যে মধ্যে বৃষ্টি হইয়া থাকে। পৌষ মাস হইতে ফাল্গুন মাসের মধ্যে সুবিধামত জমি প্রস্তুত করিয়া রাখিতে পারিলে চৈত্র মাসে অধিক পরিমাণ বৃষ্টি হইয়া গেলেই জমিতে 'যো' বুঝিয়া ধইঞ্চা বা শণের বীজ ঘন করিয়া ছিটাইয়া লাঙ্গল মৈ দেওয়া চলিতে পারে। তিন মাসের মধ্যে শণ বা ধইঞ্চা গাছগুলি ৪।৫ ফুট উচ্চ হইয়া যাইবে। পরে এই গুলির উপর গরু চরাইয়া দিয়া অথবা কাটিয়া এ গুলিকে ভূমিসাৎ করিয়া লইয়া পুনঃপুনঃ লাঙ্গল-মৈ দিয়া মৃত্তিকা-সাৎ করিয়া লইতে পারিলে মৃত্তিকা বিশেষ সারবান্ হইয়া পড়িবে। এরূপ অবস্থায় আষাঢ় বা শ্রাবণ মাসে ধান্য রোপণ করিতে পারিলে ধান্যের ফসল অনেক অধিক হইবে। ধান-চাষের সংস্রবে এইরূপ উদ্ভিদ্

সারের ব্যবহার কৃষকদিগের মধ্যে প্রচলিত হওয়া আবশ্যক। কৃষকগণ হাড়ের গুঁড়া, সোরা, খোল প্রভৃতি মূল্যবান সার ক্রয় করিয়া যে ধানের চাষে ব্যবহার করিবে এরূপ আশা করা যায় না; কিন্তু ধান রোপণের পাঁচ মাস পূর্ব্বে জমি প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিয়া তিনমাস পূর্ব্বে ধইঞ্চা বা শণ লাগাইয়া, এক মাস পূর্ব্বে ঐ ধইঞ্চা বা শণ গাছ ভূমিসাৎ করিয়া লাঙ্গল, মৈ দিয়া পুনরায় জমি প্রস্তুত করিয়া লইয়া, পরে ধান রোপণ করিতে কৃষকগণের অপারক হওয়ার কোন কারণ নাই।

৩। বঙ্গদেশের কৃষকগণ প্রায়ই এক এক স্থানে ৪।৫টী করিয়া ধানের চারা গুছি বাঁধিয়া রোপণ করিয়া থাকে। এক এক স্থানে যদি ৪।৫টী বেগুণের বা কার্পাসের, বা লঙ্কার চারা রোপণ করা যায়, তাহা হইলে একটী গাছও ভাল জন্মে না, সকলগুলি একত্রে জন্মিয়া সকলগুলিই ক্ষীণ হইয়া পড়ে, একটী হইতেও ফল ভাল হয় না, ইহা সকলেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। ধান্য সম্বন্ধে যে কিছু পৃথক্ প্রাকৃতিক নিয়ম আছে, এরূপ সম্ভব নহে। বস্তুতঃ পরীক্ষা দ্বারা সাব্যস্ত হইয়াছে এক একটী ধানের চারা এক এক স্থানে রোপণ করিলে যে পরিমাণ ফসল জন্মে, দুইটী করিয়া চারা রোপণ করিবার দ্বারা তদপেক্ষা কিছু অধিক ফসল জন্মে না, এবং চারি পাঁচটী করিয়া চারা এক এক স্থানে লাগাইলে ফসল বাস্তবিক কম হইয়া থাকে। এক এক স্থানে এক একটী করিয়া ধানের চারা রোপণ করিবার প্রথা কৃষকগণের মধ্যে প্রচলিত করা যাইতে পারে।

৪। এদেশে যেরূপ অন্তরে অন্তরে ধান্য রোপণ করিবার প্রথা আছে, তদপেক্ষা অধিক অন্তরে অন্তরে রোপণ করিলে ফল ভাল হয়। এক ফুট অন্তর একটী করিয়া চারা লাগান উচিত। ছয় বা নয় ইঞ্চি অন্তর লাগাইলে গাছে ভাল করিয়া ঝাড় বাঁধে না। বিলাতে হ্যালেট্ সাহেব নামে এক জন প্রসিদ্ধ কৃষক গোধূম প্রভৃতির গাছ অধিক

অন্তরে অন্তরে জন্মাইয়া "পেড়িগ্রি" বীজ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। এইরূপে গাছ লাগাইলে শীষে অধিক পরিমাণ দানা জন্মে এবং দানাগুলি অপেক্ষাকৃত অধিক পুষ্ট হয়, এবং এইরূপ দানা ক্রমাগত কয়েক বৎসর ধরিয়া বীজের জন্য ব্যবহারে সুপুষ্ট ও অধিক পরিমাণ দানা জন্মিবার প্রবণতা হ্যালেট্ সাহেব বীজে জন্মাইয়া দিতে সক্ষম হয়েন। এদেশের কৃষকগণ নিতান্ত ঘন করিয়া গাছ লাগাইয়া অধিক পরিমাণ বীজ ব্যবহার করিয়া, নিজেদের ক্ষতিই করিয়া থাকে। ইক্ষু, পাট, ইত্যাদি অন্যান্য ফসল সম্বন্ধেও এইরূপ ঘন করিয়া ফসল জন্মাবার কু-প্রথা প্রচলিত আছে।

৫। বর্দ্ধমান পরীক্ষা ক্ষেত্রে দ্বাদশ বৎসরের পরীক্ষার ফলে দেখা যাইতেছে, হাড়ের গুঁড়া ও সোরা ধান্যের পক্ষে অতি উত্তম সার। এই দুইটী সারের প্রচলন হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। কেবল হাড়ের গুঁড়া ব্যবহার দ্বারা বিশেষ উপকার লক্ষিত হয় না, কেননা চূর্ণাবস্থাতেও অস্থি দ্রবীভূত হইয়া অতি সত্বর উদ্ভিদের খাদ্যে পরিণত হয় না। হাড়ের গুঁড়া জমিতে ব্যবহার করিলে অতি সামান্য উপকার অনেক কাল ধরিয়া প্রাপ্ত হওয়া যায়। জমিতে সোরার কার্য্য ঠিক্ বিপরীত রূপে হইয়া থাকে। এই সার সহজেই গলিত হইয়া এক বৎসরের মধ্যেই ব্যবহৃত হইয়া যায়। বস্তুতঃ অধিক বৃষ্টি হইলে এই সার ধৌত হইয়াও যায় এবং ইহা মৃত্তিকাকে অধিক গলনশীল অবস্থায় পরিণত করিয়া ভবিষ্যতে মৃত্তিকার কিছু ক্ষতি করিয়া থাকে। হাড়ের গুঁড়া ও সোরা একই ফসলে সাররূপে ব্যবহার করিলে দুইটী সারেরই উপকারিতার বৃদ্ধি হয়, হাড়ের গুঁড়া অপেক্ষাকৃত অধিক গলনশীল অবস্থায় পরিণত হওয়ায় ইহা হইতে আশু উপকার লক্ষিত হয় এবং সোরা দ্বারা জমির যে ক্ষতি হয়, তাহা হাড়ের গুঁড়ার দ্বারা পূরণ হইয়া যায়। হাড়ের গুঁড়া বিঘা প্রতি এক মণ, জমি প্রস্তুতের সময় ছিটাইয়া দিয়া

লাঙ্গল-মৈ করিতে হয়। বীজ রোপণের পরে গাছগুলি যখন সবল হইয়া জাগিয়া উঠে তখন বিঘা প্রতি দশসের সোরা জলে গুলিয়া বালির গুঁড়া মৃত্তিকার সহিত মিশাইয়া জমিতে ছিটাইয়া দিতে হয়। বর্দ্ধমান কৃষিক্ষেত্রে যত প্রকার সার ব্যবহার করা হইয়াছে, তন্মধ্যে হাড়ের গুঁড়া ও সোরা হইতেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক লাভ হইয়াছে; বিঘা প্রতি সার প্রয়োগের ব্যয় ৪৲ টাকারও কম পড়িয়াছে, কিন্তু খরচ বাদ লাভ বিঘা প্রতি ৩৫৲ টাকা হইয়াছে। ৩২/ মণ গোময়-সার ব্যবহার দ্বারা বিঘা প্রতি ১৷৹ টাকা আন্দাজ খরচ পড়িয়াছে, কিন্তু খরচ বাদ লাভ ২৮৲ টাকা হইয়াছে। অতএব গোময় সারও ধানের পক্ষে মন্দ নহে।

৬। আশু-ধান্যের উন্নতি সম্বন্ধে একটী বিশেষ ও অভিনব আবিষ্কার বর্ণনা করিয়া এই প্রবন্ধ শেষ করিব। আশু-ধান্য বলিলেই যে দুষ্পাচ্য লোহিত বর্ণের ও কদর্য্য চাউল যুক্ত ধান্য বুঝায় এমত নহে। ৩।৪ মাসের মধ্যে পাকিয়া যায় এরূপ সূক্ষ্ম ও শ্রেষ্ঠ ধান্য স্থানে স্থানে পাওয়া যায়। যে পরীক্ষাটী বর্ণনা করা যাইবে, উহা কদর্য্য আশু-ধান্য লইয়া সম্পাদিত না করিয়া কোন শ্রেষ্ঠ জাতীয় আশু-ধান্য লইয়া সম্পাদিত করা বিধেয়। মধ্য প্রদেশের সূক্ষ্ম আশু-ধান্য ও পেশোয়ারের সোয়াতি নামক লম্বাভাবের, কিছু বৃহদাকারের কিন্তু অতি সুগন্ধ একপ্রকার ধান্য, এই দুই জাতীয় ধান্য লইয়া শিবপুর কৃষিক্ষেত্রে কয়েক বৎসর ধরিয়া এই পরীক্ষাটী সম্পাদিত হইতেছে। অন্যান্য আশু-ধান্যের ন্যায় এই দুই জাতীয় ধান্য ভাদ্র-আশ্বিন মাসেই কাটা হয়। এই সময়ে জমি বিলক্ষণ সরস থাকে। ধানের গোড়াগুলি উৎখাত করিয়া না ফেলিলে উহা হইতে নবপত্র ও কতকগুলি শীষ পুনরায় বাহির হইয়া থাকে। অগ্রহায়ণ মাসে এই শীষগুলি পাকিয়া গেলে উহাদের সংগ্রহ করিয়া পর বৎসর বীজ রূপে ব্যবহার করিলে

ঐ বীজ হইতে যে গাছ বাহির হয় উহা অপেক্ষাকৃত অধিক ফল-প্রদ ও অনাবৃষ্টিসহ হইয়া থাকে। দ্বিতীয় কাটের বীজ হইতে উৎপন্ন গাছ গুলির শিকড় অধিকতর গভীর হয় বলিয়া, উক্ত গুণ দুইটী এই গাছে লক্ষিত হয়। দ্বিতীয় কাটের বীজ হইতে যে গাছ হয়, উহা পাকিতে এক মাস বিলম্ব হয়, অর্থাৎ ভাদ্র বা আশ্বিন মাসে শস্য কাটিবার উপযুক্ত না হইয়া আশ্বিন বা কার্ত্তিক মাসে হইয়া থাকে। ইহা দ্বারাও কিছু উপকার দর্শে। আশু-ধান্যের শীষে স্বভাবতঃই কিছু অধিক "আগড়া" হইয়া থাকে। ইহার কারণ শ্রাবণ বা ভাদ্র মাসে প্রায়ই বর্ষার প্রকোপ অধিক থাকে এবং এই সময়েই আশু-ধান্যের ফুল হয়; ফুল-রেণু বর্ষার বেগে ধৌত হইয়া গেলে শীষে ভাল করিয়া দানা জন্মিতে পারে না,—অনেক শস্যশূন্য দানা জন্মিয়া যায়। অবশ্য কোন কোন বৎসরে আশ্বিন মাসে ৮।১০ দিবস ধরিয়া ক্রমাগত বর্ষা হওয়ায় ঐ সময়ে যে সকল ধান ফুলিয়া যায়, ঐ সকলের ক্ষতি করে; কিন্তু সাধারণতঃ আশ্বিন মাসে বর্ষার প্রকোপ অধিক থাকে না, এবং এই মাসে আশু-ধান্যের ফুল হইলে আগড়া কম হয়। দো-কাটের গাছ পাকিতে এক মাস অধিক সময় লাগে বলিয়া আশ্বিন মাসে এই গাছের ফুল হয় এবং এ কারণ ধান পাকিয়া গেলে আগড়া নিতান্ত কম হয়। দোকাটের গাছ হইতে যে ফসল হইবে উহা বস্তুতঃ সর্ব্বপ্রকারে আশু-ধান্যের ন্যায় ব্যবহার না করিয়া আমন ধান্যের ন্যায় ব্যবহার করা উচিত, অর্থাৎ পৃথক্ স্থানে বীজ লাগাইয়া বর্ষার প্রারম্ভে ক্ষেত্রে রোপণ করা কর্ত্তব্য। বস্তুতঃ আশু-ধান্যও রোপণ করিয়া লাগাইলে যত ফল পাওয়া যায়, ছিটাইয়া বপন করিলে তত পাওয়া যায় না। কিন্তু আমন ধান্যে এ সম্বন্ধে প্রভেদ বিশেষ রূপে লক্ষিত হয়। দো-কাটের আশু-ধান্যও আমন ধান্যের ন্যায় অধিক ফলশালী ও অপেক্ষাকৃত অধিক কাল ধরিয়া স্থান অধিকার করিয়া থাকে; একারণ ইহারও পাট ঠিক

আমন ধান্যের ন্যায় হওয়া উচিত। অথচ অনাবৃষ্টিসহতা গুণ সাধারণ আশু-ধান্য অথবা আমন ধান্য অপেক্ষা অধিক থাকাতে দো-কাটের বীজ আমন ধান্যের বীজ লাগাইবার এক মাস পূর্ব্বে লাগান যাইতে পারে; রোপণও আমন ধান্যের এক মাস পূর্ব্বে চলিতে পারে।

১৯০২ ও ১৯০৩ সালে শিবপুর পরীক্ষা ক্ষেত্রে এই পরীক্ষাটী হইতে যে ফল লাভ করা গিয়াছে, তাহার বিবরণ নিম্ন তালিকায় দেওয়া গেল :—

ধান্যের বর্ণনা।	উৎপন্ন।	
	১৯০২।	১৯০৩।
	একার প্রতি	একার প্রতি
প্রথম কাটের বীজ (মধ্য প্রদেশের সূক্ষ্ম আশু ধান্য) ...	১৮/ মণ	২০॥/ মণ
দ্বিতীয় কাটের বীজ (ঐ) ...	২২/ ,,	২৫৷৵ ,,
প্রথম কাটের বীজ (পেশোয়ারি সোয়াতি ধান্য) ...	শুকাইয়া মরিয়া যায়।	১৯॥/ ,,
দ্বিতীয় কাটের বীজ (ঐ) ...	২০/ মণ	১৯॥৫/ ,,

পেশোয়ারি সোয়াতি ধান্য সম্বন্ধে ১৯০৩ সালে দোকাটের বীজ হইতে অতি সামান্যই উপকার পাওয়া গিয়াছে; ইহার কারণ শিবপুরে নাম্‌লা বৃষ্টি অধিক হওয়াতে ১৯০৩ সালে দোকাটের বীজ হইতে যে ফসল হয় তাহাতে কিছু আগ্‌ড়া অধিক হয়। বস্তুতঃ খড়ের পরিমাণ দোকাটের বীজ হইতে অনেক অধিক হইয়াছিল। প্রথম কাটের

বীজ হইতে উৎপন্ন ফসল সোয়াতি ধান্য হইতে একার প্রতি ১৭৮৫ পাউণ্ড খড় জন্মে, ও দোকাটের বীজ হইতে যে ফসল উৎপন্ন হয় উহা হইতে একার প্রতি ২০১১ পাউণ্ড খড় জন্মে। মধ্য প্রদেশের সূক্ষ্ম ধান্যের প্রথম কাটের বীজ হইতে ১৭৭৬ পাউণ্ড ও দ্বিতীয় কাটের বীজ হইতে ২২১৪ পাউণ্ড খড় জন্মে। শ্রেষ্ঠ জাতীয় আশু ধান্যের দো-কাটের বীজ ব্যবহার দেশে প্রচলিত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক।

শ্রীনিত্যগোপাল মুখোপাধ্যায়।

জশনে নৌরোজী।

একটি উর্দ্দু গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া মোগল সম্রাট আকবর সাহের নৌরোজ উৎসবের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে লেখা হইল।

সহস্র হিজরীতে দেশ ও ধর্ম্মের অবস্থাপরিবর্ত্তন ঘটিবে এবং আকবরের দ্বারাই এই পরিবর্ত্তন সাধিত হইবে একথা অর্থলিপ্সু পণ্ডিতগণ আকবরের মাথায় ঢুকাইয়া দিয়াছিল। ইহাতে আকবর আনন্দে এতদূর অধৈর্য্য হইয়াছিলেন যে নয়শত নব্বই হিজরীতেই সহস্র হিজরীর মুদ্রা প্রচলনপূর্ব্বক জশনে নৌরোজী অর্থাৎ নববর্ষোৎসব আরম্ভ করিয়া প্রত্যেক বৎসরেই তাহার উন্নতিসাধন করিতে আরম্ভ করিলেন।

দিল্লীর প্রাসাদস্থিত দাওয়ানেআমা ও দাওয়ানেখাসের চারিদিকে সুরঞ্জিত প্রস্তরনির্ম্মিত একশত চারিটি প্রকোষ্ঠ এই উৎসব উপলক্ষে নানাবিধ দ্রব্যে সাজাইয়া আমীরগণের দক্ষতা প্রকাশ করার জন্য এক একটি প্রকোষ্ঠ এক একজন আমীরের কর্ত্তৃত্বাধীনে দেওয়া হইত। বাদশাহের খাস প্রকোষ্ঠ খাস খেদমৎগারগণ সাজাইত। ইহা ভিন্ন সভামণ্ডল অর্থাৎ দরবারগৃহ পৃথক ছিল। সাধারণতঃ সমস্ত প্রকোষ্ঠই

পর্চুগিজ বনাত, রুমী এবং কাবানী মখমল, বেনারসী জড়াও বস্ত্র, কাশ্মিরী শাল, ইউরোপ ও চীন দেশীয় পরদা, চিত্র, আয়না ইত্যাদি এবং তুর্ক স্থানও পারস্য দেশীয় গালিচার দ্বারা সাজান হইত। সেই সময়ের আমীর গণেরও নানাবিধ মনোহর শিল্পজাত দ্রব্য সংগ্রহের আগ্রহ ছিল এবং কে সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট দ্রব্য দেখাইয়া সুখ্যাতি লাভ করিতে পারে এজন্য প্রত্যেকেই যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে ত্রুটি করিত না।

আমীরগণকে তাহাদের নিজ নিজ রুচি অনুসারে কোন বিশেষ বিষয় প্রদর্শনের ভার দেওয়ার নিয়ম ছিল। খাঁ খাঁনা ও খাঁ আজম নানা দেশীয় বিবিধ প্রকার শিল্প দ্রব্য এবং সাফতেউল্লা ঘটিকা গ্লোব ইত্যাদি বৈজ্ঞানিক ও রাসায়নিক যন্ত্র প্রদর্শন করিত। কিন্তু অধিকাংশ আমীর-গণের প্রকোষ্ঠই ভারতবর্ষীয় এবং অন্যান্য দেশীয় যুদ্ধের অস্ত্রে সাজান হইত। তৎকালে ইউরোপিয়নেরাও তাহাদের দেশীয় নানাপ্রকার আশ্চর্য্যজনক দ্রব্যাদি প্রদর্শন পূর্ব্বক এবং অর্গান ইত্যাদি নানাপ্রকার বাদ্য যন্ত্র বাজাইয়া ও নাট্যাভিনয় করিয়া সকলকে মুগ্ধ করিত।

নববর্ষারম্ভ হইতে পনর দিন পর্য্যন্ত বাদশাহ প্রত্যেক আমীর কর্ত্তৃক তাহাদের প্রকোষ্ঠে নিমন্ত্রিত হইয়া সকলের সহিত বিনা আড়ম্বরে মিলিয়া মিশিয়া আপ্যায়িত করিতেন। আমীরগণ তাঁহাদের পদমর্য্যাদানুসারে বাদশাহকে উপঢৌকন প্রদান করিতেন। উৎসবের কয়েকদিন সর্ব্বত্র অবিরাম নাচ, গান, আমোদ প্রমোদের স্রোত বহিতে থাকিত।

উৎসবের নিয়ম।

উৎসবের পূর্ব্ব দিবস শুভলগ্নে একজন সধবা হিন্দু স্ত্রী দাল ভাঙ্গিয়া তাহা গঙ্গা জলে ভিজাইয়া পিষিয়া রাখিত। পরদিন উৎসবের সময় নিকটবর্ত্তী হইলে বাদশাহ স্নান করিয়া সেই সময়ের যে নক্ষত্র সেই নক্ষত্রের বর্ণানুযায়ী পরিচ্ছদ পরিধান পূর্ব্বক রাজপুতদের ন্যায় খিড়কীদার

পাগড়ী বাঁধিয়া মুকুট ধারণ করিতেন এবং কতক স্বজাতীয় ও কতক হিন্দুদের অলঙ্কার পরিতেন। জ্যোতির্ব্বিদগণ উপযুক্ত সময় জানাইলে ব্রাহ্মণে বাদশাহের কপালে টীকা দিয়া হাতে মণিমাণিক্য খচিত কঙ্কণ পরাইয়া দিত এবং সেই সঙ্গে সঙ্গেই পুর্ব্বদিনের গঙ্গাজলে বাটা দালের বড়া ভাঙ্গা আরম্ভ হইত বাদশাহ সিংহাসনে পদার্পণ করা মাত্র চতুর্দ্দিকে নহবৎ বাজিয়া উঠিত। স্বর্ণ রৌপ্য নির্ম্মিত বাদাম, পেস্তা ইত্যাদি নানাবিধ ফল ও মনি মাণিক্য মোহর পূর্ণ মুক্তার ঝালর দেওয়া জড়াও থলিয়া সজ্জিত পাত্র হস্তে আমীরগণ দাড়াইয়া থাকিত। সভা-স্থলে উক্ত মণি মাণিক্য গুলি এরূপ ছড়ান হইত বোধ হইত যেন শিলা বর্ষণ হইতেছে। রাজা, মহারাজা, প্রধান প্রধান ঠাকুর যাহারা কোথাও কখনও মস্তক নত করে নাই; ইরাণী তুরাণী সর্দ্দারগণ যাহারা বীর রুস্তম ও াস্কন্দীয়ারকে পর্য্যন্ত গ্রাহ্য করে নাই তাহারাও আপাদ-মস্তক কবচে আবৃত হইয়া দাঁড়াইয়া থাকে। খাস সাহজাদাগণ ব্যতীত অন্য কাহারও বসিবার অধিকার ছিল না। প্রথমতঃ সাহজাদাগণ তৎপর ওমরাও প্রত্যেকের পদমর্য্যাদানুসারে বাদসাহকে নজর প্রদান পূর্ব্বক স্লামগাতে উপস্থিত হইয়া সেখান হইতে সিংহাসন পর্য্যন্ত তিন স্থানে আদাব ও কুর্নীশ করতঃ যখন চতুর্থ অভিবাদন অর্থাৎ আদাবে জমীনবুস (ভূমি চুম্বন) শেষ করে তখন নকীব "আদাব বজালাও, জাহাঁপনা বাদসাহ স্লামত, মহাবলী বাদশাহ স্লামত" বলিয়া উঠে। নকিবের বাক্য শেষ হইলে রাজকবি বাদশাহের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া অভিনন্দন পাঠ করে, তাহার পর পারিতোষিক ও খিলাত বিতরণ হইয়া দরবার ভঙ্গ হয়।

মীনাবাজার—জনানা বাজার।

যে সমস্ত নানাদেশীয় নানাবিধ দ্রব্য প্রদর্শিত হইত সেইগুলি দেখিয়া

দরবার শেষ হইলে সেই স্থানে মহিলাগণের আসিবার সুবিধার্থে অস্ত্রধারী স্ত্রীলোক প্রহরী এবং দোকানগুলিতে স্ত্রীলোক বিক্রেত্রী নিযুক্ত থাকিত। বেগমেরা আসিতেন, এবং ওমরাও ও ভদ্র পরিবারস্থ মহিলাগণ যাহার ইচ্ছা আসিয়া দেখিতে পারেন এরূপ আদেশ ছিল। ইহারই নাম খুশরোজ। বাদশাহ আপন বেগম, ভগিনী, কন্যা প্রভৃতি সহ আসিলে, আমীরদের স্ত্রী, কন্যাগণ আসিয়া সেলাম্ করিয়া তাহাদের ছোট ছোট শিশু সন্তানগণকে বাদশাহের নিকট পরিচয় করিয়া দিত। সেইখানে বাদশাহ অনেকের সম্বন্ধও স্থির করিতেন। ইহাতে আকবরের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল। আমীরদের মধ্যে কখনও কোন বিষয়ে মনোমালিন্য ঘটিয়াছে ইহা আকবর জানিলে এইরূপ মনোমালিন্যে রাজ্যে নানাপ্রকার উৎপাত ও শাসনবিশৃঙ্খল ঘটিতে পারে আশঙ্কা করিয়া বাদশাহ তাহাদের বিরোধ মিটাইতে চেষ্টা করিতেন, কিন্তু সকল সময় সুবিধা হইত না। এজন্য, উক্ত উৎসবে আমীরদের স্ত্রী-পুত্র-কন্যাগণ সকলে যখন উপস্থিত হইত, তখন -পরস্পরবিরোধী কোন আমীরের পুত্র কি কন্যাকে নির্দ্দেশ করিয়া বাদশাহ বলিতেন, আজ হইতে এ সন্তান আমার হইল, ইহার উপর আর কাহারও দাবী দাওয়া রহিল না। বেগম অপর আর একজনের সন্তানকে এইভাবে গ্রহণ করিতেন। বাদশাহ ও বেগম তাহাদের সন্তানসন্ততিকে গ্রহণ করাতে, তাহাদের পিতামাতা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া বলিত, জাঁহাপনা আমাদের পরম সৌভাগ্যের বিষয়, সন্তান হুজুরের জন্যই প্রতিপালন করিয়াছি, আজ জাঁহাপনার চরণে অর্পণ করিয়া কৃতার্থ হইলাম। তখন বাদশাহ ও বেগম, উভয়ে বিরোধী আমীরের পুত্র ও কন্যার মধ্যে বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করিয়া এরূপ জাঁকজমকের সহিত তাহাদের বিবাহ দিতেন যে, তাহাদের পিতামাতার দ্বারা তদ্রূপ হওয়া কখনই সম্ভবপর ছিল না।

করিয়া তাহাদের বিরোধ মিটাইয়া দিতেন। খুশরোজ-উৎসবে এভাবে যাতায়াতে জৈন খাঁ কুকার কন্যাকে সাহজাদা সেলীম দেখিয়া উক্ত কন্যার প্রতি সেলীমের অন্তঃকরণ আকৃষ্ট হইয়া পড়ে এবং বাদশাহ তাহার পুত্রের সহিত জৈন খাঁ কুকার কন্যার বিবাহ দেওয়াইয়া দেন।

সেলীম ও মেহের উন্নিসা।

একদা এইরূপ মীনাবাজারে বেগমেরা এদিক-ওদিক বেড়াইতেছিলেন এমন সময় ঘটনাক্রমে অল্পবয়স্ক যুবক সেলীম সেখানে আসিয়া উপস্থিত হয়। সম্মুখে বাগানে ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে, সেলীমের নিতান্ত ইচ্ছা ফুল তোলে, কিন্তু দুহাতে দুটি কবুতর থাকাতে ফুল তুলিতে পারিতেছে না। সেই সময় সেই স্থান দিয়া একজন বালিকা যাইতেছিল, তাহাকে দেখিয়া সেলীম বলিল, বোন, কতক্ষণের জন্য এ দুটি কবুতর ধর, আমি ফুল তুলিয়া আনিতেছি। ইহা বলিয়া সেই বালিকার হাতে কবুতর দুটি দিয়া সেলীম ফুল তুলিতে গেল। ফিরিয়া আসিয়া দেখে, বালিকার হাতে কেবল একটিমাত্র কবুতর রহিয়াছে আর একটি নাই। ইহা দেখিয়া সেলীম জিজ্ঞাসা করিল, আর একটি কবুতর কি হইল। বালিকা উত্তর করিল, উড়িয়া গিয়াছে। সেলীম আবার প্রশ্ন করিল, কিরূপে? বালিকা হাত বাড়াইয়া দ্বিতীয় কবুতরটিও ছাড়িয়া দিয়া বলিল, এইরূপে। সেলীম অবাক হইয়া রহিল, জানিত না, এ বালিকাটি কে এবং কাহার কন্যা। অতএব পরিচয় জানার জন্য কৌতূহলী হইয়া তাহার নাম ও তাহার পিতার নাম জিজ্ঞাসা করাতে জানিতে পারিল যে, বালিকার নাম মেহের উন্নিসা, মিরজা ঘিয়াসের কন্যা। পরিচয় পাইয়া সেলীম বলিল অন্যান্য আমীরদের কন্যা আমাদের এখানে আসা-যাওয়া করে, তুমি আইস না কেন? উত্তরে বালিকা বলিল, আমার মা আইসেন বটে কিন্তু আমাকে সঙ্গে আনেন না, কারণ আমাদের

পরিবারস্থ বালিকারা অন্যত্র যাতায়াত করে না, আজ কেবল অনেক কাকুতি মিনতি করাতে মা আমাকে সঙ্গে আনিয়াছেন। সেলীম উক্ত বালিকাকে সময় সময় তাহাদের সেখানে আসিবার জন্য অনুরোধ করিলে পর বালিকা সেলাম করিয়া বিদায় হইল। কিন্তু সেই দিন হইতেই উভয়ের অন্তঃকরণ উভয়ের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল।

আর একদিন মিরজা ঘীয়াসের স্ত্রী বেগমকে সেলাম করিবার জন্য শাহী মহলে আসিবার সময় কন্যার কাকুতি-মিনতিতে কন্যাকে সঙ্গে আনে। বেগম দেখিলেন যদিও অল্পবয়স্কা বালিকা কিন্তু আদব কায়দায় পরিপক্ক ও চতুরা। বালিকার ব্যবহার ও কথাবার্ত্তা বেগমের ভাল বোধ হওয়াতে কন্যাটিকে সর্ব্বদা সঙ্গে আনার জন্য তাহার মাতাকে বলিলেন। ক্রমেই যাতায়াত চলিতে লাগিল। মেহের উন্নিসা আসিলেই সেলীম সেখানে উপস্থিত হইয়া কোন না কোন উপলক্ষে তাহার সহিত আলাপ করিত। অবশেষে বেগম তাহাদের মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া বাদশাহকে গোপনে তাহা জানাইলেন। ইহা শুনিয়া বাদশাহ বেগমকে বলিলেন যে, কয়েকদিন যেন বালিকাকে সঙ্গে না আনে, ইহা মিরজা ঘীয়াসের স্ত্রীকে বলিয়া দাও, এবং সত্বর কন্যাটিকে বিবাহ দেওয়ার জন্য মিরজা ঘীয়াসকে আদেশ করিলেন।

খাঁ খানা যখন ভক্করের শাসনকার্য্যে নিযুক্ত ছিল, সেই সময় তহমাসব কল্‌মী নামক জনৈক পারস্যদেশবাসী যুবক শাসনকার্য্যে সাহায্য করিয়া বিশেষ দক্ষতা প্রদর্শন করাতে খাঁখানাঁ তাহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া শাহীদরবারে প্রবেশ করাইয়া দেয়। তহমাসব কল্‌মী সাহস ও বীরত্ব দেখাইয়া দরবার হইতে সের আফগান উপাধি লাভ করে। বাদশাহ তাহারই সহিত মেহের উন্নিসার বিবাহ দেওয়াইয়া দিলেন। এই বিবাহই উক্ত বীরযুবকের কালস্বরূপ হইয়াছিল। অদৃষ্ট-

আফগান জাহাঙ্গীরের ষড়যন্ত্রমূলে অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইল। মেহের উন্নিসা বিধবা হইয়া শাহীমহলে আসিয়া কয়েক দিন থাকার পর নুরজাহান বেগম নামে জগতে পরিচিত হইলেন। দুঃখের বিষয় এ জগতে জাহাঙ্গীরও নাই, নুরজাহানও নাই কিন্তু চিরকালের জন্য তাহাদের নামে কলঙ্ক রহিয়া গিয়াছে।

শ্রীসমরেন্দ্রচন্দ্র দেববর্ম্মা।

ব্যাকরণ-প্রসঙ্গ।

কতিপয় বৎসর হইল বঙ্গভাষার ব্যাকরণ লইয়া আন্দোলন চলিতেছে। প্রধানতঃ দুই দল হইয়াছে—একদল সংস্কৃত ব্যাকরণের পথেই চলিতে চান, অন্য দল বঙ্গভাষার জন্য পৃথক্ ব্যাকরণ রচনার পক্ষপাতী। কেহ কেহ আবার মধ্য-পথ-অবলম্বী।

বাস্তবিক পক্ষে এই কয় দলের মধ্যে কোন বিরোধ থাকিতে পারে না। খাঁটি বাঙ্গালার জন্য 'স্বতন্ত্র' ব্যাকরণ রচনা করা কাহারও সাধ্য নয়—বোধ হয়, দ্বিতীয় দলের তাহা উদ্দেশ্যও নহে। "সংস্কৃত"র সঙ্গে তাহার পূর্ণ বিচ্ছেদ সম্ভবপর হইতে পারে না।

যাঁহারা মধ্যপথ অবলম্বনে চলিতে চান, তাঁহাদের সম্বন্ধে কোন কথাই নাই—কিন্তু সংস্কৃতের পক্ষপাতি-পণ্ডিতগণ যে ভাবে আন্দোলন করিতেছেন তৎসম্বন্ধে কিছু বক্তব্য আছে।

প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছে—"ব্যাকরণের প্রয়োজন আছে কি না?" ইহার উত্তর খুব সহজ বলিয়াই বোধ হয়। প্রথমতঃ, ভাষা কাহাকে বলে তাহা সকলেই জানেন। যে উচ্চারিত শব্দরূপ উপায়দ্বারা

শুদ্ধরূপে "লেখা" ও "বলা" যে শাস্ত্রের উদ্দেশ্য তাহার নাম ব্যাকরণ। যাহা দশজনে বলে বা দশজনে লেখে তাহা দেখিয়াই প্রথমতঃ ভাষার শুদ্ধি-অশুদ্ধি নির্ণীত হয়। একথা নিশ্চিত যে, যখন বাঙ্গালা বলিয়া একটা ভাষা আছে তখন তাহার ব্যাকরণও আবশ্যক। সুতরাং বাঙ্গালা ভাষায় ব্যাকরণের আবশ্যকতা আছে কি না এ প্রশ্ন তুলিবার কোন আবশ্যকতা দেখা যায় না। আগে ভাষা, পরে ব্যাকরণ। ভাষা যে পথে চলিবে ব্যাকরণেরও প্রথমে সেই পথে চলা উচিত। পরে মধ্যপথ হইতে এ উহার সহায় হয়। ভাষা যদি উন্নতিশীল অতএব পরিবর্ত্তনশীল হয় তবে ব্যাকরণের পরিবর্ত্তনও অবশ্যম্ভাবী। দু'শ পাঁচ শ' ব ্র পরে ভাষা দুর্ব্বোধ হইয়া পড়িবার অর্থ কি? তখনকার লোকে যে ভাষায় কথাবার্ত্তা কহিবে তাহাই কি তাহাদের কাছে দুর্ব্বোধ ঠেকিবে? না, 'আমাদের' ব্যাকরণ কি 'আমাদের' ভাষা বুঝিবার কোন সহায়তা করিবে না? অথবা, তাহারা আমাদের 'সাহিত্য' পড়িবে অথচ আমাদের 'ব্যাকরণ' পড়িবে না? ফলতঃ, কথা এই— বর্ত্তমান ব্যাকরণ আমাদের বর্দ্ধিষ্ণু ভাষার গতি সম্যক্ লক্ষ্য করিয়াছে কি না?—না, এ পর্য্যন্ত করে নাই। সেইজন্য যাঁহারা বাঙ্গলায় কথা-বর্ত্তা বলেন বা লেখনীচালনা করেন, তাঁহারা আধুনিক ব্যাকরণের উপযোগি-উপাদান নানা প্রদেশ হইতে সংগ্রহ করিতেছেন মাত্র। যাহা ইতিপূর্ব্বেই সংগৃহীত আছে তাহারও নির্ব্বাচন চলিতেছে। সম্ভবতঃ আরও কিছুদিন এই সংগ্রহকার্য্য চলিবে; পরে ব্যাকরণের প্রথম "সংস্করণ" হইবে।

"কথিত ভাষা সাধারণ লোকের ভাষা" এ কথাও সম্পূর্ণ ঠিক নয়। "সাধারণ" মানে যদি 'ইতর' বা 'অশিক্ষিত' হয়, তবে কি 'ভদ্র' বা 'শিক্ষিত' লোকের কথিত ভাষা নাই! আর যদি 'সাধারণ' মানে

সাহিত্য রচিত হইবে কি করিয়া? "বিশুদ্ধ ব্যাকরণ বিদ্যমান না থাকায় বাঙ্গালা-সাহিত্যের সবিশেষ অনিষ্ট ঘটিতেছে"—এ কথার অর্থ কি এই যে, যে সমস্ত ব্যাকরণ প্রস্তুত হইয়াছে তাহার একখানিও শুদ্ধ নয়? সকলই যদি ভ্রমসঙ্কুল হয় তবে ত আশঙ্কার কথাই বটে! সুতরাং "অধুনা বাঙ্গালালেখকগণ কোন নিয়মের বশবর্ত্তী নহেন।" ইহাতে বিচিত্র কি? কোন্ চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তি অন্ধকে পথপ্রদর্শক করে?—তবে পঙ্গু হইলে তাহার স্কন্ধে আরোহণ করাই ন্যায়সঙ্গত বটে! অতএব লেখকবর্গ যে যাহার মতে চলিতেছেন তাহাতে আক্ষেপ কি? অথবা, যদি তাঁহারা প্রকৃত লেখক হন, তবে তাঁহাদের লিখন-ভঙ্গীই যে "নিয়ম" হইয়া পড়ে! ফল কথা, যে সমস্ত ব্যাকরণ প্রচলিত আছে তাহাদের অধিকাংশই সংস্কৃতব্যাকরণের বাঙ্গালা-পকেট্-সংস্করণ, কতক বা ইংরাজিব্যাকরণের অনুকরণ—অতি অল্প সংখ্যকই বাঙ্গালা-রচনার অবলম্বন হইতে পারে। এই অত্যল্প সংখ্যকও আবার অল্প লেখকই দেখিয়া থাকেন!

'সজীব' ভাষার ব্যাকরণ প্রস্তুত করিতে হইলে ভাষার বাল্যাবস্থা হইতে অনুসন্ধান আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমানে আসিতে হইবে, পরে তাহা হইতে সাধারণসূত্র সঙ্কলনপূর্ব্বক বর্ত্তমান লেখকগণের সম্মুখে ধরিতে হইবে; এবং ভবিষ্যতে তাহার ঝোঁক কোন্ দিকে তাহাও আভাসে ইঙ্গিতে দেখাইতে হইবে। সঙ্গে সঙ্গে অভিধানরচনারও বিধান করিতে হইবে।

"ব্যাকরণের সূত্রে বদ্ধ হইলেই ভাষা মরিয়া যায়"—এ কথারও কোন যুক্তি বা ভিত্তি নাই। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, সজীব ভাষার অনুচর হচ্ছে ব্যাকরণ; শেষে অনুচর প্রায় সহচর হইয়া দাঁড়ায়। তথাপি মত্তদন্তীর মত ভাষার গতি স্বাধীন ও উদ্দাম থাকিলে ব্যাকরণের সাধ্য কি যে, সরু সরু "সূত্র" তৈরি করিয়া তাহাকে বদ্ধ করে! তবে যখন

গতি মন্থর হইয়া আসে, তখন তাহাকে বাঁধিতে চেষ্টা করিতে পারে; শেষে যখন ভাষা নিতান্ত স্থির হয় বা 'মরে,' তখন ব্যাকরণ তাহাকে একেবারেই 'বাঁধিতে' পারে! এতদিন যে অনুচর ছিল, সে এখন নিতান্ত 'আপনার' হইল—এখনই সে ভাষার প্রকৃত "সাহিত্য" লাভ করিল!

কিন্তু উপমার রজ্জু বেশী টানিলে ছিঁড়িয়া যাইতে পারে। তুলনা ছাড়িয়া স্থূলকথা এই ভাষার চরমদশায় ব্যাকরণই প্রহরীস্বরূপ। মৃত ভাষাকে নাড়া চাড়া করিতে হইলে ব্যাকরণের অনুমতি ছাড়া উপায়ান্তর নাই। ব্যাকরণের সহায়তায় মৃত ভাষারও "সাড়া" পাওয়া যায়।

আর, সকল ভাষারই কি মৃত্যু আছে? "সংস্কৃত" ভাষা অমর ভাষা। হিন্দুধর্ম্মের নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়াকলাপে, রীতিনীতিতে, তন্ত্রমন্ত্রে ইহার সজীবতা এখনও কিছু লক্ষিত হয়। এখনও ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের 'পণ্ডিতে' 'পণ্ডিতে' সংস্কৃতে কথোপকথন চলে; অদ্যাপি সংস্কৃত নাটক প্রণীত ও অভিনীত হইয়া থাকে; আজিও "সংস্কৃত" বক্তা ও শ্রোতা উভয়ই মেলে। যাহা হউক, ইহারও পরিবর্ত্তন যুগে যুগে সংসাধিত হইয়াছে। এই ভাষা কিরূপে সমুদ্ভূত হইয়াছে তাহার সর্ব্ববাদিসম্মত ইতিহাস জানিবার উপায় নাই—অর্থাৎ, উহা কৃত্রিম ব্যাকরণের উপর স্থাপিত,* কি উহা হইতেই ব্যাকরণের উদ্ভব হইয়াছে তাহা ঠিক করা কঠিন। কিন্তু এটা ঠিক যে, সুপ্রতিষ্ঠ বৈয়াকরণ পাণিনির পূর্ব্বেই উহার উন্নতির পরাকাষ্ঠা হইয়াছিল। তথাপি তাঁহার ব্যাকরণই যে এই ভাষার সর্ব্বথা নিয়ামক তাহা নহে। পরবর্ত্তী ব্যাকরণকারেরাও পাণিনি-পরিত্যক্ত অনেক শব্দের ব্যুৎপত্তি ব্যবহার নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই সকল শব্দ পাণিনির পরবর্ত্তী সংস্কৃতসাহিত্যকারগণ পরিবর্ত্তিত আকারে ব্যবহৃত করিয়া গিয়াছেন বলিয়াই ব্যাকরণে নূতন সূত্র দিতে

---

* আজ কাল Esperanto বলিয়া একটা নূতন ভাষা ইয়ুরোপে সার্ব্বজাতিক ভাবে চালাইবার চেষ্টা হইতেছে, এবং তাহার জন্য "কৃত্রিম" ব্যাকরণ রচিত হইয়াছে।

হইয়াছে। তাহা ছাড়া কত শব্দ নিপাতনে সিদ্ধ, কত শত পদের একাধিক 'রূপ' আছে, কত প্রতিপ্রসব, কত বিকল্প, কত আর্ষপ্রয়োগ ইত্যাদি কত-কি আছে, যাহাতে বোঝা যায় যে, ব্যাকরণ ও সাহিত্য প্রথমে সমভাবে বিবাদ করিলেও শেষে সাহিত্যেরই জয় হইয়াছে!

সংস্কৃতের একান্ত পক্ষপাতি-সম্প্রদায় বলেন, "যে সকল পদের হ্রাস-বৃদ্ধির সম্ভাবনা আছে, সে গুলি বর্জ্জন করা উচিত"। পদসমূহের হ্রাস-বৃদ্ধির পরিমাপক কি?—কিছুই নাই। 'যাহা বহুস্থান ও বহুকাল ব্যাপিয়া আছে' তাহা প্রবল বটে, কিন্তু তাহার হ্রাস বা বৃদ্ধি হইবে না কে বলিতে পারে? বিদ্যাসাগরী 'হইবেক' 'যাইবেক' ইত্যাদি পদ ত বহুদিন সাহিত্যে ছিল—এখন কচিৎ কদাচিৎ দেখা যায়। উহাদিগকে কি রাখা সঙ্গত "হইবেক"? যদি বলেন ঐ "ক" প্রাদেশিক বলিয়া পরিত্যক্ত হইতেছে—তাহার উত্তর এই যে 'হইবে' যাইবে' প্রভৃতি পদেও ত পূর্ব্বাঞ্চলের গন্ধ আছে! এই গুলিও 'কাল্পনিক' বা 'স্থির' পদ নয়। যাহা পূর্ব্ব হইতে "আইসে" তাহা এখন "আসে"—যাহা পূর্ব্বে হইয়া "গিয়াছে,"তাহা বর্ত্তমানে প্রায় হইয়া "গেছে"।

এইরূপে দেখা যায়, যাহাকে 'কল্পিত' বা 'স্থির' পদ বলা হয়, তাহা কোন না কোন প্রদেশের "প্রচলিত" এবং ন্যূনাধিক পরিমাণে পরিবর্ত্তনশীল। বর্ত্তমানে ক্রিয়াপদগুলির অধিকাংশই পূর্ব্ববঙ্গের প্রচলিত; অবশ্য, "লিখিত" পদ সর্ব্বথা "কথিত" শব্দের অনুরূপ হয় না। এই গুলি সময়ে রাজধানী কলিকাতা অঞ্চলের প্রাদেশিকতায় পরিবর্ত্তিত হইবার খুব সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে। তাহা ঠেকাইবার জো নাই—এবং ঠেকাইয়া লাভও নাই।

ক্রিয়াপদ ছাড়া, বিশেষ্য বিশেষণ সর্ব্বনাম অব্যয় সম্বোধন, এবং পদান্বয় বাগ্‌ভঙ্গী ইত্যাদিতেও কলিকাতা রাজধানীর প্রাধান্যই সূচিত হয়। যতদিন এই নগরই বঙ্গের রাজধানী থাকিবে ততদিনই ভাষায় ও ভূষায় অন্যান্য প্রদেশ ইহার অনুবর্ত্তন করিবে। যদি উচ্চারণ

সংবলিত অভিধান বাঙ্গলাভাষায় প্রচারিত হয়, তবে তাহা সম্ভবতঃ রাজধানী অঞ্চলের উচ্চারণ লইয়াই বাহির হইবে, এবং সেইরূপ হওয়াই বাঞ্ছনীয়। বাঙ্গলা পদ্যে ত আছেই, বাঙ্গালা গদ্যগ্রন্থে ও প্রবন্ধে, নাটকে ও নভেলে, সাপ্তাহিকে ও মাসিকে সাধুলেখকবর্গ নিরন্তর যে যে সকল কথিত প্রাদেশিক শব্দ ব্যবহার করিতেছেন, তাহাদের প্রচলন বন্ধ না করিয়া, তাহাদের ব্যুৎপত্তি বা অর্থ, ব্যাকরণ বা অভিধানে প্রদান করিবার চেষ্টা হউক। নতুবা ভাষার পুষ্টি সুদূরপরাহত। যাঁহারা বলেন—বরং 'কল্পিত' বা 'বিদেশীয়' পদ ব্যবহার করিব তথাপি প্রাদেশিক পদ ব্যবহার করিব না—তাঁহারা ভ্রান্তি-বিজৃম্ভিত। কারণ, প্রাদেশিক বা দেশজ বলিয়া অগ্রাহ্য করিবার কিছুই নাই। একটি প্রাদেশিক শব্দের মধ্যে জাতীয় অনেক তত্ত্ব নিহিত থাকিতে পারে; অধিকন্তু জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের মূল প্রকৃতি অবধারিত হইলে তাহাদের অনেকেই যে আমাদের সকলেরই নিতান্ত আত্মীয় বলিয়া পরিচিত পরিগৃহীত ও সমাদৃত হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

আমাদের ক্ষুদ্র বিবেচনায়, বাঙ্গালায় 'প্রাকৃত' ও 'সংস্কৃত' অথবা 'কথিত' ও 'লিখিত' এই দুই শ্রেণী পৃথক্ করিয়া সাহিত্যগঠনের আবশ্যকতা নাই। বরং উভয়কে পরস্পর 'বেমালুম' মিশ্রিত করিয়া ভাষাকে পুষ্ট করাই সঙ্গত।

পরিশেষে, আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, একান্ত "সাংস্কৃত্য" অনুরাগ পণ্ডিতেরা কথোপকথনেও 'খেলনা'কে 'ক্রীড়ন দ্রব্য' ও 'দাঁড় করাও' স্থলে 'দণ্ডায়মান কর' ইত্যাদি বিশুদ্ধভাষাপ্রয়োগে বদ্ধপরিকর হইয়াও অসংখ্য স্থলে 'খাঁটি' প্রাদেশিক বাঙ্গালা লিখিয়া ফেলিয়াছেন, এবং এইরূপে অনেক নিরীহ সংস্কৃত পদকেও অকারণে "বিদুরিত" করিতেছেন।

শ্রীবিহারীলাল গোস্বামী।

পল্লীগ্রামে একদিন।

আমাদের নিবাস হুগলি জেলাস্থ—গ্রামে। আমার পিতৃপিতামহাদি ঐ গ্রামেই মানুষ হইয়াছিলেন। তখন গ্রামের অবস্থাও ভাল ছিল। শীর্ণকায়া স্বচ্ছসলিলা নদী রূপার হারের ন্যায় গ্রামখানির কণ্ঠ বেষ্টন করিয়াছিল। নদীতে প্রচুর মৎস্য—উহার জল সুস্বাদু। গ্রামবাসীর কখন জলকষ্ট ছিল না। এখন সে নদী শুকাইয়া গিয়াছে। যেখানে নদী বহিত সেখানে এখন জঙ্গল। রত্নহারা সুন্দরী আভরণ বিহীনা হইলে যেমন হতশ্রী হইয়া পড়ে গ্রামখানিও সেইরূপ নদী বিহনে শ্রীভ্রষ্ট।

সুবৃহৎ গ্রাম। পূর্ব্বে তথায় বহুলোকের বসতি ছিল। ব্রাহ্মণ কায়স্থের সংখ্যাই অধিক। এতদ্ব্যতীত গ্রামপ্রান্তে অনেক বাগ্দী প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীর লোক ও তন্তুবায় প্রভৃতি শিল্পজাতির বসতি ছিল। ব্রাহ্মণ কায়স্থগণের মধ্যে প্রায় সকলেই অবস্থাপন্ন। সকল গৃহেই গৃহদেবতা। বিবিধ বিধানে সকলেই প্রত্যহ স্ব স্ব দেবতার পূজা করিতেন। গ্রামে কয়েকটী শিব ও কালীর মন্দির ছিল। মন্দিরাধিষ্ঠিত দেবদেবীর সেবার কখনও ক্রটি হইত না। গ্রামান্তর হইতে কত লোক কত মানস করিয়া ভক্তিরসার্দ্রচিত্তে দেবদেবীর পূজা দিয়া চরণামৃত লইয়া যাইত। প্রতি অমাবস্যায় ষোড়শোপচারে মায়ের পূজা হইত। সন্ধ্যাকালে মন্দিরগুলি দীপমণ্ডিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিত। অসংখ্য লোক আরতি দর্শনাভিলাষে মন্দির সন্নিধানে সমবেত হইত। আরতির সময় নাগ্‌রার গম্ভীর বাদ্য, শঙ্খধ্বনি, ঘণ্টারব—ইত্যাদি চারিদিক প্লাবিত করিত, গ্রামে এক অব্যক্ত, অভাবনীয় ভক্তিস্রোত প্রবাহিত হইত।

অবস্থাপন্ন কায়স্থগণ বৃহৎ পরিবার প্রতিপালন করিতেন ; এবং সকলেই যথাসম্ভব পরহিত-রত ছিলেন। কয়েক জমিদারের বাস ছিল—তাঁহারা অনেক কাঙ্গালগরীবের পিতামাতাস্বরূপ ছিলেন। তাঁহাদের গৃহে সদাব্রত—সকাল, সন্ধ্যা, দিবারাত্রি তাঁহারা অতিথি অভ্যাগত লইয়াই ব্যস্ত থাকিতেন। প্রতি বৎসর গ্রামে ৮।১০ খানি প্রতিমা হইত, কখন কখন সহর হইতে যাত্রার দল যাইত। সকল গৃহেই আনন্দের উৎস ছুটিত। গরীব দুঃখীরাও জমীদারদিগের নিকট নূতন বস্ত্র, অল্পবিস্তর অর্থসাহায্যাদি পাইয়া আহ্লাদে আটখানা হইয়া বেড়াইত।

আমরা এখন সহরবাসী, সেকালের পল্লীগ্রাম দেখি নাই ; পিতৃ-পিতামহের মুখে তথাকার সুখস্বচ্ছন্দের কথা শুনিয়াছি। অনেক দিনের পর সেই সকল কথা মনে হইতে লাগিল। সাধ হইল একবার আমাদিগের সেই পূর্ব্বপুরুষদিগের স্মৃতি-বিজড়িত পল্লীটুকু দেখিয়া আসিব। আমরা সেস্থান ত্যাগ করিয়াছি—আমাদের ন্যায় আরো অনেকে দেশত্যাগী হইয়াছেন। নানাকারণে তথাকার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছে। এখন সেখানে লোক নাই, আহার নাই, জল নাই। তাহার উপর আবার রোগের পীড়ন। সুতরাং একদিনের জন্য যাইব। রাত্রি কাটান হইবে না—কারণ পল্লীগ্রামের মশকে ম্যালেরিয়া, জলে ওলাউঠা।

এই সেদিনকার কথা বলিতেছি। প্রাতে উঠিয়াই যাত্রা করিলাম। ২।৩ ঘণ্টার রেলপথ ; তাহার পর একক্রোশ হাঁটা পথ বা ঘোড়ার-গাড়ী। সহরে থাকিয়া আমাদের অনেকেরই পায়ে পক্ষাঘাত হইয়া যায়—আমারও তদবস্থা। ষ্টেশনে নামিয়া অনেক বিবেচনার পর গাড়ী করাই সাব্যস্ত হইল। আমি গাড়ীতে উঠিলাম। সহরের ন্যায় সুনির্ম্মিত পথ তথায় নাই—সেখানে কাঁচা রাস্তা। বর্ষাগমে

সে অপ্রশস্ত পথ ভীষণাকার ধারণ করিয়াছে। কর্দ্দমের অবধি নাই—পথ স্থানে স্থানে ধসিয়া যাইতেছে। তাহাতে আবার সেদিন অজস্র বারিবর্ষণ হইতেছিল। গাড়ী কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইবার পরই থামিয়া গেল। আমি তাড়াতাড়ি নামিয়া পড়িলাম। দেখিলাম চাকা কর্দ্দমে বসিয়া গিয়াছে। অনেক কষ্টে তাহার উদ্ধার হইল। কিছু দূর হাঁটিয়া গিয়া পুনরায় গাড়ীতে উঠিলাম; কিন্তু ২।৪ মিনিট অন্তরই এক একবার নামিতে হইল; কারণ সে ভীষণ শকটান্দোলন সহ্য করা আমাদের ন্যায় সহরবাসীর পক্ষে একরূপ অসম্ভব।

পথের চতুস্পার্শ্বস্থ দৃশ্য-মাধুর্য্যে আমি বড় আকৃষ্ট হইলাম। উভয় পার্শ্বে বনপ্রান্ত শস্যশ্যামল প্রশস্ত মাঠ সোনার রঙে রঞ্জিত।—মধ্যে মধ্যে গ্রামের দৃশ্য পরিদৃশ্যমান্। বায়ুহিল্লোলে শস্যরাশি তরঙ্গায়িত হইতেছে; স্থানে স্থানে নাতিদীর্ঘ ঝিল বরষায় পরিপূর্ণ হইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গ তুলিয়া নৃত্য করিতেছে। তীরে সিঞ্চিত-পঙ্কে স্থিরচিত্তে বসিয়া বকপক্ষী শিকারের প্রতীক্ষা করিতেছে।

প্রায় একঘণ্টাকাল এইরূপ দৃশ্যের মধ্য দিয়া গিয়া আমাদের গ্রামের সীমান্তে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। গাড়ীচড়ার সুখ তখন সম্যক্ উপলব্ধি হইয়াছে। দূর হইতেই গাড়ী হইতে নামিয়া পদব্রজে যাইতে লাগিলাম। মনে এক নূতন ভাবের উদয় হইতে লাগিল—আমি যেন তাহাতে অভিভূত হইয়া পড়িলাম। অতীতের স্মৃতিগুলি একে একে হৃদয়ে জাগরিত হইতে লাগিল।

ক্রমে গ্রামমধ্যে প্রবেশ করিলাম। প্রথম দৃশ্যে যাহা দেখিলাম তাহাতে হৃদয় বড় ব্যথিত হইল। সুন্দরীর রত্নহারতুল্য অমন যে নদী—তাহার চিহ্নমাত্র পরিলক্ষিত হয় না। স্থানে স্থানে দরিদ্র পল্লীবাসীরা জলকষ্ট নিবারণের জন্য নদীর খাতে ডোবা কাটিয়া রাখিয়াছে। পথি মধ্যে কয়েকটী সুবৃহৎ অট্টালিকা ও দুই চারিটী

ভগ্ন মন্দির। অট্টালিকায় মনুষ্য নাই, সৌষ্ঠব নাই, মন্দিরে দেবতা নাই। ধীরে ধীরে ব্যথিত হৃদয়ে একটী ভগ্ন অট্টালিকার জঙ্গলপূর্ণ প্রাঙ্গনে আসিয়া দাঁড়াইলাম। দ্বিতল অট্টালিকা। উপরে উঠিব বলিয়া সিঁড়ির নিকট অগ্রসর হইলাম। সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে—গৃহ সকল অর্দ্ধভগ্নাবস্থায় এখনও কালের সহিত যুদ্ধ করিতেছে। হায়! যেখানে লোকজন দাসদাসী অতিথি-অভ্যাগত কত সুখে বিচরণ করিত আজ সেস্থান মনুষ্যকণ্ঠ-হীন—আজ তথায় অহোরাত্র প্রহেলিকাময় মানব জীবনের অপূর্ব্ব রহস্যগাথা ধ্বনিত হইতেছে। দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া আমি তথা হইতে এক ভগ্ন দেবালয় সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। বহুকালের মন্দির সংস্কারাভাবে জীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। প্রাচীন অশ্বত্থ বট তাহার উন্নতচূড়া বেষ্টন করিয়া আছে—বিষধর ফণিণী তাহার নিভৃত-নিকেতনে আশ্রয় লইয়াছে। চারিদিকে চাহিয়া দেখিলাম, মনুষ্যবসতির চিহ্নও নাই, একটা শৃগাল কুক্কুরও দৃষ্টিগোচর হয় না। আমার আতঙ্ক হইল। আপনার হৃৎপিণ্ডের শব্দ আপনি শুনিতে শুনিতে সেস্থান পরিত্যাগ করিলাম।

কিছুদূর আসিয়া বিশ্রামার্থ এক পুষ্করিণীর ভগ্নঘাটে উপবেশন করিলাম। সরোবরে স্নাতক নাই। অনেকক্ষণ পরে এক অশীতিবর্ষীয়া বৃদ্ধা যষ্টিতে ভর দিয়া আসিয়া আমার নিকট বসিয়া পড়িলেন। বুঝিলাম ক্লান্ত হইয়া বৃদ্ধা বসিয়া পড়িয়াছেন। একটু পরে তিনি আমায় পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন এবং জ্ঞাত হইয়া আমায় আশীর্ব্বাদ করিলেন। অতঃপর উভয়ে গৃহাভিমুখে অগ্রসর হইলাম। গমন কালে বৃদ্ধা আত্ম-পরিচয় দিতে লাগিলেন। তখন বুঝিলাম তিনি আমাদেরই এক দূরসম্পর্কীয় জ্ঞাতি। এক্ষণে তাঁহার কেহই নাই। পুত্র পৌত্রাদি তাঁহার সকলই ছিল; কিন্তু দুরন্ত কাল তাঁহার সর্ব্বস্বই কাড়িয়া লইয়াছে। এখন ঐ যষ্টিই তাঁহার একমাত্র অবলম্বন। একটী বৃহৎ

ভগ্ন অট্টালিকার মধ্যে বৃদ্ধা প্রবেশ করিলেন। ঐ অট্টালিকায় বসিয়া এক সময় তাঁহার স্বামী সমগ্র গ্রামবাসীকে লইয়া কত আমোদ প্রমোদ করিয়াছেন! প্রশস্ত দালান যেখানে বৎসর বৎসর মা জগদম্বা আসিতেন; বসনে, ভূষণে, অলঙ্কারে কত সাজে মাকে সাজাইয়া গৃহস্থ ও প্রতিবেশীবর্গ চরিতার্থ হইতেন—আজ সে স্থান শূন্য। গায়কের গীতধ্বনি, বাদ্যকরের বাদ্যরব, ভিক্ষুকগণের জয়োল্লাস, শঙ্খধ্বনি, ঘণ্টারব ইত্যাদি যে স্থান সতত প্লাবিত করিত আজ সেখানে গভীর নীরবতা—দুই চারিটা চামচিকা সকাল সন্ধ্যায় তথায় কিচি মিচি করে—রাত্রিতে কয়েকটা জোনাকী জ্বলে মাত্র। আর কখন কখন ঐ শোকসন্তপ্তা বৃদ্ধা ঐ ভগ্নদালানের সম্মুখে দাঁড়াইয়া মানস নেত্রে বসনভূষণ অলঙ্কার পরিধানা, শোভাসমন্বিতা, পতিতপাবণী জগন্মাতাকে দেখিতে পান—অলক্ষ্যে তাঁহার চক্ষে শতধারা বহিতে থাকে।

বৃদ্ধাকে দেখিয়া ও তাঁহার অবস্থা ভাবিয়া মনে বড় কষ্ট হইল। পথে আর কোথাও অপেক্ষা না করিয়া মনে মনে বিধির নির্ব্বন্ধ, কালের গতি ভাবিতে ভাবিতে আমাদের বাটীর চণ্ডীমণ্ডপের সম্মুখে আসিলাম। সুবৃহৎ চণ্ডীমণ্ডপ; সম্মুখে প্রশস্ত প্রাঙ্গন—চারিদিক চকমিলান। পশ্চাতে অন্দরমহল বা বসতবাড়ী। চণ্ডীমণ্ডপের আর সে পূর্ব্বশ্রী নাই—চাল পর্য্যন্ত খসিয়া পড়িতেছে। বসতবাড়ীর অবস্থা অতি শোচনীয়—দুই এক অংশ ভূমিসাৎ হইয়াছে—অবশিষ্টাংশ পতনোন্মুখ। পুরাতন ইষ্টকস্তূপ ব্যতীত তথায় দেখিবার আর কিছুই নাই। খিড়কীর পথ উন্মুক্ত, তাহা দিয়া বাহিরে আসা যায়; কিন্তু সে পথ এত জঙ্গলপূর্ণ যে তাহাতে প্রবেশ করিতে সাহস হয় না। খিড়কীতে একটী সুন্দর সরোবর ছিল—এখন তাহার চিহ্ন পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়াছে।

আমি আসিয়াছি শুনিয়া দুই চারিজন বৃদ্ধ গ্রামবাসী আমার নিকট

আগমন করিলেন, আমি তাঁহাদের কাহাকেও চিনি না—পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতেও লজ্জা হইল। অবশেষে তাঁহারা আপনারাই পরিচয় দিলেন। কতক বুঝিলাম কতক বুঝিলাম না। একজন প্রবীণ ব্যক্তি আমাদের ভগ্নভিটা ও চণ্ডীমণ্ডপের প্রতি অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া কাতর ভাবে আমায় বলিলেন :—বাবা, সহরের স্বাদ পাইয়া কেমন করিয়া পূর্ব্বপুরুষদিগের ভিটা ত্যাগ করিয়া আছ? বলদেখি, বাস্তুভিটার এ দুর্গতি দেখিয়া তোমার অন্তর কাঁদে কি না? পূর্ব্বে ঐ বৃহৎ অট্টালিকায় লোক ধরিত না; এই চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া তোমার পিতামহ কৃতাঞ্জলীপুটে মহামায়ার সমক্ষে তোমাদের মঙ্গল কামনা করিতেন। আহা! সে যেন সেদিনকার কথা! কায়মনোবাক্যে তিনি মহামায়ার নিকট যে কামনা করিয়াছিলেন তাহা পূর্ণ হইয়াছিল। তিনি তোমাদের সকলকেই রাখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু আজ তোমরা থাকিতে তোমাদের পিতামহের আদরের জন্মস্থান, সাধের বাড়ী, প্রিয়তম চণ্ডীমণ্ডপের এ দুরবস্থা কেন? তুমি হয়ত বলিবে, পল্লীগ্রামের স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছে, কেমন করিয়া আসা যাওয়া চলে। আমি বলি সেটী ভুল। লোক না থাকিলেই দেশের স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়। আবার তোমরা দশঘর আসিয়া দেশে বাস করিলে দেশের অবস্থা ফিরিবে। সুতরাং আমার অনুরোধ এই, পূর্ব্বপুরুষদিগের মনে কষ্ট দিও না। আবার দেশে আসিয়া বাস করিয়া দোল দুর্গোৎসব কর।”

বৃদ্ধের কথা আমার প্রাণে লাগিল। যতক্ষণ সেখানে ছিলাম মনে মনে ঐ কথারই আলোচনা করিতে লাগিলাম। তখন মনে পড়িল কি জন্য মহাত্মা দ্বারকানাথ মিত্র শেষপীড়াকালীন রাজধানীর রাজসম্মান এবং বৃহৎ নগরীর বিরাট সমাজের বিপুল যত্ন হইতে আপনাকে বঞ্চিত করিয়া অপ্রথিতনামা সেই অতি ক্ষুদ্র কিন্তু বড় আদরের জন্মস্থান আগুণ্সী গ্রামে গিয়া পিতৃ-পিতামহের চিতাভস্মে আপন নশ্বর দেহের

ভষ্মাবশেষ মিশাইয়া ছিলেন। আমি বুঝিতে পারিলাম নিবাসস্থানের প্রতি নির্ম্মম হইয়া আমরা পূর্ব্বপুরুষদিগের প্রতি অবিচার করিতেছি।

যে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ আমায় পূর্ব্বোক্তরূপে উপদেশ দিয়াছিলেন তিনি আমায় আহার করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। আমি গিয়াছি জানিয়া ইতিপূর্ব্বেই তিনি আমার আহারের বন্দোবস্ত করিয়া আসিয়া ছিলেন। আমার তখন ক্ষুধাতৃষ্ণা বিশেষ কিছুই হয় নাই—দেশের দুর্গতি দেখিয়া আমি বড় ভাবনাক্লিষ্ট হইয়াছিলাম। তথাপি ব্রাহ্মণের অনুরোধ উপেক্ষা করিতে সাহস হইল না। তাঁহার বাটীতে প্রসাদ পাওয়া সৌভাগ্যের কথা। সুতরাং তাঁহার সমভিব্যাহারে চলিলাম। বেলা দুই প্রহর অতীত—আকাশের আর দুর্য্যোগ নাই। বিস্তীর্ণ মাঠ রৌদ্রে তপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। আমাদের বহির্ব্বাটীর বৃহৎ পুষ্করিণীর সংলগ্ন আম্রকানন মধ্যে ঘুঘু ডাকিতেছে। দুই চারিজন কৃষক লাঙ্গল লইয়া, কদাচিৎ কোন গোপালক গরু লইয়া যাইতেছে। প্রথম গিয়া গ্রামখানিকে যত নির্জ্জীব দেখিয়াছিলাম এখন তদপেক্ষা স্ফূর্ত্তিযুক্ত দেখিলাম।

আমাদের বাটী হইতে প্রায় একপোয়া দূরে ব্রাহ্মণের বাড়ী, অবশ্য আমাকে পদব্রজেই যাইতে হইল। অশ্বযানের কি দুরবস্থা তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। আর এ পল্লীগ্রামের মেঠো পথে বৈদ্যুতিক গাড়ীই বা কোথায় পাইব? সহর হইলে এতখানি পথ পদব্রজে যাওয়া অনেকের পক্ষে পঙ্গুর গিরিলঙ্ঘনতুল্য। কিন্তু পল্লীবাসীর পক্ষে এ পথ অতি সামান্য। এখানে বৈদ্যুতিক গাড়ী নাই বটে, কিন্তু এক অপূর্ব্ব বৈদ্যুতিক শক্তি আছে। সর্ব্বাভরণভূষিতা প্রকৃতিরই সেই বৈদ্যুতিক শক্তি। পল্লীবাসিগণ সেই শক্তির সাহায্যে পদব্রজে ভ্রমণ করিয়া বৈদ্যুতিক যানারোহণ অপেক্ষা অধিকতর সুখ অনুভব করেন। আমি পল্লীবাসী না হইলেও তৎকালে পল্লীবাসীর মানসিক অবস্থায়

উপস্থিত হইয়া প্রকৃতি শক্তির অধিকারী হইয়াছিলাম। সেই জন্য এত ভ্রমণেও ক্লান্তি আসিল না।

ব্রাহ্মণের বাড়াতে আসিয়া বহির্ব্বাটীর দাওয়ার উপর একখানি মাদুরে উপবেশন করিলাম। বাড়ীতে কয়েকখানি মেটে ঘর আছে। ইষ্টকনির্ম্মিত একটী ক্ষুদ্র গৃহে গৃহদেবতা থাকেন। ব্রাহ্মণের অবস্থা স্বচ্ছল নহে। তথাপি গৃহদেবতাকে নিজেরা যেরূপ ঘরে থাকেন সেরূপ ঘরে রাখিতে পারেন নাই, সেই জন্য কষ্ট করিয়াও একটী পাকাঘর করিয়া দিয়াছেন। যাহা হউক দেবতার অনুগ্রহে এই জনহীন পল্লীগ্রামে থাকিয়াও তিনি ও তাঁহার পরিবারবর্গ বেশ মনের সুখে দিনাতিপাত করিতেছেন।

বাড়ীটী বেশ পরিষ্কার—চারিদিক প্রাচীর বেষ্টিত। সম্মুখে এক খণ্ড প্রশস্তভূমি, তাহার এক দিকে বেল্ লেবু পেয়ারা প্রভৃতি বৃক্ষ, আর একদিকে কপি কলাইশুঁটি, বেগুন প্রভৃতির ছোট ছোট ক্ষেত্র। বাড়ীর পিছনে খিড়কীর পুষ্করিণী। খিড়কীর পথের এক পার্শ্বে মাচার উপর পুঁই শাক, লাউশাক, কুমড়াশাক ইত্যাদি ; অপর পার্শ্বে নটিয়া, পালম প্রভৃতির ক্ষেত্র। পুষ্করিণীতে প্রচুর মৎস্য, গৃহস্থকে কখন মৎস্য কিনিয়া খাইতে হয় না। পুষ্করিণীর চারিদিকে নারিকেল ও তালবৃক্ষ, পরপারে পাঁচ ছয় বিঘা প্রমাণ বাগান। বাগানে আম, কাঁঠাল, লিচু প্রভৃতি বৃক্ষ ; একদিকে একটা বাঁশঝাড়—আর একদিকে কতকগুলা কলাগাছ। বাড়ীর পশ্চিমদিকে একটী ছোট ডোবা—ডোবায় প্রচুর কই ও মাগুর মাছ। ডোবার একদিকে পথ, অপর দিকে গাছ—সজিনা গাছ, আমড়া গাছ, চালতা গাছ, তেঁতুল গাছ ইত্যাদি। সে বাড়ীতে রীতিমত ফুলের বাগান নাই। কিন্তু বহিবাটীর বহির্দ্বারের উপরপার্শ্বে কতকগুলি শেফালিকা, জবা ও চম্পকাদি পুষ্প বৃক্ষ। ঐ সকল পুষ্প গৃহস্থের নিত্য পূজায় ব্যবহৃত হয়।

বাড়ীটী দেখিয়া আমার বড় আহ্লাদ হইল। পথে আরো দুই একটী ঐরূপ বাড়ী দেখিয়া আসিয়াছিলাম। গ্রাম প্রায় জনশূন্য হইলেও এই সকল দরিদ্র গৃহস্থ কেমন সুখে দিনপাত করিতেছে। অনেক গৃহেই এইরূপ গাছে ফল, মাচায় শাক, পুকুরে মাছ ইত্যাদি পাওয়া যায়—ওসকল কিনিয়া খাইতে হয় না। বাটীর স্ত্রীলোকেরা স্বয়ং এগুলির তত্ত্বাবধান করেন। এবং গৃহজাত তরকারীর দ্বারা উৎকৃষ্ট ও উপাদেয় ব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত করিয়া গৃহস্থকে ভোজন করাইয়া পরম পরিতোষ লাভ করেন। সুন্দর গৃহস্থালির গুণে গৃহস্থকে কখন পল্লীত্যাগী সহরবিলাসীদিগের ন্যায় শুষ্ক, পুরাতন, পচা বা কীট-ভুক্ত তরকারী খাইয়া পীড়া বা রুচিবিকারগ্রস্ত হইতে হয় না এবং ভোজনার্থ নিত্য ব্যয়বাহুল্যও স্বীকার করিতে হয় না।

দেখিতে দেখিতে বেলা অধিক হইয়া পড়িল, আমি তখনও আহার করি নাই—চারিদিক দেখিয়া বেড়াইতেছি। ক্রমে জানিতে পারিলাম ব্রাহ্মণ সপরিবারে তখনও অভুক্ত আছেন। আমি তাঁহার স্বগ্রামবাসী, অতিথি, সুতরাং আমায় আহার না করাইয়া তিনি ও তাঁহার পরিবারবর্গ কেমন করিয়া আহার করিবেন? পল্লীগ্রামে এখনও যে এরূপ আতিথেয়তা আছে তাহা আমি জানিতাম না। আমরা সহরবাসী হইয়া আতিথ্যকর্ম্মে জলাঞ্জলি দিতেছি। আমরা "রুটিন্" দুরস্ত করিয়া ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে সঙ্গে চলি; কোন কাজের একটু এদিক ওদিক হইলে ত্রিলোক আলোড়িত করি; আহার প্রস্তুতের পাঁচ মিনিট বিলম্বে ব্রহ্মাণ্ড শূন্য দেখি—উন্মত্ত হইয়া সমস্ত পরিবারের অবমাননা করি। আহারীয় দ্রব্য পদদলিত করিয়া, তৈজসাদি ভাঙ্গিয়া, সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা স্নেহময়ী বনিতার চক্ষের জল ফেলাইয়া ত্বরিতপদে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হই। নিমন্ত্রিতই আসুন, আর অতিথি অভ্যাগতই আসুন, আমাদের নিজের আহারের সময়ের একটু অগ্রপশ্চাৎ হইলেই ব্রহ্মাণ্ডের বন্ধন শিথিল হইয়া পড়ে। এই ক্ষুদ্র পল্লীগ্রামে দরিদ্রের গৃহে আতিথ্যধর্ম্মের যে পবিত্র স্রোত এখনও প্রবাহিত তাহার কণিকামাত্র আমাদিগকে স্পর্শ করিলে আমরা আমাদের পুণ্যাত্মা পূর্ব্বপুরুষদিগের পরিচয় দিবার উপযুক্ত হই।

আমি আর ক্ষণবিলম্ব না করিয়া আহারার্থ গমন করিলাম।

অনেক ঘুরিয়া ফিরিয়া তখন ক্ষুধারও উদ্রেক হইয়াছিল। ভিতর বাড়ীর একটী বড় ঘরের সম্মুখস্থ প্রশস্ত দাওয়ায় আমার আহারের স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। সে স্থানটুকু বেশ পরিষ্কার। মাটির হইলেও যেন ঝক ঝক করিতেছে, দেখিলে বসিতে ইচ্ছা করে। সম্মুখস্থ প্রাঙ্গনটুকুও বেশ পরিচ্ছন্ন। তাহার একদিকে কতকগুলি ছোট বড় ধানের মরাই, অপর দিকে ঢেঁকিশালা। বাসগৃহের ন্যায় গোশালাও পরিষ্কার ও গন্ধহীন—তথায় মশাটী পর্য্যন্ত আছে বলিয়া বোধ হয় না। দুইটী গাভী রহিয়াছে। ব্রাহ্মণ এই বৃদ্ধ বয়সে এখনও স্বহস্তে গাভীর সেবা করেন। গাভীদ্বয় বেশ হৃষ্ট পুষ্ট—দেখিয়া বুঝিলাম ব্রাহ্মণ ইহাদের অতি যত্নপূর্ব্বক পালন করিয়া থাকেন।

আমি আহারে বসিলাম। ব্রাহ্মণী দীর্ঘ অবগুণ্ঠনে আবৃতা হইয়া, সঙ্কুচিত ভাবে, ধীরে ধীরে আমায় অন্নব্যঞ্জনাদি দিয়া গেলেন। তিনি আমার ঠাকুরমাতার বয়ঃপ্রাপ্তা তথাপি এখনও এত লজ্জাশীলা যে তাঁহাকে দেখিলে অসূর্য্যম্পশ্যা হিন্দুরমণীর প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায়।

আহারকালে ব্রাহ্মণ ও গ্রামস্থ আরো দুই একজন প্রবীণ ব্যক্তি আমার নিকট বসিয়া যত্নপূর্ব্বক আমায় আহার করাইতে লাগিলেন। চপ্, কাট্‌লেট, কোরমা, কোপ্তা, punch, pudding—এ সকল কিছুই ছিল না। মোগল, পাঠান, ফরাসী, জর্ম্মাণ,—কাহারও অনুকরণে রন্ধন করা হয় নাই। আহারের উপকরণ অতি সামান্য, কিন্তু বড় উপাদেয়। সুসিদ্ধ অন্ন,—সুন্দর ডাল ও কয়েকপ্রকার ব্যঞ্জন, সুমিষ্ট মাছের ঝোল ও অম্ল, সর্ব্বশেষে একটু সুস্বাদু দুগ্ধ ও চিনি। অন্নব্যঞ্জনাদি পল্লীরমণীর প্রাচীন পাকপ্রণালীমতে প্রস্তুত। আমি খাইয়া পরিতুষ্ট হইলাম। আহার করিয়া এমন তৃপ্তিলাভ অনেক কাল আমার ভাগ্যে ঘটে নাই। সহরে আমরা বেতনভোগী পাচক পাচিকার হস্তেই খাইয়া থাকি। তাহারা কায়িক পরিশ্রমে পটু হইলেও এরূপ রন্ধন করিতে অসমর্থ। শুদ্ধ ঘি মশলার শ্রাদ্ধ করিতে পারিলে রন্ধন করা হয় না। রন্ধন বড় উচ্চ অঙ্গের কার্য্য। রন্ধনকালে রন্ধনকারীর শারীরিক বল অপেক্ষা মানসিক বলের অধিক প্রয়োজন। ধর্ম্মকার্য্যে যেমন একাগ্রতা ও আন্তরিকতা আবশ্যক রন্ধনকার্য্যেও সেইরূপ প্রয়োজন। কোনরূপ মানসিক উদ্বেগ থাকিলে ভোক্তার যেরূপ

খাইয়া তৃপ্তি হয় না, সেইরূপ রন্ধনকারীর মনপ্রাণ তাহার কার্য্যে নিবদ্ধ না থাকিলে সুরন্ধনও কখন সম্ভবে না। অর্থ দিয়া আমরা লোক সংগ্রহ করিতে পারি, কিন্তু লোকের মন পাই কিরূপে? সেই নিমিত্ত বেতনভোগী পাচক পাচিকার হস্তে খাইয়া আমরা তৃপ্ত হইতে পারি না। পরিবারভুক্ত স্ত্রীলোকগণ অকৃত্রিম যত্ন ও স্নেহসহকারে রন্ধন কার্য্যে প্রবৃত্ত হন এবং পাকান্তে ভোক্তার পরিতুষ্টির জন্য একান্ত মনে জগদীশ্বরকে ডাকেন। রন্ধন কার্য্য তাঁহাদের নিকট একটী ধর্ম্মকার্য্য —সুতরাং তাঁহাদের অপার্থিব স্নেহজাত দ্রব্যাদি খাইয়া ভোক্তা অপরিসীম তৃপ্তিলাভ করে। আমার এক বিশেষ বন্ধু আমায় বলিয়াছেন যে তাঁহার বাটীতে তাঁহার জননীও রন্ধন করেন, পাচিকাও রন্ধন করেন; কিন্তু কোন্ ব্যঞ্জন কে রন্ধন করিয়াছেন তাহা তিনি আহার করিয়া বলিতে পারেন। কারণ তাঁহার জননীর ন্যায় সুমিষ্ট রন্ধন বামুনদিদির দ্বারা হয় না। সে মিষ্টত্বটুকু যে জননীর স্নেহ হইতে আসে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। রন্ধনকালে জননীর ও বেতনভোগী পাচিকার মানসিক অবস্থাই এবম্বিধ তারতম্যের কারণ। জননী যে ভাবে যে প্রাণে সন্তানকে স্তন্যদান করেন এবং সেই স্তন্য পানে সন্তানের যে শক্তিলাভ হয়, জননীর অভাবে ধাত্রী কি সেইভাবে, সেই প্রাণে শিশুকে স্তন্যদান করিতে পারে; না, তাহার স্তন্যপানে শিশু মাতৃস্তন্য পানের ফল সম্যক লাভ করিতে সমর্থ হয়? সেইজন্য বলিতেছি যে রন্ধনকার্য্য বেতনভোগী পাচক পাচিকার দ্বারা সম্পন্ন হইলে আহারের সুখ ও মধুরতা আমরা সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারিব না। পল্লীগ্রামে এখনও রন্ধনের সমাদর আছে। অবস্থাপন্নদিগের মধ্যেও বাটীর স্ত্রীলোকেরা রন্ধনকার্য্য সম্পন্ন বা পরিদর্শন করিয়া থাকেন। শিক্ষাদোষে, কালের বশে সহরে থাকিয়া আমাদের রমণীরা রন্ধনকার্য্য একরূপ ভুলিয়া যাইতেছেন, সামান্য দুধটুকু গরম করিতে গিয়া তাঁহারা হস্ত পদাদি দগ্ধ করিয়া ফেলেন—ভাতের ফেণ গালিবার কথা শুনিলে শিহরিয়া উঠেন। বড় দুঃখের কথা। রন্ধনশিল্প উঠিয়া গেলে আমাদের ধর্ম্মের একটী অঙ্গ খসিয়া পড়িবে।

আহারান্তে বিশ্রামার্থ আমি বহির্ব্বাটীতে আসিয়া বসিলাম। একে একে গ্রামের কয়েকটী লোক আসিয়া আমার নিকট বসিলেন।

নানারূপ গল্পগুজবে আমাদের সময় অতিবাহিত হইতে লাগিল। আমায় দেখিয়া সকলেই বড় আনন্দিত। একবাক্যে সকলেই আমায় বাস্তুভিটার সংস্কার করিয়া আবার দেশের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিবার জন্য পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিলেন। স্বগ্রামের অবস্থা দেখিয়া এবং গ্রামবাসীদিগের সহিত আলাপ করিয়া আমার মনে হইল যে নিবাসস্থান ত্যাগ করিয়া আমরা ভাল করি নাই। আবাস থাকিতে কে কোথায় প্রবাসী হইয়া থাকে? সহর আমাদিগের পক্ষে প্রবাস। সহরে আমরা বিলাস-বৈভবের ক্রোড়ে লালিত। যেখানে বিলাসভোগেচ্ছা প্রবল, অর্থচিন্তা ভয়ঙ্কর, প্রলোভন বিস্তারিত, অশান্তি প্রবাহিত, সেখানে কখন প্রকৃত সুখ ও স্বচ্ছন্দ থাকিতে পারে না। সহরে ঐ সকলই আছে—এই জন্য তথায় সুখ শান্তির এত অভাব। সহরে থাকিয়া আমাদিগের সরল, সুন্দর, শান্তিময় পল্লী-জীবনের স্বচ্ছন্দটুকু কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে। পল্লীগ্রামে একদিন আসিয়া আমি তাহা বেশ বুঝিতে পারিলাম। প্রত্যাগমনকালে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়া আসিলাম আবার যাহাতে বাস্তুভিটায় সন্ধ্যা জ্বলে প্রাণপণে তাহার চেষ্টা করিব।

শ্রীহরনাথ বসু।

আমাদের ঐতিহাসিক ভাণ্ডার।

৺ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর দোলমঞ্চ।

এই দোলমঞ্চটীর সম্বন্ধে কোনও বিষয় লিপিবদ্ধ করিবার পূর্ব্বে ইহার স্থাপয়িতার বিষয়ে দুই চারিটী কথা বলা বিশেষ প্রয়োজন বলিয়া বোধ করিতেছি। যাঁহারা ৺ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর মহোদয়ের জীবনবৃত্তান্ত অবগত আছেন তাঁহাদের নিকট এই মহাত্মার নাম নিতান্ত অপরিচিত বলিয়া বোধ হইবে না। কবিবর ভারতচন্দ্র

যখন কৈশোরে দারিদ্রের কঠোর পীড়নে ক্লিষ্ট ও পিষ্ট হইতেছিলেন তখন এই মহানুভবই স্বীয় স্বভাবসিদ্ধ মনস্বিতা ও ঔদার্য্য সহকারে তাঁহাকে চন্দননগরে স্বীয় বাসভবনে আশ্রয় দান করিয়া তাঁহার ও বঙ্গভাষার প্রভূত কল্যাণ সাধন করেন। কৃষ্ণনগরের মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সহিত ইন্দ্রনারায়ণের বিশেষ সৌহার্দ্দ ও ঘনিষ্ঠতা ছিল। এমন কি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র মধ্যে মধ্যে ইন্দ্রনারায়ণের নিকট টাকা কর্জ্জ লইতেন ও তদুপলক্ষে তিনি চন্দননগরে শুভাগমন করিতেন। মহারাজের সহিত এতাদৃশ আত্মীয়তা থাকায় তিনি আশ্রিত ভারতচন্দ্রকে তাঁহার সহিত সহজেই পরিচিত করিয়া দেন। পরে কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় ভারতচন্দ্র কিরূপ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন তাহা বঙ্গসাহিত্যসেবী মাত্রেই অবগত আছেন। এবং তাহা এই প্রবন্ধের বিষয়ীভূতও নহে।

আমাদের আলোচ্য দোলমঞ্চ ব্যতীত ইঁহার বিস্তর কীর্ত্তি এখনও বিদ্যমান আছে। ফরাসী চন্দন নগরের Quai Dupleix নামক মনোরম স্থানটী ইহাঁরই প্রদত্ত অর্থে নির্ম্মিত। তথায় চৌধুরী-ঘাট বলিয়া যে বিস্তীর্ণ সোপানশ্রেণী গঙ্গাবক্ষে অদ্যাবধি শোভা পাইতেছে তাহাও তাঁহারই অর্থে নির্ম্মিত। ফরাসী গবর্ণমেণ্টের অধীনে তিনি দেওয়ানের কার্য্য করিতেন। বলা বাহুল্য সেই সময়ে ভারতবর্ষে ফরাসীদের অবস্থা এখনকার মত হীনপ্রভ ছিল না। বিখ্যাত বীরপুরুষ Dupleix তখন ফরাসীভারতের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। সুতরাং তখন ফরাসী গবর্ণমেণ্টের দেওয়ানের পদ যে কিরূপ সম্মানার্হ ছিল তাহা সহজেই অনুমেয়। ফরাসী গবর্ণমেণ্টের Dupleix মহোদয় ইন্দ্রনারায়ণকে যে পত্রাদি লিখিতেন সেগুলি তাঁহার বংশধরগণ অদ্যাপি যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করিয়া আসিতেছেন।

এই প্রবন্ধের পুরোভাগে যে দোলমঞ্চটীর বিষয় কথিত হইয়াছে তাহা সন ১১৪৬ সালে নির্ম্মিত হইয়াছিল। মন্দিরটীর সম্মুখস্থ এক-

খানি প্রস্তর ফলকের উপর ইহার নির্ম্মাণের তারিখ উৎকীর্ণ আছে। প্রস্তর ফলকখানি এইরূপ :—

শকাব্দা ১৬৬১।৮	
হরে কৃষ্ণ	হরে কৃষ্ণ
কৃষ্ণ কৃষ্ণ	হরে হরে
হরে রাম	হরে রাম
রাম রাম	হরে হরে
সন ১১৪৬ সাল	

সুতরাং এই প্রস্তর ফলক দৃষ্টে জানা যায় যে এই মন্দিরটী ১৬৫ বৎসর পূর্ব্বে নির্ম্মিত হইয়াছে। নির্ম্মিত হইবার পরে আর কেহ কখনও এই মন্দিরটীতে হস্তার্পণ করে নাই।* কিন্তু এখনও পর্য্যন্ত ইহা কালের প্রবল অত্যাচার সহ্য করিয়াও প্রায় অটুট অবস্থায় রহিয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইহার সামান্য দুই একটী স্থান ফাটিয়াছে মাত্র। তবে মন্দিরপ্রাঙ্গনে পুরোহিত পাচক প্রভৃতির নিমিত্ত যে বাসগৃহ ছিল তাহা ভূমিসাৎ হইয়াছে। ইন্দ্রনারায়ণের বংশধরগণ আজ কাল নিঃস্ব অবস্থায় কালযাপন করিতেছেন, মন্দিরটী সংস্কার করিবার সামর্থ্য তাঁহাদের আর নাই। মন্দিরসম্মুখস্থ প্রাঙ্গন ও চতুর্দ্দিকের মাঠ বিজন অরণ্যে পরিপূর্ণ হইয়াছে। মন্দিরটী আজ কাল শূন্য অবস্থায় পতিত রহিয়াছে। প্রায় ২০।২৫ বৎসর পূর্ব্বে ইহার ভিতর জনৈক ভট্টাচার্য্য ব্রাহ্মণ একটী টোল স্থাপিত করিয়া অধ্যাপনা করিতেন—কিন্তু আজ কাল তাহাও উঠিয়া গিয়াছে। পরিত্যক্ত স্থান বলিয়া স্থানটী বদমায়েসদিগের আবাসভূমি হইয়া উঠিয়াছে ও মধ্যে মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় জনৈক ফিরিঙ্গি মুর্দ্দাফরাস মন্দিরের ভিতর বসিয়া কফিন প্রস্তুত করে।

একশত বৎসর পূর্ব্বে এখানে দোলযাত্রা উপলক্ষে মহাসমারোহ হইত। মন্দিরের সম্মুখেই বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণে বিস্তর জনতা হইত। তুমুল বাদ্যোদ্যোম ও সমবেত যাত্রীগণের কলরবে দিঙ্মণ্ডল মুখরিত হইয়া উঠিত। দূরবর্ত্তী স্থান সমূহ হইতে ব্যবসায়ীগণ আসিয়া উৎসব-ক্ষেত্রের শোভা বর্দ্ধন করিত।

মন্দিরটী দেখিলে উহার নির্ম্মাতাগণের প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। ইহার নির্ম্মাণকৌশল এতই সুন্দর যে দেখিলে সহজেই উপলব্ধি হয় যে প্রচণ্ড বলশালী ঝটিকার বেগ অপ্রতিহতভাবে সহ্য করিবার জন্যই যেন ইহা নির্ম্মিত হইয়াছে।

ইহার ছাদ এইরূপভাবে নির্ম্মিত যে বৃষ্টির জল তিলার্দ্ধের জন্যও তাহার উপর দাঁড়াইতে পারে না। বোধ হয় এই কারণেই ইহা এতকাল ধরিয়া বিনা সংস্কারে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। মন্দিরটীর পশ্চাদ্ভাগে 'নন্দদুলাল' নামে এক অতি বৃহৎ সরোবর বিরাজিত। মন্দিরটীর সঙ্গে সঙ্গে ইহাও খনন করা হয়—এই সরোবরও নানাপ্রকার জলজ শৈবালে আজ কাল পরিপূর্ণ। ইহার চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী জঙ্গল এতই ভয়ানক যে দিবসেও কেহ ইহার নিকট যাইতে সাহসী হয় না। ইহার জলকর প্রায় ১০ বিঘা হইবে। মন্দিরটীর উত্তরাংশের দেউলের প্রায় অর্দ্ধেক এই সরোবরে প্রোথিত রহিয়াছে, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে সে স্থানের একখানি ইষ্টকও স্থানচ্যুত হয় নাই। বিগত ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ভীষণ ভূমিকম্পে ইহার কিছুই ক্ষতি হয় নাই।

ইহার কারুকার্য্যও অতি সুন্দর। মন্দিরের গাত্রে নানা প্রকার লতা পুষ্প ও দেবদেবীর প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত করা আছে। সেগুলি এত সুন্দর যে দেখিলে প্রকৃত বলিয়া ভ্রম জন্মে। তাহাদের বর্ণ এখনও এত উজ্জ্বল যে দেখিলে বোধ হয় যেন দুই চারি দিন পূর্ব্বে কোনও নিপুণ চিত্রকর তাহাদের উপর নূতন করিয়া রং ফলাইয়াছে।

মন্দিরটীর গঠন বাঙ্গালাদেশের সাধারণ মন্দিরের গঠন হইতে কিছু বিভিন্ন। ইহা দৈর্ঘ্যে প্রায় দুই শত হাত ও প্রস্থে প্রায় চল্লিশ হাত হইবে। প্রায় তিন হাত উচ্চ একটী ভিত্তির উপর মন্দিরটী স্থাপিত রহিয়াছে। ইহাতে কড়িকাঠ বা বরগার সম্পর্ক নাই। এতাদৃশ বৃহৎ মন্দিরের ছাদ একটী খিলানের দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে; ঈদৃশ বৃহৎ

খিলান তৎকালীন রাজমিস্ত্রীর দ্বারা যে কি প্রকারে নির্ম্মিত হইয়াছিল তাহা স্থির করা দুঃসাধ্য।

মন্দিরের অভ্যন্তরে যে বিগ্রহ অধিষ্ঠিত ছিলেন তাঁহার নাম নন্দ-দুলাল। এইরূপ কিম্বদন্তী যে তিনি মৃত্তিকার গর্ভ হইতে উত্তোলিত হইয়াছিলেন। বিগ্রহটী এক্ষণে আর নাই।

মন্দিরটীর দিকে দৃষ্টি স্থাপন করিলে দর্শকের হৃদয় স্বতঃই এক উদাসভাবে সমাচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। যে স্থানে পূর্ব্বে দেবতার প্রতিমূর্ত্তি অধিষ্ঠিত ছিল আজ সেই স্থান সর্পজাতির আবাসভূমি হইয়াছে। দিবসেও কেহ উহার ভিতরে প্রবেশ করিতে সাহসী হয় না। সায়াহ্নে মধুর মঙ্গল আরতির পরিবর্ত্তে আজকাল তথায় আরণ্য কপোতের হৃদয়ভেদী কণ্ঠস্বর শ্রুত হইয়া থাকে। পূর্ব্বে যে স্থান ব্রাহ্মণ কণ্ঠনিসৃত স্তোত্র মুখরিত ছিল অধুনা তথায় বায়স কুলের কর্কশ রব কর্ণেন্দ্রিয়ের বিরক্তি উৎপাদন করিয়া থাকে। মন্দির প্রাঙ্গন, যথায় পূর্ব্বে একফোঁটা সিন্দুর পড়িলে কুড়াইয়া লইতে পারা যাইত তথায়, আজকাল বিজন অরণ্যসমাকুল হইয়া রহিয়াছে। সে স্থানটী এতই নিস্তব্ধ যে তথায় উপনীত হইবামাত্র অতি লঘুচেতা ব্যক্তিগনের মনেও এক উদারভাবের আবির্ভাব হইয়া থাকে। ইহার পূর্ব্ব-গৌরব অন্তর্হিত হইয়াছে সত্য কিন্তু এই ভগ্নস্তুপের সমক্ষে দণ্ডায়মান হইলে ইহার স্থাপয়িতার বিগত সম্পদের কথা যখন স্মরণ হয় তখন মানুষের জীবন ও তাহার কীর্ত্তির ক্ষণভঙ্গুরতা জীবন্ত অক্ষরে হৃদয়ে প্রতিপন্ন হয়।

এই প্রবন্ধ লেখকের সহিত এই মন্দির সম্বন্ধে চন্দননগরের গবর্ণর সাহেব Monsieu Bernard Chevalier de la Legiond Honneurএর সহিত কথোপকথন হইয়াছিল। তিনি এই মন্দিরটী দেখিয়া বিশেষ প্রীতিলাভ করেন। তাঁহার পত্নী স্বহস্তে ইহার একখানি তৈলচিত্র অঙ্কিত করিয়া লইয়া তাহা ফ্রান্সে পাঠাইয়া দিয়াছেন। Governor বাহাদুর বলিলেন যে তিনি অনেক দেশ ভ্রমণ করিয়াছেন কিন্তু ঈদৃশ chaste style of architecture কুত্রাপি তাঁহার নয়নগোচর হয় নাই। তিনি আশ্বাস দিয়াছেন ইহার জীর্ণ সংস্কার বিষয়ে তিনি মনোযোগ করিবেন।

শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়।

সেয়ার সাতা ।

পত্র ।

বনক্ষেত্র । শিমলাশৈল,
শনিবার ১৮৯৮ ।

সৃষ্টি প্রলয়ের তত্ত্ব,
লয়ে সদা আছ মত্ত,
দৃষ্টি শুধু আকাশে ফিরিছে,
গ্রহ তারকার পথে
যাইতেছ মনোরথে,
ছুটিছ উল্কার পিছে পিছে ;
হাঁকায়ে দুচারি জোড়া
তাজা পক্ষিরাজ ঘোড়া,
কল্পনা গগন-ভেদিনী
তোমারে করিয়া সঙ্গী
দেশ কাল যায় লঙ্ঘি
কোথা পড়ে থাকে এ মেদিনী ?
সেই তুমি ব্যোমচারী,
আকাশ-রবিরে ছাড়ি
ধরার রবিরে কর মনে,
ছাড়িয়া নক্ষত্র গ্রহ
একি আজ অনুগ্রহ
জ্যোতিহীন মর্ত্ত্যবাসী জনে !
ভুলেছ ভুলেছ কক্ষ
দূরবীণ ভ্রষ্টলক্ষ্য
কোথা হতে কোথায় পতন !
ত্যজি দীপ্ত ছায়া পথে
পড়িয়াছ কায়া-পথে,
মেদ মাংস মজ্জা নিকেতন !
বিধি বড় অনুকূল,
মাঝে মাঝে হয় ভুল,
ভুল থাক্ জন্ম জন্ম বেঁচে !—
তবুত ক্ষণেক তরে
ধূলিময় খেলা ঘরে
মাঝে মাঝে দেখা দাও কেঁচে !

তুমি অদ্য কাশীবাসী,
সম্প্রতি লয়েছ আসি
বাবা ভোলানাথের শরণ ;
দিব্য নেশা জমে ওঠে
দু'বেলা প্রসাদ জোটে,
বিধিমতে ধূম্রোপকরণ !
জেগে উঠে মহানন্দ
খুলে যায় ছন্দোবন্ধ,
ছুটে যায় পেন্সিল উদ্দাম,
পরিপূর্ণ ভাব ভরে
লেফাফা ফাটিয়া পড়ে,
বেড়ে যায় ইষ্টাম্পের দাম !
আমার সে কর্ম্ম নাস্তি,
দারুণ দৈবের শাস্তি,
শ্লেষ্মা দেবী চেপেছেন বক্ষে,
সহজেই দম কম
তাহে লাগাইলে দম,
কিছুতে রবে না আর রক্ষে !
নাহি গান নাহি বাঁশী,
দিন রাত্রি শুধু কাশী,
ছন্দ তাল কিছু নাহি তাহে ;
নবরস কবিত্বের
চিত্তে ছিল জমা ঢের
বহে গেল সর্দ্দির প্রবাহে !
অতএব নমো নম
অধম অক্ষমে ক্ষম
ভঙ্গ আমি দিনু ছন্দোরণে,
মগধে কলিঙ্গে গৌড়ে
কল্পনার ঘোড়দৌড়ে
কে বল পারিবে তোমাসনে !

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ।

অস্ত্রের জন্মকথা।*

সভাসদ্ ও অমাত্যপরিবৃত সভামধ্যে রাজা জনমেজয় সম্মুখোপবিষ্ট মহর্ষি বৈশম্পায়নকে জিজ্ঞাসা করিলেন—হে পুরুষোত্তম! ইহসংসারে কিরূপে এবং কোন্ সময়ে অধুনাপ্রচলিত অস্ত্রসমূহের প্রথম উৎপত্তি হয় তাহা আমাকে সবিস্তারে বলুন; আমি শুনিবার জন্য বড় কৌতূহলাক্রান্ত হইয়াছি।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—হে জনমেজয়! অস্ত্রের জন্মকথা শুনিতে তোমার আগ্রহ দেখিয়া আমি বড়ই প্রীত হইলাম। হে রাজন্! আজ পর্য্যন্ত অস্ত্রের এই জন্মকথা পৃথিবীতে অপরিজ্ঞাত আছে; আমি অতি গোপনে ব্যাসদেব প্রমুখাৎ ইহা বহুকাল পূর্ব্বে শ্রবণ করিয়াছিলাম; তাঁহার আদেশ ছিল, উপযুক্ত কালে যেন আমি এই নিগূঢ় তথ্যপূর্ণ কথা সর্ব্বসাধারণের হিতার্থে ইহজগতে প্রকাশ করি। ভারতবর্ষের এই দুর্দ্দিনে এই অস্ত্রকথা প্রচার করিবার উপযুক্ত সময়,—আমি তোমাকে সেই অদ্ভুত বিস্ময়পূর্ণ অস্ত্রের জন্মকথা বলিতেছি, তুমি ধীরচিত্তে শ্রবণ কর।

জনমেজয়! জগতে অস্ত্রই সর্ব্বাপেক্ষা গুণী ও বলশালী। এই অস্ত্র রাজার রাজ্য ও মান এবং প্রজাবৃন্দের ধন ও প্রাণ রক্ষা করে; দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন করে। অস্ত্রবলে রাজ্যতাড়িত, লাঞ্ছিত, দীনহীন ব্যক্তিও পুনঃ রাজ্যলাভ করে; ভিখারী সময়ে রত্নসিংহাসনের অধিকারী হয়। এ সংসারে অস্ত্রই বীরের একমাত্র সহায়। অস্ত্রযুক্ত থাকিলে অতি ভীরু অন্তঃকরণেও সাহস সঞ্চার হয়। অস্ত্রচর্চ্চার অভাবে রাজ্য বিশৃঙ্খল এবং প্রজা বিপদসঙ্কুল হয়। দেখ,

---

* নবপ্রকাশিত মহাভারতের একাধ্যায়।

অস্ত্রপ্রভাবে পাশ্চাত্য জাতি অধুনা কিরূপ বলবিক্রমশালী ও গৌরবান্বিত। একমাত্র অস্ত্রসহায়ে ইংরাজজাতি আজ মেদিনীর অধিপতি, কত কোটী কোটী নর তাহাদের দাসত্ব করিতেছে। ত্রিশ বৎসরের জাতি ক্ষুদ্রকায় জাপানী আজ অস্ত্রবলে বলীয়ান বলিয়া এক পাশ্চাত্য মহাজাতির সহিত সম্মুখযুদ্ধে সগর্ব্বে দণ্ডায়মান; প্রতি পদক্ষেপে তাহাদিগকে বিধ্বস্ত করিতেছে। আর দেখ, অস্ত্রচর্য্যার অভাবে দেবগণের পরম প্রিয় স্থান, ধনবীর্য্যসম্পদে গরীয়ান্ ভারতবর্ষের আজ কি দুর্দ্দশা!

হে মহারাজ! সৃষ্টির পুরাকালে—যে সময় মানবজাতি পূর্ণ অসভ্য অবস্থায় বর্ত্তমান, বল্কল যখন তাঁহাদের পরিধেয়, ফলমূল যখন আহার্য্য, পর্ণকুটীর যখন বাসগৃহ—সেই অতীতের দিনে অস্ত্র বলিয়া কোন দ্রব্য মানবসমাজে প্রচলিত ছিল না। কালক্রমে তাহার উৎপত্তি হয়।

জনমেজয় কহিলেন—হে মহর্ষে! পুরাকালে কোন প্রকার অস্ত্র ছিল না শুনিয়া সংশয়ান্বিত হইতেছি। মানবগণ একত্র হইলে পরস্পরের মধ্যে যেমন সদ্ভাব হইয়া থাকে আবার তেমনই বিবাদ বিসম্বাদও হয়। হে দেব! সেকালে পরস্পরের মধ্যে কলহ বাধিলে কি উপায়ে তাহার মীমাংসা হইত?—আমরা ত দেখি, অনেক কলহ বিনা অস্ত্রঝঙ্কারে নিষ্পত্তি হয় না। আধুনিক নরপতিদিগের ন্যায় স্বাধিকার-ভুক্ত ভূমি, শস্য, ফল লইয়া বিবাদ হইলে তাহার নিরাকরণ তাঁহারা কি ভাবে করিতেন?—আর অস্ত্র অভাবে হিংস্র পশ্বাদির কবল হইতেই বা কিরূপে তাঁহারা আত্মরক্ষা করিতেন। আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ কি ভাবে অস্ত্রহীন হইয়া জীবনযাপন করিতেন তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি না;—আপনি আমার সংশয় দূর করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন—হে নরপতি! অতি প্রাচীনকালে অস্ত্র

নামে কোন বিশেষ দ্রব্য পৃথিবীতে ছিল না, কিন্তু কালক্রমে, কার্য্যানুরোধে আবশ্যকানুযায়ী হস্ত, পদ, দশন প্রভৃতি অস্ত্ররূপে ব্যবহৃত হইত। এই দৈহিক অঙ্গগুলি হইতেই জগতে সর্ব্ব অস্ত্রের উদ্ভব হয়। সে অপূর্ব্ব রহস্য তোমাকে বিশদ ভাবে বিবৃত করিতেছি তুমি শ্রবণ কর।

মানবের মনের অভ্যন্তরে এমন একটি বৃত্তি আছে যাহার সাহায্যে বাহ্যিক ব্যবহার হইতে মানুষ হর্ষ দুঃখ প্রভৃতি ভাব টানিয়া লয়। এই বৃত্তি শান্ত বা নম্র ব্যবহারে হর্ষাদিতে বিগলিত হয় এবং রূঢ় ও কর্কশ ব্যবহারে উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করে। এই বৃত্তি কোন প্রকারে উত্তেজিত হইলে মানুষের মন চঞ্চল হয় এবং মনশ্চাঞ্চল্যের ফলে দৈহিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদিও চঞ্চল হয়। ইহা আর তোমাকে দৃষ্টান্তদ্বারা বুঝাইতে হইবে না,—তুমি শত সহস্রবার দেখিয়াছ মনে আনন্দের আবেগে মানুষ অনেক সময় নৃত্য করে; ক্রোধাবিষ্ট হইলে কম্পিতকলেবর হয়, বিকট অঙ্গভঙ্গী করে; ক্ষুণ্ণ হইলে তাহার অনেক চিহ্ন বাহিরে প্রকাশ পায়। হে জনমেজয়! ইহার কারণ আর কিছুই নহে; কেবল মানসিক চাঞ্চল্য বাহিরের অঙ্গে আসিয়া বিকাশ পায়। তোমাকে বোধ হয় বলিবার আবশ্যক নাই যে বিবাদ, যুদ্ধ, মারা-মারি প্রভৃতির মূলে কোন না কোনরূপ মনশ্চাঞ্চল্যের কারণ বিদ্যমান থাকে। পরস্পরের মধ্যে অসঙ্গত বা অন্যায় ব্যবহার না থাকিলে কখন বিবাদ হইতে পারে না। মানুষ যখন এইরূপ কোন একটি অসঙ্গত আচরণ অপরের নিকট হইতে প্রাপ্ত হয় তখন তাহার সেই মানসিক বৃত্তিটা জাগিয়া উঠে। সেই বৃত্তি উত্তেজিত হইয়া মনকে চঞ্চল করিয়া দেয় এবং নিজের উগ্রমূর্ত্তি লইয়া মানুষের অঙ্গে আসিয়া প্রকাশ পায়। দৈহিক অবয়বগুলিও এইরূপে উত্ত্যক্ত হইলে সম্মুখে যাহাকে পায় তাহার উপরই অত্যাচার করে। এই ভাবে পৃথিবীতে মানবের অজ্ঞাতসারে আপনা

আপনি মারামারি নামক দৈত্যটা আবির্ভূত হয়। এখন বুঝিতেছ, মারা-মারি যুদ্ধ বা অস্ত্রের আবশ্যকতা কেবল ঐ মানসিক চাঞ্চল্য শীতল করিবার জন্য; এবং সেই পন্থা কিরূপ স্বাভাবিক উপায়ে বাহির হইয়াছিল। প্রথমে অবশ্য মানুষ জানিত না যে অন্যায় আচরণের প্রতিশোধ দিতে হইলে হস্ত পদের ব্যবহার করিতে হয়,—কিন্তু প্রতিশোধের স্বভাবোদ্রিক্ত প্রণালী দেখিয়া তাহারা সেইটাকে সময়ে ব্যবহারগত করিয়া লয়। তখন মারা-মারিতে হস্তদ্বারা মুষ্ট্যাঘাত, পদ-দ্বারা পদাঘাত, দশন দ্বারা দংশনাদি করিয়াই যুদ্ধের বিজয় গর্বে মানব উৎফুল্ল হইয়া উঠিত। হে মহারাজ! আদিম ও অসভ্য অবস্থায় যাবতীয় স্বাভাবিক উপকরণই মানুষের ব্যবহার্য্য ছিল, তখন অন্য যুদ্ধোপকরণ আর কোথা!

জনমেজয় বলিলেন,—হে বৈশম্পায়ন! এখন বুঝিলাম হস্তপদ প্রভৃতি অবয়বগুলি কিরূপে অস্ত্রভাব ধারণ করিয়াছিল। অস্ত্রের বিবরণ শ্রবণে আমার বড়ই আগ্রহ বৃদ্ধি পাইতেছে আপনি তাহা বর্ণন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—হে আর্য্য! আমি বলিয়াছি অবয়ব চালন হইতেই জগতে যাবতীয় অস্ত্রের উৎপত্তি—এখন মনোযোগ দিয়া শ্রবণ কর, তোমায় বিবৃত করিতেছি।

একমাত্র হস্তপদাদিরূপ যুদ্ধোপকরণের ব্যবহার কিছুকাল চলিল। ক্রমে দেখা গেল হস্তাদির দ্বারা এবম্প্রকার যুদ্ধ সমীচীন নয়, যে হেতু তাহা বিশেষ অসুবিধাজনক; এ উপায়ে অনেকের বিরুদ্ধে একজন দণ্ডায়মান হইতে পারেন না, অধিকন্তু তাঁহাকেই বিশেষ বিড়ম্বনা ভোগ করিতে হয়; বাহুযুদ্ধে পরতাড়নায় স্বীয় অঙ্গই বিশেষ ভাবে লাঞ্ছিত হয় বরঞ্চ অপরকে গুরুতর ভাবে মনোক্ষোভ মিটাইয়া প্রহার করা যায় না;—এবম্প্রকার নানাবিধ গোলযোগ ও অসুবিধা বাহুযুদ্ধে প্রত্যক্ষ হইতে লাগিল। ইতিমধ্যে মনুষ্যজাতি আলোচনা

করিয়া বুঝিলেন যুদ্ধ-মারা-মারির জন্য অন্যবিধ উপায় উদ্ভাবন একান্ত আবশ্যক। অতঃপর সকলেই সে বিষয়ে মনোযোগ করিলেন।

হে জনমেজয়! প্রয়োজনই উদ্ভাবনের জনয়িতা। বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ অনেক গবেষণা ও চিন্তাদ্বারা ধার্য্য করিলেন যে হস্তপদাদির ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট অপর কোনও প্রাকৃতিক দ্রব্য দ্বারাও অস্ত্রের কার্য্য চলিবে, যে হেতু হস্তপদাদির দ্বারা যখন এ কার্য্য নিষ্পন্ন হয় তখন সেইরূপ সুগোল, দীর্ঘ আকৃতিবিশিষ্ট অপর কোন দ্রব্য দ্বারা তাহা হইবে না কেন? অল্পদিনের মধ্যেই মানবের লোলুপদৃষ্টি সহজলব্ধ প্রকাণ্ড তরুশ্রেণীর উপর পতিত হইল। তাঁহারা মিলাইয়া দেখিলেন মানুষের হস্ত পদ ও বৃক্ষের শাখা প্রশাখা প্রায় একরূপেই গঠিত,—তেমনই সুগোল, তেমনি দীর্ঘাকৃতি! সকলেই উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন;—ভাল ভাল বাছাই করিয়া এই বৃক্ষশাখা চারিদিক হইতে সংগৃহীত হইতে লাগিল। কোথাও মারা-মারি বাধিলে বড় বড় বৃক্ষশাখায় সজ্জিত হইয়া দুই পক্ষ রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইতে লাগিলেন,—চারিদিকে তুমুল কাণ্ড বাধিয়া গেল। বাহুযুদ্ধের অনেক কষ্ট দূর হইল;—সকলেই ভাবিলেন, ঠিক হইয়াছে!— আমরা উপযুক্ত অস্ত্র পাইয়াছি! হে জনমেজয়! দেখ, কিরূপে হস্তাদি হইতে প্রথম কৃত্রিম অস্ত্রের উৎপত্তি হইল।

মানুষের সৌখীনতা তাহাকে অধিক দিন বৃক্ষশাখার পক্ষপাতী থাকিতে দিল না;—বৃক্ষশাখা কি কুৎসিৎ! কি অসরল! পরে দেখা গেল, বৃক্ষশাখা হইতে বংশ দণ্ড অধিকতর কার্য্যোপযোগী, যে হেতু ইহা সরল ও সবল। তখন সকলেই বৃক্ষশাখা ফেলিয়া বংশদণ্ডের উদ্দেশে ছুটিলেন।—এই হইল যষ্টির উৎপত্তি।

সরল বংশদণ্ড প্রয়োজন মত কাটিয়া, নানা উপায় অবলম্বনে সবলতর করিয়া তুলিলে তাহা জগতে যষ্টি বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইল। এই যষ্টি বা লাঠি পুঙ্গবের উদ্ভবে জগতে মহোপকার সাধিত হইয়াছিল।—

আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ ইহার কল্যাণে আপনাদিগকে বিশেষ বলশালী জ্ঞান করিতেন।

হে নররাজ! অস্ত্রের আদিপুরুষ লাঠির গৌরবে এককালে মেদিনী গৌরবান্বিত ছিলেন। দেখ, কত কাল চলিয়া গিয়াছে, কত দ্রব্যের উত্থান ও পতন হইয়াছে, কত দ্রব্য একেবারে লয়প্রাপ্ত হইয়াছে—তত্রাচ লাঠির এখনও ধ্বংশ সাধন হয় নাই। অল্প হউক, বিস্তর হউক এখনও তাহার যথেষ্ট আধিপত্য রহিয়াছে। এখন, ভারতবর্ষে রাজার আজ্ঞায় নেটিভ্‌গণের অস্ত্র ব্যবহারে অধিকার নাই; কিন্তু গৌরাঙ্গগণ কর্তৃক অনেক লাঞ্ছিত নেটিভ্‌ এই একমাত্র লাঠির সাহায্যে অনেক মনোক্ষোভ মিটাইতেছে। কিন্তু অধুনা এ অস্ত্রদেবের ততদূর আদর নাই সেই জন্য তাহার প্রশংসা আর আমাদের কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত করে না। তত্রাচ আমি বলি ইহার গুণ অনুপম—এক মুখে শেষ করা যায় না। এক সময় বাঙ্গালাদেশ ইহার ব্যবহারে বিশেষ বিখ্যাত ছিল। বড় বড় বাঙ্গালী লাঠিয়ালের লাঠির জোরে অনেক কাজ হইয়াছে। এই লাঠির কৃপায় এক এক মহাপুরুষ জগতে বীরখ্যাতি লাভ করিয়া অমর হইয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই সহজপ্রাপ্য অস্ত্রের আদর মানব একেবারে ভুলিয়াছে! হে রাজন্‌, যে পুরাকালে আমাদের ধন মান প্রাণ রক্ষা করিয়াছে, যে মহা বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়াছে, যে চির-কাল সঙ্গের সাথী তাহার প্রতি এ অবজ্ঞা তাচ্ছিল্য কি মানুষের শোভা পায়? বঙ্গদেশের এক কৃতী সন্তান—একজন বিখ্যাত গ্রন্থকার তাঁহার এক অমূল্য পুস্তকে এই লাঠির গুণ কীর্ত্তন করিয়াছেন তুমি সময়ান্তরে পাঠ করিও, বিপুল আনন্দ লাভ করিবে।

জনমেজয় কহিলেন,—মানব অকৃতজ্ঞ ও নরাধম! অস্ত্রের আদি পুরুষ লাঠির প্রতি মানুষের তাচ্ছিল্য ভাব আমায় মর্ম্মাহত করিতেছে;

ব্রহ্মার অভিশম্পাতে তাহারা ইহার ফলভোগ করুক! হে মহর্ষে! এখন বলুন, হস্তপদ, বৃক্ষশাখা ও লাঠিকে আপনি অস্ত্র বলিয়া কীর্ত্তন করিলেন কেন? অধুনা ঐ গুলিকে অস্ত্র বলিয়া প্রখ্যাত করিলে জনসমাজে হাস্যাস্পদ হইতে হয়। কেননা, ইদানীং যে সমস্ত আশ্চর্য্যজনক বিপুল ক্ষমতাশালী অস্ত্র প্রচলিত হইয়াছে, তাহার সমক্ষে ও গুলি অতি তুচ্ছ, হীনাদপি হীন!

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—হে জনমেজয়! আমাকে বাতুল ভাবিও না। আজকালকার তর্জ্জন গর্জ্জনশালী নানাবিধ অস্ত্র বর্ত্তমানে আমি ঐ সামান্য পদার্থগুলিকেও অস্ত্র নাম দিতে সাহস পাইয়াছি, তাহার কারণ আছে। যাহা ক্ষেপণ করা যায় তাহাই অস্ত্র। অস্যতে ক্ষিপ্যতে ইতি অস্ত্রং। তবে ওগুলিকে অস্ত্র বলিব না কেন? হে নররাজ! লাঠির গুণকীর্ত্তন শ্রবণ করিয়াছ, এখন অস্ত্রের ক্রমবিকাশের কথা অবধান কর। দেখ, এই লাঠি হইতেই অন্যান্য অস্ত্রের বিকাশ। বহুকাল পর্য্যন্ত এই লাঠির অমোঘ শক্তির গর্ব্ব দিগ্বিদিকে প্রচার ছিল, এমন স্থান প্রায় ছিল না যথায় উহা অপরিজ্ঞাত ছিল। কিন্তু কালের স্রোতে ও মানবের প্রয়োজনবিধায় অনেক দ্রব্য ভাঙ্গিয়া চুরিয়া নূতন করিয়া গড়িতে হয়। লাঠির শক্তি কতকটা সীমাবদ্ধ স্থানের মধ্যেই থাকে; কালে সেই সীমার গণ্ডী বড় করিয়া তুলিবার আবশ্যক হইয়া উঠিল। কালের কুটিলতায় মানুষও কুটিল হইয়া উঠে। যুদ্ধ বিগ্রহে কুটিলতা প্রবেশ করিল, মানব নিজেকে রক্ষা করিয়া, ফাঁকি দিয়া অপরের সর্ব্বনাশ করিবার পন্থা খুঁজিতে লাগিল—দূর হইতেই শক্রর উচ্ছেদ সাধনের চিন্তা মাথায় ঘুরিতে থাকিল!

হস্তদ্বারা দ্রব্যাদি উত্তোলন, প্রস্তর প্রক্ষেপণ প্রভৃতি কার্য্য লক্ষ্য করিয়া মানুষের জ্ঞান হইয়াছিল যে "আকর্ষণের" মধ্যে একটা মহতী শক্তি রহিয়াছে,—একটা জিনিসকে যত দূরে ফেলিবার দরকার হাত-

টাকে তত জোরে আকর্ষণ করিতে হয়। এই আকর্ষণী শক্তিকে কার্য্যে নিয়োগ করিবার জন্য মানুষ লুব্ধ হইয়া উঠিল। এবং তাহাদের যত্নে ও চেষ্টায় ক্রমে সেই শক্তি লাঠির স্কন্ধে আসিয়া চাপিল—ভারাক্রান্ত লাঠি বক্রভাব ধারণ করিল।—এই হইল ধনুর উৎপত্তি।

হে জনমেজয়! এই গেল কতক লোকের কথা। একটা বিষয় লইয়া বিশ্বশুদ্ধ লোক যখন মাথা ঘামায় তখন তাহার নিষ্পত্তি ভিন্ন ভিন্ন লোকের মাথায় ভিন্নভাবে গজাইয়া উঠে। একদল যখন "আকর্ষণী-শক্তি"টাকে সরল বংশদণ্ডের কাঁধে চাপাইবার ব্যবস্থা করিতেছিলেন, ঠিক সেই সময়ে আর এক দিকে, আর এক দল সরলদণ্ডের শ্রাদ্ধ করিয়া তাহারই একটা নূতন সংস্করণ ফাঁদিয়া বসিয়াছিলেন। বংশ-দণ্ডের ভঙ্গ-প্রবণতার হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য তাঁহারা একেবারে ধাতুর আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। তখন অনেক মহাপুরুষ মৃত্তিকা খুঁড়িয়া, আকাশে চড়িয়া বিশ্বস্রষ্টা কোথায় কি গুপ্তধন রাখিয়াছেন তাহা বাহির করিবার জন্য বিশ্বখানা ওলট পালট করিতেছিলেন। সবে মাত্র তাঁহাদের নবপ্রাপ্ত গুপ্তধন "লৌহ" লইয়া নাড়া চাড়া হইতেছে এমন সময় অস্ত্রসংস্কারকদের দৃষ্টি তাহার উপর পড়িল। তাঁহারা লৌহ পরীক্ষা করিয়া তাহাই মঞ্জুর করিলেন। সরল বংশদণ্ড বেচারা এইভাবে নিরপরাধে নির্ব্বাসিত হইলে, তাহারই ভীম ভাই কঠিনধাতুপুষ্ট অঙ্গ লইয়া তাহার স্থানে শোভা পাইতে লাগিলেন। সরল বংশদণ্ডের হাতে যাঁহারা এতদিন প্রাণ বাঁচাইয়া চলিতেছিলেন, ভীম লৌহদণ্ডের কাছে তাঁহাদের একেবারে স্বর্গ প্রয়ানের ব্যবস্থা হইল।

পৃথিবীতে যখন যে জিনিসটা নূতন দেখা দেয়, তার প্রতিপত্তি বড় বেশী হইয়া উঠে।

হে জনমেজয়! মানুষ যখন কোন একটা নূতন লইয়া মাতে,

তখন সে কিছুতেই স্থির হইতে পারে না। সে যতই কেন করুক না, তার করিবার আগ্রহ আরো বৃদ্ধি পায়। লৌহকে সংসারে একটা ছোট-খাট প্রতিপত্তি দিয়াও মানুষ ক্ষান্ত হইতে পারিলেন না। পিটিয়া ছাঁটিয়া তাহাকে নানা ভাবে দাঁড় করাইলেন। পীড়নের উপর পীড়ন খাইতে খাইতে সুগোল লৌহদণ্ড একেবারে সূক্ষ্ম পাত হইয়া গেল; সকলে সবিস্ময়ে দেখিলেন এই নবোদ্ভূত দ্রব্যে এক অভূতপূর্ব্ব বিষয় সাধন হয়—এই হইল তরবারি।

হে নরপতি! যে উপায়ে এই তরবারি নির্ম্মিত হইল তাহাই অনুসরণ করিয়া অনেকে অনেক প্রকার লৌহাস্ত্র নির্ম্মাণ করিলেন। তাহার নাম তোমায় আর কি বলিব? মহাভারতে সবিস্তৃত বিবরণ পূর্ব্বে শুনিয়াছ।

সুগোল লৌহদণ্ড পিটিয়া অস্থিমাংসহীন করিয়া যে যে অস্ত্র পাইলেন, মানব তাহাতেও সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না। লৌহটাকে আবার নূতন উদ্যমে ঘাঁটিতে লাগিলেন। একটা লৌহদণ্ডকে যতটা সূক্ষ্ম করা যাইতে পারে তাহার চূড়ান্ত হইয়াছে, এখন দেখা যাউক এটা স্থূলতর করিয়া আমরা কি পাই। এই আকাঙ্ক্ষায় মানুষের সমস্ত শক্তি ও অধ্যবসায় লৌহদণ্ডের শরীরের পুষ্টি সাধনের জন্য লাগিয়া গেল। একবার তাহাকে অস্থিমাংসহীন করিয়া যে পাপ সঞ্চয় করিয়াছেন ইহা যেন তাহারই প্রতিকার।

লৌহদণ্ডকে পুষ্ট হইতে ক্রমশঃ পুষ্টতর করা হইতে লাগিল। এই স্থূলকায় বিশাল হৃষ্ট পুষ্ট লৌহদণ্ড মনুষ্যসমাজে কোন্ অস্ত্র বলিয়া প্রখ্যাত জান কি?—ইহা হইতেই শতঘ্নী কামান ও বন্দুকের সৃষ্টি!

নানা প্রকার বৈজ্ঞানিক কৌশল অবলম্বন করিয়া এই অস্ত্র সৃষ্টি হয়। এই অস্ত্র আধুনিক সভ্য জগতের শ্রেষ্ঠ অস্ত্র, তাহা তুমি জান। হে রাজন্! এখন বুঝিতেছ, এক অস্ত্র হইতে সর্ব্ব অস্ত্রের উৎপত্তি।

কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে বহু প্রকার অস্ত্রের নামোল্লেখ করিয়াছি, এখন আর তাহা বলিব না। ঐ যুদ্ধকালে অস্ত্রের এক প্রকার পূর্ণাঙ্গতা লাভ হইয়াছিল। যাবতীয় অস্ত্র প্রথম ভারতবর্ষেই সৃষ্টি হয়; ক্রমশঃ চীন প্রভৃতি নানা জাতি, এই ভারতবর্ষ হইতে যাবতীয় অস্ত্র ও তাহাদের নির্ম্মাণকৌশল সংগ্রহ করিয়া লইয়া যায়। তাহাদিগের নিকট হইতে প্রথমে পাশ্চাত্য জাতি এই সমস্ত প্রাপ্ত হয়। কি উপায়ে এবং কেমন ভাবে তাহা সময়ান্তরে বলিব।

হে নররাজ! এই অস্ত্রের জন্মকথা যিনি সোৎসুকে ও সাগ্রহে নিত্য শ্রবণ করেন তাঁহার অক্ষয় স্বর্গবাস হয়—যিনি ইহার অবহেলা করেন তাঁহার পাপের সীমা নাই। তুমি অস্ত্রের সৃষ্টি কথা ও তাহার উদ্ভাবক মহাপুরুষগণকে ধন্যবাদ করিয়া সভা ভঙ্গ কর।

স্বস্তি বচন ।*

নয় কাশী বারাণসী, নয় বৃন্দাবন,
এবার বৃটনভূমি বিলাতী নন্দন।
তাড়া তাড়ি দিয়ে পাড়ি বড় চট্‌পট্‌,
বাঙ্গালি মুল্লুক ছাড়ি দাওহে চম্পট্‌।
পত্রারম্ভে তাই
মিষ্টান্নের সঙ্গে দুটো স্বস্তি বলা চাই।
প্রদ্যোৎ তোমার দ্যুতি সপ্ত সিন্ধু পারে
উঠুক উজ্জ্বলতর উদয় শিখরে।
স্বয়ং জলধিনাথ † সহায় যাহার,
অপার সমুদ্র মাঝে কি ভয় তাহার!
দক্ষিণে নলিনীকান্ত † নিজে দিনমণি,
বামেতে গগণচন্দ্র † পীযূষের খণি
সম্মুখে পুণ্ডরীকাক্ষে † রাখিয়া সদাই,
বিদ্যুতের বেগে চল কিছু ভয় নাই।

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

---

* ভারতেশ্বরের আমন্ত্রণে মহারাজকুমার প্রদ্যোৎকুমারের বিলাত যাত্রা উপলক্ষে রচিত।

† সহযাত্রিক আত্মীয়গণ।

কণিকা।

শুধু সঞ্চয় করা সুগৃহিণীর একমাত্র পরিচয় নয়, তাঁর ঘরে অপচয়ও অনেক ঘটে। অতিথি প্রত্যহ আসে না কিন্তু সেই প্রত্যাশায় তিনি প্রতিদিনই কত আয়োজন করে রাখেন।

গৃহিণী যদি বিধবা হ'ন তবে শুধু তাঁর নিরামিষের ব্যবস্থা করিলে চলেনা, আমিষের ব্যবস্থা তাঁকেই করিতে হয়, একাদশীর দিনেও তাঁর ঘরে রান্না চড়ে।

দুঃখের দিনে দুঃখ করাতো বিদ্রোহ নয়, কিন্তু সেই দুঃখকে জীবনে জাগ্রত করে রাখিবার চেষ্টাই বিদ্রোহ।

মানুষ নিজের দোষে জীবনটা নষ্ট করে, যখন দুঃখে পড়ে তখন অদৃষ্টের দোষ দেয়; কিন্তু দৈবে যদি সুখ হয় তখন আত্মপ্রশংসা আর মুখে ধরে না।

———

চিত্র।

টাউন হল শ্রোতৃবর্গে পূর্ণ। সভাপতি আসীন।
বক্তার বক্তৃতা।

মহোদয়গণ, করুন শ্রবণ,
সভা এক মোরা করেছি গঠন ;
উদ্দেশ্য, হিন্দুধর্ম্মের রক্ষণ।
কারণ, কলির বাতাসে বেজায়,
পাছে ঋষিদের ধর্ম্ম উবে যায়,
কর্পূরের মত ! মোরা সেই ভয়ে,
কাঁপিতাম সদা দিশেহারা হয়ে ;
যথা কাঁপে বৃক্ষ বায়ুর গতিতে
সাঁ সাঁ করে ! এ বিষম বিপত্তিতে,
কিবা দশা হোত আমাদের, যদি
পূজনীয় প্রাজ্ঞ বিজ্ঞ সভাপতি,
দিয়া পরামর্শ অতি সুগভীর,
আমাদের নাহি করিতেন স্থির !

পাঠ্যাবস্থা হোতে আমরা ছ'জন
ভাবিতাম সদা করি প্রাণপন
দেশের দুর্গতি। লাগিত না মন
কোন কাজে ; দুনিয়াটা অনুক্ষণ
বোধ হত ফাঁপা ফুটবল সম,
শুধু বায়ু ভরা। নিরেট দেখিয়া
না কিছু, হৃদয় উঠিত রুখিয়া

কথন কথন। কভু, মানবের
দুঃখ হেরি, উত্তাপেতে বরফের
মত, গলে যেত আমাদের মন।
এইরূপে গেল দিন অগণন।

একদিন মোরা বসি নদীতীরে,
খাইতেছি খাবি ঘোর চিন্তা নীরে,
হেন কালে যেন কাহার আহ্বান
পশিল শ্রবণে, শিহরিল প্রাণ;
দেখিলাম এক পুরুষ মহান্
দাঁড়াইয়া পাশে। শুভাশীষ দান,
করি শুধালেন চিন্তার কারণ;
কহিলাম মোরা সর্ব্ব বিবরণ।

বলিলেন তিনি হয়ে অতি ক্রুদ্ধ,
স্বাধীনতা দ্বার না করিলে রুদ্ধ,
হিন্দুদের না হবে মঙ্গল। শিশি-
বদ্ধ কর্পূর মরিচ, দিবানিশি
থাকে নিরাপদে। তথা, লোকাচার-
বোতলেই, হিন্দুধর্ম্মের আগার।
বোতলের মধ্যে, ফেলে গঙ্গামাটি,
শাস্ত্র ছিপি দিয়ে মুখ দাও আঁটি;
এরূপেই এই ধর্ম্ম রবে খাঁটি।

ঘোর রজনীতে, রাতকানা পায়
যদি দিব্যদৃষ্টি, তার হৃদি তায়
যেমন নেচে ওঠে ফড়িঙের প্রায়

আহ্লাদেতে! সেইরূপ পুলকিত
হইলাম মোরা। হল কণ্টকিত
রোমগুলি, ঠিক সজারুর মত,
শুনি তাঁর কথা অমৃত সমান।
লুটালাম মাথা হয়ে ভক্তিমান্
চরণেতে; তাঁরে করিয়া বরণ
গুরুপদে, মিলি মোরা ছয় জন
করিলাম এই সভা। সভ্যদল
বাড়িতেছে ক্রমে, যথা বাড়ে জল
জলের সংযোগে। সে দিন আসিবে,
যবে সকলে এ সভাকে মানিবে।

শুনিলেন সবে মহাশয়গণ,
যেরূপে হয়েছে সভার স্থাপন।
কালটা পড়েছে বিষম এমন,
কেহ নাহি করে মস্তিষ্ক চালন।
ইউরোপের কথায়, সর্ব্বজন
করে ওঠ্‌বোস্, কাণটি ধরিয়ে
হাতে; যদি সে উঠে চীৎকারিয়ে,
"কাণ নিয়ে গেল কাকে," আহাম্মাক
সব, অমি ছোটে যথা যায় কাক।
য়ুরোপের মত করুন শ্রবণ,
জাতিভেদ হয় করিয়া যেমন।
"পিতৃদের গুণ সন্তানে বর্ত্তায়,"
ব্রাহ্মণের পুত্র ব্রাহ্মণত্ব পায়।

মুষিকের বাচ্ছা সিংহ কভু নয়,
শূদ্র পুত্র কভু ব্রাহ্মণ না হয়।
ব্রাহ্মণ হিন্দুর মাথা, শাস্ত্রে বলে ;
লোকে মাথার রক্ত খারাপ হোলে,
যেমন পাগল হয়,—হিন্দুদেরো,
জাতিভেদ বিনা সেইরূপ গেরো !

ইউরোপে জাতিভেদ নাই বোলে,
কার্য্যের বিভাগ না জানে সকলে।
যার যাহা ইচ্ছা করে সেই কাজ,
এইজন্য সেথা নাই লোক লাজ।
মুচির ছেলে সেখানে রাজ্য পায়,
রাজার ছেলে সেথা নৌকা চালায়।
ধোপা নাপিত মুচি সেখানে নাই,
নিজের কাজ নিজে করে সবাই।
এইরূপে নীচুকাজ করে বোলে,
ধর্ম্মহীন হয় তাহারা সকলে।
সদা ব্যস্ত থাকে আপনাকে নিয়ে,
পর সুখ দুখ না দেখে চাহিয়ে।
তাই তারা হয় বড় স্বার্থপর,
বাহ্য চাকচিক্যে মত্ত নিরন্তর।

অতএব জাতিভেদ উঠিলে কলে,
ভারত ডুবিবে সাগরের জলে।
ব্রাহ্মণের পাদুক জল খাইবে
না কেহ, দক্ষিণা মারা যাইবে।

রিক্ত হস্ত ব্রাহ্মণকে খেতে হবে
ব্রাহ্মণীর ঝাঁটা; ধর্ম্ম নাহি রবে।
কি ভীষণ কাণ্ড উপস্থিত হবে,
জানিবেন সবে শিহরিবে প্রাণ!

স্ত্রীশিক্ষা, স্ত্রীস্বাধীনতা, বিধবার
বিয়ে নিয়ে; লোকে, আজ কালকার
দিনে, এত গোলযোগ করে; যেন,
ধরণীমাতা হারাইয়া জ্ঞান,—
তাদের কণ্ঠের ফুৎকারে, উড়ে
যানই বুঝি লক্ষ যোজন দূরে।

একথাটা অবিদিত নাই কারো,
স্ত্রীদিগের কূটবুদ্ধি আছে বড়ো।
আর, তারা পেঁচাও বুদ্ধির জোরে,
স্বামীদের রাখে এরকম কোরে,
তারা ঘানিচক্রে ইঙ্গিতের
ফেরে ঘোরে অবিরত, বলদের মত।
এরওপোর দিলে তাদের শিক্ষা,
স্বামীবেচারারা নাহি পাবে রক্ষা;
একজোট হোয়ে স্ত্রীলোক সকলে,
ফেলিবে ফাঁপরে পুরুষের দলে।
তাই বলে ইহা শাস্ত্রকারগণ,
স্ত্রীকর্ম্ম স্বামীর পদে তৈললেপন।
ইহার অধিক কিছু করিলেই,
স্ত্রীত্ব তাদের লোপ হইবেই।

লেখা পড়া তারা শিখিলেই কিন্তু,
হবে কিম্ভুত কিমাকার জন্তু।
এবারে আসিছে বিধবা বিবাহ কথা,
ইহা ঠিক সোণার পাথর বাটি যথা।
ভেবে দেখ বিধবার কি মহান ধর্ম্ম,
কেমন আচরয়ে তারা নিষ্কাম কর্ম্ম!
আপন ভুলিয়ে, পরহিতে লেগে থাকে,
যে রকমে রাখ, তাতেই সন্তুষ্ট থাকে।
তারা কাজ করে বেশী, আর অল্প খায়,
তাই সধবার চেয়ে, সুস্থদেহ হয়।
আর মোদের চেষ্টায় গৃহিণীরা ক্রমে
হইতেছে পতিব্রতা; তারা থাকে জমে,
জোঁকের মতন, পতিদেবের চরণে।
পতিই সর্ব্বস্বধন; পতির বিহনে,
চক্ষে দেখে তারা, শুধু সরিষার ফুল।
পতিপুত্রের মঙ্গলে হইয়া আকুল,
কোন কাজে অপারগ। ইহার উপর,
কুটুম্বের যাতায়াত আছে নিরন্তর।
তা ভিন্ন আজ কালের দাসী ও চাকরে
বড়ই দেমাকে, তারা কার্য্য ত্যাগ করে
কথায় কথায়। বিধবারা নাহি র'লে
এমন সঙ্কটে কেমনে কাজ চলে!

আমাদের পূজা আর্চ্চা যাহা কিছু হয়,

পার্থক্য রবেনা কোন হিন্দুতে ও ম্লেচ্ছে,
সনাতন ধর্ম্ম সব হয়ে যাবে মিছে!
যে বিধবা বিবাহ এত অনিষ্ট আলয়,
সে বিধবা বিবাহ কি না দিলেই নয়?
দেশেতে গরীব দুঃখী কত লোক আছে,
আর দুর্ভিক্ষ মড়ক ত লেগেই পাছে।
কার্য্যের এ ক্ষেত্রগুলি কেহ নাহি চষে
খালি "বিধবার বিয়ে দাও" চেঁচায় কষে,
দেখি হস্ত পদ ত্বক জ্বলে যায় রোষে।

ভুলে গেছি এক কথা উৎসাহের চোটে;
কারণ দপ্ কোরে শোকাগ্নি জ্বলে ওঠে,
আর থাক হোয়ে যায় হৃদয়ের গিঁঠে।
দেশের দুর্দ্দশা হেরি স্মৃতি যায় মিটে,
সে কথাটা দরকারী, সকলে শুনুন,
এ দেশে মেয়ের সংখ্যা পুরুষের দ্বিগুণ।
বিধবাদের বিবাহ হইলে, এস্থলে,
বড় অবিচার হয় কুমারীর দলে।

সম্প্রতি একদল শৃগাল বৃত্তিধর,
ডাক্‌ছে ফেউ—
"স্ত্রীবাল্য বিবাহ অকল্যাণকর।"
যেন তাঁরাই হন সমাজের
বংশকল্পতরু,
আর পূর্ব্ব পুরুষেরা ছিলেন,
এক একটি প্রকাণ্ড গরু।

এ সোজা কথাটা তারা,
বোঝে নাক মোটে,
মেয়েরা পুরুষের চেয়ে,
শীঘ্র বেড়ে ওঠে ;

আর, দশ বছরের মেয়ে,
বিশ বছরের যুবাকে,
চড়িয়ে আসে গোঠে।
সুতরাং তাদের মুখ চোখ কাণ,
ফুটিয়া ওঠেনি যবে,
শ্বশুর বাড়ীর শৃঙ্খলেতে টেনে,
বদ্ধ করতে হবে,
এ রকম করলেই তাদের
সুশিক্ষা দান হবে।
ইউরোপের লোকে এ কথাটা
জানে না বলেই,
সেখানে সংসারে কিছুমাত্র
সুখশান্তি নেই।

অতএব দেখুন সকলে চক্ষু চেয়ে,
কিবা ভয়ানক, কালো, বড় মেঘে ছেয়ে
রহিয়াছে ভারত আকাশ! যদি বাজ
পড়ে, সাবাড় কর্ব্বে হিন্দুধর্ম্মের কাজ।
কিংবা যদি বৃষ্টি পড়ে জোরে, ভাসাইয়া

সবাকার। অতএব থাকিতে সময়
হন সাবধান, মোর শেষ অনুনয়।
হলে এ সভার সভ্য, দুনিয়ার তত্ত্ব
জানিবেন সবে, কহিলাম খাঁটি সত্য।

(বক্তার উপবেশন।)

সভাপতি। বক্তা মহাশয়ের কথা অতি উপাদেয়,
পুলকেতে ভরে দেছে মন প্রাণ দেহ।
আর এতে আমার সন্দেহ নাই,
আপনাদের সকলের মতও তাই।

বিলাসিতা রাহু যবে দেশগ্রাস করে,
এ ঘোর দুর্দ্দিনে কারু টনক না নড়ে!
এই সভ্যতার না অসভ্যতার, ফলে,
অভক্ষ্যে অপেয়ে ঘৃণা না করে সকলে।
নিরামিষ আহারেই সত্ত্বগুণ রয়,
একথাটা কলিকালে গূঢ়তত্ত্ব হয়।
এ জগৎটা কিছু না, মিথ্যা কারসাজী,
খালি ভেল্কি, অবিকল যেন ছায়াবাজী,
মুহূর্ত্ত মধ্যে, সবার নয়ন ঝাঁঝি
শূন্যেতে মিশায় যথা আতসবাজী।
জানে ইহা, ঘটে কিছু বুদ্ধি আছে যার,
আত্মতত্ত্ব সারতত্ত্ব, সব মিছে আর।
আত্মা পরমাত্মার ছায়া, আত্মজ্ঞান
বিনা, লাভ নাহি হয় পরব্রহ্ম জ্ঞান।
এই হেতু শাস্ত্রেতে এ বাণীর উদ্ভব,

এতত্ত্ব যে পর্য্যন্ত না চিনিতে পারিবে,
নিষ্কাম কর্ম্মের তত্ত্ব অজ্ঞাত থাকিবে।
শঙ্করাচার্য্যের উক্তি জানত সবাই,
অহং ব্রহ্ম ভিন্ন কিছু এজগতে নাই।
গীতাতেও সর্ব্বস্থলে আছে এই কথা,
বেদেতেও প্রতিসূত্রে আছে সেই প্রথা।
নিষ্কাম কর্ম্ম মানে, কামনাহীন কর্ম্ম,
না করিলে বুঝিতে নারিবে এর মর্ম্ম।
আতর যেমন শুধু গোলাপের সার,
ধর্ম্মশাস্ত্র বিনা কিছু সত্য নাহি আর।

অতএব, পৃথিবীতে কোন্ ধর্ম্ম আছে,
যাহা লাগে মহিমায় হিন্দুধর্ম্ম কাছে।
বুঝি ইহা ইউরোপ আমেরিকাবাসী,
অনেকে রেখেছে টিকি, থাকে উপবাসী।
কেহ লয়ে প্রচার দীক্ষা, নিরামিশাষী,
কেহ করে গঙ্গাস্নান, কেহ বা সন্ন্যাসী।
কেহ যায় যোগাভ্যাসে হিমালয় শিরে,
কেহ যায় হত্যা দিতে তারকমন্দিরে।
কেহ লেখে বই, ইহা প্রমান করিতে,
হিন্দুধর্ম্ম, এক সার ধর্ম্ম পৃথিবীতে।

যবে, ম্লেচ্ছেরা শিখিছে মোদের হিন্দুধর্ম্ম,
মোরা তাদের কিছু শিখি, বিষম কুকর্ম্ম!
আমরা কোন্ বিষয়ে, তাদের চেয়ে ছোট,
সেদিনো তারা বেড়াত বনে যথা মর্কট।
অতএব হিন্দুদের কোন্ অভাব আছে,

(জনৈক ইংরাজ শ্রোতার সভাপতির নিকট আগমন।)

সাহেব। Baboo, I say you are preaching sedition,
I will hand you o'er to police station.

সভাপতি। No no sir, আমি কিছু বলিনি seditious,
আমি preach কচ্ছিলাম religion precious,
তার witness এই সভাশুদ্ধ লোক,
জিজ্ঞেস করুন, সত্য বলবে যেহোক।

সাহেব। Policeman টুম্ জল্‌ডি ইহাঁ আও,
Arrest this man, থানামে লেজাও।

সভাপতি। হুজুর, আমাকে অনুগ্রহ হোক আজ,
আর কখন করব না এমন কাজ।

সাহেব। টোমরা বর বজ্জাট্, worthless fellows,
টোমাদের উপযুক্ত সাজা কেবল gallows,
যে গৌরবশালী জাটি, অনুগ্রহ করে, টোমাদের সভ্য কর্‌ছে,
টোমাদের সুশাসনের জন্য, কট ডুর দেশ থেকে অস্‌ছে।
যাডের আসবার আগে, টোমরা শাণ্টি নিরীক্ষণ করনি,
রাজা ও ডাকাটের অট্যাচারে, টোমাদের সুনিড্রা হয়নি।
টোমাদের দেশে, এট নরহট্যা হইট,
যে, গঙ্গার জল লাল হোয়ে Bay of Bengalএ পরিট ;
আর, আমাদের নাবিকেরা টা দেকে শিহরিট।
টোমাদের দেশে যট শস্য হইট,

টোমরা বেঁচে থাকৃটে খালি ঘাসের বিচি খেয়ে,
এ রকম করেই ডেশে মড়ক পড়ত ছেয়ে।
টোমাদের জেনানায় যট স্ত্রীলোক থাকিট,
সকলকে ঢরে নবাব হারেমে পুরে রাখিট।
যা কিছু দু একটা ছিল লুকিয়ে, পাহাড়ে ও জঙ্গলে,—
এ রকমে টোমাদের race টা extinct হচ্চিলই বোলে।
হেন সময়ে, যদি বিডাটা আমাদের না পাটাট,
টা না হোলে টোমাদের শমন ভবনে যেটে হোট।
আগে, টোমরা স্বাদীনতা কিচু না জানিট,
কথায় কথায় নবাব, টোমাদের গর্দান নিট।
আর, মুসলমানেরা হিন্দুদের মুকে থুথু দিট।
টোমরা পরস্পরকে, এমন কি বাপকেও, করে এট ঈর্ষা,
যডি টোমরা দেখে কারুকে টোমাদের চেয়ে ফর্সা।
আর, টোমরা দেবটার কাছে, এই প্রার্থনা করে,
যাটে টোমাদের চেয়ে সব কালো হোয়ে পড়ে।

আর, টোমরা যদি দেখে কারো মাথা উচুঁ,
টটক্ষন মনে শান্টি নাহি পায় কিছু,
যটক্ষন না টার্ মাথা করে দিটে পারে নিচু।
টোমাদের সামনে, দেক ইয়ুরোপের আলো,
কিছুটে না ছাড়ে তবু কুসংস্কার জঞ্জাল।
টোমাদের ধর্ম্ম, ইটিহাস সাহিত্য সকল,
টোমরা জেনেছ আমাদের পুষ্টকে কেবল।
টোমাদের আছে, যাহা কিছু পুরাণ গৌরব,

টোমরা অক্নটজ্ঞ নরাধম এমন,
সে সব স্বীকার না কর কথন।
পুলিসের সঙ্গে থানা চল এক্ষন।

সভাপতি। ধর্ম্মাবতার, হাতজোড় করে বলছি আপনাকে,
এমন কথন করব না, ছেড়ে দিন আমাকে।

সাহেব। আচ্ছা, হেবার দোষ ক্ষমা করিবে আমি,
যদি, এই কাগজে লিখিয়া দাও টুমি
ছুজন witnessএর সামনে, যে করিছ
মহা অন্যায়, আর এর জন্য সহিছ
অনুটাপ অগ্নি যাহা হবে নির্ব্বাপিট্
সেই দিনে, যবে হেন কথা জিব্বাগ্রে না হবে উদিট ;
আর, বক্টৃটা টোমার থাকবে বণ্ড ফু বট্সরের মট।

সভাপতি। এই নিন লিখে দিলাম, সহ সাক্ষীদের স্বাক্ষর,
এবার অনুমতি করুন, আমায়ে যেতে-নিজ ঘর।

সাহেব। যাও, খবরদার, সাবডান থাকিবে,
হেবার দোষ হোলে দীপাণ্টর যাইবে।

(সভাভঙ্গ। সাহেবের ও পুলিসের প্রস্থান।)

(সভাপতি, বক্তা ও কতিপয় অন্যান্য লোক।)

বক্তা। দেখ্‌লে, এ সাহেবটার কিছুমাত্র আক্কেল নাই,
আজকালকার অধিকাংশ সাহেবই, এর পিসতুত ভাই।
এরা, আমাদের কোন গুণ দেখিতে না পায়,
আমাদের দোষগুলার দিকে, চারচক্ষে চায়।
ওদের সভ্যতাটা যে বিষকুম্ভপয়োমুখম্,

এরা নিজ ছিদ্রগুলির দিকে অন্ধ হইয়ে,
খালি বের করে পর ছিদ্র খুঁজিয়ে খুঁজিয়ে।
এসব বিষয়ে, আমি প্রবন্ধ লিখব মজবুৎ,
ভারত ও বিলাতের খবরের কাগজে বহুৎ।

১ম লোক। দেখ, যখন সাহেবটা আমাদের দিচ্ছিল গাল,
আমার শিরা রক্ত ধমনী, হোয়ে উঠ্‌ছিল উত্তাল।
ভাবলাম, তার সঙ্গে ঝগড়া করি খুব জোরে;
নিরস্ত হলেম, ভাবি, কেহ সাহায্য করবে না মোরে;
আর, আমায় টেনে নে যাবে কয়েদখানার অন্ধকারে।

২য়, ৩য় ও ৪র্থ লোক। দেখ, তোমরা নিশ্চয় আমাদের সাহায্য পেতে,
যদি আমরা চাকরি না কত্তেম, ঐ সাহেবের আফিসেতে।

৫ম ও ৬ষ্ঠ লোক। এ ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব বড়ই জবরদস্ত,
পুলিসেরা এর হাতে, কলের পুতুলের মত।

৭ম লোক। সভাপতি মশায় যদি হভেন শক্তমন,
তবে, সহিতে হত না অপমান এমন।
সভাপতি। আমিও প্রথমে ভারি রেগে উঠেছিলুম,
কিন্তু, কাদায় ঢিল ফেল্লে, গায়ে ছিটে লাগে,
এই ভেবে চেপে গেলুম।
আর এক কথা, চকিতের মত আমার মনে এলো,
নির্জনে বসে, লেখবার পড়বার সময় পাওয়া গেলো।

মনেতে সংকল্প কত রখেছিনু করে,

তাহার কারণ; বঙ্গদেশে গ্রীষ্মের সময়,
বই হাতে করলেই হয় নিদ্রার উদয় ;
আর, চিন্তাদেবী ধরা দিয়ে হন না সদয়
আর বরষার কালে,
দেখি ঘন মেঘজালে,
হৃদয় আমার স্থির নাহি রয়,
খালি মেঘদূত শ্লোক মনে হয়।

তাভিন্ন, বঙ্গদেশের জলহাওয়াটা ভিজে অতি ;
এখানে, উৎসাহী লোকের সর্ব্বদা থাকাই ক্ষতি,
দেখ দেখি বিধাতার কৌশল এমন,
আমার সংকল্প সিদ্ধ হইল কেমন।
তোমাদের কাছে, আগে চেয়েছিনু ছুটি দুইবার,
তোমরা বল্লে, আমা ভিন্ন চলবে না দিন একটি সভার।
বিধাতা লিপির উপর কথাটি না চলে আর!
আমার যাওয়াতে, তোমরা দুঃখ করোনা কিছু
এ দুই বছরে আমি বই লিখব অনেক উঁচু উঁচু।
বক্তৃতার চেয়ে পুস্তককে বড় বলে জান,
বক্তৃতার শব্দ শূন্যে হয় উড্ডীয়মান,
কিন্তু, পুস্তকের কথা নাহি হয় অবসান।

এটা জেন তোমাদের পরীক্ষা উপস্থিত,
তোমাদের ধৈর্য্যহীন হওয়া না হয় উচিত।
এখন, আমায় হৃষ্টমনে দাও তোমরা বিদায়,
আবার হইবে দেখা ভুল নাহি তায়।　　　সভা ভঙ্গ।

প্রোক্লামেশন্।

বিনয়ে সুধাও গিয়া সিংহাসন তলে।
মহাসভা-সভ্য সেই ইংরাজের দলে॥
প্রথমে বলেন রাণী যে সব বচন।
সাম্রাজ্ঞী রূপেতে পরে করান স্মরণ॥
সু-পুত্র সম্রাট হয়ে' দিয়াছেন রায়।
অক্ষরে অক্ষরে যাহা রহিবে বজায়॥
সেই সব বচনের প্রকৃত কি অর্থ।
হবে কি রক্ষিত তাহা কখন যথার্থ॥
মেনে ল'ব রাজবাক্য জ্ঞান করি বেদ।
শ্বেত কৃষ্ণে কিছু মাত্র রবে না প্রভেদ॥
বাজার গরম এই চাকরীর হাটে।
কোরা কালো বসে' যাবে ধলো গোরা-পাটে॥
করিয়া গোরার কাজ কালর বেতন।
হবে কি কখনো ঠিক গোরার মতন॥
মিষ্টার ফুলার যদি বধে কেষ্টা কুলি।
সত্য কি মরিবে গোরা ফাঁসী কাষ্ঠে ঝুলি॥
কেষ্টার ঘুষির বৃষ্টি নাশিলে ফুলার।
হবে কি সিদ্ধান্ত পিলে ফেটে ছিল তার॥
জিজ্ঞাসা করিও ভাল করে' কসামাজা।
ইংরাজ বণিক ছাড়া আর কে কে রাজা॥
মাঞ্চেষ্টার যদি হয় কেষ্টারে বিরূপ।
ভূপের ব্যবস্থা তাতে হইবে কিরূপ॥
মরে যদি কেষ্টা তাঁতি ক'রে কুলিগিরি।
তার পুত্র সূত্র-কর্ম্ম পাবে কিগো ফিরি॥

দুর্ভিক্ষ যদ্যপি দেশে ব্যাড়ে ব্যাড়া জাল।
তবু কি রপ্তানী বন্ধ হবে কভু চাল॥
অতি কচি ছেলেদের লুটিতে পকেট।
কত দিনে হবে বন্ধ আসা সিগারেট॥
কেবল পকেট নয় ইঁচড়ে বখাট।
দোকানে কোকেন চলে শীঘ্র আনে খাট॥
মরিলে কলুর কলু কেরোসিন তেলে।
কলুনীর চুলো কিগো রাজা দেবে জ্বেলে॥
কখন দেবেনা হাত ধর্ম্মেতে প্রজার।
এ কেমন কথা শুনি মুখেতে রাজার॥
অত্যাচার করিবেনা যদি অর্থ হয়।
জিজ্ঞাসিও সে কথা কি বেশী অতিশয়॥
"ডিফেনডার্ অফদি ফেথ" যাহার উপাধি।
কোন লাজে সে হইবে ধর্ম্মেতে বিবাদী॥
খৃষ্টানের মত পার্শী হিন্দু মুসল্‌মান্।
পাবে কি রাজার দ্বারে টান দান মান॥
ব্রহ্মহত্যা হয় যদি চীনের ক্যাণ্টনে।
যাবে কি শাসিতে চীনে গোরার পল্টনে॥
জাতি ধর্ম্ম বর্ণভেদ না করি বিচার।
বিস্তার কৌশলে পদ বাড়িবে প্রজার॥
বহুদিন হ'তে মনে আছে এক ধাঁধাঁ।
এ কথাটী কে কাহারে বলিতেছে দাদা॥
ইংরাজ জাতির ভাব,—ভু-পালের ভাব।
অমৃত সমান কথা শুনে হিন্দু দাস॥

এ বর্ণের অর্থ কিগো নহে চতুর্ব্বর্ণ।
যাদের পৈত্রিক সম্বন্ধে নাহি দিবে কর্ণ॥
"কাষ্ট ক্রিড্ কলারের" এই রূপ মানে।
এক বোকা করিয়াছে খামকা এখানে॥
মহা সভা-সভ্য দলে বোলো ভাল করে'।
বোকার বোকাত্ব যেন কার্য্যে দেন ধরে'॥
আরো নানা কথা আছে সেই ঘোষণায়।
তন্ন তন্ন মানে বুঝে এস সমুদায়॥
তাৎপর্য্যটী একবার হয়ে গেলে ধার্য্য।
কোন কার্য্যে ভবিষ্যতে হবনা আশ্চর্য্য॥
"রাইট রাইট" বলে না করে' চিৎকার।
মর্ম্মে মর্ম্মে কৃষ্ণ চর্ম্মে দানিব ধিৎকার॥
হিন্দুর চক্ষেতে রাজা দেব-শক্তি-ময়।
মারো কাটো ভালবাসো তবু গাব জয়॥

শ্রীঅমৃতলাল বসু।

সাময়িক কথা।

সম্প্রতি উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের ছোটলাট বাহাদুরের মন্ত্রণা-সভার সদস্য মাননীয়

রায় নেহাল চাঁদ বাহাদুরের প্রস্তাব।

শ্রীযুক্ত রায় নেহালচাঁদ বাহাদুর এতদ্দেশীয় ভিক্ষাজীবী ও সাধু সম্প্রদায়ের বিষয় সংক্রান্ত একখানি পুস্তিকা প্রণয়ন করিয়াছেন।

রায় বাহাদুর বলেন, বিগত ১৯০১ খৃঃ অব্দের আদমসুমারিতে দৃষ্ট হয়, ভারতবর্ষে হিন্দু ও মুসলমান ভিক্ষুকের সংখ্যা মোট ৫০ লক্ষের উপরে, ইহারা প্রকাশ্যভাবে ভিক্ষাবৃত্তি করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করে, ইহা ছাড়া আরও সহস্র সহস্র লোক, যাহাদের পেশা ভিক্ষা নহে তাহারাও রাস্তায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া ভিক্ষা করিয়া বেড়ায়, এই লক্ষ লক্ষ ভিক্ষুকের প্রায় তিন-চতুর্থাংশ পাঞ্জাবের লোক। ইহাদের দেহ বলিষ্ঠ, মুখে দুর্ব্বলতা বা ভগ্ন স্বাস্থ্যের কোন চিহ্ন নাই, ইহারা জোর করিয়া দাবী আদায় করিয়া লয়, এবং সময়ে সময়ে ভয় দেখাইতেও ত্রুটি করে না।

বাজে ভিক্ষুকের কথা ছাড়িয়া দিলেও, ৫০ লক্ষ খাঁটি ভিক্ষুকের অন্নবস্ত্র সংস্থানের জন্য ন্যূন পক্ষে গড়ে জন প্রতি তিন টাকা মাসিক ব্যয় ধরিয়া লইলে ভারতবর্ষকে মাসে মাসে ইহাদের জন্য ১½ কোটি টাকা ব্যয় করিতে হয়; রায় বাহাদুরের মতে এই টাকাটা বরং জলে ফেলিয়া দেওয়াও ভাল, তথাপি এই সাধু ও ভিক্ষুকদিগকে দেওয়া ঠিক নহে, কারণ ইহাদের দ্বারা জগতের অনিষ্ট ভিন্ন ইষ্ট-উৎপাদনের কোন সম্ভাবনাই নাই। ইহারা চুরি ডাকাতি প্রভৃতি সর্ব্ব প্রকার উপদ্রব ঘটাইয়া থাকে, পল্লীর শান্ত গৃহস্থকে ইহাদের ভয়ে সর্ব্বদা শঙ্কিত থাকিতে হয়,—সুতরাং এই সাধু ও ভিক্ষুকের দলকে আর প্রশ্রয় দেওয়া কোনরূপেই সঙ্গত নহে, ইহাদের উপর যে বিপুল অর্থ ব্যয় হয়, জাতীয় ক্ষতির হিসাবে তাহাই একমাত্র অহিত নহে, এই ৫০ লক্ষ লোক যদি ভিক্ষাবৃত্তি ত্যাগ করিয়া—কোন হিতকর বৃত্তি অবলম্বন করিত, তবে সমাজের অশেষ কল্যান সাধিত হইত।

রায় বাহাদুর সংকল্প করিয়াছেন, এই সাধু ও ভিক্ষুকের দলের বিরুদ্ধে আইন করিবার জন্য উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের ছোটলাটের সভায় প্রস্তাব উপস্থিত করিবেন। তাঁহার মতে এই প্রকার সাধু ও ভিক্ষুকের বৃত্তি হিন্দু বা মুসলমানের ধর্ম্মের

অনুমোদিত নহে। মনুর মতে বার্দ্ধক্যের পূর্ব্বে ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণ অসিদ্ধ। যাঁহারা বিদ্যা বা ধর্ম্মচর্চ্চায় জীবন অতিবাহিত করেন, অথবা রুগ্ন বা অসমর্থ, মনু তাহাদিগকেই প্রকৃত দানের পাত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যাহারা ধর্ম্মের ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া নিরীহ গৃহস্থকে পীড়ন করে, তাহারা ধর্ম্মানুসারে দণ্ডার্হ। বিশেষতঃ অজাতশ্মশ্রু বালকদের সাধু সাজিবার অধিকার কোন ধর্ম্মে নাই।

গবর্ণমেণ্ট আমাদের সমাজ ও ধর্ম্মসংক্রান্ত কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন না, কিন্তু নিতান্ত প্রয়োজন হইলে গভর্ণমেণ্ট উদাসীন থাকিতে পারেন না। সতীদাহ, গঙ্গায় শিশুসন্তান বিসর্জ্জন, সম্মতির বয়সনির্দ্ধারণ প্রভৃতি কতকগুলি ব্যাপারে গভর্ণমেণ্ট হস্তক্ষেপ করিতে বাধ্য হইয়াছেন, এই সাধুগণের হস্ত হইতে ভারতকে উদ্ধার করাও সেইরূপ প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিয়াছে।

রায় বাহাদুর এতৎসম্বন্ধে ইংরাজী ও উর্দ্দু ভাষায় তিন শত পত্র ছাপাইয়া বন্ধু বান্ধব ও গণ্য মান্য ব্যক্তিগণের মধ্যে বিলি করিয়াছেন, তিনি এতৎসম্বন্ধে একখানি বড় পুস্তক রচনা করিয়াছেন, তাহাও শীঘ্র প্রকাশিত হইবে বলিয়া আশা দিয়াছেন। তিনি ছোটলাটের সভায় এই ভাবের বিল উপস্থিত করিতে ইচ্ছুক।

১। ২১ বৎসরের নিম্নে কেহ ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিতে পারিবে না।

২। যদি কোন পিতা বা অভিভাবক অপ্রাপ্তবয়স্ক বালককে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিতে ছাড়িয়া দেন, তবে তাঁহারা দণ্ডনীয় হইবেন।

৩। এই দুই অপরাধ প্রমাণিত হইলে ১০৲ টাকা জরিমানা হইবে।

৪। যদি কোন ভিক্ষুকের দলে এরূপ অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক থাকে এবং ইহা প্রমাণ হয় যে, সে ব্যক্তি ঐ বালকের আইনসঙ্গত অভিভাবক নহে, তবে তাহাকে সেই আশ্রয় হইতে উঠাইয়া লইয়া কোন অনাথাশ্রমে রাখা হইবে।

৫। এই সকল বালকের শিক্ষা দীক্ষার জন্য স্থানে স্থানে অনাথাশ্রম প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করা হইবে।

অযোধ্যার রাজা স্যার প্রতাপ নারায়ণ বাহাদুর এই সংকল্প অবগত হইয়া অনেক সাধুবাদ দিয়াছেন এবং আরও একটু অগ্রসর হইয়া বলিয়াছেন,—ন্যায়সঙ্গত বা অন্যায়সঙ্গত যে উপায়েই কোন গুরু চেলা সংগ্রহ করিবেন, তাঁহারও দণ্ড পাইতে হইবে এবং কোন ভিক্ষুক ঘুরিয়া ঘুরিয়া ভিক্ষা না করিতে পারে, তজ্জন্যও আইন করা উচিত।

নেহালচাঁদ বাহাদুরের এই অভিপ্রায় সমর্থন করিয়া অযোধ্যার উপাধিপ্রাপ্ত রাজা বাহাদুর সার প্রতাপনারায়ণ রায়, শ্যামসুন্দর লাল বাহাদুর সি, আই, ই, মলভি মকসদ আলি খাঁ—ডিপুটি কলেক্টার, বাবু তুলসি রাম ডিপুটি কলেক্টার প্রভৃতি গভর্ণমেণ্টের সম্মানপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ ও কর্ম্মচারীগণ পত্র লিখিয়াছেন—রায় নেহালচাঁদ বাহাদুর সেগুলি তাঁহার পুস্তিকায় ছাপিয়া দিয়াছেন।

সত্য কথা বলিতে কি রায় বাহাদুরের এই প্রস্তাব এবং এতৎসম্বন্ধে উদ্যোগাদি দেখিয়া আমরা কিছুমাত্র উৎসাহ বোধ করিতেছি না। যে জিনিস ভাল তাহারই ভেল থাকে,—ভারতের সাধুগণ জগতের পূজনীয়। যদি শত শত সাধুনামধারী অসাধুর মধ্যে একটী সাধু থাকে তবে তাহাই আমাদের যথেষ্ট লাভ। য়ুরোপের বিপুল বৈজ্ঞানিক পাঠশালাগুলি হইতে যেরূপ বহু সহস্র অকৃতী শিক্ষার্থীর মধ্যে একটী নিউটন, পাস্কেল কিম্বা এডিসন আবির্ভাব হইলে সেগুলি সার্থক হয়, সেইরূপ ব্রহ্মচর্য্যের অনুশীলনের উপযোগী যে সকল আড্ডা ভারতবর্ষ জুড়িয়া আছে, তাহারাও নানারূপ নিরুৎসাহকর উপাদানের মধ্যে ভাস্করানন্দ কিম্বা তৈলঙ্গস্বামীর ন্যায় মহাপুরুষের প্রতীক্ষা করিয়া থাকে, সেইরূপ মহাপুরুষের আবির্ভাব সাধুগণের আড্ডাতেই সম্ভব। সাধুরা অসাধুবৃত্তি করিতেছে সত্য, কিন্তু খাঁটি সাধু নাই একথা কেহ অঙ্গীকার করিয়া বলিতে পারিবেন না, যাঁহারা আছেন তাঁহারা জগৎপূজ্য।—সমস্ত সাধুর আড্ডা ভাঙ্গিয়া দেওয়া ভারতবর্ষ কখনই সহ্য করিবেন না, কারণ সেই সকল আড্ডাতেই ভারতের প্রকৃত শক্তি ও পুণ্য সঞ্চিত রহিয়াছে। ডাকাত সাধুকে ফাঁসি দাও তজ্জন্যত আইন রহিয়াছে, সে আইন নূতন করিয়া বিধিবদ্ধ করিবার প্রয়োজন কি? রত্নের খনি অধিকাংশ হীন কয়লায় পূর্ণ বলিয়া সেই খনিগুলি বিনষ্ট করিবার ব্যবস্থা উচিত নহে।

বাল্য হইতে ব্রহ্মচর্য্যে দীক্ষিত না হইলে একুশ বৎসরের মধ্যে লোকের গৃহস্থ হইয়া পড়া স্বাভাবিক, সুতরাং বয়সের যে সীমা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহাতে আর কেহ সাধু হইতে পারিবেন না, বিশেষ অযোধ্যারাজের প্রস্তাবানুসারে ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা দিলেও গুরু দণ্ডনীয় হইবেন,—ইহাতে সাধুকুল নির্ম্মূল করিবার আর কোন অনুষ্ঠান বাকী রহিল না।

সাধুরা বলিষ্ঠ ও সুস্থ দেহ, তজ্জন্য দুঃখ কেন? ত্রিশকোটি অর্দ্ধাশন প্রাপ্ত দাস-বৃত্তি অবলম্বী, কেরাণীপদপ্রার্থী দুর্ভাগ্যের গণ্ডী বাড়াইয়া কি লাভ হইবে?

যাহারা এই পরমুখাপেক্ষী হীন জীবনের কলঙ্কিত বায়ু হইতে—দূরে একটু স্বাধীনভাবে জীবনযাপন করিতেছে, যাহারা অবিবাহিত সুতরাং কোনরূপ উৎকৃষ্ট দীক্ষার জন্য অনায়াসে প্রস্তুত হইতে পারে, তাহাদিগকে টিকি ধরিয়া অনাথাশ্রমে আনিয়া কেরাণীগিরির জন্য প্রস্তুত করিলে ভারতবর্ষ সবল হইবে কি দুর্ব্বল হইবে, তাহা ভাল করিয়া বিবেচনা করা উচিত।

এই সাধুসম্প্রদায় ভারতের পল্লীগ্রামের ধর্ম্ম-বিশ্বাস জীবন্ত করিয়া রাখিয়াছেন; ইহাঁরা কেরানী সাজিয়া উৎকোচ গ্রহণ করিবেন, পুলিসে কর্ম্ম লইয়া দস্যুবৃত্তি করিবেন,—তাহাতেই বা জাতির কি উন্নতি হইবে? আফিসে কর্ম্মপ্রার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি হইবে এবং ইহাঁরা সন্তানসন্ততি বৃদ্ধি করিলে বাজারে অন্ন ও রুটির মূল্য দ্বিগুণ বাড়িয়া যাইবে। তাহা হইতে ইহাঁরা যে ধর্ম্ম-শিক্ষায় অন্ততঃ ভাণ করিয়াও সংসার হইতে বাহির হইয়া পড়িয়াছেন—সেই ভাণ ঘুচাইয়া খাঁটি ধর্ম্মের শিক্ষা ইহাদিগকে প্রদান করিবার ব্যবস্থা করিলে সেইরূপ সংস্কারে দেশের প্রকৃত উপকার হইবে। আজিও সাধুর কথায় সমস্ত ভারতবর্ষ সাড়া দেয়, যদি সাধুর প্রকৃত সাধুত্ব হয়, তবে ভারতের কল্যাণ অনিবার্য্য, সাধুর আড্ডায় ডাকাতের মত পড়িয়া গভর্ণমেণ্টের আইন কানুন ও শান্ত্রী পাহারা লইয়া—উহা ধ্বংস করিবার ব্যবস্থার কথা শুনিলে সমস্ত ভারতবর্ষ শিহরিত হইয়া উঠিবে।—কুম্ভমেলায় যে সকল সাধুর সমাগম হয়, তাঁহাদের মধ্যে জগৎদুর্লভ চরিত্রের দৃষ্টান্ত এখনও বিরল নহে, যে শৃঙ্খলা ও শান্তির দৃশ্য তখন প্রকটিত হয়, তাহা অপূর্ব্ব,—তাহা না দেখিয়া কেহ কল্পনা করিতে পারেন না।—সাধুদিগকে উৎপীড়ন করিলে, ভারতের শীর্ষস্থানে বেদনা অনুভূত হইবে। চোর ডাকাত ধরিবার জন্য ডিটেকটিভ ডিপার্টমেণ্ট লাগিয়া পড়িয়া আছেন, তজ্জন্য নেহাল চাঁদ রায় বাহাদুরের ভাবিবার কোন কারণ নাই। আর এদেশে বিলাতের মত সরকারী গরীবখানা নাই; যাহারা দুঃখী তাহাদের পথে আসিয়া দাঁড়াইতে হইবে, কিম্বা অন্নবস্ত্রের জন্য লোকের দ্বারে দ্বারে যাইতে হইবে, নতুবা তাহারা কোথায় যাইবে? আজিও এদেশে গৃহস্থ গরীবকে এক মুষ্টি অন্ন দিয়া হস্ত পবিত্র করিয়া থাকে, কোন উৎসব উপলক্ষে কাঙ্গালীরা দ্বারে দ্বারে কদলীপত্র লইয়া বসিয়া পড়ে,—গরীবখানা অপেক্ষা লোকের এইরূপ ব্যক্তিগত দানশীলতা সমাজের পক্ষে কল্যানকর, দাতা ও গৃহীতা উভয়ে সক্ষাৎ সম্বন্ধে পরস্পরের সম্পর্কে আসিয়া ধন্য হইয়া থাকে—আর যদি বলিষ্ঠ কেহ ভিক্ষা করিতে

আসে তবে একথাও মনে হইতে পারে, নিরাশ্রয় দুর্ভিক্ষপীড়িত বহুপোষ্য হয়ত তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া আছে, আজকালকার কর্ম্মবিরলতার দিনে তাহার বাহুবল হয়ত উপার্জ্জনের পন্থা খুঁজিয়া পায় নাই,—সুতরাং দরিদ্র ব্যক্তির সম্বন্ধে কোন পাশব শক্তি প্রয়োগ বা আইন বিধিবদ্ধ করিবার পূর্ব্বে অনেকটা ভাবিয়া দেখা উচিত। যেখানে কেহ সত্য সত্যই প্রতারণা করিতেছে সেখানেও তুমি এক মুষ্টির বেশী ক্ষতি স্বীকার করিতেছ না,—এবং প্রতারককে শাস্তি দেওয়ার অধিকারও তোমার আছে, এমতবস্থায় আমাদের দেশের একান্নভুক্ত বৃহৎ পরিবারের দারিদ্র্যের সমস্যা উৎকৃষ্টরূপ পর্য্যালোচনা না করিয়া—দরিদ্রের বিরুদ্ধে আইন করিবার প্রস্তাব অতি অসঙ্গত। যাহারা আমাদের দেশে ভিক্ষা করিতেছে—তাহারাই শুধু এদেশের প্রকৃত দরিদ্র নহে, বহু বুভুক্ষিতের উদরের জ্বালা গৃহ-প্রাচীরের বাহিরে ব্যক্ত হয় না, লজ্জায় বহুলোক স্বীয় দুরবস্থা কাহাকেও না জানাইয়া নানারূপ কষ্ট পাইতেছে—এই দারিদ্র্যপীড়িত দুঃখময় ভারতবর্ষে দরিদ্রের ভিক্ষা চাওয়ার ক্ষমতা লোপ করা ও তাহাকে গলা টিপিয়া মারিয়া ফেলা তুল্য। রায় বাহাদুরের অর্থের অংশ দরিদ্রগণের হিতার্থে ব্যয়িত হইতে দেখিলে আমরা সুখী হইতাম, দরিদ্র দলনের জন্য গভর্ণমেন্টের শরণাপন্ন হওয়া বড়ই বিসদৃশ—এমন কি নৃশংস বলিয়া মনে হয়।

গ্রন্থ সমালোচনা।

ভগবদ্গীতা, শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক বাঙ্গালা পদ্যে অনুবাদিত।

অনুবাদক পুস্তকের প্রারম্ভে একটি সুদীর্ঘ ভূমিকা লিখিয়াছেন, তাহাতে গীতার কাল, এবং গীতোক্ত ধর্ম্ম সম্বন্ধে বিস্তারিত গবেষণা আছে। অনুবাদ ও ভূমিকা পাঠে দেখা যায় সত্যেন্দ্র বাবু গীতার প্রতি ভক্তের ন্যায় শ্রদ্ধাযুক্ত, গীতার উপাসনায় ইনি কাহারও অপেক্ষা ন্যূন আগ্রহ দেখান নাই, অথচ ভক্তির উচ্ছ্বাসে ইনি ঐতিহাসিকের চক্ষু দুইটি হারাইয়া বসেন নাই। গীতার কালনির্ণয় প্রসঙ্গে ইনি স্বর্গীয় কাশীনাথ ত্র্যম্বক তিলাঙ্গ, বঙ্কিম বাবু প্রভৃতি মণিষীগণের মত উদ্ধার করিয়া বিচার করিয়াছেন; তিনি বাণভট্ট ও কালিদাসের গ্রন্থ হইতে উদাহরণস্বরূপ শ্লোক উদ্ধার করিয়া দেখাইয়াছেন, খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে গীতা বিদ্যমান ও বিশেষরূপে আদৃত ছিল, যদিও তিলাঙ্গের উদ্ধৃত ব্রহ্মসূত্রের প্রমাণ তিনি অগ্রাহ্য করিয়াছেন, তথাপি মোটের উপর গীতার কাল সম্বন্ধে তাঁহার মতে সায় দিয়াছেন, খৃষ্ট জন্মিবার ২।৩ শতাব্দী পূর্ব্বে গীতা রচিত হইয়াছিল, ইহাই সিদ্ধান্ত। মূল মহাভারতে গীতা ছিল কিনা এ সম্বন্ধে তর্ক উত্থাপিত হইয়াছে, সত্যেন্দ্র বাবু মনে করেন গীতা মহাভারতের পরবর্ত্তী কালে যোজিত হইয়াছে। তাঁহার মতে মহাভারতে এরূপ প্রমাণ পাওয়া যায় যাহাতে শ্রীকৃষ্ণ প্রথমতঃ মানুষ তৎপরে মহাপুরুষ এবং শেষে স্বয়ং ভগবানের অবতার রূপে লোকের ধারণা হইয়াছিল। মহাভারত বহুকাল ব্যাপিয়া বর্ত্তমান আকারে সঙ্কলিত হইয়াছিল, ত্রিবিধযুগের এই ত্রিবিধ প্রচলিত বিশ্বাসের ক্রম পর্য্যায় অনুসন্ধান করিলে মহাভারতেই পাওয়া যাইবে। অবতারবাদ বৌদ্ধধর্ম্ম হইতে গৃহীত এবং গীতায় যখন শ্রীকৃষ্ণ ভগবান রূপে কল্পিত হইয়াছেন, তখন মহাভারতের গীতাভাগ বৌদ্ধযুগের সংযোজনা, সত্যেন্দ্র বাবুর এই মত। মতামত সম্বন্ধে অনুকূলতা ও প্রতিকূলতা উভয়ই থাকিবে, কিন্তু গ্রন্থকার যেরূপ ধীর বিচক্ষণতার সহিত বিচার করিয়াছেন, তাহা অতীব প্রশংসনীয়। তৎপরে গীতার জ্ঞান, কর্ম্ম, ভক্তি ও দর্শনাংশ লইয়া বিস্তারিত আলোচনা আছে, তাহা অতি সরস ভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। গীতার এক বিষয়ে প্রাধান্য অবশ্যই স্বীকার করিতে

বিশিষ্টাদ্বৈত, নিরাকার সাকার, সগুণ, নির্গুণ প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার মতের সমর্থক যুক্তি পাওয়া যায়,—এমন কি জন্মান্তরবাদ সম্বন্ধেও ইহার মধ্যে অনুকূল ও প্রতিকূল উভয়বিধ প্রমাণ পাওয়া যায় এরূপ শুনিয়াছি, সুতরাং এক বিষয়ে গীতা আমাদিগকে যাহা দিয়াছে, অন্য কোন ধর্ম্মগ্রন্থ তাহা দেয় নাই, পৃথিবীর সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্মমতের বিরোধ গীতা ভঞ্জন করিয়া দিয়াছে। ইহার সমুচ্চ দার্শনিক বেদী হইতে এই গ্রন্থ সমস্ত জগতকে আহ্বান করিয়া বলিতেছে, যে যেভাবে প্রীতি ও শ্রদ্ধার সহিত দেবসেবা করিতেছে, সকলের জন্যই স্বর্গের পথ উন্মুক্ত। এই বাণী হিন্দুধর্ম্মের পরম বাণী, এই বাণীর প্রভাবে হিন্দুস্থানে ধর্ম্মবৈরের শেষ স্ফুলিঙ্গ নিবিয়া গিয়াছে, পাদ্রী যখন আমাদিগকে গালাগালি দেয় তখন আমরা তাহার প্রত্যুত্তর গাহিয়া জিহ্বা কলঙ্কিত করি না।

অনুবাদ অতি চমৎকার হইয়াছে, বাঙ্গালা পয়ার ও ত্রিপদী প্রভৃতি সরলচ্ছন্দে গীতামাহাত্ম্য এভাবে আর কোন পুস্তকে ধরা দেয় নাই,—আমরা একটি স্থল উদ্ধৃত করিলাম—

"দেখ পার্থ দেখ চেয়ে শতরূপ সহস্র প্রকার,
নানাবর্ণে বিভূষিত, জ্যোতির্ম্ময় বিচিত্র আকার।
দেখ সূর্য্য, বসু, রুদ্র, দেখ যুগ্ম অশ্বিনী কুমার,
কখন যা দেখ নাই, বহুরূপ চিত্র চমৎকার।
একত্রিত এক ঠাঁই সমুদয় বিশ্ব চরাচর,
দেখ যাহা ইচ্ছা তব, মম দেহে হে গুরে গুর।
তোমার এ চর্ম্ম চক্ষে এ দৃশ্য না আসিবে কখন,
দিব্য চক্ষু করি দান হবে তাহে সুলভ দর্শন।

এই পুস্তকের বাঁধাই ও সাজ সজ্জা বড় সুন্দর হইয়াছে। প্রবীন গীতাকে এই নবীন পোষাকে বড় মানাইয়াছে।

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন।

যশোহর।

ত্রিশত বৎসর আগে যে জয়পত্রিকা,
উড়েছিল মহাতেজে বাঙ্গালার শিরে,
বীরত্ব গৌরবদৃপ্ত যেই রাজটীকা
শোভেছিল ধন্য করি এই বাঙ্গালীরে ;
তাহারি মহিমাস্মৃতি যশোপ্রভোজ্জ্বল
আজো জ্বলে তব বক্ষে, নয়নরঞ্জন
—অতীতের কীর্ত্তিগাথা সাক্ষী অচঞ্চল,
করে আজ বাঙ্গালীর কলঙ্ক ভঞ্জন।
বাঙ্গলার কুরুক্ষেত্র ! বঙ্গবীরাশ্রিত,
যে যশোর ! বহুদিন তুমি অনাদৃত ;
তবু তব গরীয়সী স্মৃতির সম্পদে
মহাধনী বঙ্গবাসী, বাচ্য বীর পদে !
এক কালে হ'রেছিলে সবাকার যশ
হে যশোর ! আজি হ'র বঙ্গঅপযশ !

তুকারামের আত্মকাহিনী।

তুকারাম জাতিতে শূদ্র ছিলেন, শস্য-ব্যবসায়ের দ্বারা তাঁহার জীবিকানির্ব্বাহ হইত। পুণা হইতে আট ক্রোশ উত্তর-পশ্চিমে, দেহুগ্রামে ১৬০৮ খৃষ্টাব্দে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মহারাষ্ট্রাধিপতি শিবাজি ও শিবাজির গুরু রামদাসের সমসাময়িক। তুকারামের বংশ, পুরুষানুক্রমে পণ্ঢরপুরস্থ বিঠোবা-দেবের ভক্ত। তাঁহার পিতার নাম বহ্লজি। বহ্লজীর বার্দ্ধক্য উপস্থিত হইলে, তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র সাবাজির উপর সংসারের ভার দিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। কিন্তু ধর্ম্মের দিকে তাঁহার মন থাকায়, তিনি সাংসারিক কার্য্যে নিযুক্ত হইতে অস্বীকৃত হইলেন। তখন বহ্লজী তাঁহার মধ্যম পুত্র তুকারামকে কাজকর্ম্মে দীক্ষিত করিলেন। ত্রয়োদশ বৎসর বয়ঃক্রমকাল হইতে কিছুকাল পর্য্যন্ত তুকারাম সাংসারিক কাজকর্ম্ম সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। তুকারামের দুই স্ত্রী ছিল—রুক্মাই ও জিজাই। তুকারামের যখন বিশ বৎসর বয়স তখন রুক্মাইর মৃত্যু হয়। সেই বৎসর তাঁহার একপুত্রও কালগ্রাসে পতিত হয়। ইতঃপূর্ব্বে তাঁহার পিতামাতা ও ভ্রাতৃজায়াও ইহলীলা সম্বরণ করেন। তাহার ভ্রাতাও গৃহ ছাড়িয়া তীর্থযাত্রায় বহির্গত হয়েন। তাহার পর, দেশে একটা দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়; এই দুর্ভিক্ষে তাঁহার ব্যবসায়ে বিস্তর ক্ষতি হইল,—তিনি সর্ব্বস্বান্ত হইলেন। এই সময়ে তিনি সংসারে বিরাগী হইয়া দেহুগ্রামে বিঠোবার আরাধনায় নিযুক্ত হইলেন। কি হেতু তিনি এই পথের পথিক হইলেন—তাঁহার সহভক্ত ভ্রাতৃগণ তাঁহাকে প্রশ্ন করায়, তিনি তাঁহার কোন একটা অভঙ্গে * আত্মকাহিনী

---

* তুকারামের রচিত পদাবলীর নাম "অভঙ্গ"; ইহা অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত। ইহা ভক্তিরসাত্মক বিবিধ তত্ত্বকথায় পরিপূর্ণ। এই অভঙ্গ-রচনায় তাঁহার এতটা অভ্যাস ছিল যে, কীর্ত্তন-কালে উহা মুখেমুখে রচনা করিয়া অনর্গল বলিতে পারিতেন।

যেরূপ সংক্ষেপে ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহারি যথাযথ অনুবাদ নিম্নে দিলাম।

* শূদ্রবংশে জন্ম মোর, করি ব্যবসায় ;
কুলপূজ্য আমাদের বিঠোবা-ঠাকুর।
বলাটা উচিত নহে—কিন্তু সাধুগণ !
তোমরা করিছ প্রশ্ন—পালিব বচন।
অতি দুঃখে দুঃখী আমি হইনু সংসারে
মা-বাপ মরিলা যবে ; দুর্ভিক্ষ-অকালে
নিঃশেষ হইল অর্থ, হারাইনু মান।
"হা অন্ন ! হা অন্ন !" করি' মরে পত্নী এক ;
পেনু লজ্জা ; এই দুঃখে ফাটিল পরাণ।
দেখিলাম ব্যবসায়ে হইতেছে ক্ষতি ;
ভগ্ন দেবালয়ে আসি করিলাম বাস।
কীর্ত্তন করিনু সুরু একাদশ দিনে ;
না ছিল অভ্যাস আগে ; করিনু কণ্ঠস্থ
সাধুদের পদাবলী সাদর বিশ্বাসে।
গান যবে হ'ত—আমি ধরিতাম ধুয়া
চিত্তশুদ্ধি করি' ভাবে ; তীর্থসম সাধুদের
সেবিতাম পদযুগ লজ্জা করি' দূর।
যথাসাধ্য করিতাম পর-উপকার

বিশেষত্ব এই যে, উহাতে কবির ব্যক্তিগত ভাব মুদ্রিত। তাঁহার মনে যখন যে ভাবের উদয় হইত,—তিনি অভঙ্গ রচনা করিয়া তাহা ব্যক্ত করিতেন। ইহাতে পদলালিত্য ও বিশেষ কবিত্বের ঘটা না থাকিলেও, ভক্ত হৃদয়ের অকৃত্রিম উচ্ছ্বাস বলিয়াই ইহা এত হৃদয়গ্রাহী। মহারাষ্ট্র দেশে এই জন্যই ইঁহার এত আদর। বঙ্গদেশে যেরূপ রামপ্রসাদ, উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে যেরূপ তুলসি দাস, মহারাষ্ট্রদেশে সেইরূপ তুকারাম।

খাটায়ে শরীর নিজ ; না মানিনু আমি
সুহৃদ্ জনের বাক্য ; সমস্ত সংসারে
হইল বিতৃষ্ণা ঘোর ; মনেরে করিনু
সত্যাসত্যের সাক্ষী, গ্রাহ্য না করিয়া
বহুজন মতামত ; করিনু গ্রহণ
স্বপ্নে গুরু-উপদেশ ; ধরিলাম নাম *
দৃঢ় বিশ্বাসের ভরে ; হ'ল তারি পরে
কবিত্ব-স্ফূরতি মোর ; ধরিলাম চিতে
বিঠোবার পা-দুখানি ; পাইনু আঘাত
কোন নিষেধ বচনে ; কিছুকাল তরে
হইলাম মর্ম্মাহত ; কবিতার পুঁথি
ডুবাইয়া নদী জলে ধন্না দিনু বসি' ;
তখন দিলেন শান্তি মোরে নারায়ণ।
বিস্তারি' কহিতে গেলে হইবে বিলম্ব,
— থাক্ আজিকার মত ; দেখিছ তোমরা
—যে ভাবে এখন আছি ; কি হইবে পরে
—জানেন বিঠোবা দেব ; কৃপাময় হরি
না করেন ভক্তজনে উপেক্ষা তিলেক
—জানিতে পেরেছি আমি ; তুকারাম বলে,
যে বোল্ বলান্ মোরে দেব পাণ্ডুরং
তাই মোর একমাত্র জীবন-সম্বল।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

---

* নাম-কীর্ত্তন চৈতন্যদেবই প্রথম প্রচার করেন। এই চৈতন্যধর্ম্ম বোধ হয় মহারাষ্ট্রদেশেও এক সময়ে প্রচারিত হইয়াছিল। "বাবাজি" নামে কোন ব্যক্তি তুকারামের নিকট স্বপ্নে আবির্ভূত হইয়া, "রাম, কৃষ্ণ, হরি" এই মন্ত্রে তাঁহাকে দীক্ষিত করেন এবং রাঘব-চৈতন্য ও কেশব-চৈতন্যকে গুরু বলিয়া মানিতে উপদেশ দেন। ইহাতেই বোধ হয়, মহাপ্রভু চৈতন্যের নামে, চৈতন্যের কোন শিষ্য মহারাষ্ট্রদেশে বৈষ্ণব-ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত সারদা চরণ মিত্র মহাশয় এই সম্বন্ধে বোধ হয় আমাদের কৌতূহল চরিতার্থ করিতে পারিবেন।

পাণিনি-তত্ত্ব।

লিপি-প্রণালী।

"যেন ধৌতা গিরঃ পুংসাং বিমলৈঃ শব্দ বারিভিঃ।
তস্মৈ পাণিণায় নমঃ"॥

ভারতীয় পুরাতত্ত্বানুসন্ধানের জন্য অধুনা অনেকেই বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন। ইহাতে আমাদের মনে অনেক আশার সঞ্চার হইয়াছে। হয়ত এই উপলক্ষে অশেষ জ্ঞান-ভাণ্ডারস্বরূপ পুরাতন সংস্কৃত গ্রন্থের প্রচুর অধ্যয়ন অধ্যাপনা পুনঃ-প্রবর্ত্তিত হইতে পারে। বাস্তবিক পক্ষে, ঐ সকল পুস্তকের যথাযথ অধ্যয়ন অধ্যাপনা ব্যতীত, ভারতের প্রাচীনতত্ত্ববিষয়ক কোনরূপ মতামত স্থির করিবার উপায়ান্তর নাই। প্রায় দুই শত বৎসর হইতে ইউরোপে ভারতীয় পুরাতত্ত্বানুসন্ধানের চেষ্টা আরব্ধ হইয়াছে তদুপলক্ষে বহুসংখ্যক সংস্কৃত পুস্তকের সংগ্রহ, মুদ্রাঙ্কন ও ভাষান্তর সম্পাদিত হইয়াছে। অনেক পুস্তক ও প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছে। কিন্তু মূল সংস্কৃতপুস্তকগুলি যথাযথ অধীত না হওয়ায়, এবং তর্ক-শাস্ত্রের সমুচিত মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া তাহার সমালোচনার চেষ্টা না করায়, পাশ্চাত্য পণ্ডিতবর্গের প্রচারিত অনেক সিদ্ধান্তই দোষশূন্য বলিয়া গ্রহণ করিতে সাহস হয় না। আমাদের দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের নিকট অনেক বিষয়ে ঋণী হইলেও, সংস্কৃতগ্রন্থনিহিত তত্ত্ব সম্বন্ধেও বিদেশ হইতে ঋণ গ্রহণ করিয়া অনর্থক ঋণভার বৃদ্ধি করেন, ইহা বাঞ্ছনীয় নহে। সংস্কৃত গ্রন্থ ও তদন্তর্নিহিত তত্ত্বগুলি আমাদের পৈত্রিক সম্পত্তি। তাহার জন্য বিদেশীয় লোকের মুখাপেক্ষী হওয়া নিতান্ত লজ্জার বিষয়।

অধুনা বাঙ্গালা মাসিক পত্রের ঐতিহাসিক প্রবন্ধে ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সম্বন্ধে অনেক মতামতের অবতারণা দেখা যাইতেছে। তাহাতে সাধারণতঃ ঐ পাশ্চাত্য মতেরই পুনরুক্তির পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহা আমাদের বিশেষ গৌরবের বিষয় নহে। আমাদের স্বদেশীয় সুধীগণ যখন মূলগ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া, উপযুক্ত তর্কপদ্ধতির সাহায্যে, কোনও বিষয়ে মতামত প্রকাশ করিবেন, তখনই তাঁহাদের কথার সমুচিত সমাদর হইবে। নতুবা কেবল নামের গৌরবে, মতের গৌরব দীর্ঘকাল প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারিবে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ পাশ্চত্য পণ্ডিতবর্গের মধ্যে একজন খ্যাতনামা পণ্ডিতের একটী মত এই প্রবন্ধে সংক্ষেপে আলোচিত হইতেছে। পাঠকগণ তাহাতেই বুঝিতে পারিবেন, অবিচারিত ভাবে সমস্ত পাশ্চাত্য মত গ্রহণ করা কতদূর সঙ্গত!

এইস্থলে আরও একটা কথার উল্লেখ করিতে হইতেছে পাশ্চাত্য পণ্ডিতবর্গ আমাদের প্রসিদ্ধ পুরাতন গ্রন্থগুলির রচনাকাল নির্ণয়ের জন্য বিশেষ প্রয়াস স্বীকার করিয়া থাকেন। কিন্তু সর্ব্বত্র আশানুরূপ ফললাভ করিতে পারিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না। আমাদের পুরাতন গ্রন্থকারগণ গ্রন্থরচনার কালনিরূপণের বিশেষ কোন প্রমাণ রাখিয়া যান নাই। বরং অধিকাংশ স্থলে তাঁহারা আত্ম-পরিচয় পর্য্যন্তও প্রদান করেন নাই। ইহা ভিন্ন, বহুকাল পর্য্যন্ত তাঁহাদের রচিত গ্রন্থগুলি হস্তলিপি সাহায্যে রক্ষিত হইয়া আসিয়াছে বলিয়া অনেক স্থলে কালক্রমে অনেক প্রক্ষিপ্তাংশ সংযুক্ত হইয়াছে। এই সকল ও অন্যান্য কারণে ঐ সকল গ্রন্থের রচনাকাল নির্ণয় করা একরূপ অসাধ্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ এই সকল বাধাবিপত্তি থাকিতেও, এই কার্য্যে অগ্রসর হইয়া, এক একজন একই বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন।

পাণিনি-ব্যাকরণ বলিলে পাণিনিমুনিকৃত "অষ্টাধ্যায়ী" ব্যাকরণ বুঝায়। ঐ ব্যাকরণের আটটি "অধ্যায়" ও প্রত্যেক অধ্যায়ের চারিটি "পদ" আছে। এইরূপে সমগ্র ব্যাকরণ আট "অধ্যায়" ও বত্রিশ "পাদে" বিভক্ত। পাণিনি-ব্যাকরণের সূত্রমাত্রেই রচনা করিবার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়; তিনি স্বকৃত সূত্রের সহিত কোন বৃত্তি বা উদাহরণ সংযোগ করিয়াছিলেন কি না, তাহার কোন সন্ধান প্রাপ্ত হওয়া যায় না। এক্ষনে যে "অষ্টাধ্যায়ী" প্রচলিত আছে তাহার সূত্রসংখ্যা ৩৯৯৬।* তাহার মধ্যে প্রায় পাঁচশত সূত্র স্বর-বিষয়ক; তজ্জন্য তাহা সাধারণত এর "স্বরসূত্র" নামে কথিত হইয়া থাকে। সংস্কৃতশব্দগুলি সাধারণতঃ দুইভাগে বিভক্ত;—বৈদিক ও লৌকিক। বৈদিক শব্দগুলি কেবল বেদেই নিযুক্ত ছিল; অন্যত্র প্রযুক্ত হইত না। লৌকিক শব্দগুলি লোকে অর্থাৎ সাধুসমাজে প্রচলিত ছিল; এবং তাহা স্থলবিশেষ ভিন্ন, বেদেও ব্যবহৃত হইত। লৌকিক শব্দ "ভাষা" নামেও পরিচিত ছিল। প্রত্যেক শব্দই বিশেষ বিশেষ স্বর আশ্রয়ে উচ্চারিত হইত। ঐ স্বর তিনটি;—উদাত্ত, অনুদাত্ত, স্বরিত। পাণিনি লৌকিক ও বৈদিক উভয়বিধ শব্দেরই ব্যাকরণ রচনা করিয়াছিলেন। "ভাষা" হইতে বহুকাল স্বরের ব্যবহার বিলুপ্ত হইয়াছে। বঙ্গদেশে বৈদিকশব্দ পর্য্যন্তও স্বর ব্যতীত উচ্চারিত হইয়া থাকে। পাণিনি-ব্যাকরণের আরম্ভেই

অথ শব্দানুশাসনং

বলিয়া একটী প্রতিজ্ঞা আছে। তাহার পর প্রত্যাহারের চতুর্দ্দশটী সূত্র আছে। তাহা "মাহেশ্বর" সূত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ। প্রবাদ আছে যে,—পাণিনি তপোবলে দেবাদিদেব মহেশ্বরের নিকট হইতে ঐ চতুর্দ্দশসূত্র লাভ করিয়া, তাহারই সাহায্যে "অষ্টাধ্যায়ী" রচনা করিয়া

* এই সকল সূত্রের মধ্যে তিনটি কি চারিটি সূত্র পাণিনি-রচিত কিনা তদ্বিষয়ে কেহ কেহ সন্দেহ করিয়া থাকেন। এবিষয়ে Godstucker's Panini. p. 29. দ্রষ্টব্য।

ছিলেন। সে যাহা হউক, ঐ চতুর্দ্দশ সূত্র পাণিনি-সূত্র মধ্যে পরিগণিত নহে। কাত্যায়ন উক্ত চতুর্দ্দশ সূত্রকে "অক্ষর-সমাম্নায়" অর্থাৎ অক্ষর পাঠের ক্রম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন।

"যেনাক্ষরসমাম্নায় মাধিগম্য মহেশ্বরাৎ।
কৃৎস্নং ব্যাকরণং প্রোক্তং তস্মৈ পাণিনয়ে নমঃ॥"

এই অক্ষর পাঠের ক্রম পূর্ব্বপ্রচলিত ক্রম হইতে বিভিন্ন এবং উহা কেবল পাণিনি ব্যাকরণেরই উপযোগী। কলাপ-ব্যাকরণ-প্রণেতা ঐ ক্রম অবলম্বন না করিয়া, পূর্ব্বপ্রচলিত ক্রমেরই অনুসরণ করিয়াছিলেন। লোকসমাজে অদ্যাপি পুরাতন ক্রমই প্রচলিত আছে বালকেরা তদনুসারেই বর্ণমালা শিক্ষা করিয়া থাকে। কলাপ, ব্যাকরণের প্রথম সূত্রে লিখিত আছে,—

সিদ্ধো বর্ণ-সমাম্নায়ঃ॥

ঐ সূত্রটি স্বনামখ্যাত নিরুক্তকার সাঙ্ক ঋষির সূত্র।

সংস্কৃত ভাষায় পাণিনির পূর্ব্ব হইতেই অনেক ব্যাকরণ প্রচলিত ছিল। পাণিনিসূত্রে ঐ সকল পূর্ব্ববর্ত্তী ব্যাকরণের মত উদ্ধৃত হইয়াছে। নিম্নে বর্ণমালাক্রমে তাঁহাদের নাম ও পাণিনি কর্ত্তৃক কোন্ সূত্রে তাহা উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা উদ্ধৃত হইল।

আপিশলি	...	...	৬।১।৯২।
কাশ্যপ	...	...	১।২।২৫।
গার্গ্য	...	...	৭।৩।৯৯।
চাক্রবর্ম্মণ	...	...	৬।১।১৩০।
ভারদ্বাজ	...	...	৭।২।৬৩।
শাকটায়ন	...	...	৩।৪।১১১।
সাকল্য	...	...	১।১।১৬।
সেনক	...	...	৫।৪।১১২।

ইঁহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও নাম একাধিক সূত্রেও প্রাপ্ত হওয়া যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ একটি কেবলমাত্র সূত্রই উদ্ধৃত হইল।

পাণিনির সময়ে সংস্কৃত ভাষার ঐ সকল ব্যাকরণ ব্যতীত ব্যাকরণের সহযোগী আরও অনেক গ্রন্থ প্রচলিত ছিল এমন প্রমাণ পাণিনির সূত্রেই পাওয়া যায়। ঐ সকল গ্রন্থের মধ্যে শিক্ষা, গণ-পাঠ, উণাদিসূত্র ও অভিধান বিশেষরূপে পরিলক্ষিত হয়। কোন্ কোন্ বর্ণ পরস্পর সবর্ণ; কোন্ কোন্ বর্ণ কোন্ কোন্ বর্গের অন্তর্গত; কোন্‌গুলি অল্পপ্রাণ, মহাপ্রাণ, নাদ, ঘোষ, বিবৃত, সংবৃত এই সকল বিষয়ের কোন সূত্র অষ্টাধ্যায়ীতে নাই; অথচ এই গুলির বিশেষ জ্ঞান না থাকিলে অষ্টাধ্যায়ীর অনেক সূত্রই বুঝিতে পারা যায় না। দৃষ্টান্তস্বরূপ কয়েকটী সূত্রের উল্লেখ করা যাইতেছে।

তুল্যাস্যপ্রযত্নং সবর্ণং　　১।১।৯

মুখের তুল্য স্থান হইতে যে সকল বর্ণের উচ্চারণ হইয়া থাকে তাহাদিগকে সবর্ণ বলে। কোন্ কোন্ বর্ণ তুল্য স্থান হইতে উচ্চারণ হয়, পাণিনির ব্যাকরণে তাহার কোন সূত্র নাই।

স্তোশ্চুনাশ্চুঃ　　৮।৪।৪০

ষ্টুনা ষ্টুঃ　　৮।৪।৪১

কুপ্বোঃ = ক = পৌচ।　৮।৩।৩৭

কুহোশ্চুঃ।

এই সকল সূত্রে কবর্গ, চবর্গ, টবর্গ, তবর্গ, পবর্গ, ইত্যাদির স্পষ্ট উল্লেখ আছে; অথচ কোন্ গুলি কবর্গ বা চবর্গ বা টবর্গ বা তবর্গ বা পবর্গ তাহার কোন সূত্র অষ্টাধ্যায়ীতে নাই। "কুহোশ্চুঃ" সূত্রে কবর্গ ও হকারের স্থানে স্থলবিশেষে চবর্গ হওয়ার বিধান আছে; কিন্তু কবর্গভুক্ত কোন্ বর্ণস্থানে চবর্গভুক্ত কোন্ বর্ণের আদেশ হইবে তাহার কোন সূত্র নাই।

সুতরাং স্বীকার করিতে হইতেছে ঐ সকল বিষয়ের উপদেশ বা শিক্ষার জন্য অন্য কোন গ্রন্থ অর্থাৎ শিক্ষাগ্রন্থ অবশ্যই বর্ত্তমান

ছিল। তজ্জন্যই পাণিনি মুনি আপন ব্যাকরণে ঐ সকল বিষয়ের নূতন কোন সূত্র করেন নাই।

চাদয়োঽসত্ত্বে	১।৪।৫৭
স্বরাদি নিপাতনমব্যয়ম্।	১।১।৩৭
নড়াদিভ্য ফক্।	৪।১।৯১
ভূবাদয়ো ধাতবঃ।	১।৩।১
নবৃত্ত্যশ্চতুর্ভ্যঃ।	৭।২ ৫৯
নিজাং ত্রয়াণাং গুণঃ শ্লৌ।	৭।৪।৭৫
জক্ষিত্যাদয়ঃ ষট্।	৬।১।৬
তুদাদিভ্যঃ শঃ।	৩।১।৭৭
অদাদিভ্যঃ পঃ।	২।৪।৭২
ক্র্যাদিভ্যঃ শ্না।	৩।১।৮১
রধাদিভ্যঃ শ্নম্।	৩ ১।৭৮
জুহোত্যাদিভ্যঃ শ্লুঃ।	৩।৪'৭৫
দিবাদিভ্যঃ শ্যন্।	৩।১।৬৫
স্বাদিভ্যঃ শ্নুঃ।	৩।১।৭৩
তনাদি কৃঞভ্যঃ উঃ।	৩।১।৭৯

এই সকল ও অন্যান্য বহুবিধ সূত্রে প্রমাণ পাওয়া যায় যে ধাতু ও তদিতর শব্দের এক্ষণে যেরূপ গণপাঠ প্রচলিত আছে ঐরূপ গণপাঠের গ্রন্থ পাণিনির সময়েও প্রচলিত ছিল। তাহা না হইলে পাণিনি উপরি লিখিত সূত্রগুলিতে গণের নামমাত্র উল্লেখ করিয়া ক্ষান্ত থাকিতেন না কোন্ কোন্ শব্দ কোন্ কোন্ গণভুক্ত ব্যাকরণেই তাহার উল্লেখ করিতেন।

পাণিনির ব্যাকরণ পাঠে আরও জানা যায় যে উণাদি প্রত্যয়ের গ্রন্থ তাঁহার সময়ের পূর্ব্ব হইতেই প্রচলিত ছিল। উণাদি প্রত্যয়

ধাতুর উত্তর হইয়া থাকে। সে গুলিও কৃৎপ্রত্যয়। কোন্ উণাদি প্রত্যয় কোন্ ধাতুর উত্তর হয়, তাহার কোন নিয়ম পাণিনি-সূত্রে নাই। অথচ উণাদি প্রত্যয় স্বীকার করিয়া পাণিনি কয়েকটী সূত্র রচনা করিয়াছেন। যথা—

উণাদয়ো বহুলম্　　৩।৩।১
ভূতেঽপি দৃশ্যন্তে　　৩।৩।২
তাভ্যামন্যত্র উণাদয়ঃ　　৩।৪।৭৫

ইহা ব্যতীত অভিধানের গ্রন্থ প্রচলিত থাকারও বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায়।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে পাণিনি সংস্কৃত ব্যাকরণের সূত্রমাত্রই রচনা করিয়াছিলেন; তাহা ভিন্ন, সূত্রের বৃত্তি বা ব্যাখ্যা রচনা করার কোনই প্রমাণ পাওয়া যায় না। কিন্তু সূত্রের বৃত্তি, ব্যাখ্যা, উদাহরণ ও প্রত্যুদাহরণ ইত্যাদি না থাকিলে পাণিনিসূত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্য গ্রহণ করা অতীব দুরূহ। পাণিনি আপন ছাত্রদিগকে যে কেবল সূত্রমাত্রই শিক্ষা দিয়াছিলেন এরূপ অনুমান করা যায় না; সম্ভবতঃ তিনি সূত্রগুলির ব্যাখ্যাও করিয়া দিয়াছিলেন। কোন এক সময়ে কাত্যায়ন মুনি পাণিনিসূত্রের বৃত্তি রচনা করিয়াছিলেন, উহাকে মহাবৃত্তি বলে। এ পর্য্যন্ত ঐ মহাবৃত্তি কুত্রাপি মুদ্রিত আছে শুনা যায় না। কাত্যায়নের পরবর্ত্তী কোনও সময়ে পতঞ্জলি মুনি পাণিনি-সূত্রের ভাষ্য রচনা করিয়াছিলেন, উহাকে মহাভাষ্য বলে। এক্ষণে ঐ মহাভাষ্যেই কাত্যায়নের মহাবৃত্তির অস্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। এই মহাবৃত্তি ও মহাভাষ্যযোগে পাণিনিসূত্র পূর্ণকলেবর প্রাপ্ত হইয়াছে। এবং সেই কারণেই তাঁহাদের রচিত গ্রন্থসমষ্টিকে 'ত্রিমুনি ব্যাকরণ' কহে। তিন মুনি বিদ্যায় সমতা লাভ করায় 'একবংশ্য' বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। এবং "সংখ্যা বংশ্যেন" ২।১।১৯।

সূত্র অনুসারে ঐ সংজ্ঞা হইয়াছে। যেমন এক বংশে জন্মহেতু সন্তানগণ 'একবংশ্য' বলিয়া অভিহিত হয় সেইরূপ বিদ্যার তুল্যতা-হেতু এক লক্ষণযুক্ত ব্যক্তিগণও 'বংশ্য' বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। এই ত্রিমুনিব্যাকরণ ব্যতীত পরবর্ত্তী সময়ে পাণিনি-সূত্রের আরও অনেক বৃত্তি, টীকা ও ব্যাখ্যা রচিত হইয়াছে, এস্থলে তাহার উল্লেখ করা অনাবশ্যক। পূর্ব্বে আমাদের দেশে এই ত্রিমুনি ব্যাকরণই অধীত হইত। পরবর্ত্তী সময়ে স্বল্পপ্রয়াসীর জন্য সংস্কৃত ভাষার অনেক সংক্ষিপ্ত ব্যাকরণ রচিত হওয়ায় এবং তাহাদের পঠন পাঠন বাহুল্যরূপে প্রচলিত হওয়ায়, ত্রিমুনি-ব্যাকরণের অধ্যয়ন ও অধ্যাপন ক্রমে বিরল হওয়াতে ত্রিমুনি-গ্রন্থগুলিও বিলুপ্ত হইবার উপক্রম হইয়াছিল।

পাণিনির সময়ের পূর্ব্ব হইতেই যে সকল গ্রন্থ প্রচলিত ছিল বলা হইল, ঐ সকল গ্রন্থই লিখন-প্রণালীর অস্তিত্বের পরিচায়ক। সাহিত্যের বাহুল্য ও বিশেষ আদর না হইলে, ব্যাকরণের আদৌ আবশ্যক উপস্থিত হয় না। পূর্ব্ব হইতেই বৈদিক ও ভাষা উভয়বিধ সাহিত্য প্রচলিত থাকার প্রমাণ পাণিনি-ব্যাকরণেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। ভাষা-সংস্কৃত সম্বন্ধে পূর্ব্ববর্ত্তী বৈয়াকরণগণের মত পাণিনি আপন ব্যাকরণে উদ্ধৃত করিয়াছেন * ; তাহাতেই বুঝা যায়,—ঐ সকল বৈয়াকরণের সময়েও ভাষা-সাহিত্য এবং ভাষা-ব্যাকরণ প্রচলিত ছিল।

বৈদিক যুগে বৈদিক সাহিত্য লইয়াই আর্য্যগণের বিশেষ ভাবে ব্যাপৃত থাকিবার কথা, তখন হয়ত "ভাষার" বিশেষ আদর ছিল না। কিন্তু পাণিনির বহুপূর্ব্ব হইতেই ঐ ভাবের পরিবর্ত্তন ঘটিয়া-

---

* ৭।৩।৪৬-৪৯।

ছিল এবং ভাষা-সংস্কৃতও যথেষ্ট গৌরব লাভ করিয়া নানা সাহিত্যে অলংকৃত হইয়াছিল। তাহাদের সেবা করাও অত্যাবশ্যক বলিয়াই বৈয়াকরণগণ একই ব্যাকরণে বৈদিক ও ভাষা-সংস্কৃতের শব্দানুশাসন-সূত্র একত্র সমাবেশ করিয়া উভয়কেই তুল্যাসনে স্থান দান করিয়াছিলেন।

পাণিনি-ব্যাকরণ রচিত হইবার কত কাল পূর্ব্বে আর্য্যসমাজে এই পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছিল, তাহার কালনির্দ্দেশ করা অসম্ভব, স্থিতিশীল ও বেদপ্রাণ আর্য্যসমাজের প্রকৃতির প্রতি লক্ষ্য করিলে, এই পরিবর্ত্তন বহুকাল-সাপেক্ষ বলিয়াই বোধ হয়। পাণিনির পূর্ব্বে ভাষা-সাহিত্যে কোন্ কোন্ গ্রন্থ প্রচলিত ছিল, তাহার সম্পূর্ণ নির্ঘণ্ট প্রস্তুত করিবার উপায় না থাকিলেও, পাণিনি-সূত্রের কোন কোন স্থানে কিছু কিছু আভাস মাত্র প্রাপ্ত হওয়া যায়। যথাঃ—

অধিকৃত্য কৃতে গ্রন্থে ॥৪।-।৮৭॥

শিশুক্রন্দ-যমসভ-দ্বন্দ্বেন্দ্রজননাদিভ্য শ্ছঃ ॥৪।৩।৮৮॥

পারাশর্য্য-শিলালিভ্যাং ভিক্ষু-নট-সূত্রয়োঃ ॥৪।৩।১১০॥

কর্ম্মন্দ-কৃশাশ্বাদিনিঃ ॥৪।৩।১১১॥

গ্রন্থান্তাধিকে চ ॥৬।৩।৭৯॥

বহু সাহিত্য বিরচিত হইয়া ভাষা যে আকার ধারণ করে, তাহার পরিবর্ত্তন সহজে সাধিত হয় না বলিয়াই, সাহিত্যের ভাষার ব্যাকরণ রচনা করিবার সম্ভাবনা থাকে। কথনের ভাষা দেশ, শ্রেণী ও সময় ভেদে সর্ব্বদাই পরিবর্ত্তনশীল। এজন্য তাহার ব্যাকরণ রচনা করিবার সম্ভাবনা থাকে না। সুতরাং ব্যাকরণ রচনা দ্বারা জানা যাইতেছে যে,—তৎপূর্ব্বেই সাহিত্যের ভাষা স্থায়ী আকার ধারণ করিয়াছিল। এই সাহিত্যরাশি কেবল মুখে মুখে রচিত ও রক্ষিত হইয়া থাকিলে, তাহার ব্যাকরণ রচনার প্রয়াস বৃথা হইত

যে দেশে ভাষা এতদূর উন্নতি লাভ করিয়াছিল, সে দেশে যে লিখন প্রণালী উদ্ভাবিত হয় নাই, ইহা একরূপ অসম্ভব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

লিপি-কৌশল কি এতই মহোচ্চ প্রতিভা-বিজ্ঞাপক যে, প্রাচীন কালে আর্য্যজাতির মধ্যে তাহার বিকাশ হওয়া একেবারে অসম্ভব ছিল? তাহাও একবার ভাবিয়া দেখা আবশ্যক। মনের ভাব ব্যক্ত করিবার জন্য মনুষ্য নানা সঙ্কেতের আশ্রয় গ্রহণ করে;—ইঙ্গিত ও উচ্চারিত শব্দই ঐ সঙ্কেত। হস্তপদাদি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সাহায্যে ইঙ্গিতে ভাব-প্রকাশ করা বিশেষ বিদ্যাবুদ্ধির অপেক্ষা করে না। অল্পবুদ্ধি ও অশিক্ষিত লোকেও ঐ উপায় অবলম্বন করিয়া থাকে। যে আর্য্যজাতি, উচ্চরিত সর্ব্বপ্রকার ব্যক্ত শব্দের সমগ্র তত্ত্ব পুংখানুপুংখরূপে পর্য্যালোচনা করিয়া, অ-কারাদি অক্ষর কল্পনা করিয়াছিলেন, এবং প্রত্যেক অক্ষরের উচ্চারণের স্থান ও কৌশল স্থির করিয়া, প্রত্যেক বর্ণের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তত্ত্ব অবগত হইয়া, তাহার অনুশাসনের জন্য শিক্ষাগ্রন্থ এবং অনন্ত শব্দ রাশির অনুশাসনের জন্য ব্যাকরণগ্রন্থ পর্য্যন্ত রচনা করিবার সঙ্কেত প্রাপ্ত হইয়া মহোচ্চ প্রতিভার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন, তাঁহারা যে সঙ্গে সঙ্গে অপেক্ষাকৃত অল্পায়াসসাধ্য অথচ গ্রন্থরচনার নিত্যপ্রয়োজনীয় উপাদানস্বরূপ লিপি-কৌশল আবিষ্কার করিতে পারেন নাই, তাহা বিশ্বাস করা কঠিন। অভাবই মানব সমাজকে বিবিধ কৌশল উদ্ভাবনায় প্রেরণ করিয়া, নূতন নূতন তথ্য আবিষ্কৃত করিয়া দেয়। প্রাচীন আর্য্যজাতি বেদ-প্রাণ ছিলেন; বেদ ও আর্য্যজাতি যেন নিত্য-সহচরিত ভাবে প্রথমেই আবির্ভূত হইয়াছিলেন। মানব-সভ্যতার যত দিনের ইতিহাস প্রাপ্ত হওয়া যায়, তত দিনই বেদ আর্য্যজাতির নিত্যসহচর থাকার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। বাল্য

—বধি বেদাধ্যয়ন আরম্ভ করিয়া, বেদার্থ সম্যক্ অধিগত ও আজীবন তাহারই সেবা করা আর্য্যজীবনের সর্ব্বপ্রধান লক্ষ্য বলিয়া পরিগণিত ছিল। ইহারই অনুরোধে শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দস্ ও জ্যোতিষ,—বেদের এই সুবিখ্যাত ষড়ঙ্গের উৎপত্তি হইয়াছিল। যাঁহারা পুরুষানুক্রমে অনন্তকাল পর্য্যন্ত বেদবেদাঙ্গের প্রত্যেক অক্ষরের যথাযথ অধ্যয়ন, অধ্যাপনা অবিকৃতভাবে প্রচলিত ও সুরক্ষিত করিবার জন্য এতদূর ব্যাকুল ছিলেন, তাঁহারা কি তাহার একমাত্র সহজ উপায়স্বরূপ লিখনপ্রণালী আবিষ্কৃত করিবার জন্য চেষ্টা করেন নাই, বা চেষ্টা করিয়া বিফল-প্রয়াস হইয়াছিলেন?

অন্যান্য জাতির ইতিহাসে জানা যায় যে,—ক্রয়বিক্রয় ও বাণিজ্য-ব্যবসায় লিখনপ্রণালীর আবিষ্কার করিয়া দেশ দেশান্তরে বিস্তৃত করিয়াছিল। তাহাতে কাহারও কাহারও মনে এরূপ সন্দেহের উদয় হইয়াছে,—হয় ত কাল্দীয়, ফিনিসীয় বা গ্রীসীয় জনপদ হইতেই ভারতবর্ষে লিখন-প্রণালী আনীত হইয়া থাকিবে। ইহা তাঁহাদের অনুমান মাত্র; এরূপ অনুমানের কোন মূল প্রাপ্ত হওয়া যায় না। আর্য্যজাতির বর্ণমালাই এরূপ অনুমানের বিশেষ অন্তরায়। কাল্দীয়, ফিনিসীয় বা গ্রীসীয় বর্ণমালায় পরস্পরের মধ্যে কোনরূপ সামঞ্জস্য থাকিলেও, তাহার সহিত ভারতবর্ষীয় আর্য্যগণের বর্ণমালার কোন সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায় না।

আর্য্য বর্ণমালা প্রধানতঃ স্বর ও ব্যঞ্জন এই দুইভাগে, এবং উহারা আবার কণ্ঠ্য, তালব্য, দন্ত্য, ওষ্ঠ্য, মূর্দ্ধণ্যাদি উচ্চারণের স্থানভেদের স্বাভাবিক নিয়মে বিভক্ত হইয়া প্রথম হইতেই বর্ত্তমান আছে। তাহাই আর্য্য বর্ণমালার বিশেষত্ব! আদর্শের অভাবে তাহা অনুকরণ-লব্ধ বা দেশান্তরাগত বলিয়া অনুমিত হইতে পারেনা। আর্য্যজাতির বর্ণমালার পূর্ণতা, স্বাভাবিক বিভাগ ও যথাস্থান বিন্যাস অদ্যাপি

অপরাপর সকল জাতির বর্ণমালাকে তিরস্কৃত করিয়া থাকে। ইহা কাহারও অনুকরণলব্ধ হইতে পারে না। কোন্ সময়ে এই বর্ণমালা আর্য্যজাতিকে প্রথমে আশ্রয় করিয়াছিল, তাহার কাল কেহই প্রমাণ দ্বারা নিরূপণ করিতে পারেন নাই।

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন,—লোকে সর্ব্বপ্রথমে চিত্র বা বস্তুর আকৃতিবিজ্ঞাপক চিহ্নাদির দ্বারা শব্দ লিখিবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়াছিল। কালদীয় রাজ্যে ঐ প্রণালী প্রচলিত ছিল, চীনদেশে অদ্যাপিও তাহা প্রচলিত আছে। পরে, ক্রমে শব্দগুলির প্রত্যেক বর্ণবোধক লিপি-সঙ্কেত আবিষ্কৃত হইয়াছিল। লিখনপ্রণালী আর্য্যগণের গৃহজাত হইলে, এই দুই অবস্থার কোন না কোন একটির অস্তিত্বের পরিচয় অবশ্যই ভারতবর্ষে প্রাপ্ত হওয়া যাইত। আর্য্যগণের বর্ণমালার যে সর্ব্ব প্রাচীন আদর্শ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা বর্ত্তমান সময়ের পূর্ণ কলেবর বর্ণমালার অনুরূপ। অন্যদেশে, চিত্রাদির অবস্থা উদ্ভূত হইয়া লিখনপ্রণালী মার্জ্জিত অবস্থা প্রাপ্ত হইবার পরেই, তাহা ভারতবর্ষে আনীত হইয়াছিল। তজ্জন্যই ভারতবর্ষে বর্ণমালার অতি পুরাতন লিখনকৌশলের কোন চিহ্ন বর্ত্তমান নাই; বিদেশে তাহা বর্ত্তমান আছে। এই সকল কারণে ভারতবর্ষীয় বর্ণমালা বিদেশীয় আদর্শে গঠিত হইয়াছিল বলিয়া কথিত হইয়া থাকে।

এরূপ তর্কের সহজ উত্তর এই যে,—হয়ত আর্য্যগণের মধ্যেও অতি পুরাকালে চিত্রাদির দ্বারা লিখনপ্রণালীর প্রথম সূচনা হইয়া থাকিবে। কিন্তু সে বহুকালের কথা। তাহার স্মৃতি লুপ্ত হওয়ার পর বৈদিকযুগ প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। কেবল বুভুক্ষা ও জিজীবিষা দ্বারা তাড়িত হইয়া মানবসমাজ, জীবনসংগ্রামে ব্যতিব্যস্ত থাকিবার সময়ে, পশুবৎ সময় কর্ত্তন করিতে করিতে ক্রমে উন্নতিলাভ করিয়াছে। বৈদিকযুগ প্রবর্ত্তিত হইবার পূর্ব্বেই আর্য্যগণ সেই

প্রাথমিক অবস্থা অতিক্রম করিয়াছিলেন। ঐ প্রাথমিক অবস্থায় তাঁহারা কোন্ বিষয় কত সংগ্রামের পর বৈদিকযুগের সমুন্নতাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহার কোন বিষয়েরই প্রমাণ প্রাপ্ত হইবার উপায় নাই। বহুকালের ব্যবধানে তাহা লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। সুতরাং লিপিকৌশল আবিষ্কারের প্রথম চেষ্টার কোনরূপ নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায় না বলিয়াই, তাহা দেশান্তরানীত বলিয়া সিদ্ধান্ত করা সঙ্গত হয় না।

কেহ কেহ বলেন,—ভারতবর্ষে অশোকের সময়ের পূর্ব্বের কোনরূপ প্রশস্তি বা খোদিতলিপি প্রাপ্ত হওয়া যায় না। সে সময়ে লিপিকৌশল পরিজ্ঞাত থাকিলে, অবশ্যই কোন না কোন প্রশস্তি বা খোদিতলিপি প্রাপ্ত হওয়া যাইত। এই তর্কও সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। অশোকের সময়ে যে যে কারণে খোদিত লিপির প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছিল, তৎপূর্ব্বে ঐ সকল কারণেরই অভাব ছিল। অশোক, রাজশাসন ও বৌদ্ধ ধর্ম্মশাসন বিস্তার করিবার জন্যই খোদিত-লিপির আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি পূর্ব্বপ্রচলিত ধর্ম্ম ও শাসনের পরিবর্ত্তে নবপ্রবর্ত্তিত বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচারে ব্যস্ত ছিলেন, তজ্জন্যই তাঁহাকে অভিনবপ্রণালীর অবলম্বন করিতে হইয়াছিল। বৈদিক শাস্ত্রের শাসন অশোকের বহুপূর্ব্ব হইতেই দেশে বদ্ধমূল ও প্রতিষ্ঠিত ছিল। সে বিস্তীর্ণ শাস্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্য গ্রহণ করা গুরূপদেশ সাপেক্ষ থাকায় তাহা স্বল্পস্থানে স্বল্পাক্ষরে খোদিত করিয়া প্রচার করা অসম্ভব। রাজশাসন, ধর্ম্মাধিকারে নিযুক্ত পণ্ডিতগণের মতানুসারে প্রবর্ত্তিত হইত। তাহার জন্যও খোদিত লিপির সাহায্য গ্রহণের প্রয়োজন ছিল না। ব্রাহ্মণগণ তপঃস্বাধ্যায়নিরত থাকিয়া বর্ণাশ্রমানুসারে জীবনের শেষভাগে বানপ্রস্থ বা ভিক্ষু হইবারই জন্য প্রয়াস করিতেন। অল্প লোকেই ভূমিদানগ্রহণ করিতে সম্মত

হইতেন। ব্রাহ্মণের প্রতি জনসাধারণের দেববৎ অবিচলিত ভক্তি প্রবল থাকায়, ব্রহ্মস্ব অপহৃত হইবারও আশঙ্কা ছিল না। সুতরাং ভূমিদান লিপিবদ্ধ করিবার জন্য রাজপ্রশস্তির প্রয়োজন অনুভূত হইত না। প্রয়োজনের অভাবই প্রশস্তির অভাবের কারণ বলিয়া বোধ হয়। এই স্থলে, রামায়ণের একটি ক্ষুদ্র আখ্যায়িকা স্মরণপথে পতিত হইতেছে। রাজা দশরথ অশ্বমেধযজ্ঞ সম্পন্ন করিয়া ব্রাহ্মণগণকে ভূমিদান করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণগণ তৎপরিবর্ত্তে যৎকিঞ্চিৎ মূল্য-গ্রহণের জন্যই আকাঙ্খা প্রকাশ করিয়াছিলেন। যথা—

"ক্রতুং সমাপ্য তু তদা ন্যায়তঃ পুরুষর্ষভঃ।
ঋত্বিগ্‌ভ্যো হি দদৌ রাজা ধরাস্থাং কুলবর্দ্ধনঃ॥
এবং দত্ত্বা প্রহৃষ্টোঽভূৎ শ্রীমানিক্ষ্বাকুনন্দনঃ।
ঋত্বিজস্ত্বব্রুবন্ সর্ব্বে রাজানং গতকিল্বিষম্॥
ভবানেব মহীং কৃৎস্নামেকো রক্ষিতুমর্হতি।
ন ভূম্যা কার্য্যমস্মাকং নহি শক্তাঃ স্ম পালনে॥
রতাঃ স্বাধ্যায়করণে বয়ং নিত্যং হি ভূমিপ।
নিষ্ক্রয়ং কিঞ্চিদেবেহ প্রযচ্ছতু ভবানিতি॥
মণিরত্নং সুবর্ণং বা গাবো যদ্বা সমুদ্যতং।
তৎ প্রযচ্ছ নৃপশ্রেষ্ঠ ধরণ্যা ন প্রয়োজনম্॥"

শ্রীপ্রসন্নকুমার ভট্টাচার্য্য।

ভারতের কলকারখানা।

১৮৫৪ খৃঃ অব্দে সর্ব্বপ্রথম বোম্বাই নগরে ষ্টীমেরদ্বারা চালিত যন্ত্র প্রবর্ত্তিত হয়। ইহাতে কার্পাসের কার্য্য হইত। তৎপরে, চল্লিশ বৎসরের মধ্যে ভারতের সমস্ত বাণিজ্য-প্রধান স্থানে এবং প্রেসিডেন্সি নগরের চতুর্দ্দিকে অনেক ছোটবড় কুঠি স্থাপিত হইয়াছে। বিশেষতঃ সুয়েজখাল উন্মুক্তের পর হইতে ভারতবর্ষে ষ্টীমের ব্যবহার অত্যধিক বর্দ্ধিত হইয়াছে। নিম্নলিখিত তালিকা পাঠে অবগত হওয়া যাইবে, ভারতে বর্ত্তমান সময়ে কোন কাজের কতটি কল আছে,—

কল।	সংখ্যা।	শ্রমজীবিরসংখ্যা।	তাঁত।	কত টাকা খাটে।
তুলার	১২৫	১১১৯৯৮	২৩৮৭৫	১২০০০০০০০৲
কোষ্টার	২৬	৬১৯১১	৮৩০০	৩৫০০০০০০০৲
পশমের	৫	২১৬৪	৫২৬	২৪৭৫০০০৲

এতদ্ব্যতীত সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে ছয়টী কাগজের এবং তিনটী চামড়ার কলকারখানা আছে। দুই একটী শস্যনিষ্পেষণের কল ও চিনির কুঠি, এদেশে দেখিতে পাওয়া যায়। জয়েণ্টষ্টক কোম্পানীদিগের সম্পত্তি,—তুলার কারখানা ব্যতীত, পূর্ব্বোলিখিত অধিকাংশ কুঠিই ইংরেজ মহাজনদিগের।

যে ভারতবর্ষের পরিমাণ ৯৪৪, ১০৮ বর্গ মাইল, যাহার লোকসংখ্যা ইহার দ্বিগুণেরও অধিক, যে ভারতবর্ষ, বৃটন এবং আয়ারল্যাণ্ড অপেক্ষাও সাতগুণ বড়, সেই ভারতবর্ষে কেবল ১৬০টী মাত্র কারখানা, আর যাহার তুলনায় যুক্তরাজ্য সুচাগ্রপরিমিত ভূমিখণ্ড বলিলেও চলে, তথায় সাত হাজারেরও অধিক কলকারখানা এবং কার্পাসের কার্য্যে ২৫০০ হাজারেরও অধিক লোক নিযুক্ত আছে।

লিভারপুলের মিঃ টমাস ইলিমন বলেন যে, এই সকল কারখানায় ২০০,০০০,০০০ পাউণ্ড অর্থ খাটিতেছে এবং স্ত্রীপুরুষ-বালকবালিকাতে অন্ততঃ ৫,০০০,০০০ জন তদ্দ্বারা জীবিকা উপার্জ্জন করিতেছে। অপিচ, বৃটিশ এবং আয়রিস্‌দিগের প্রস্তুত দ্রব্যের অর্দ্ধেকই রপ্তানির জন্য এবং তাহা সমস্তই তান্তব দ্রব্য।

তুলনাব্যপদেশে একবার আমেরিকার শিল্প ও কারখানার প্রতি দৃষ্টিপাত করা যাউক্‌। বহুসংখ্যক লৌহ এবং ইস্পাতের কুঠির মধ্যে চিগাগোর ইলিনোইস ষ্টীল্‌ কোম্পানী (Illinois Steel Co.) বৎসরে ৭০০,০০০টন দ্রব্য প্রস্তুত এবং শিল্পীদিগকে ১,২০০,০০০ পাউণ্ড মুদ্রা বেতন প্রদান করে। আর একটী টিনের কারখানায় প্রত্যহ ৮০০,০০০ হাজার ক্যানেস্তারা প্রস্তুত হয়। এই কারখানার সমস্ত কার্য্যই কলের সাহায্যে সম্পাদিত হইয়া থাকে। কলেই টিনের পাত কাটা হয়, ক্যানেস্তারার আকারে গঠিত করা হয়, কলেই জোড় দেওয়া হয়, নীচে ও উপরে ঢাকনি লাগান হয়, উপরে বোতাম লাগান হয়, ছিদ্র আছে কিনা পরীক্ষিত হয়; কলেই গণনা করা হয় এবং তৎসাহায্যেই গোলাজাত কারবার জন্য গুদামে ও রপ্তানির জন্য মালগাড়ীতে প্রেরিত হয়। ফিলাডেল্‌ফিয়ার Baldwin Locomotive Worksএ বৎসরে ৮০০ হইতে ৯০০ শত এঞ্জিন প্রস্তুত হয়। দ্বিতীয় শ্রেণীর জেলা বার্‌মিন্‌হাম, তাহার খনি হইতে, প্রত্যহ ২০,০০০ টন কয়লা ও ২,২০০টন লৌহ প্রদান করে। পিট্‌স্‌বার্গ জেলা, ১,১২৫ মাইলব্যাপী পাইপে প্রত্যহ ৭৫০,০০০,০০০ ফিট গ্যাস (natural gas) যোগায় এবং তদ্দ্বারা বৎসরে ৮,০০০,০০০ টন কয়লার মূল্য বাঁচিয়া যায়। ইহা হইতে পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন যন্ত্রদ্বারা কত অধিক পরিমাণ দ্রব্য উৎপন্ন করা যাইতে পারে এবং কত পরিশ্রমের লাঘব হয়।

আমাদের দেশে যে দুই একটী কলকারখানা স্থাপিত হইয়াছে

তাহার অবস্থাও নিতান্ত শোচনীয় নহে। ভারতে সর্ব্বশুদ্ধ যত কার্পাস উৎপন্ন হয়, তাহার ⅙ ভাগ এই সকল কারখানায় বিভিন্ন দ্রব্য-প্রস্তুতে ব্যয়িত হয়। হুইট্টাকার (Whittaker) বলেন যে, চায়না এবং জাপানের বিপণিসমূহ ইংলণ্ড হইতে প্রচুর পরিমাণ দ্রব্য জোর করিয়া লইলেও, বোম্বাই কলের অধিকারীগণ পূর্ব্বাঅফ্রিকা, সিলোন, এডেন এবং ষ্ট্রেট সেটেলমেণ্টের বাজারে সাফল্যের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া আসিতেছে। আমাদের শিশুশিল্পের পক্ষে ইহা নিতান্তই গৌরবের বিষয়।

কাগজের ছয়টী কলেও বেশ কাজ হইতেছে। বালির কলের উন্নতি দেখিয়া অনুমান করা যাইতে পারে যে, এই প্রকার কার্য্যের উন্নতি অবশ্যম্ভাবী। একজন মাদ্রাজ বালক স্থানীয় কলেজের ছাত্রমণ্ডলীকে বলিয়াছিলেন যে, "কেবল কাগজের জন্য ভারতবর্ষ প্রতি বৎসর ইয়ুরোপকে পঞ্চাশ লক্ষ টাকা দিয়া থাকে। এই টাকা সমস্তই এদেশে রাখা উচিত। ভারতবর্ষ যে প্রকারের কাগজ চায়, তদপেক্ষা উৎকৃষ্টতর কাগজ প্রস্তুতের উপাদান আমাদের বনজঙ্গলে, ময়দানে এবং পাথিপার্শ্বে পচিতেছে। ক্রয় করার পরিবর্ত্তে ভারতের কাগজ বিক্রয় করা উচিত।" বর্ম্মা হইতে মাদ্রাজের উপকূল পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই কদলী বৃক্ষ পওয়া যায় এবং লোহিত কার্পাস বৃক্ষও উৎকৃষ্ট কাগজ প্রস্তুতের উপকরণ প্রদান করে। বাঁসও কাগজের একটী উৎকৃষ্ট উপকরণ।

দুই একটী চামড়ার কারখানার কথাও পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। সমগ্র ভারতবর্ষে যে সকল উৎকৃষ্ট (fancy) চামড়ার দ্রব্য পাওয়া যায়, ঐ সকল কারখানা হইতে তাহা সংগৃহীত হইতে পারে না। কারণ প্রতি বৎসর প্রায় ৫০০ লক্ষ টাকার চর্ম্ম, নানা প্রকার দ্রব্য প্রস্তুতের জন্য ভারত হইতে বিলাতে রপ্তানি হয়।

ভারতীয় পাটের কলের কার্য্যাবলী অবলোকন করিয়া আমরা আনন্দ প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারি না। কলিকাতা যে কেবল সমগ্র ভারতবর্ষের বস্তার (থলের) অভাব মোচন করে তাহা নহে, এই একটী মাত্র ভারতীয় দ্রব্য অনেক বিদেশীয় বাজারে উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছে। মিঃ ওকনর (O' Connor) বলেন, 'আমেরিকার ও অন্যান্য বৈদেশিক বিপণিতে ডান্‌ডি হইতে যে সকল থলে প্রেরিত হয়, ভারতবর্ষ কেবল যে সেইস্থান অধিকার করিয়া বসিবে তাহা নহে, ইংলণ্ডকেও সে ডান্‌ডি অপেক্ষা সুলভ মূল্যে থলে সরবরাহ করিতে পারিবে।'

এতদ্ব্যতীত দুর্ভিক্ষ কমিশন আমাদের দেশের দক্ষ শিল্পীদিগকে শর্করা প্রস্তুত ও পরিশুদ্ধ করিতে, কার্পাস, রেশমী ও পশমী সূত্র প্রস্তুত করিতে এবং আঁইসযুক্ত দ্রব্য হইতে সূত্র বাহির করা শিক্ষা করিতে উপদেশ দেন। কমিশন আরো বলেন যে, গ্লাস, সাবান, বাতি, তৈল প্রভৃতি প্রস্তুত প্রণালীও শিক্ষা করা উচিত। আঁইস-যুক্ত গাছ-পালা হইতে বুনানের উপযোগী সূত্র প্রস্তুতের ব্যবসা সুন্দর রূপে চলিতে পারে। তামাকের চাষ ছাড়া ঔষধীয় বৃক্ষলতা পালন ও ঔষধ প্রস্তুতের কার্য্যও একবার চেষ্টা করিয়া দেখা উচিত।

ছাতা এবং 'লুসফির' দেশলাই প্রস্তুতও যে আমাদের সাধ্যাতীত তাহা নহে। শিল্পজগতে ইহা অপেক্ষা সহজ কার্য্য আর কিছুই নাই। ১৮৯৩-৯৪ সালে ৩৮ লক্ষ টাকার দেশলাই এবং ৪৮ লক্ষ টাকার ছাতা আমরা আমদানি করিয়াছি। এই ব্যবসায় ক্রমে ক্রমে দেশে বিস্তৃত হইলেও, আশ্চর্য্যের বিষয়, ভারতীয় মহাজনদিগের দৃষ্টি এদিকে পড়িতেছে না।

লর্ড ল্যান্সডাউন, রয়েল এক্সচেঞ্জে বিদায় কালীন বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন যে, ভারতবর্ষ অনেক শিল্পবিভাগে সুন্দর উন্নতি

করিয়াছে কিন্তু যখন উহার উপাদান সমূহ, উহার উর্ব্বরা ভূমি, ইহার সুলভ শ্রমজীবিও ভীতিবিহ্বল জনসমূহ কি প্রকারের উন্নতি লাভ করিয়াছে চিন্তা করি, তখন আমি সহজে সন্তুষ্ট হইতে পারি না।

দুর্ভিক্ষ কমিশনের রিপোর্ট হইতে এইটুকু আমরা উদ্ধৃত না করিয়া নিবৃত্ত হইতে পারিলাম না ;—আমরা অন্যত্র বলিয়াছি যে ভারতের লোকসমূহের দারিদ্র্যের ও দুর্ভিক্ষের সময় তাহাদের যে শঙ্কটাবস্থা হয় তাহার একমাত্র কারণ, প্রায় অধিকাংশ লোক কৃষি-কার্য্যের উপরই নির্ভর করে। যত দিন না তাহারা অন্য কার্য্যে মনোনিবেশ করিবে, যতদিন না তাহারা বিভিন্ন শিল্পকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবে, ততদিন ইহার প্রতিবিধান হইবে না।

আমাদের দেশে যে আজকাল কলকারখানা স্থাপিত হইতেছে তাহা দেশের শুভচিহ্ন। বর্ত্তমান অবারিত প্রতিযোগীতায় এবং অস্তিত্বরক্ষার প্রাণপণসংগ্রামসময়ে কলকারখানায় প্রস্তুত দ্রব্যের পরিমাণের উপরই জাতীয় প্রাধান্য নির্ভর করিতেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের দেশে কলকারখানার সংখ্যা এত অল্প যে তাহার উপর বড় আশা করা যায় না এবং সত্য কথা বলিতে কি বোম্বাই-য়ের পারসীদিগের তুলার কল ব্যতীত অধিকাংশ কল ও কুঠী ইংরাজ মহাজনদিগের। বিদেশীয় অর্থদ্বারা আমাদিগের জীবনোপায় এভাবে উন্নত করা নিশ্চয়ই মঙ্গলকর নহে—ইহাতে আমাদিগকে দিন দিন জীবনসংগ্রামে অনুপযুক্ত করিতেছে এবং প্রতি বৎসর প্রভূত অর্থ চক্রবৃদ্ধির হারে বিদেশে চলিয়া যাইতেছে।

শ্রীব্রজসুন্দর সান্যাল।

শিগো-মুভে।

প্রসিদ্ধ শিকারী ডুশেলুর অনুগ্রহে, পাঠকবর্গকে আফ্রিকার নিবিড় জঙ্গলবাসী শিগো-মুভের বিবরণ উপহার দিতে সমর্থ হইলাম। শিগো-মুভে দেখিতে গরিলার ন্যায়, কেবলমাত্র প্রভেদ এই যে, ইহারা কিছু ছোট। উভয়ের মধ্যে প্রকৃতিগত বৈষম্য অনেক; ইহারা গরিলা অপেক্ষা কোমলস্বভাব এবং শীঘ্র মনুষ্যের অনুগত হয়। বানর বা বনমানুষের মধ্যে বাসগৃহনির্ম্মাণপ্রথা বিরল। কিন্তু শিগো-মুভে, বৃক্ষের ছোট ছোট শাখা ও পত্রাদি দ্বারা একপ্রার বাসস্থান বা আশ্রয় প্রস্তুত করে। বনমধ্যস্থ অন্যান্য বৃক্ষ হইতে পৃথক একটী বৃক্ষ বাছিয়া লইয়া ভূমি হইতে প্রায় ১৫ বা ২০ ফুট উচ্চে ইহার আবাস নির্ম্মাণ করে; এরূপ করিবার উদ্দেশ্য এই যে, বনের অন্যান্য বৃক্ষের সহিত সংশ্রব না থাকিলে গৃহটী অপেক্ষাকৃত নিরাপদ হইবে। ইহারা যে শাখায় বাসস্থান নির্ম্মাণ করে তাহার নিম্নে বৃক্ষের অন্য শাখা থাকে না। ভূমি হইতে প্রায় ৫০ ফুট উর্দ্ধেও শিকারী ডুশেলু ইহাদিগের গৃহ দেখিয়াছেন। কিন্তু তাহা অতি বিরল।

একজন দেশীয় শিকারী ডুশেলুকে বলিয়াছেন যে ইহারা স্ত্রীপুরুষ মিলিয়া গৃহনির্ম্মাণোপযোগী দ্রব্য-সমূহ সংগ্রহ করে। শিগো-মুভে গৃহের ছাদ বা আবরণের নিমিত্ত পত্রযুক্ত ছোট ছোট শাখা এবং সেই সকল শাখানির্ম্মিত গৃহটী বৃক্ষে বন্ধন করিবার নিমিত্ত লতা ব্যবহার করে। ইহাদিগের বন্ধনক্রিয়া এত পরিচ্ছন্ন এবং ছাদ এরূপ সুনির্ম্মিত যে ঐ সমুদয় গৃহ দেখিলে মনুষ্যহস্ত নির্ম্মিত বলিয়া বোধ হয়।

শিগো-মুভে দলবদ্ধ থাকিতে ভালবাসে না। এই বিষয়ে ইহারা

পাওয়া যায় না। সময়ে সময়ে কোন নিভৃত বাসস্থানে এক একটী বৃদ্ধ, শুভ্রকেশ, ভগ্নদন্ত শিগো-ম্বুভে দৃষ্ট হয়—যেন বৃদ্ধ, সংসারের কোলাহল হইতে দূরে, নির্জ্জনে আসিয়া সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছে।

শিগো-ম্বুভে গরিলার ন্যায় বন্য ফলাদি ভক্ষণ করিয়া জীবনধারণ করে। ইহাদিগের সংসারিক প্রথা অত্যন্ত আশ্চর্য্যজনক। যদিও গৃহনির্ম্মাণ কার্য্যে পুরুষশিগো-ম্বুভে স্বনির্ব্বাচিত অন্যের সাহায্য গ্রহণ করে—স্ত্রীশিগো গৃহনির্ম্মাণ উপযোগী দ্রব্যাদি বহন করে ও পুরুষটী নির্ম্মাণ কার্য্য সম্পন্ন করে—যদিও কখন কখন স্ত্রীপুরুষকে একত্র মিলিয়া আহার করিতে দেখা যায়, তথাপি তাহারা কখনও একগৃহে বাস করে না। স্ত্রী ও পুরুষ ভিন্ন ভিন্ন বাসস্থান নির্ম্মাণ করে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি—শিগো-ম্বুভে গরিলা অপেক্ষা ছোট। হুশেলু কর্ত্তৃক নিহত সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ শিগো-ম্বুভে ৪॥ ফুটের অনধিক উচ্চ কিন্তু তাঁর কর্ত্তৃক রক্ষিত সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ গরিলার চর্ম্ম মস্তক হইতে পদ পর্য্যন্ত দৈর্ঘ্যে ছয় ফুট। শিগোর বক্ষ গরিলা অপেক্ষা আয়তনে ক্ষুদ্র। ইহাদিগের শরীর সবল পেশীবিহীন। কিন্তু গরিলা অপেক্ষা ইহাদিগের বাহু দীর্ঘ—প্রসার করিলে এক হস্তের অঙ্গুলির অগ্রভাগ হইতে অপর হস্তের অঙ্গুলির অগ্রভাগ পর্য্যন্ত সাত ফুট হইবে। এই দুই প্রাণীর লোমেরও পার্থক্য আছে। শিগোর লোম গরিলা অপেক্ষা অধিক দীর্ঘ, উজ্জ্বল এবং কৃষ্ণবর্ণ। গরিলার মস্তক যেমন লোমাবৃত ইহাদের মস্তক তেমন নহে। ইহাদের মস্তকে আদৌ লোম নাই। নাসিকা গরিলা অপেক্ষা ক্ষুদ্র; মুখ বিস্তৃত; কর্ণ অতি বৃহৎ ও মুখের নিম্নভাগ গোল। শিগোর দেহের পশ্চাৎ ভাগ লোমবিহীন। এবং সেখানকার চর্ম্ম শ্বেতবর্ণ। ইহাদিগের ভ্রূ দীর্ঘ, কৃষ্ণবর্ণ ও অল্প লোমাবৃত; মুখের নিম্নভাগ ও কর্ণ মধ্যস্থলের সমদেশ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিরল লোমযুক্ত।

ইহাদিগের বাসভূমি গরিলা অপেক্ষা অপ্রশস্ত। কেবলমাত্র আফ্রিকার মধ্যস্থিত অধিত্যকা ও নিবিড়তম বনে ডুশেলু ইহাদিগের সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছেন। গরিলার সহিত একবনে ইহারা বাস করে এবং এই ভীষণ প্রাণীর সহিত বেশ সদ্ভাবে থাকে। ডুশেলু বলিয়াছেন :— "আমি অনেকবার শিগোকে রাত্রে স্বীয় বাসস্থানে যাইয়া আশ্রয় লইতে দেখিয়াছি। আরও অনেকবার দেখিয়াছি, শিগো বৃক্ষারোহণপূর্ব্বক গৃহের নিকটবর্ত্তী হইল ও তৎপরে গৃহবহিস্থিত শাখার উপর স্বচ্ছন্দে বসিয়া গৃহচুড়া মধ্যে মস্তক লুক্কায়িত রাখিয়া হস্ত দ্বারা বৃক্ষকাণ্ড বেষ্টন করিয়া রহিল " ইহাদিগের গৃহের ছাদের আকৃতি ঠিক একটী বিস্তৃত ছাতার ন্যায় এবং ব্যাস আট ফুটের অধিক হয় না।

ডুশেলুর সহিত শিগোর প্রথম পরিচয়ের প্রায় এক মাস পরে সুবিধাক্রমে তিনি একটী শিগোশিশু ধৃত করিয়াছিলেন। ডুশেলু স্বয়ং এরূপ মনোহর ভাষায় তাহাকে ধরিবার বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন ও সেই শিগোশিশু যতকাল জীবিত ছিল ততকাল আচার ব্যবহারে আকৃতি ও প্রকৃতিতে মনুষ্যের ন্যায় অন্ততঃ মনুষ্যশিশুর সহিত তাহার এতদূর সাদৃশ্য ছিল যে, তাহার বিবরণ যথেষ্ট প্রীতিদায়ক হইবে। আমরা তাহার অনুবাদ নিম্নে প্রদান করিলাম।

"আমরা এক অধিত্যকার উপর দিয়া যাইতেছিলাম ; এমন সময়ে একটী জন্তুশাবকের শব্দ শ্রুতিগোচর হইল। আমরা বুঝিতে পারিলাম যে তাহা শিগোশিশুর শব্দ। ইহাতে যেন আমার অন্তরে বৈদ্যুতিক তেজোসঞ্চার হইল। ইতঃপূর্ব্বে প্রতি পদবিক্ষেপেই যেন প্রাণ বহির্গত হইতেছিল। সে বিষম ক্লান্তি তখন দূরীভূত হইল, যে ক্ষুধা তৃষ্ণা আমাদিগকে এতক্ষণ কাতর করিয়াছিল তাহা অকস্মাৎ যেন লোপ পাইল। শিশুর ক্রন্দনের ন্যায় সেই শব্দ শুনিতে শুনিতে আমরা যথাসম্ভব নিঃশব্দে জঙ্গলের ভিতর দিয়া হস্ত ও পদের উপর

ভর দিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম। অবশেষে একখণ্ড পরিষ্কৃত ভূমির নিকটবর্ত্তী হইয়া বনমধ্যে লুক্কায়িত থাকিয়া দেখিলাম যে একটী প্রাণী আমাদের দিকে দৌড়াইয়া আসিতেছে। সে সমীপবর্ত্তী হইলে বুঝিতে পারিলাম যে একটী স্ত্রী শিগো-মুভে বক্ষে একটী সন্তান ধারণ করিয়া চারিহস্তে ভর দিয়া বেগে আসিতেছে; সে সময়ে সে বিশেষ ব্যস্ত হইয়া ফল ভক্ষণ করিতেছিল এবং একহস্ত দ্বারা অপর হস্তে সন্তানের ভার রক্ষা করিতেছিল।

"আমার একজন অনুচর সুবিধা বুঝিয়া তাহাকে গুলি করিল। হতভাগিণী তৎক্ষণাৎ জড়বৎ ধরাশায়ী হইল। দুর্ভাগ্য শিশু 'হিউ হিউ হিউ' শব্দ করিয়া মৃত মাতার দেহ জড়াইয়া স্তনপান করিতে লাগিল এবং বন্দুকের শব্দে ভয় পাইয়া মাতার বক্ষস্থলে মস্তক লুকাইল। আমরা মহানন্দে তাহাকে ধরিবার নিমিত্ত ছুটিলাম। সেই শিগো-শিশুর মুখ নির্ম্মল শ্বেতবর্ণ দেখিয়া আমার হৃদয়ে অনির্ব্বচনীয় কৌতুহলোদ্রেক হইল। তাহার মুখ রক্তাভাহীন, বিবর্ণ, ইংরাজ শিশুর মুখের ন্যায় শুভ্র। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তাহার মাতার মুখ গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ।

"শিগো শিশুটী উচ্চে এক ফুটের অধিক হইবে না; আমার একজন অনুচর দৌড়াইয়া তাহার মস্তকে এক খণ্ড বস্ত্র ফেলিয়া দিয়া কিছুক্ষণ ধরিয়া রহিল। ইত্যবসরে অন্য একজন তাহার গলদেশ রজ্জুদ্বারা বন্ধন করিল। শিশুটী অতি অল্প বয়স্ক হইলেও আমাদিগের সহিত চলিয়া আসিল। আমরা তাহাকে লইয়া অবিলম্বে আমাদিগের তাম্বু অভিমুখে অগ্রসর হইলাম। আমরা সন্ধ্যার প্রাক্কালে তথায় পৌঁছিলাম। এতক্ষণ ক্ষুদ্র শিগো শিশুটী তাহার মৃতমাতার নিকট হইতে দূরে ছিল। এখন তাহাকে তাহার মাতার নিকট যাইতে দেওয়া হইল। তখন এক হৃদয়ভেদী করুণ দৃশ্য আমাদিগকে

বিচলিত করিয়া ফেলিল। শিশুশাবক দৌড়াইয়া তাহার মৃত মাতার নিকট উপস্থিত হইল এবং মাতার মুখ ও বক্ষ স্পর্শ করিয়া বুঝিতে পারিল যে নিশ্চয়ই কোন এক প্রভূত পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। কিছুক্ষণ সে মৃতমাতাকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক যেন আদর করিয়া পুনর্জীবিত করিতে চেষ্টা করিল কিন্তু অকৃতকার্য্য হইয়া একবারে হতাশ হইয়া পড়িল। তাহার ক্ষুদ্র চক্ষু দুইটী প্রগাঢ় দুঃখব্যঞ্জক ভাব ধারণ করিল এবং সে অতি করুণস্বরে 'উঙ্গ, উঙ্গ, উঙ্গ' শব্দে শোক প্রকাশ করিতে লাগিল। তাহার দুঃখে আমার হৃদয় বিগলিত হইল। সেই শোকার্ত্ত আকৃতিতে স্পষ্ট বোধ হইল যে সে তাহার দুরদৃষ্ট যথার্থ অনুভব করিতেছে। আমাদের আবাসস্থ সকলে, বিশেষতঃ স্ত্রীলোকগণ তাহার দুঃখে অতিশয় কাতর হইলেন।"

সেই ক্ষুদ্র শ্বেতমুখ বানরশিশুর মাতৃশোকে কোমলান্তঃকরণ শিকারী দুশেলু অভিভূত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহাকে সান্ত্বনা করিতে অধিক দিন যাইল না। তিন দিনের মধ্যে সে এমন শান্ত হইল যে দুশেলুর হস্ত হইতে নিঃসঙ্কোচে আহার লইত। সে যেন বুঝিয়াছিল যে অদৃষ্টের সহিত বিবাদ করা বৃথা। একপক্ষমধ্যে সে এমন পোষ মানিল যে আর তাহাকে বন্ধন করা আবশ্যক হইত না; তখন সে যথেচ্ছা বিচরণ করিত। দুশেলু তাহার নাম রাখিয়াছিলেন "টমি"। টমি শীঘ্রই নীচপ্রকৃতি মানবসুলভ চৌর্য্যবৃত্তি শিক্ষা করিল। দুশেলু লিখিয়াছেন:—"সে প্রায় আমার নিকট হইতে লুকাইয়া পলায়ন করিত। আমার কুটীরে প্রচুর পরিমাণে পক্ক কদলী ও অন্যান্য ফল থাকিত। টমি বুঝিয়াছিল যে, প্রত্যূষে যখন আমি নিদ্রিত থাকি তখনই চুরি করিবার প্রশস্ত সময়। সে তখন অঙ্গুলীর অগ্রভাগের উপর ভর দিয়া নিঃশব্দে আমার শয্যার নিকট আসিত, আমার মুদিত চক্ষের উপর এক দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিত এবং চক্ষের পাতা নিশ্চল দেখিলে

মহানন্দে নিশ্চিন্তমনে তথা হইতে যাইয়া স্বেচ্ছামত কদলী চুরি করিত। আমি অনুমাত্র নড়িলে সে বিদ্যুৎ বেগে পলায়ন করিত। অল্পক্ষণ পরেই আমি ঘুমাইতেছি কিনা আবার পরীক্ষা করিতে আসিত। যদি এরূপ চুরি করিতে আসিয়া কখনও দেখিত আমি জাগিয়া রহিয়াছি তাহা হইলে সে ছুটিয়া আমার নিকট আসিত ও লাফাইয়া আমার গলা জড়াইয়া বসিত—যেন কত ভাল মানুষ—যেন আমাকে আদর করিতেই আসিতেছিল। সে অবস্থাতেও সহজে বুঝিতে পারিতাম, টমি মধ্যে মধ্যে সতৃষ্ণ নয়নে কদলীগুচ্ছের দিকে চাহিতেছে। আমার কুটীরের কপাট ছিল না; এক খণ্ড পর্দাই দ্বারের কার্য্য করিত। আমি নিদ্রিত আছি কিনা দেখিবার নিমিত্ত 'টমি' অতি ধীরে সেই পর্দার এক কোণ তুলিয়া উঁকি মারিত। আমরা তাহার এই রঙ্গ দেখিয়া বড়ই প্রীত হইতাম। কখনও কখনও আমি নিদ্রার ভান করিতাম এবং 'টমি' যখন কদলা লইয়া পলাইতে চেষ্টা করিত অমনি উঠিয়া পড়িতাম। সে তখন কদলীগুলি ফেলিয়া ভয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিত।

"বানরজাতি যত প্রকার দুষ্টপ্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হয় ক্ষুদ্র 'টমি' তাহার ক্ষুদ্র জীবনে সর্ব্বতোভাবে তাহার প্রমাণ দিয়াছিল! শীতকালের রাত্রে সে নিগ্রোভৃত্যদিগের শয্যায় প্রবেশ করিত এবং প্রাতঃকালে শয্যা হইতে বহির্গত হইয়া "হু, হু" শব্দ করিয়া পরমানন্দে প্রভুর করমর্দ্দণ করিত—যেন তাহার ভাষায় গুডমর্ণিং কথাটী 'হু হু'তে পরিণত হইয়াছিল। প্রাতঃ ভোজনের সময় সে মনুষ্যের ন্যায় বেশ সভ্যভাবে কাফিপান করিত। অবশেষে সে একদিন মদ্যপানে মত্ত হইয়া চিরকালের মত অখ্যাতি ক্রয় করিল। ডুশেলু বলিয়াছেন— "দেখিলাম আমার বহুযত্নরক্ষিত ব্র্যাণ্ডির বোতলটী খণ্ড খণ্ড হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। 'টমি' সেই ভগ্ন কাচখণ্ডগুলির পার্শ্বে 'বেদম

মাতাল' হইয়া জড়সড়ভাবে পড়িয়া আছে। সেইটিই আমার শেষ বোতল। আফ্রিকার এই অংশে ব্র্যাণ্ডি কুইনাইনের মত নিত্য-প্রয়োজনীয়। কিন্তু কি করিব. 'টমি' আমাকে বিষম কষ্টে ফেলিল সেখানে ব্র্যাণ্ডি পাওয়া যায় না। সে আমাকে দেখিতে পাইয়াই উঠিয়া আমার দিকে টলিতে টলিতে আসিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না, অনেকবার পড়িয়া গেল। তাহার চক্ষু দুইটী তখন মদ্য-পানে বিহ্বল মনুষ্যের ন্যায়। আমাকে ধরিবার নিমিত্ত সে কেবল বৃথা হস্ত প্রসার করিতে লাগিল। তাহার স্বরভঙ্গ হইয়াছিল। প্রকৃত পক্ষে তখন তাহার অবস্থা মদ্যপানে মত্ত মনুষ্যের ন্যায়—সে যেন আপনার কুকার্য্যের নিমিত্ত অনুতপ্ত অথচ তাহার ভঙ্গিমা বিলক্ষণ রঙ্গপূর্ণ। তাহার প্রতি অঙ্গ বিক্ষেপে অনুতপ্ত মদ্যপানোন্মত্ত মনুষ্যের ব্যবহার প্রতিফলিত হইতেছিল। আমি তাহাকে বিলক্ষণ প্রহার করিলাম। তাহাতে সেই ক্ষুদ্র মাতাল একটু প্রকৃতিস্থ হইল। কিন্তু তদবধি তাহার বিষম পানাসক্তি জন্মিল—কিছুতেই তাহার সে আসক্তি ত্যাগ করাইতে পারিলাম না।

"হায়, হতভাগ্য 'টমি' অকস্মাৎ আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া গেল। একদিন প্রাতঃকালে সে কিছুই খাইতে চাহিল না; অতি বিমর্ষভাব ধারণ করিয়া এবং কোলে উঠিয়া বসিবার ও তাহার গায়ে হাত বুলাইয়া দিবার আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিল। আমি তাহার জন্য বিবিধ প্রকার বন্য ফল সংগ্রহ করিয়া আনিলাম। কিন্তু সে তাহার একটীও স্পর্শ করিল না। তাহার শরীরে কোন প্রকার পীড়ার লক্ষণ দৃষ্ট হয় নাই। কিন্তু সে দিন সে কিছুই খাইল না। পর দিবস অনুমাত্র কষ্ট না পাইয়া পাঁচ মাস মাত্র বয়সে প্রাণত্যাগ করিল।"

শ্রীবিপিন বিহারী দত্ত।

মহানাটক।*

নান্দী।

ত্রিগুণের সহায়তা অবলম্বি' যিনি বারম্বার
স্বেচ্ছাক্রমে করিছেন সৃজন পালন সংহার,
কি-এক মহিমা যাঁর লোকাতীত, বিরাজয়ে
সর্ব্বসীমা করি' অতিক্রম,
চক্ষু শ্রোত্র ইন্দ্রিয়াদি বর্জ্জিত হয়েও যিনি
ইন্দ্রিয়ের কার্য্যে দক্ষতম,
—সেই বিশ্বেশ্বর দেব
তোমাদের করুন রক্ষণ॥

শুণ্ডাগ্রে গণেশ যবে সমস্ত সমুদ্র-জল
পান করি'—করিলেন পুন উদ্গীরণ,
সেই অলৌকিক কার্য্য দেখিলেন সবিস্ময়ে
গগন-মণ্ডলবাসী যত দেবগণ।
কোথাও রহিল অম্বু, কোথাও বা ব্রহ্মা বিষ্ণু,
কোথাও অনন্ত আর কোথাও বা শৈল;
কোথাও বাড়বানল, কোথাও বা রত্নরাশি,
কোথাও বা মৎস্য নক্র তিমি তিমিঙ্গিল;
—এ-হেন সে বিঘ্নেশ্বর বিঘ্নবিনাশন
গণপতি তোমাদের করুন রক্ষণ॥

রঘুবংশ-অবতংশ— কৌশল্যার আনন্দ বর্দ্ধন,
দশানন-হন্তা যিনি, যিনি পদ্মপলাশলোচন,

* হনুমান-রচিত বলিয়া ইহার আর এক নাম হনুমান-নাটক। কিন্তু ইহার প্রকৃত গ্রন্থকার শ্রীমধুসূদন মিশ্র। নাটক না বলিয়া ইহাকে কাব্য বলিলেই ঠিক্ হয়। গ্রন্থকার রাম-বৃত্তান্ত ঘটিত নানা শ্লোক নানা গ্রন্থ হইতে সংকলন করিয়া

সেই সে রামের জয় জয় জয় বল' সর্ব্বজন।
সুর-কল্পতরু যিনি ধনুর্দ্ধর, নীরদবরণ,
গুণ-অভিরাম সেই রামচন্দ্র কমল-বদন
লক্ষ্মীর আস্পদ, যাঁরে লক্ষ্মী নাহি ত্যজেন কখন।
লক্ষ্মণ অনুজ যাঁর, রঘুবর, সীতাপতি,
সুরূপ সুন্দর,
কাকুৎস্থ, করুণাময়, বিপ্র-প্রিয়, গুণনিধি,
ধার্ম্মিকপ্রবর,
রাজ-শ্রেষ্ঠ, সত্যসন্ধ, দশরথের তনয়,
সৌম্য শান্ত মূরতি শ্যামল,
রঘুকুল-তিলক যে, রাঘব, রাবণ-অরি
—বন্দি তাঁর চরণ-কমল॥
মন-অভিরাম যিনি, নয়নাভিরাম,
বাক্য অভিরাম যিনি, শ্রবণাভিরাম,
—বন্দি আমি সদা সেই দাশরথী রাম॥'
তুমি গো শ্রীরামচন্দ্র, ভুবন-বিশ্রুত কীর্ত্তি-চন্দ্র,
মৃদু হাস্যানন-চন্দ্র, নিশাচরগণ-পদ্মচন্দ্র, *
তুমি গো আনন্দচন্দ্র, রঘুবংশ-জলধির চন্দ্র,
সীতা-চিত্ত-কুমুদের সুখচন্দ্র তুমি সীতাপতে!
নমি তোমা বার বার নমোনমঃ নমস্তে নমস্তে!
সর্ব্ব কল্যাণের মূল কলি-পাপ-ধ্বংসক্ষম,
সজ্জন-জীবন:
কৈবল্য লভিবারে ঝটিতি আকাঙ্ক্ষা করে
মুমুক্ষু যে জন
—পথের সম্বল তার; কবিবর-বচনের
যাহা হয় একমাত্র বিশ্রামের স্থল,

* রাক্ষসরূপ পদ্ম যে চন্দ্রের উদয়ে সঙ্কুচিত হয়।

পাবক-পাবন যাহা,—　　ধর্ম্মতরু-বীজ সেই
রাম-নাম তোমাদের করুক মঙ্গল ॥ ৯
যে রামের বাহুদ্বয়　　ক'রিয়াছে ছারখার
দশানন-কণ্ঠরূপ কদলীর বন,
সতী-কুচ-কুম্ভ-লগ্ন　　কুঙ্কুমের রক্ত-চূর্ণে
অঙ্কিত হইয়া ধরে অরুণ বরণ,
লোক-পরিত্রাণকর　　সেই বাহু সাধুজন-
কৃত যজ্ঞ-যূপের সমান,
সেই মহৈশ্বর্য্যশালী　　বাহুদ্বয় করুক গো
তোমাদের মঙ্গল বিধান ॥
শিব-ধনুর্ভঙ্গাবধি　　বাল্যকালে রামচন্দ্র
করিলেন বাল্যলীলা যত,
অরণ্য-গমনাবধি　　করিলেন নম্রভাবে
যাহা কিছু পিতৃ-আজ্ঞামত,
সুগ্রীবের সখ্যাবধি　　করিলেন যে সকল
দয়ার করম,
বারিধি-বন্ধনাবধি　　করিলেন যাহা কিছু
প্রকটি' শাসন,
লঙ্কেশ-বিনাশাবধি　　করিলেন অর্জ্জন
যে সমস্ত যশ,
জানকী-বর্জ্জনাবধি　　করিলেন যাহা কিছু
হয়ে লোক-বশ,
সেই সব তাঁর কার্য্য অতীব বিচিত্র
তোমা সবাকারে যেন করয়ে পবিত্র ।

সূত্রধার ।

বাল্মীকির উপদেশে　　বক্তা স্বয়ং কপি হনুমান ;
রঘুবংশ-ধুরন্ধর　　শ্রীরামের চরিত মহান্ ;
সৌম্য নর্ত্তক মোরা ;　　বেষ্টিত এ সভাস্থল
সুহৃৎ সজ্জনে ;

তাই বলি, সুধিগণ ! আনন্দ সম্ভোগ কর
তোমরা এক্ষণে ;
রামায়ণ-কথা আমি বলিতেছি, শোনো সবে
প্রফুল্লিত মনে ॥
মহারথ দশরথ সূর্য্যবংশ-অগ্রগণ্য
ছিলেন নৃপতি ;
আছিল তাঁহার তিন মহিষী শুভলক্ষণা
—অতি রূপবতী।
জ্যেষ্ঠ রাম, তা'র পর কনিষ্ঠ ভরত, পরে
অনুজ লক্ষ্মণ,
শত্রুঘ্ন তাহার পর ; —জনমিল বীরপুত্র
এই চারি জন।
শত্রুঘাতী শত্রুঘ্ন সে, —কৈকেয়ী-নন্দন সেই
ভরতের স্নেহবশে হৈলা অনুগত।
ধর্ম্মকর্ম্মে সুপ্রবীণ লক্ষণ সুমিত্রা-পুত্র
হইলেন স্নেহবশে রামের ভকত।
দশরথ নৃপতির চারিটি তনয় এই
বিষ্ণুরি ছিলেন সবে অংশ-অবতার ঃ
তার মধ্যে রামচন্দ্রে প্রার্থিলে কৌশিক মুনি
যজ্ঞসিদ্ধি তরে,
পিতৃ-আজ্ঞা শিরে ধরি' লক্ষ্মণেরে লয়ে রাম
কৌতুকের ভরে
গেলেন সে যজ্ঞভূমে বধিতে রাক্ষসগণে ;
যাত্রাকালে পুরনারীগণ
নয়ন-কমল খুলি' সাদর ঔৎসুক্য ভরে
করিতে লাগিল নিরীক্ষণ।

[শ্রীরামচন্দ্র তপোবনে প্রবেশ করিলে বৈতালিকের প্রবেশ।]

বৈতালিক।—জয়া ও বিজয়া এই উৎকৃষ্ট বিদ্যা দুটি
বিশ্বামিত্র-সন্নিধানে হয়ে অবগত

যাজ্ঞিকের হয়ে বন্ধু   বধিতে রাক্ষসবৃন্দ
দেখ ওই রামচন্দ্র এবে সমাগত ॥"
রাক্ষস-চমুর নেতা   মারীচ রাক্ষসবরে
বধিলেন স্বয়ং রাঘব।
লক্ষণের শরাঘাতে   যমালয়ে গেল চলি,
আর যত রাক্ষসেরা সব ॥
মহর্ষিগণের সাথে   বিপ্রবর্গ সকলেরি
হইল আহ্লাদ।
যজ্ঞক্রিয়া সমাপনে   হয়ে হৃষ্ট করিলেন
শুভ আশীর্ব্বাদ।
রক্ষকুলে রামভদ্র   করিলে নিধন,
যজ্ঞকর্ম্ম বিধি মতে করি' সমাপন,
বিশ্বামিত্র চলিলেন   জনক-পত্তনে
সঙ্গেলয়ে নিজ সাথে রাম ও লক্ষ্মণ ॥

(বৈতালিকের প্রস্থান)

রাম মিথিলায় প্রবেশ করিলে
বৈতালিকগণের প্রবেশ।

বৈতালিকগণ।—যজ্ঞ-বিঘ্ন-নাশ-তরে   বিশ্বামিত্রমুনি হস্তে
দশরথ দিলেন যাঁহারে,
বন প্রস্থানের কালে   পথের মাঝারে যিনি
বধিলেন পাপ-তাড়কারে,
মুনি-হতে অস্ত্র লভি'   মুনির সে যজ্ঞ যিনি
দেখিলেন কৌতুকের ভরে,
সেই সে রাঘব এবে   অনুজে লইয়া সাথে
সমাগত জনক-নগরে ॥
নিজের সে যজ্ঞকর্ম্ম   সুসম্পন্ন হল যবে
তখন সে বিশ্বামিত্র মুনি,
সীতা-স্বয়ম্বরাগত   নৃপ যত, ধনুর্যজ্ঞে
ভগ্নবীর্য্য হইয়াছে—শুনি,'

জনকের আমন্ত্রণে রামচন্দ্রে লয়ে সাথে
আইলেন তিনি মিথিলায় ;
যোগ্য অভ্যর্থনা লভি' উপস্থিত হইলেন
অবশেষে যজ্ঞের সভায় ॥

(জনকের প্রবেশ।)

জনক।—অসুর-সুর-ভুজঙ্গ বানর-নর-কিন্নর
সিদ্ধ চারণ-আদি-মাঝে যেই জন
এই ভীম হর-ধনু পারিবেক নোয়াইতে,
মোর কন্যা সীতারে সে করিবে বরণ ॥

(রাবণ-দূত শৌষ্কলের প্রবেশ)

শৌষ্কল।—(সকোপে)
দুর্ম্মদ রাজন্ ও গো! যে রাবণ-বাহুবলে
—হর ও হর-বল্লভা পার্ব্বতী-সহিত—
গণেশ, কার্ত্তিক, বৃষ ভূতগণ-সমাকীর্ণ
গিরিরাজ কইলাস হয় উত্তোলিত,
সেই মহাবাহুবল রাবণ রাজের
হরধনুর্ভঙ্গ-কাজে পরীক্ষা কিসের?

জনক।—এ হর-ধনুতে যেই বসাতে পারিবে ছিলা
করিব তাহারে কন্যাদান।

শৌষ্কল।—গুরুর ধনুক সে যে নতুবা গো ক্ষণমাত্রে
করিতেন তারে খান্ খান্ ॥
এ তব দুহিতাটিরে কাহাকেও-না-কাহাকে
অবশ্য করিতে হবে দান।
যার ভুজ-পরাক্রমে সমস্ত এ ত্রিভুবন
হইয়াছে মশক-সমান,
সেই লঙ্কা-অধিপতি যাচে তব দুহিতারে,
কেন তবে মূঢ়বৎ করিছ দর্শন?
জানতো মরীচী-আদি পূর্ব্বতন মুনিগণ
সাত্ত্বিক চরিত্র তাঁর করিলা কীর্ত্তন ॥

(রামের প্রতি)

চারিদিক হতে যাঁরে সুরাঙ্গনাগণ
বায়ুর তরঙ্গ তুলি করিছে ব্যজন
উজ্জ্বল অর্গল-সম বাহুদুটী যাঁর
চারি ধারে সউরস্ত করিছে বিস্তার,
ত্রিভুবন জয়ী সেই পুলস্ত্য-নন্দন
যাহারে হৃদয়-মাঝে করিল ধারণ
—জনক-নন্দিনী সেই—সীতা যার নাম—
কহিনু তারে বিয়া শোন্ বলি রাম!

শম্ভুর আবাস-ভূমি　　　কৈলাস-পর্ব্বত যেই
　　তুলে কুতূহলে,
সে রাবণ হর-ধনু　　　পারে না কি আকর্ষিতে
　　নিজ বাহুবলে?

(খেদ-সহকারে)

মহেশ্বর-উপাসক রাজা দশানন;
হীনবল অতি ক্ষুদ্র অন্য রাজগণ,
ধনুর্ভঙ্গপণ এবে জনক রাজার,
হায় সীতা! এ সঙ্কটে কি হবে তোমার?

(দূতের প্রস্থান।)

নৃপ-পূর্ণ সভামাঝে　　　জনক-রাজার পুরোহিত
শতানন্দ, রাজাদের　　　কহিলেন বচন বিহিত।

শতানন্দ।—শোনো গো ক্ষত্রিয় সবে, জনকের পণ :—
কুণ্ঠিত-শকতি যাহে রাজা দশানন,
সেই ধনুকেতে ছিলা যেই দিবে তুলি'
তারি পত্নী—ত্রিভুবন-জয়িনী মৈথিলী॥
(নৃপতিগণ ধনুর্গ্রহণ না করায়)

জনক।—দেশদেশান্তর হতে সমাগত বহু নরপতি;
কাঞ্চন-কোমল-কান্তি এই কন্যা—কীর্ত্তিও মহতী;
কিন্তু তবু কাহা-হতে হ'ল না এ ধনু আকর্ষিত,
টক্কিত, নমিত কিম্বা স্থান-হতে তিল উত্থাপিত।
কি আশ্চর্য্য হায়-হায়! উর্ব্বীতল নির্ব্বীর নিশ্চিত॥

সীতার সখীজন।—রাম দুর্ব্বাদল শ্যাম জানকী কানকী লতা,
যোগ্য এ উদ্বাহ, কিন্তু বিষম সে পণ-কথা।

সীতা।—(স্বগত)
কমঠ-পৃষ্ঠের সম কঠোর এ ধনু,
কোমল মধুর রঘু-নন্দনের তনু,
কেমনে ধনুতে হবে গুণ আরোপণ,
ও হো হো! পিতাগো তব দারুণ এ পণ॥

লক্ষণ।—(শ্রীরামের লজ্জা হইলে সীতার উৎসাহ-বর্দ্ধন করত)
বীরশ্রেষ্ঠ রঘুনাথ! অধিক বলিব কিবা আর,
উপস্থিত আছে হেথা লক্ষণ, এ কিঙ্কর তোমার।
সুমেরু-ভূধর আদি তুচ্ছগণি, তুচ্ছ এই
মাহেশ্বর-ধনু পুরাতন;
আদেশ করহে বীর! পাইলে বচন তব
কতুহলী আমি এ লক্ষণ,
উত্তোলিতে, নাড়াইতে নোয়াতে, ভাঙ্গিতে এই
ধনুটিরে আমি-ই সক্ষম॥

কবি।—পরিণয়োদ্যত হয়ে রামচন্দ্র হরধনু
করিলে গ্রহণ,
জানকী ও রামলগ্না —উভয়েরি বাম নেত্র
হইল স্পন্দন।

রাম।—(ধনুর্গ্রহণ)

লক্ষণ।—পৃথ্বী হও স্থির তুমি, নাগ-পতি ধর' পৃথিবীরে,
তুমি ওগো কূর্ম্মরাজ! ধর' ধর' ভুজঙ্গ-পতিরে,

তোমরা গো দিক্-হস্তী !　　তিনেরেই করহ ধারণ,
হরের ধনুতে আর্য্য　　করিছেন গুণ আরোপণ ॥
পৃথ্বী রসাতলোন্মুখী ;　　ফণিপতি আনমিত
ফণা ধরি হইল ব্যথিত ;
কূর্ম্মরাজ-সহ যত　　দিক্-গজ সকাতর
ঘোররবে করয়ে বৃংহিত ;
রাঘব-পুঙ্গব এবে　　হর-শরাসনে গুণ
ওই দেখ করেন যোজিত ॥
হর-শরাসন, রাম তুলিলা যখন,
মুচকি-মুচকি হাসে যত নৃপগণ।
গুণ-আরোপণে যবে হইলা তৎপর,
করতালি দিয়া হাসে তারা পরস্পর।
অঙ্গুলী-পল্লবগুলি করি' সঞ্চালন,
করিতে উদ্যত যবে গুণ আকর্ষণ
ম্লানমুখ হল তারা ; গুণে দিয়া টান্
খান্-খান্ করে যবে সেই ধনু, রাম,
অমনি, নৃপতি যারা ছিল উপস্থিত
নিজ নিজ সিংহাসনে হইল মূর্চ্ছিত ॥
কৌশিক-পুলক-সাথে　　ধনু হল উত্তোলিত,
নৃপদের মুখ-সাথে　　ধনু হল আনমিত,
জনক-সংশয়-সাথে　　ধনু হল আন্দোলিত,
বৈদেহীর চিত্ত-সাথে　　ধনু হল আকর্ষিত,
ভার্গবের গর্ব্ব-সাথে　　ধনু হল বিখণ্ডিত ॥
চতুর্ম্মুখ-অষ্টকর্ণ করি' মুখরিত,
অষ্টদিক্ সমুদায় করিয়া ধ্বনিত,
অষ্টমূর্ত্তি শঙ্করের করি' বক্রীকৃত,
অষ্ট কুল-পর্ব্বতেরে করি' বিদলিত,
বধীর করিয়া তুলি অষ্টনাগগণে
আর্য্য-ধনু-মহানাদ উঠিল গগনে ॥

নিদ্রা ভাঙ্গি মুরারীর, সকল নৃপতিদের
শৌর্য্যদর্প করিয়া খণ্ডিত,
দিগ্‌দন্তী-সমূহের ছেদি' কর্ণ, আর করি'
সর্পরাজ-ফণারে কম্পিত,
উদ্দাম গম্ভীর সেই কল্‌পান্ত জলদের
গরজন করি' তিরস্কৃত
ভগ্ন-হর-ধনু-হতে ভীষণ টঙ্কার-ধ্বনি,
মহারবে হল বিনিসৃত ॥
সপ্তলোক নিনাদিয়া উদ্‌ভ্রান্ত করি তুলি
সূরজের সাতটি তুরঙ্গ,
সপ্তর্ষির ধ্যান ভাঙি, বিক্ষুব্ধ করি তুলি'
সপ্ত-মহাসিন্ধুর তরঙ্গ,
অতল বিতল আর নিতল সুতল আদি
সপ্ত রসাতলদের করি আন্দোলিত।
রাম-বাহু-বিদলিত কোদণ্ড-প্রচণ্ড-ধ্বনি
গগন-মণ্ডল ব্যাপি' হল সমুত্থিত ॥
কন্দুক-লাঞ্ছন-চিহ্নে যেই বাহু এখনো ভূষিত,
রক্ত-পদ্ম-নাল সম যেই বাহু হয় গো লক্ষিত,
যে বাহুতে কৌশল্যা পরাইলা মঙ্গল-কঙ্কণ,
যে বাহু বাড়িবারে করিয়াছে সবে উপক্রম,
সেই রাম-বাহুবলে সহসা সে হরধনু ভগ্ন
আর সেই ধনু-হতে ঘোর শব্দ হয়ে উৎপন্ন,
ত্রিলোক দলিত করি' কল্পান্ত-সাগরে হ'ল মগ্ন।
যে ভীম কঠোর নাদে সভাজন হইল বিস্মিত,
ত্রাসে রবি মার্গভ্রষ্ট, শম্ভু'শিব হ'ল বিকম্পিত,
বিশ্লথিত দিগ্‌দন্তী, বিচলিত মহা-গিরিকুল,
আন্দোলিত সপ্তসিন্ধু, বৈদেহী সে মদন-আকুল,
মদাক্কজনেরা সবে হইল দমিত,
সমস্ত ত্রৈলোক্য তাহে হল সম্মোহিত ॥

সে প্রচণ্ড শব্দ-পিণ্ড　　বিজয়-ডিণ্ডিম-সম
আর্য্যের সে বাল্য-কথা
বিশ্বজনে করি' বিঘোষিত,
ত্রৈলোক্য-কপাল ভেদি'　　ব্রহ্মাণ্ডের ভাণ্ডোদরে
ভ্রমিয়া অদ্যিও তবু
কিছুমাত্র হল না শমিত॥
ধনুর্ভঙ্গে দশ দিক　　যে করিল মুখরিত
অসামান্য ধনুর্বিৎ মহা কীর্ত্তিমান
জনক-কন্যার সেই　　শ্লাঘ্য বরণীয় বর
—করি আমি বারবার তাঁহারে প্রণাম॥

শতানন্দ-আনীত দশরথ মিথিলায়
প্রবেশ করিলে বৈতালিকের
পাঠ।

শতানন্দ-প্রমুখাৎ　　শুনি' হৃদ্য প্রিয়বাক্য
—রাম-শৌর্য্য কথা
হৃষ্ট হয়ে দশরথ　　আর দুটি পুত্র সাথে
আইলেন তথা।
পরমাতিথের রাজা　　জনক মিথিলা অধিপতি
আতিথ্য সৎকার করি'　　যথাবিধি দশরথ-প্রতি
নিজ কন্যা সীতা　　ও তার কনিষ্ঠ ঊর্ম্মিলায়,
মাণ্ডবী ও শ্রুতকীর্ত্তি,—　　কুশধ্বজ ভ্রাতার কন্যায়
শ্রীরাম লক্ষ্মণে আর ভরত শত্রুঘ্নে
যথাবিধি সম্প্রদান করিলা যতনে॥
রসাল মর্দ্দল-রব, ভেরীর গভীর ধ্বনি
আর অন্য বাদ্য শব্দজালে,
হইল গো পরিপূর্ণ　　পৃথিবী গগনতল
রাম সীতা-পরিণয় কালে॥

বিশ্বামিত্র, জামদগ্ন্য, বাল্মীকি, বশিষ্ঠ, গৌতম,
—ইঁহাদের দ্বারা হ'ল সমাপন শুভ অনুষ্ঠান।
অনুজ-সহিত রাম তিল, গাভী আর বহুধন
ঐ সব পুরোহিতে মুক্ত হস্তে করিলেন দান।
জনক ও দশরথ —এ দোঁহার অপত্যের
হল শুভ পরিণয়-যোগ ;
ত্রিভুবন-জন তাহে হইয়া একত্র সবে
হরষ প্রমোদ কত করিল সম্ভোগ।
সীতায় শ্রীরামচন্দ্র, ভরত সে মাণ্ডবীরে,
লক্ষ্মণ সে চারু উর্ম্মিলায়
করিলে বিবাহ, পরে উৎসব করিয়া শেষ
দশরথ গেলা অযোধ্যায়।
মহাবীর শ্রীরামের বিক্রম কীর্ত্তন করি'
এ মহানাটকখানি রচিলা হনুমান।
শ্রীমধুসূদন মিশ্র রচি' তা' সন্দর্ভাকারে
প্রথম অঙ্কের দিলা "সীতালাভ" নাম॥

ইতি প্রথম অঙ্ক সমাপ্ত।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

আমাদের ঐতিহাসিক ভাণ্ডার।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রাচীন ইতিহাস।

বল্লাল সেনের সঙ্গে সঙ্গেই রামপালের অধঃপতনের সূত্রপাত হয়, একথা আমরা পূর্ব্ব প্রবন্ধেই বলিয়াছি। বল্লাল-পুত্র লক্ষ্মণ সেন, কিছুকাল রামপালের সিংহাসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার জীবনের অধিকাংশ সময়ই স্বনাম-প্রসিদ্ধ লক্ষ্মণাবতী নগরীতে অতিবাহিত হইয়াছিল। তাঁহার সময়ের বিশেষ কোন বৃত্তান্ত, লোক-প্রবাদ বা অন্য কোনও সূত্রে জানা যায় না। তবে এইমাত্র জানা যায় যে, তিনি পরম পণ্ডিত ছিলেন। নানা দিগ্দেশাগত পণ্ডিতমণ্ডলীর সহিত শাস্ত্রালোচনায়, তিনি পরম পরিতোষ লাভ করিতেন। বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন সভার অনুকরণে গঠিত, তাঁহার পঞ্চরত্ন নামে এক সভা ছিল। গোবর্দ্ধণাচার্য্য, বারণাচার্য্য, জয়দেব, উমাপতি ও কবিরাজ মিশ্র এই পঞ্চ উজ্জ্বল রত্ন দ্বারা লক্ষ্মণ সেনের পঞ্চরত্ন-সভা সদা শোভিত থাকিত। এই জয়দেবই, রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক সুমধুর সঙ্গীতময় "গীত-গোবিন্দ" কাব্যের প্রণেতা—অমর কবি জয়দেব গোস্বামী। কথিত আছে, তিনি লক্ষ্মণসেনের সভায় থাকিয়াই উক্ত মধুময় কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। শাস্ত্রদর্শী পণ্ডিত হলায়ুধ, উক্ত পণ্ডিত সভার সদস্য ও রাজার প্রধান মন্ত্রীরূপে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ইহাঁর রচিত "ব্রাহ্মণ সর্ব্বস্ব" নামক স্মৃতিগ্রন্থ ইহাঁর অগাধ পাণ্ডিত্যের প্রকৃষ্ট প্রমাণরূপে বর্ত্তমান আছে।

লক্ষ্মণসেনের পরেই রামপাল-রাজধানী একপ্রকার পরিত্যক্ত অবস্থায় ছিল। তবে লক্ষ্মণ সেনের পৌত্র লাক্ষ্মণেয় সেন, সময় সময় রামপালে আসিয়া বাস করিতেন। কথিত আছে বক্তিয়ার খিলিজি কর্ত্তৃক নবদ্বীপ অধিকৃত হইলে পর, লক্ষ্মণসেন পরিবার ও পরিচারকগণ-

সহ নবদ্বীপ হইতে পলায়ন করিয়া রামপালে আসিয়া বাস করেন। শেষে জীবনের অন্তীম সময়ে পুরুষোত্তমধামে চলিয়া যান। সেখানেই তাঁহার অশান্তিময় জীবন চিরশান্তি লাভ করে।

লক্ষ্মণসেনের অবসানের সঙ্গেই রামপালের অস্তমিতপ্রায় সৌভাগ্য রবির অবসান হয়। মুসলমান-প্রভাব শনৈঃ শনৈঃ সমস্ত বঙ্গদেশে অনুপ্রবিষ্ট হইতে থাকে। কিন্তু হিন্দু-প্রভাব অস্তমিত হইলেও মুসলমান-প্রভাব বদ্ধমূল হইতে অনেক কাল গত হইয়াছিল। এই মধ্যবর্ত্তী সময়ে সমস্ত বঙ্গদেশ, বিশেষতঃ পূর্ব্ববঙ্গ, একপ্রকার অরাজক অবস্থায় ছিল। এই অরাজক সময়ে রামপালের সমৃদ্ধ অধিবাসীগণ, রাজশূন্য বিলুপ্ত-প্রভ রাজধানীতে বাস করা শঙ্কাজনক মনে করিয়া আপন আপন ইচ্ছামত নিরাপদ স্থানে চলিয়া যান। সেই সময় হইতেই সুরম্যহর্ম্ম্যাবলীপরিশোভিত রামপাল, বিজন অরণ্যে পরিণত হইতে থাকে।

রামপালের অবনতির সঙ্গেই বিক্রমপুরও হতশ্রী হইতে থাকে। হিন্দুরাজশ্রী বিক্রমপুর পরিত্যাগ করিলে অরাজকতায় দেশ সমাচ্ছন্ন হয়। দুর্ব্বলের প্রতি প্রবলের অত্যাচার, দস্যু তস্করাদির উপদ্রব দেশে বিশেষ প্রাবল্য লাভ করে। সেই সময় হইতে বিক্রমপুরের ঐতিহাসিকতত্ত্ব, ঘোর তমসাচ্ছন্ন। সেই অনালোকিত অতীতের ধারাবাহিক বৃত্তান্ত সংগ্রহ করা একেবারেই অসম্ভব। জনশ্রুতি, পুরাতন মঠ, মন্দির, দেউল, দীঘিকা প্রভৃতি হইতে যে সকল বৃত্তান্ত সংগ্রহ করা যায়, তাহা আপাততঃ অকিঞ্চিৎকর বোধ হইলেও লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিলে হয়ত কালে কোন ঐতিহাসিকের প্রয়োজনে আসিতে পারে।

রামপালে হিন্দুরাজত্বের অবসানের পর হইতে মোগল রাজত্বের প্রায় অন্তিম সময় পর্য্যন্ত, সুদীর্ঘ কালের মধ্যে, বিক্রমপুরে যে সকল

ব্যক্তি অসাধারণ কার্য্য বা অসাধারণ গুণে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া সঙ্গে সঙ্গে নিজ বাসস্থল ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানগুলিকে বিশেষ বিখ্যাত করিয়া গিয়াছেন,—যাঁহাদের কীর্ত্তির ধ্বংশাবশেষ বক্ষে বহন করিয়া বিক্রমপুর আজিও পূর্ব্বস্মৃতিজনিত উষ্ণশ্বাস ত্যাগ করে—সেইরূপ কয়েকটী লোকের বৃত্তান্ত সংক্ষেপে এই প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ করিব। এই প্রবন্ধে জগন্নাথ বণিক, রাজা রঘুনাথ রায়, রাজা হরিশ্চন্দ্র রায়, কাজি মহোম্মদ সাদি উদ্দিন এই চারি ব্যক্তির বৃত্তান্ত যতদূর সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি তাহাই সংক্ষেপে বর্ণন করিতে চেষ্টা করিব।

কোনো পুরাতন বৃত্তান্ত সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইলেই, অধিকাংশ স্থলে জনশ্রুতির উপর বেশী নির্ভর করিতে হয়। এক ঘটনাই ভিন্ন ভিন্ন লোকের নিকট ভিন্ন ভিন্ন প্রকার শুনিতে পাওয়া যায়। বাস্তব ঘটনার সহিত নানা অবান্তর ঘটনা মিশ্রিত হইয়া বাস্তব বৃত্তান্তটীকে এরূপ দুরূদ্ধর করিয়া তুলে যে সহসা বাস্তব বৃত্তান্তের উদ্ধার অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু বহু লোকের নিকট এক বিষয়ের অনুসন্ধান করিলে প্রকৃত তত্ত্ব লুক্কায়িত থাকিতে পারে না। যাহা সত্য, তাহা আপনিই প্রকাশিত হইয়া পড়ে। এই সকল বৃত্তান্ত সংগ্রহেও সেই পথই অনুসৃত হইতেছে। অনেকে জনশ্রুতির উপরে নির্ভর করিতে ভরসা করেন না, কিন্তু আমরা বলি "নহ্যমুলাজনশ্রুতি" এই প্রাচীন বাক্যটীর মূলে সত্য নিহিত আছে। কিন্তু আমরা কেবল জনশ্রুতির উপরই নির্ভর করি নাই ; প্রত্যেকের নামের সহিত জড়িত হইয়া যে ২।৪টী কীর্ত্তি—মট, মন্দিরাদির ভগ্নাংশ, দেউল, সরোবরাদি বর্ত্তমান আছে, সে সকল আমরা ভালরূপ পরিদর্শন ও তৎপার্শ্বস্থিত লোকদিগের নিকট তৎবৃত্তান্ত যতদূর সম্ভব সংগ্রহ করিয়া প্রধান জনশ্রুতির সহিত তাহার সমন্বয় করিয়াছি। এবং বিশেষ সতর্কতার সহিত যতটুকু সত্য বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে তাহা গ্রহণ করিয়া অবশিষ্ট পরিত্যাগ করিয়াছি।

পূর্ব্ব-বাঙ্গালায় মুসলমান রাজত্বের প্রারম্ভ-কালে রামপালের নিকটবর্ত্তী স্থানে জগন্নাথ বণিক নামে এক ব্যক্তি অতুল সম্পত্তির অধিশ্বর হইয়া, তাহার সদ্ব্যবহার দ্বারা বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল জগন্নাথ অতি দরিদ্রের সন্তান ছিল। বাল্যে ইহার পিতৃবিয়োগ হইলে একমাত্র বিধবা জননীই তাহার অকূল সংসারসাগরের ভগ্নতরণীর ন্যায় একমাত্র আশ্রয় ছিল। বালক জগন্নাথ ৮।১০ বৎসর বয়সের সময়ই পৈত্রিক ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হ'য়। বনজাত ঔষধ, লতা, পত্র, বৃক্ষ, বল্কলাদি সংগ্রহ করিয়া বিক্রয় করাই তাহার ব্যবসা ছিল। এই ব্যবসায়ে তাহার ও তাহার জননীর গ্রাসাচ্ছাদন কোনও প্রকারে চলিত। এই দরিদ্র বালক তখন "জগাবেণে" নামে পরিচিত ছিল। কালে এই জগাবেণেই কোটী-পতি জগন্নাথ বণিক নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। দরিদ্র বালক জগন্নাথ দারিদ্রের সহিত সংগ্রাম করিয়া কিরূপে জয়লাভ করে, কিরূপে কপর্দকসম্বলহীন বালক অতুল ধনেশ্বর হইতে সমর্থ হয়, তাহার প্রকৃত কারণ সৌজন্য ও ব্যবসায়-নৈপুণ্য ভিন্ন আর কিছুই অনুমিত হয় না। কিন্তু তাহার এই ভাগ্য পরিবর্ত্তনের অসাধারণতা দৃষ্টে, তাহার একটী অসাধারণ কারণও লোকে প্রচার করে। সেটী কল্পিত উপাখ্যান বলিয়া বিবেচিত হইলেও তদ্দারা জগন্নাথের সম্পত্তির বিপুলতার একটা আনুসঙ্গিক প্রমান লোকচিত্তে বদ্ধমূল হইয়াছে। উপাখ্যানটী কৌতুহলোদ্দীপক বলিয়া এস্থানে তাহা উদ্ধৃত করা গেল।

কথিত আছে—একদা জগন্নাথ বাড়ীর নিকটবর্ত্তী বাজারে সমস্ত দিন নিজের দোকানের কাজ করিয়া সন্ধ্যার পরে একটী বোয়াল মাছ লইয়া বাড়ীতে উপস্থিত হয়। জগন্নাথের গৃহে এমন অস্ত্র ছিল না যে যদ্দারা অত বড় মাছ কাটা যাইতে পারে। জগন্নাথের মাতা কোন প্রতিবেশীর বাড়ী হইতে একখানা মাছ কাটা দা চাহিয়া আনে এবং

মাছটী কাটিয়া রাত্রিতেই প্রতিবেশীকে তাহার দা ফিরাইয়া দেয়। পরদিন প্রতিবেশী আসিয়া বলে যে আমাকে যে দা রাত্রিতে দিয়াছ, তাহা আমার দা নয়। জগন্নাথের মাতা বিস্ময়ের সহিত দেখিতে পায় প্রকৃতই দায়ের বর্ণ বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। প্রতিবেশীদিগের মধ্যে একথা প্রচারিত হইলে অনেকেই সেই দা দেখিতে আসে। অভিজ্ঞ প্রতিবেশীগণ দর্শনমাত্রই দাখানা স্বর্ণময় বলিয়া বুঝিতে পারে। তখন এই অদ্ভুত ব্যাপারের কারণ অনুসন্ধান হইতে থাকে। অনুসন্ধানে স্থির হয় যে, নিশ্চয়ই বোয়াল মাছের উদরাভ্যন্তরে স্পর্শমণি ছিল, তাহার সংস্পর্শেই লৌহময় দা, স্বর্ণময় হইয়াছে। ইহার পরে জগন্নাথ যেখানে মাছের আঁইস ইত্যাদি নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল সেখানে অনুসন্ধান করিয়া সেই স্পর্শমণি প্রাপ্ত হয়। এই স্পর্শমণির প্রভাবেই লৌহকে স্বর্ণে পরিণত করিয়া জগন্নাথ অতুল সম্পত্তির অধীশ্বর হয়।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে ইহা কল্পিত উপাখ্যান মাত্র। যাঁহারা বাণিজ্য ব্যবসায়ে নিযুক্ত আছেন, তাঁহারা জানেন বাণিজ্যে যখন পড়তা পড়ে তখন স্পর্শমণির বিস্ময়করী শক্তির অপেক্ষাও তাহার শক্তি অধিকতর বিস্ময়কর বলিয়া বোধ হয়। স্পর্শমণি লৌহকে স্বর্ণে পরিবর্ত্তিত করে; পড়তা, ছাইমুষ্টিকে স্বর্ণমুটিতে পরিণত করিয়া থাকে। যখন যাহার পড়তা পড়ে তখন তাহার সমস্ত প্রতিকূল অবস্থা, সূর্য্যোদয়ে অন্ধকার রাশির ন্যায়, আপনা হইতেই কাটিয়া যায়। জগন্নাথেরও তাহাই ঘটিয়াছিল, ইহাতে বিস্ময়ের বিষয় কিছুই নাই।

জগন্নাথ নানা সৎকার্য্যে ধনরাশির বিনিয়োগ করিয়াছিল। কথিত আছে, সে অষ্টোত্তর শত দেউল প্রতিষ্ঠা ও বহুসংখ্যক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিল। এতৎ ভিন্ন বহুসংখ্যক দীঘি ও পুষ্করিণী খনন করাইয়া তাহা দেবোদ্দেশে উৎসর্গ করে। তাহার প্রতিষ্ঠিত বহুসংখ্যক দেউলের ভগ্নাবশেষ—ইষ্টকের স্তূপাকার, আমরা জোড়া-

দেউল, গানাম, সুখবাসপুর, দেওসাব, সোণারঙ্গ প্রভৃতি গ্রামে আজিও দেখিতে পাই। এক একটী দেউলের ভগ্নাবশেষের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই প্রতীতি হয় যে, দেউলগুলি বিপুলায়তন ছিল। এক একটী দেউলের ভগ্নাবশেষ দ্বারা কোন কোন স্থানে ২।৩ বিঘা ভূমি, তৎচতুঃপার্শ্বস্থ ভূমি অপেক্ষা ৮।৯ হাত উচ্চতা লাভ করিয়াছে। জোড়াদেউল গ্রামে এইরূপ দুইটী (জোড়া) দেউল একস্থানে প্রতিষ্ঠিত ছিল বলিয়াই ইহা জোড়াদেউল নামে পরিচিত হইয়া আসিতেছে। এই দেউলদ্বয় যে ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত ছিল, আজিও "দেউল বাড়ী" নামে তাহা পরিচিত আছে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে এইরূপ বহুসংখ্যক দেউলের ভগ্নাবশেষ এ অঞ্চলে দেখিতে পাওয়া যায়। সমস্তগুলি জগন্নাথের প্রতিষ্ঠিত বলিয়া কথিত হয়। ভগ্ন-দেউলের ইষ্টকস্তূপ তৎপার্শ্বস্থ সমতল ভূমি হইতে ক্ষুদ্র পাহাড়ের ন্যায় দৃষ্ট হয়। এই সকল ইষ্টকস্তূপের উপর নানা প্রকার বৃক্ষাদি জন্মিয়া পাহাড়ের সহিত সমতা আরও বৃদ্ধি করিয়াছে। অনেক দেউলের উপরে গৃহস্থগণ আবাস-বাটী নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতেছে। এই সকল দেউলের গঠণ প্রণালী ও তাহার নির্ম্মাণকৌশল কিরূপ ছিল, এবং তাহাতে কোন্ প্রকার দেবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল, বর্ত্তমান অবস্থায় তাহার কিছুই জানিবার উপায় নাই। এই সকল স্থান খনন করিলে বহু পুরাতত্ত্ব আবিষ্কৃত হইতে পারে, এরূপ ভরসা করা যায়। কিন্তু তাহা বহু অর্থ-ব্যয় ও রাজশক্তির সাহায্য সাপেক্ষ।

প্রায় ৩০ বৎসর অতীত হইল উক্ত দেউল বাড়ীর এক স্থান খনন করার সময় বড় বড় কৃষ্ণবর্ণ অনেক প্রস্তরখণ্ড দৃষ্ট হয়। বহু চেষ্টায় তাহার এক খণ্ড উত্তোলিত হইয়াছিল। তাহা নানা কারুকার্য্য সমন্বিত ও খোদিত দেবনাগর অক্ষরলিপি পূর্ণ ছিল। এই প্রস্তর খণ্ড এক কাগজীর নিকট যৎসামান্য মূল্যে বিক্রীত হয়। কাগজীগণ

সুদৃঢ় প্রস্তরের উপর কাগজের উপাদানসামগ্রী, জীর্ণ বস্ত্র, পাট ইত্যাদি রাখিয়া ঢেকি দ্বারা তাহা চুর্ণ করে, সেই চুর্ণ, মাড়যুক্ত জলে গুলিয়া কাগজ প্রস্তুত করিয়া থাকে। এই সামান্য কার্য্যের জন্য একটী অমূল্য জিনিস তুচ্ছ মূল্যে কাগজীর হস্তগত হয়। আমরা সেই কাগজীর অনুসন্ধান করিয়া বিফল মনোরথ হইয়াছি। উক্ত প্রস্তরখণ্ড পাওয়া গেলে পুরাতন অনেক কথা জানিবার উপায় হইত। অপর প্রস্তর খণ্ড পূর্ব্বকথিত স্থানেই পতিত আছে। বিশেষ চেষ্টা করিলে এই প্রস্তরখণ্ড উত্তোলন করা যাইতে পারে। যতদুর দেখা যায় তাহাতে কোন কারুকার্য্য বা লিপি দৃষ্ট হয় না। জগন্নাথ বণিক যে সকল জলাশয় প্রতিষ্ঠা করিয়া যায়, তাহার অনেকগুলি এখনও দৃষ্ট হয়। যেখানে জগন্নাথের দেউল আছে তাহার নিকটেই তৎকর্ত্তৃক নিখাত জলাশয় দেখিতে পাওয়া যায়। উপরে জোড়াদেউলগ্রামে যে দেউল বাড়ীর কথা উল্লিখিত হইয়াছে, তাহার পশ্চিম পার্শ্বে একটী পুরাতন দীর্ঘিকা জগাবেণের দীঘিনামে আজিও পরিচিত হইতেছে। আমরা অনুসন্ধান করিয়া আর কোন জলাশয় জগন্নাথ বণিকের নামাঙ্কযুক্ত দেখিতে পাই নাই। কিন্তু জগন্নাথের প্রতিষ্ঠিত দেউলের অদূরেই যে সকল পুরাতন জলাশয় দেখা যায় সেগুলি যে তৎকর্ত্তৃক নিখাত তাহাতে কোন সন্দেহ থাকে না। জগন্নাথের বাস ঠিক কোন্ স্থানে ছিল তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। কেহ কেহ বলেন, জগন্নাথের বংশধরদের মধ্যে কেহ কেহ পঞ্চসার নামক স্থানে বাস করিতেছে। পঞ্চসার গ্রামে কয়েক ঘর বণিক বাস করে সত্য কিন্তু তাহারা কেহই তাহাদের ধারাবাহিক বংশাবলী বলিতে পারে না। অনেকেই পিতামহের পূর্ব্ববর্ত্তী পুরুষের বাসস্থানে জানে না। কাজেই ঐ কথা কতদুর সত্য তাহা স্থির করা অসম্ভব।

জগন্নাথের সম্বন্ধে আরও ২।১টী অদ্ভুত কাহিনী প্রচলিত আছে,

তাহা এক্ষণে উল্লেখ করিয়াই জগন্নাথের বৃত্তান্তের উপসংহার করা যাইতেছে। শুনা যায়, জগন্নাথ স্বর্ণময় দেউল নির্ম্মাণ করাইয়া, তাঁহার প্রতিষ্ঠার মানস করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা সম্পন্ন করিয়া যাইতে পারেন নাই। তখন পাঠানগণ পূর্ব্ব বাঙ্গালার নানা স্থানে আপনাদের অধিকার স্থাপন করিতে ব্যস্ত ছিল। তাহাদের অত্যাচারে দেশ অশান্তির আলয় হইয়াছিল। জগন্নাথের অতুল সম্পত্তির কথা তাহাদের শ্রুতিগোচর হয়। এ দেশের তদানীন্তন পাঠানরাজপ্রতিনিধি জগন্নাথের অতুল সম্পত্তির নিদান—সেই স্পর্শমণি, রাজপ্রাপ্য বলিয়া দাবি করে এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যে রাজ প্রতিনিধির নিকট তাহা দেওয়ার আদেশ করে। অনন্যোপায় হইয়া জগন্নাথ স্পর্শমণিসহ লক্ষ্যা নদীতে পাঠান-রাজ-প্রতিনিধির সহিত সাক্ষাৎ করেন। কথিত আছে, জগন্নাথ রাজপ্রতিনিধির হস্তে উক্তমণি অর্পণ করার সময় কৌশলক্রমে তাহা নদীতে ফেলিয়া দেন। সাধারণ লোকে বলে তদবধি সেই স্পর্শমণির স্পর্শে লক্ষ্যার জল অসাধারণ শৈত্য ও নির্ম্মলতা—গুণসমন্বিত হইয়াছে, এবং শীতললক্ষ্যা নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে।

এই জনশ্রুতি দ্বারা অনুমিত হয় জগন্নাথের বিপুল সম্পত্তির কথা পাঠানগণের কর্ণগোচর হওয়াতে তাহারা জগন্নাথের প্রতি অত্যাচার করিয়া সেই সম্পত্তিরাশি স্বাধিকারভুক্ত করিয়া লয়। ইহার পরে জগন্নাথের সম্বন্ধে আর কোন কথাই শুনিতে পাওয়া যায় না।

জগন্নাথের পরই আমরা এ প্রদেশে রাজা রঘুরাম রায়ের নাম শুনিতে পাই। মুসলমানরাজত্বের মধ্যাহ্ন সময়ে, যখন পূর্ব্ববঙ্গে মোগলরাজত্ব সবেমাত্র বদ্ধমূল হইতেছিল, যখন পূর্ব্ববঙ্গের মুসলমান রাজধানী জাহাঙ্গীর নগরের (ঢাকার) ভিত্তি পত্তন হয় নাই, সেই সময়ে রাম পালের দেড় মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে, রঘুরামপুর নামক স্থানে,

কায়স্থকুলসম্ভূত রাজা রঘুরাম রায়, বিলুপ্তপ্রায় হিন্দুগৌরব-প্রভার ক্ষীণ-আলোক-বর্ত্তিকার ন্যায় বর্ত্তমান থাকিয়া বিক্রমপুর আলোকিত করিতেছিলেন। শুনা যায়, তখন তিনি এই বিক্রমপুরের কিয়দংশে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতেছিলেন। কিন্তু সে সৌভাগ্য তাঁহাকে অধিক দিন ভোগ করিতে হয় নাই। তাঁহার রাজ্যের সীমা কতদূর বিস্তৃত ছিল অধুনা তাহা নিশ্চয়রূপে বলা যায় না। তবে সে সময়ের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে বোধ হয়, তাঁহার রাজত্ব অতি বিস্তীর্ণ ছিল না। মুসলমান আধিপত্য পূর্ব্ববঙ্গে স্থিরভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্ব্বে, যখন মোগলপাঠানগণ নিজ নিজ ভাগ্য পরীক্ষায় ব্যস্ত ছিলেন, দেশ এক প্রকার অরাজক অবস্থায় ছিল; তখন শক্তিশালী উদ্যমশীল লোকগণ পার্শ্ববর্ত্তী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূম্যাধিকারীদিগকে লাঠির জোরে বশীভূত করিয়া আপনাদের অধিকার বিস্তৃত করিয়া লইয়াছিল; এইরূপে পূর্ব্ববাঙ্গলা বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূঁইয়ার অধিকারভুক্ত হইয়াছিল। এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূঁয়ার অধিকৃত স্থানই কালে বঙ্গের প্রসিদ্ধ বার ভূঁয়ার অধিকারভুক্ত হয়। যখন রাজা রঘুরাম রায় বিক্রমপুরে আধিপত্য করিতেছিলেন তখন সোণারগাঁ মুসলমান করতলগত হইয়াছিল। দক্ষিণে, ইদিলপুর প্রসিদ্ধ চৌধুরীবংশের অধিকৃত ছিল। পূর্ব্বে,—মেঘনার পূর্ব্বে, ত্রিপুরারাজের অধিকার ছিল। পশ্চিমে, বিশালকায়া পদ্মা, ফতেয়াবাদ (বর্ত্তমান ফরিদপুর) রঘুরামের রাজ্যকে বিচ্ছিন্ন রাখিয়াছিল। উত্তরে, জেনানাবাদ ভাওয়ালের গাজি বংশের অধিকার ভুক্ত ছিল। বর্ত্তমান সময় যে স্থানে ঢাকা নগরী বিস্তৃত আছে, তাহা জেনানাবাদেরই অংশ বিশেষ। সে সময় ঐ স্থান কৃষকপল্লী বা অসমৃদ্ধ ক্ষুদ্র নগর মাত্র ছিল। রঘুরাম রায়ের অধিকার এই অনতিবিস্তৃত সীমার মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। এই সীমান্তবর্ত্তী ভূভাগেরও রঘুরামরায়ের সর্ব্বাংশে আধিপত্য ছিল

কি না তাহার কোন বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে রঘুরাম রায়ের সমকালে বিক্রমপুরে অন্য কোনও পরাক্রান্ত ভূস্বামীর নাম শুনিতে পাওয়া যায় না। রঘুরাম রায়ের পরেই বিক্রমপুরে চাঁদরায় কেদার রায় বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের অধিকার যে রঘুরায়ের অধিকার অপেক্ষা অনেক বিস্তৃত ছিল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। তবে রঘুরায়ের অধিকার যে কেবল রঘুরামপুরের নিকটবর্ত্তী স্থানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল এমন বোধ হয় না। বিশালবক্ষা পদ্মার গর্ভে বিক্রমপুরের যে সকল পল্লী বিলুপ্ত হইয়াছে, তন্মধ্যে হরিশপুর একটী বিস্তৃত ও সমৃদ্ধ পল্লী ছিল। সেখানে রায়দীঘি নামক এক বৃহৎ জলাশয়ের পাড়ে প্রতি বৎসর বিজয়াদশমীর দিন হইতে একটী সপ্তাহব্যাপী মেলা বসিত। রাজনগরের সমৃদ্ধি সময়েও সেই মেলা বর্ত্তমান ছিল। কথিত আছে, হরিশপুরে রাজা হরিশ্চন্দ্র সময়ে সময়ে বাস করিতেন। সেখানে তিনি প্রতি বৎসর বিশেষ সমারোহপূর্ব্বক দুর্গোৎসব করিতেন। সেই সময় হইতেই উক্ত মেলার সৃষ্টি হইয়াছিল। এই হরিশ্চন্দ্র, রঘুরাম রায়ের কনিষ্ঠ সহোদর ছিলেন —এখন সেই হরিশপুর, রায়দীঘী ও বিজয়ার মেলা ধ্বংশ .রে আশ্রয় লাভ করিয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে তালতলার বাজারের অদূরে রায়পুর নামে যে গ্রাম দৃষ্ট হয়, অনেকের বিশ্বাস তাহাও উক্ত পরিবারেরই নামযুক্ত। ইহাদ্বারাও অনুমিত হয় রঘুরাম ও হরিশ্চন্দ্র রায়ের অধিকার কেবল রঘুরামপুর ও তৎসমীপবর্ত্তী কতিপয় গ্রামের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না।

রঘুরাম রায়ের অধিকার ক্ষুদ্র হইলেও তাঁহার বীরত্বের খ্যাতি যেরূপ শ্রুত হওয়া যায় তাহা তত ক্ষুদ্র নয়। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, মুসলমান আধিপত্য তখনও পূর্ব্ববাঙ্গালায় সর্ব্বত্র বদ্ধমূল হয় নাই। পাঠানগণ কখনও পাণ্ডুয়ায় কখনও সোণার গাঁয় আপনাদিগের

রাজধানী স্থাপন করিয়া অধিকৃত রাজ্যের শাসন সংরক্ষণ করিতেছিলেন, তাঁহাদের রাজ্যশাসনপ্রণালীতে কোন প্রকার শৃঙ্খলা ছিল না। কোনও শাসনকর্ত্তা দিল্লীর রাজশক্তির অধীনে থাকিয়া, কেহ বা সেই শাসন ছিন্ন করিয়া, রাজ্য-শাসনের নামে রাজ্য-শোষণ করিতেন। সর্ব্বদা লুট তরাজ করিয়া রাজভাণ্ডার পূর্ণ করাই তাহাদের প্রধান ব্রত ছিল। কিন্তু তাহাদের এমন সৈন্যবল বা সৈন্য পরিচালন ক্ষমতা ছিলনা, যে কেহ সাহস করিয়া তাহাদের অত্যাচারে বাধা দিতে উদ্যত হইলে তাঁহারা স্বাভীষ্ট সিদ্ধ করিতে পারিতেন। অন্ততঃ রঘুরাম রায়ের সময় পর্য্যন্ত পূর্ব্ববাঙ্গলার পাঠানগণের অবস্থা এইরূপই অনুমিত হয়। রঘুরামের সময়ে পাঠানগণ হীনবীর্য্য হওয়াতে মোগল প্রভুত্ব পশ্চিম-বাঙ্গলার ন্যায় পূর্ব্ব-বাঙ্গালায়ও প্রতিষ্ঠিত হইতে থাকে।

কথিত আছে, সোণারগাঁয়ের মুসলমানরাজপ্রতিনিধি রঘুরাম রায়কে তাহাদের বশ্যতা স্বীকার ও করপ্রদানে নিজ রাজ্যভোগ করিতে বলিয়াছিলেন। রঘুরাম রায় ঘৃণার সহিত সে প্রস্তাব অগ্রাহ্য করেন। ইহাতে মুসলমান রাজপ্রতিনিধি ক্রুদ্ধ হইয়া অবিলম্বে তাহার অধীনস্থ সৈন্যসহ রঘুরামের রাজধানী রঘুরামপুরের অদূরে আসিয়া উপস্থিত হন। রঘুরামরায়ও অপ্রস্তুত ছিলেন না। তিনি তাহার লাঠিয়াল ও গুলানবাজসৈন্যসহ অসীম সাহসের সহিত তাহাদের সম্মুখীন্ হইলেন। লাঠিয়ালগণের লাঠিপরিচালননৈপুণ্যে মুসলমান সৈন্যের সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ হইল। লাঠিয়ালগণ বাণের জলপ্রবাহের ন্যায় মুসলমান সৈন্যদল ভাসাইয়া লইয়া চলিল। এইরূপে বিতাড়িত হইয়া তাহারা ইছামতী (বর্ত্তমান ধনেশ্বরী) নদীর পরপারে যাইয়া নিরাপদ হইল।

এইরূপে মুসলমান সৈন্য প্রতিনিবৃত্ত হইলে, রঘুরাম বিজয়োল্লাসে উৎফুল্ল হইয়া স্বভবনে উপস্থিত হন, এবং স্বহস্তে সৈন্য ও সেনা-নায়ক

দিগকে পুরস্কার বিতরণ করেন। এই সেনাদলের নায়ক রাম-মালিক সরদার বিশেষ ভাবে পুরস্কৃত হয়। লাঠি পরিচালন কার্য্যে রাম মালিকের অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। কথিত আছে শত্রুপক্ষের তীর ও গুলির আক্রমণ হইতে রাম মালিক এক মাত্র লাঠির সাহায্যে আত্মরক্ষা করিতে পারিত। তাহার সম্বন্ধে কয়েকটী গ্রাম্য ছড়া এখনও প্রাচীন লোকের মুখে শুনিতে পাওয়া যায়। আমরা তাহার চারিটী ছড়া এস্থলে উদ্ধৃত করিলাম।

রাম মালিকের লাঠি।
রঘু রায়ের মাটা॥
উঠলে লাঠির ডাক।
দোড়ে পলায় বাঘ॥
গুলি ফিরে ঝাকে।
রামের লাঠির পাকে।
মালিক ধরে লাঠি।
যম যেন সে খাটি॥

এই সকল ছড়ায় রাম মালিকের লাঠি পরিচালনদক্ষতার যে পরিচয় পাওয়া যায় তাহাতে তাহাকে অসাধারণ লাঠিয়াল বলিয়া অনুমান করা অসঙ্গত নয়। বাঙ্গালায় লাঠির প্রভাব এক সময়ে যে অসাধারণ ছিল তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। আজিও পূর্ব্ববঙ্গে, লাঠির সে পূর্ব্বমহিমার যে ক্ষীণজ্যোতি, বৃটিশ শাসনে সংযতহস্ত লাঠিয়াল বংশধরগণের লাঠিতে প্রতিভাত হয় তাহা দেখিয়াই আমরা বিস্মিত হইয়া থাকি। বাঙ্গালী জাতি লাঠি বিসর্জ্জন দিয়াই আপনাদের মনুষ্যত্ব বিসর্জ্জন দিয়াছে। যতদিন বাঙ্গালী লাঠির সম্মান করিত ততদিন তাহাদের সম্মানও অক্ষুণ্ণ ছিল।

রঘুরামপুরের অদূরে মাণিককান্দারমাঠ নামে একটী ক্ষুদ্র প্রান্তর

দৃষ্ট হয়। রামমালিকের সহিত এই নামের কোন সংস্রব আছে কিনা বিশেষ অনুসন্ধানেও আমরা তাহা স্থির করিতে পারি নাই। তবে ঐ প্রান্তরটী যে বহুকাল হইতে ঐ নামে পরিচিত হইয়া আসিতেছে তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। রঘুরাম রায়ের লাঠিয়াল সেনার অধিনায়ক রামমালিকের নামে ঐ প্রান্তরের নামকরণ হইয়া থাকিবে, এরূপ অনুমান একেবারে কষ্টকল্পনা সঞ্জাত নয়।

উপরে মুসলমান রাজপ্রতিনিধির সহিত যে সংঘর্ষের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা অপাতসুখকর হইলেও পরিণামে যে বিষময় হইবে, তাহা তীক্ষ্ণবুদ্ধি রঘুরাম রায়ের বুঝিতে বিলম্ব হয় নাই। সোণারগাঁয়ের ক্ষুদ্র রাজকীয় সৈন্যদলের পশ্চাতে যে পাঠানের বিপুল বল মজুত আছে, তাহা তাঁহার অজ্ঞাত ছিল না। সে বলের নিকট তাঁহার সামান্য লাঠিয়াল সৈন্যবল যে ঝড়ের সম্মুখবর্ত্তী তৃণের ন্যায় একান্ত অকিঞ্চিৎকর তাহাও তিনি জানিতেন। তবে তিনি কেন এরূপ অসমসাহসিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহার উপযুক্ত কোন কারণ দেখিতে পাওয়া যায় না। তবে তেজস্বী পুরুষের তেজ প্রায় পরিণামচিন্তার অবসর রাখে না। ইহাই এরূপ অসমসাহসিক কার্য্যের কারণ বলিয়া অনুমিত হয়।

যে সময়ের কথা বলা হইতেছে, তখন দিল্লীতে মোগল অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইলেও অব্যাহত হয় নাই। দেশের প্রায় সর্ব্বত্রই, বিশেষতঃ পূর্ব্ববাঙ্গালায়, পাঠানের সহিত মোগলের বলপরীক্ষা চলিতেছে। কোন পক্ষই আপনাকে নিরাপদ মনে করিতে পারিতেছে না। উভয় পক্ষই আপন লইয়া ব্যস্ত, সেজন্য শাসনপ্রণালীর কোন শৃঙ্খলাই ছিল না। বর্ত্তমান ইংরেজশাসনযন্ত্র যেমন সুগঠিত, মুসলমান রাজত্বের চরমোন্নতির সময়ও মুসলমান শাসনযন্ত্র, তাহার শতাংশের একাংশ উৎকর্ষও লাভ করিতে পারে নাই। এখন শাসনযন্ত্রের এক ক্ষুদ্র

প্রান্তে অতি সামান্য আঘাত হইলে, যন্ত্রের কেন্দ্রস্থল পর্য্যন্ত সে আঘাত-বেগ প্রসৃত হইয়া থাকে। যন্ত্রটী যেন সজীব রক্তমাংসের দেহ,—ক্ষুদ্র কণ্টকপ্রহারবেদনাও নিমেষে মস্তিষ্কে অনুভূত হয়। মুসলমান শাসনযন্ত্রের গঠণপ্রনালীতে সেরূপ সুকৌশল কেন্দ্রস্থানেও লক্ষিত হয় নাই। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, বাঙ্গালার নবাবগণ কখনও দিল্লীর রাজশক্তির অধীনে থাকিয়া কখনও বা স্বাধীনভাবে বাঙ্গালা শাসন করিতেন। পূর্ব্ববাঙ্গালায় নবাবের এক প্রতিনিধি শাসনকর্ত্তা থাকিতেন। তিনিও সুযোগ পাইলেই নবাবের অধীনতাপাশ ছিন্ন করিয়া স্বাধীনভাবে রাজ্যরক্ষা করিতেন। যখন বাঙ্গালার সুবাদার দিল্লীর শাসন ও পূর্ব্ব বাঙ্গালার রাজপ্রতিনিধি সুবাদারের শাসন মানিয়া চলিতেন তখনও পূর্ব্ববাঙ্গালার সংবাদ নবাবদরবারে পৌঁছিতে বহু সময় লাগিত। দিল্লীর সম্রাটসকাশে সে সংবাদ পৌঁছিতে আরও কত অধিক সময়সাপেক্ষ তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। সেই সকল সংবাদ আদান প্রদানেরও নানা প্রকার অযথা সময়হারী কায়দা কানুন ছিল। অনেক সংবাদ নবাব বা সম্রাটের নিকট পেশ করা, না করা, কর্ম্মচারি-বিশেষের বিবেচনাধীন ছিল। ঘুষের রাজত্ব সর্ব্বত্রই অব্যাহত চলিয়া আসিতেছে। মুসলমান শাসন সময়েও তাহার বিশেষ প্রাবল্য ছিল। তাহার প্রসাদে অনেক গুরুতর ঘটনার সংবাদও চাপা পড়িয়া থাকিত। এই সকল বাধা অতিক্রম করিয়া কোন সংবাদ নবাব বা বাদসাহের গোচরে আসিলেও ২।১ বার বিচার বিতর্কের বিষয়ীভূত হইয়া উপযুক্ত আদেশের অপেক্ষায় দপ্তরের বাকসজাত হইয়া থাকিত। নবাব ও বাদসাহগণ তাহাদের চিরাভ্যস্ত বিলাসিতার প্রবলস্রোতে গা ঢালিয়া দিয়া জীবন্মৃতবৎ ভাসিয়া ফিরিতেন আর কর্ম্মচারীগণ আপন খেয়ালমতে রাজ্য চালাইতেন। ঐ সকল গুরুতর বিষয়ে কোন কর্ম্মচারী স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কোন

কথা উত্থাপন না করিলে সে সম্বন্ধে আর কোন কথাই হইত না; অনেক সময় বাকী রাজস্বের জন্য অথবা অন্য প্রয়োজনীয় বিষয়ের জন্য পুনঃ পুনঃ চিঠি লিখিয়াও যখন অভীপ্সিত কার্য্য সাধন করা যাইত না তখন বাদসাহদরবার হইতে নবাবদরবারে; নবাবদরবার হইতে পূর্ব্ববাঙ্গালার রাজপ্রতিনিধির সকাশে, পত্রবাহক মারফত রাজকীয় পত্রবিশেষ আড়ম্বরের সহিত প্রেরিত হইত। অনেক সময় এরূপ ঘটিত যে, পত্রবাহক যাহার নিকট প্রেরিত হইত তাহার নিকট হইতে কিছু জায়গীর বা প্রচুর আস্রবি আত্মসাৎ করিয়া সে আর প্রত্যাবৃত্ত হইত না। যে সেরেস্তা হইতে লোক প্রেরিত হইত সেখানে উপযুক্ত তদ্বির হইলে, রাজদরবারে আর সে কথা কখনও উঠিত না।

রঘুরামরায় মুসলমান শাসনপ্রণালীর এই দুর্ব্বলতা অবশ্যই লক্ষ্য করিয়াছিলেন। তিনি কৌশলে স্বকীয় অধিকার দৃঢ় রাখা ও স্বকৃত রাজকীয় সৈন্যের পরাভবের প্রতিশোধ হইতে আত্মরক্ষার অভিপ্রায়ে পূর্ব্বোক্ত সংঘর্ষের অব্যবহিত পরেই নিজ কনিষ্ঠ সহোদর হরিশ্চন্দ্র রায়কে দিল্লীতে বাদসাহদরবারে পাঠাইয়া দেন। হরিশ্চন্দ্র দিল্লীতে থাকিয়া পার্শি ভাষায় বিলক্ষণ বুৎপত্তি লাভ করেন। অল্পকাল মধ্যেই হরিশ্চন্দ্র সেখানে অসাধারণ বিদ্বান, বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ লোক বলিয়া সকলের নিকট পরিচিত হন। এবং দরবারের প্রধান প্রধান আমীর ওমরাহগণের সহিত বিশেষরূপ ঘনিষ্ঠতা স্থাপন করিতে সমর্থ হন। এইরূপে হরিশ্চন্দ্র দিল্লীর রাজদরবারে এক অসাধারণ কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া নিজের অসামান্য কার্য্যদক্ষতাগুণে উচ্চপদ লাভ করেন।

এই সময়ে মোগলরবি আকবর, দিল্লীররাজসিংহাসন অলঙ্কৃত করিতে ছিলেন। তাঁহার জাতিনির্ব্বিশেষে গুণগ্রাহিতার খ্যাতি ইতিহাসে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। হরিশ্চন্দ্রের গুণের কাহিনী

তাঁহাকে বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট করিয়াছিল। শুনা যায়, হরিশ্চন্দ্র অনেক কঠিন কার্য্য সম্পাদনের ভার প্রাপ্ত হইয়া অতি অনায়াসে তাহা সুসম্পন্ন করাতে বাদসাহ বিশেষ প্রীত হন। প্রীতির চিহ্ন-স্বরূপ রঘুরামরায়ের অধিকৃত রাজ্যের আধিপত্য, নামমাত্র করদানের অঙ্গীকারে বাধ্য করিয়া, হরিশ্চন্দ্রকে প্রদান করেন। হরিশ্চন্দ্র তাহা জ্যেষ্ঠভ্রাতা রঘুরামরায়ের নামেই গ্রহণ করিয়া ভ্রাতৃভক্তির পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। এইরূপে বিক্রমপুরে প্রথম মুসলমান আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

এই ঘটনার সমকালেই পূর্ব্ববাঙ্গালায় পাঠানদিগের আধিপত্য এক প্রকার বিলুপ্তপ্রায় হইয়া পড়ে। রঘুরামরায়কৃত পরাভবের প্রতি-শোধের পূর্ব্বেই তাহারা ছত্রভঙ্গ হইয়া নানা স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দস্যুদল রূপে পরিণত হয়। তদবধি রঘুরাম রায় নিঃশঙ্কভাবে স্বরাজ্যে অবাধশক্তির পরিচালন করিতে থাকেন। যতদিন হরিশ্চন্দ্র দিল্লীর রাজসরকারে কার্য্য করিয়াছিলেন ততদিন রঘুরামরায়, নামমাত্রে অধীনতা স্বীকার করিয়া স্বাধীন ভাবেই শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করেন।

কিছুকাল এইরূপে অতিবাহিত হইলে যখন রঘুরাম রায় বার্দ্ধক্য-প্রযুক্ত রাজ্য চালাইতে অসমর্থ হইয়া পড়েন, তখন হরিশ্চন্দ্র স্বীয় জামাতাকে দিল্লীর রাজসরকারে এক কার্য্যে নিযুক্ত করাইয়া নিজে কার্য্য পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন এবং রঘুরামের হস্ত হইতে তাহার স্বেচ্ছাপ্রদত্ত রাজ্যভার গ্রহণ করিয়া দক্ষতার সহিত শাসনদণ্ড পরিচালন করিতে থাকেন।

সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্যের অবস্থা লোকের চিরদিন সমভাবে বর্ত্তমান থাকে না। রাজা রঘুরামরায় ও হরিশ্চন্দ্র এতদিন ভাগ্যলক্ষ্মীর কোমলক্রোড়ে পরিবর্দ্ধিত হইয়া সংসারকে চিরসুখের স্থান বলিয়াই মনে করিতেছিলেন। সহসা অবস্থাচক্রনেমীর বিবর্ত্তন আরম্ভ হইল।

রঘুরাম ও হরিশ্চন্দ্রের সেই ভাগ্যবিবর্ত্তনবৃত্তান্ত আমরা সংক্ষেপে এস্থানে বিবৃত করিতেছি।

আক্‌বরের রাজত্বের প্রারম্ভসময়ে বোগ্দাদ হইতে এক সম্ভ্রান্ত মুসলমান, ভাগ্যচক্রের নিষ্পেষণে ক্লিষ্ট হইয়া অদৃষ্টযবনিকার অন্তরালে আর কি লুক্কায়িত আছে নির্দ্ধারণ জন্য স্বজন-বন্ধু-বান্ধব-সমন্বিত প্রিয় জন্মভূমি পরিত্যাগপূর্ব্বক হিন্দুস্থানে উপস্থিত হয়। কালে এই মুসলমান যুবক দিল্লীর রাজদরবারে বিশেষ পরিচিত হইয়া উঠে। কথিত আছে, রাজকুমার সেলিমের সহিত এই যুবকের বিশেষ সদ্ভাব ছিল। সেলিম তাহার পিতার আদেশে বাঙ্গালায় আগমন করিয়াছিলেন; সেই সময় উক্ত যুবক মাহাম্মদ মজফিউদ্দিন তাঁহার সহিত এদেশে উপস্থিত হয়। সেলিম উক্ত মাহাম্মদ মজফিউদ্দিনের সহিত পূর্ব্ব বাঙ্গালার অনেক স্থান পরিদর্শন করেন। অবশেষে সেলিমের অনুরোধে মাহাম্মদ মজফিউদ্দিন পূর্ব্ব-বাঙ্গালার প্রধান কাজির পদলাভ করিয়া কাজি মাহাম্মদ নামে পরিচিত হন। কাজি সাহেব রঘুরামপুরের অদূরবর্ত্তী কস্‌বা নামক স্থান স্বীয় আবাস জন্য মনোনীত করিয়া দিল্লীর রাজসরকারে আবেদন করাতে সেলিমের অনুগ্রহে তিনশত বাহান্ন দ্রোণ ভূমির সহিত উক্ত গ্রাম তাঁহাকে নিষ্কর জায়গীর প্রদত্ত হয়। কাজি সাহেব কস্‌বা গ্রামে স্বীয় বাসবাটী নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতে থাকেন। তদবধি ঐ স্থান কাজি কস্‌বা নামে পরিচিত হইয়া আসিতেছে।

কাজি সাহেবকে যে ভূসম্পত্তি প্রদত্ত হয়, তাহা রঘুরাম রায়ের অধিকৃত ভূভাগ হইতেই গৃহীত হইয়াছিল। তখন পূর্ব্ববাঙ্গলায় মোগলপ্রভুত্ব এক প্রকার বদ্ধমূল হইয়াছে। রাজশক্তি অবিচলিত রাখার জন্য রীতিমত সৈন্যসামন্ত সোণারগাঁয়ে স্থাপিত হইয়াছিল। তথাপি হরিশ্চন্দ্র রায় এই অপ্রীতিকর কার্য্যের উপযুক্ত প্রতিবাদের

জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে কাজি সাহেব দিল্লীর দরবারে আবেদন করিয়া একদল মুসলমান সিপাহী আত্মরক্ষার জন্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাহাদের বাসের নিমিত্ত ও খরচ সরবরাহের জন্য আর একটী গ্রাম কাজি সাহেব নিষ্কর প্রাপ্ত হন। অদ্যাপি ঐ গ্রাম সিপাইপাড়া নামে কথিত হইয়া থাকে। সিপাইপাড়ায় এখনও সেই সিপাইদিগের বংশধরগণ বর্ত্তমান থাকিয়া কাজিগণের পূর্ব্ব-গৌরবের পরিচয় প্রদান করিতেছে।

হরিশ্চন্দ্র প্রথমতঃ স্বীয় জামাতা দ্বারা দিল্লীর দরবারে ইহার প্রতিকারপ্রার্থী হন। তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া, কাজিদিগের বিরুদ্ধে এক অভিযোগ উপস্থিত করেন। তখন কাজি মাহাম্মদের পুত্র কাজি আবুলফতা এ প্রদেশের প্রধান কাজির পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি স্বকীয় বাসস্থানে একখানা বড় বাংলা (চারি চালা ঘর) প্রস্তুত করিয়া নানা প্রকার গৃহসজ্জায় পরিশোভিত করিয়াছিলেন। সে সময় কোন প্রজারই ঐ প্রকার ঘর প্রস্তুত করার অধিকার ছিল না। উহা বাণ, ডঙ্কা, নিশানাদির ন্যায় রাজ বিভুতি-স্বরূপ ব্যবহৃত হইত। রাজপ্রতিনিধি বা রাজকীয় প্রধান প্রধান কর্ম্মচারীর বাসের জন্য ঐ প্রকার ঘর রাজব্যয়ে নির্ম্মিত হইত। কোন প্রজা, বাদসাহ বা নবাবের অনুমতি ভিন্ন, ঐরূপ ঘর প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার করিলে রাজদণ্ড লাভের যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইত। বাদসাহ সকাশে এই অভিযোগ উপস্থিত হওয়ার সংবাদ কাজি সাহেবের অবিদিত ছিল না। তিনি অবিলম্বে হরিশ্চন্দ্র রায়ের বিরুদ্ধে ইহার পাল্টা এক অভিযোগ উপস্থিত করিলেন। তাহার মর্ম্ম এই :—হরিশ্চন্দ্র রায় সর্ব্বদাই কাজিদিগকে কাজিকস্‌বা হইতে তাড়াইবার চেষ্টা করিতেছেন। তিনি বৈধ উপায়ে কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন না মনে করিয়া, অবৈধ উপায় অবলম্বন করিয়াছেন।

দিবারাত্রির অধিকাংশ সময় শঙ্খ, ঘণ্টা, কাঁশি ও ঢাক বাদ্য দ্বারা তাঁহাদের নমাজের ব্যাঘাত করিতেছেন। এই উভয় অভিযোগের তদন্তভার তদানীন্তন পূর্ব্ববাঙ্গালার রাজ-প্রতিনিধির প্রতি অর্পিত হয়। কাজি সাহেবের তখন উক্ত রাজ প্রতিনিধির নিকট বিশেষ প্রতিপত্তি। তিনি তাঁহার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের উত্তরে বলিলেন যে তিনি চারিচালা ঘর প্রস্তুত করিয়াছেন সত্য কিন্তু নিজ ব্যবহার জন্য নয়;—উহা খোদাই ঘর—কেবল নমাজের জন্য ব্যবহৃত হয়। এই উত্তরে রাজ-প্রতিনিধি সন্তুষ্ট হন। হরিশ্চন্দ্রের বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগের উত্তরে তিনি বলেন দেবপূজা কোন প্রকার বাদ্য ভিন্ন হইতে পারে না। কাজেই ধর্ম্মানুষ্ঠানের অনুরোধে তাহা করিতে হয়। বলা বাহুল্য, এ উত্তর মুসলমান রাজপ্রতিনিধির প্রীতিকর হইল না। তিনি কাজিগণের অনুকূলে ও রায়গণের প্রতিকূলে আপন মন্তব্য প্রকাশ করিলেন। ইহার ফলে দিল্লীদরবার হইতে আদেশ হইল—অবিলম্বে রঘুরাম ও হরিশ্চন্দ্রের বাসভবন স্থানান্তরিত করিতে হইবে, তাহারা স্বেচ্ছায় তাহা না করিলে রাজকীয় সৈন্যদল এ আদেশ কার্য্যে পরিণত করিবে।

এই আদেশের বিষয় অবগত হইয়া রঘুরাম তাঁহার সম্পত্তি ও পরিবারসহ স্থানান্তরে চলিয়া যান। হরিশ্চন্দ্র রাজকীয় সৈন্যের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবার জন্য প্রস্তুত হইতে থাকেন। রাজকীয় সৈন্যদল কাজি সাহেবের সৈন্যসহ মিলিত হইয়া রঘুরামপুরের নিকটবর্ত্তী হইলে হরিশ্চন্দ্র তাহার লাঠিয়াল সৈন্যদলসহ তাহাদের গতিরোধ করিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ হইয়া যায়। মুসলমান সৈন্য রঘুরামপুরে প্রবেশ করিয়া অল্প সময়ের মধ্যে সুগঠিত রাজভবন চূর্ণ করিয়া ফেলে। রঘুরামের প্রতিষ্ঠিত সমস্ত দেবালয় ভগ্ন এবং দেবমূর্ত্তিগুলি ভগ্ন ও স্থানান্তরিত

করে। কথিত আছে, রঘুরাম রায়ের ভগ্ন দেবালয়ের মাল মসলা দ্বারা কাজি আবুলফতা তাহার বাস ভবনের সম্মুখে থালকা নামক স্থানে এক সুবৃহৎ মসজিদ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। সে মসজিদও এখন ভগ্নাবস্থায় পতিত আছে। কাজি সাহেবের বাসবাটীর পূর্ব্ব-পার্শ্বে একটী মসজিদ অদ্যাপি দেখিতে পাওয়া যায়। কতক বৎসর হইল তাহার জীর্ণসংস্কার করা হইয়াছে। উক্ত কাজি সাহেবের বংশধরগণ বলেন ঐ মসজিদও কাজি আবুলফতার সময়েই নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই মসজিদের দ্বারদেশে একটী প্রস্তরময় বাসুদেব মূর্ত্তি দেখা যায়। কাজিগণ বলেন রঘুরাম রায়ের প্রতিষ্ঠিত "বাসুদেব" বিগ্রহ জয়ের চিহ্নস্বরূপ আনিয়া কাজিসাহেব তাহার মসজিদের দ্বারের সিঁড়ি রূপে স্থাপিত করিয়াছিলেন। এই মসজিদের দ্বারদেশের উপরিভাগে পারসী ভাষায় লিখিত একখণ্ড শিলালিপি প্রোথিত ছিল। মসজিদটীর জীর্ণাবস্থা ঘটিলে, উহা স্থানভ্রষ্ট হইয়া ভূতলে পতিত ছিল। সে সময় ডাক্তার ওয়াইজ সাহেব তাহা লইয়া যান। সম্ভবতঃ ওয়াইজ সাহেবের লিখিত ঢাকা জেলার বিবরণে তাহার অনুলিপি উদ্ধৃত হইয়া থাকিবে। তাহা পাওয়া গেলে রঘুরাম রায় ও হরিশ্চন্দ্র রায়ের সময়নির্ণয়ে বিশেষ সুবিধা হইত।

ঐরূপে রঘুরামপুরের ধ্বংশের পর রায়পরিবার ঠিক কোন স্থানে যাইয়া বাস করিয়াছিল তাহা নিশ্চয়রূপে জানা যায় না। এ সম্বন্ধে নানা প্রকার জনশ্রুতি শুনিতে পাওয়া যায়। কেহ বলেন কীর্ত্তি-পাশার কুক্ষিগত নপাড়া নামক স্থানে ইহঁারা নূতন আবাস বাটী নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতে থাকেন। তাঁহাদের মতে এই হরিশ্চন্দ্র রায়, নপাড়ার প্রসিদ্ধ চৌধুরি বংশের আদিপুরুষ। নপাড়ার চৌধুরি-গণ বৈদ্যবংশীয় ছিলেন। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি রঘুরাম কায়স্থ বংশধর। এরূপ নির্দ্দেশের কারণ এই—রঘুরামপুরের নিকটবর্ত্তী

শঙ্করবন্দ নামক স্থানে চৌধুরী উপাধিধারী যে সকল কায়স্থ ভদ্রলোক আছেন, তাঁহাদের মধ্যে কোন কোন প্রাচীন লোক আপনাদিগকে রঘুরামরায়ের বংশধর বলিয়া পরিচয় দেন। যাঁহারা রঘুরাম রায়কে কায়স্থকুলোদ্ভব দে বংশীয় বলিয়া বলেন তাঁহারা আরও একটু অগ্রসর হইতে চান। প্রসিদ্ধ চাঁদরায় ও কেদার রায়কে তাঁহারা এই রঘুরাম বা হরিশ্চন্দ্রের বংশধর বলিয়া অনুমান করেন। উক্ত চাঁদরায়, কেদার রায় যে দে-বংশজাত কায়স্থ তাহা ইতিহাসপ্রসিদ্ধ কথা। এজন্যই ঐরূপ অনুমান একেবারে অহেতুক নয়। রঘুরাম ও হরিশ্চন্দ্র রায়ের পরেই আমরা বিক্রমপুরে চাঁদ রায়, কেদার রায়ের প্রসিদ্ধির কথা শুনিতে পাই। এই সকল কারণেই আমরা পূর্ব্বোক্ত জনশ্রুতিতে উপেক্ষা প্রদর্শন করিতে পারিতেছি না।

যাঁহারা রঘুরাম ও হরিশ্চন্দ্রকে নপাড়ার চৌধুরী বংশের প্রবর্ত্তক বলিয়া বলেন, তাঁহাদের সম্বন্ধেও ২।১টী কথা আলোচনার যোগ্য। বজ্রযোগিনীতে পুরোহিতপাড়া নামে একটী পল্লী আছে। রঘুরাম রায়ের পুরোহিত বংশের বাসস্থান বলিয়াই ঐ পল্লীর নাম পুরোহিত পাড়া বলিয়া প্রসিদ্ধ। পুরোহিত পাড়াতে উক্ত পুরোহিত বংশীয় যে সকল প্রাচীন লোক বর্ত্তমান আছেন, তাঁহারা বলেন নপাড়ার চৌধুরী বংশ তাঁহাদের যজমান। এখনও তাঁহারা ইহাঁদিগকে তাঁহাদের পুরোহিত বলিয়া স্বীকার করেন। উক্ত চৌধুরীগণের আদিপুরুষ রঘুরামপুর হইতেই নপাড়ায় যাইয়া বাস করেন। কিন্তু সেই আদিপুরুষ রঘুরাম কিম্বা হরিশ্চন্দ্র রায় কি না তাহা উক্ত পুরোহিত মহাশয়গণ বলিতে পারেন না। এস্থলে রঘুরাম রায়ের পরিত্যক্ত রঘুরামপুর ও তন্নিকটবর্ত্তী ২।১ টী স্থানের বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে আর দু'চারিটী কথা বলিয়াই এ প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

বর্ত্তমান সময়ে রঘুরামপুর একটী অসমৃদ্ধ কৃষকপল্লীতে পরিণত

হইয়াছে। ইহার অধিকাংশ স্থানে কৃষকগণের ইক্ষু, কদলী, আদা, হরিদ্রা ইত্যাদির বাগান; মধ্যে মধ্যে জঙ্গল ও কৃষকগণের আবাস বাটী দৃষ্ট হয়। রঘুরামপুরে ও তাহার নিকটবর্ত্তী স্থানে অনেক প্রাচীন দীঘি, পুষ্করিণী ও ইষ্টকালয়ের ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। এই সমস্ত রঘুরাম ও হরিশ্চন্দ্র রায়ের কীর্ত্তি বলিয়াই সর্ব্বত্র কথিত হইয়া থাকে। রঘুরামপুরের অনতিদূর উত্তরে দেওসায়ের দীঘি নামে একটী বৃহৎ জলাশয় এখনও অর্দ্ধভরাঠ অবস্থায় বর্ত্তমান আছে। পূর্ব্বোক্ত মুসলমান অত্যাচারে ও কালের কঠোর দশনাঘাতে দেবমূর্ত্তির সহিত দেবমন্দিরগুলি কালের তিমিরগর্ভে প্রবেশ করিয়াছে কিন্তু মন্দিরাদির ভগ্নাবশেষ এখনও অল্পমাত্র মৃত্তিকা খনন করিলেই সর্ব্বত্র পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। এই দেওসার নাম, সম্ভবতঃ দেবসার নামেরই অপভ্রংশ। বহুদেবদেবীর স্থান বলিয়াই ঐ স্থানের নাম দেবসার হইয়া থাকিবে।

রঘুরামপুরের অব্যবহিত পশ্চিমে সুখবাসপুর নামে একটী গ্রাম বর্ত্তমান আছে। এই গ্রাম প্রসিদ্ধ যোগিনী গ্রামের অন্তর্গত। এই গ্রামে একটী পুরাতন দীর্ঘিকা বর্ত্তমান আছে। ইহা সুখবাসপুরের দীঘি নামে এ অঞ্চলে পরিচিত। জনশ্রুতি এই—এই দীঘির পূর্ব্ব-পারে রঘুরাম রায়ের একটী আরামবাটী ছিল। তিনি অবকাশের অধিকাংশ সময় এই বাটীতে অবস্থিতি করিয়া শান্তিসুখ অনুভব করিতেন। এইজন্য এই স্থানের নাম সুখবাসপুর হইয়াছে।

রঘুরামপুরের অল্পদূর দক্ষিণে শঙ্করবন্দ নামে একটী গ্রাম বর্ত্তমান আছে। এই স্থানে শঙ্কর চক্রবর্ত্তীর নিবাস ছিল। এই শঙ্কর রঘুরাম-রায়ের সভাপণ্ডিত ছিলেন। রঘুরামরায় উক্ত পণ্ডিত মহাশয়ের বাসগ্রাম তাঁহাকে নিষ্কর ব্রহ্মোত্তর দান করেন। সেই জন্যই ইহা শঙ্করবন্দনামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। এই শঙ্কর চক্রবর্ত্তী কোন্

বংশীয় ছিলেন এবং তাঁহার বংশের কেহ বর্ত্তমান আছেন কি না তাহা জানিবার উপায় নাই।

রঘুরামপুরে একটী দর্শনীয় ব্যাপার দেখিবার জন্য প্রতিবৎসর অনেক লোক আসিয়া থাকে। এই স্থানে হরিশ্চন্দ্রের দীঘি নামে একটী পুরাতন জলাশয় আছে। এই জলাশয়ের অধিকাংশই ভরাট হইয়া গিয়াছে। মধ্যে একটু স্থানে অল্প জল থাকে, তাহাও অতি পুরু জলজতৃণাদি দ্বারা আবৃত থাকে। উক্ত তৃণগুল্ম এরূপ পুরু যে তাহার উপর দিয়া অনায়াসে হাঁটিয়া যাওয়া যায়। মাঘ মাসের শুক্লপক্ষে ঐ তৃণস্তর একটু একটু করিয়া প্রতিদিন নামিয়া যাইতে থাকে। সপ্তমী-অষ্টমী তিথিতে প্রায় সমস্ত তৃণগুল্মই তলাইয়া যায়। তখন পরিস্কার জল উহার উপরে ঢল ঢল করিতে থাকে। ইহার পরে ৭।৮ দিনের মধ্যে আবার পুকুরটী ক্রমে পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হয়। জলজ উদ্ভিদস্তর পুনরায় ভাসিয়া উঠে, জলরাশি অদৃশ্য হইয়া যায়। এই আশ্চর্য্য দৃশ্য অনেকেই দেখিয়াছেন ; কিন্তু অদ্যাপি ইহার কারণ কেহই স্থির করিতে পারেন নাই।

রঘুরামপুরে পূর্ব্বসমৃদ্ধির যে ভগ্নাবশেষ পতিত আছে, তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে রঘুরামরায় ও বর্ত্তমান কাজিদিগের পূর্ব্বপুরুষ কাজি মাহাম্মদ ও কাজি আবুলফতা যে এক সময়ের লোক তাহাতে সন্দেহ উপস্থিত হয়। রঘুরামপুরের ভূগর্ভে যে সকল অট্টালিকার ভগ্নাংশ ও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ইষ্টকাদি দেখিতে পাওয়া যায় তদ্‌ভিন্ন ভূমির উপরে দণ্ডায়মান কোন মন্দির, মঠ বা আবাসগৃহ দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু কাজি আবুলফতার সময় যে মস্‌জিদ্‌ নির্ম্মিত হইয়াছে জীর্ণবস্থাপন্ন হইলেও তাহা এ পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হয় নাই। কাজি মাহাম্মদ হইতে কাজি ইমামুদ্দিন অষ্টম পুরুষ, এখন নবম পুরুষ চলিতেছে। প্রতি পুরুষের স্থিতিকাল ৪০ বৎসর ধরিলেও ৩২০

বৎসর হয়। এই সময়ের সহিত আকবরের রাজত্ব সময়ের ঐক্য লক্ষিত হয়। কাজি ইমাসুদ্দিনের নিকট হইতে যে সকল বৃত্তান্ত সংগৃহীত হইয়াছে তাহার উপর নির্ভর করিয়াই রঘুরাম রায়ের অভ্যুদয়ের সময় আকবরের রাজত্বের সমকালবর্ত্তী বলিয়া আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। উক্ত কাজি ইমাসুদ্দিনের নিকট বাদসাহ জাহাঙ্গীরের পাঞ্জা (হাতের ছাপ) যুক্ত এক সনদ ছিল। তাহাতে আকবর প্রদত্ত জায়গীরের স্বত্ব কাজিদিগকে দৃঢ় করিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং তদতিরিক্ত আরও নূতন জায়গীর দানের বিষয় উল্লিখিত আছে। ইহার পরেও কাজিদিগের বংশবৃদ্ধি হইলে, পূর্ব্ব জায়গীরের আয় দ্বারা তাঁহাদের সম্যক ভরণপোষণ কষ্টকর বলিয়া সম্রাট সাহআলম পুনরায় থালকা গ্রাম জায়গীর দেন। তাহাতেও পূর্ব্বদত্ত জায়গীরের উল্লেখ আছে। এই দলিলেও বাদসাহ সাহ আলমের দস্তখৎ ও মোহর অঙ্কিত আছে। ঐ উভয় দলিল কোন এক মোকদ্দমায় আদালতে দাখিল থাকাতে আমরা তাহা দেখিতে পাই নাই। কিন্তু উক্ত কাজি সাহেবের কথিত উক্তিতে অবিশ্বাসের কোন কারণ দেখা যায় না। ঐ সকল প্রমাণ দৃষ্টে রঘুরাম রায় যে ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যসময়ে বর্ত্তমান ছিলেন তাহাতে কোন সন্দেহ করা যায় না। ৩০০—৩৫০ বৎসর পূর্ব্বে নির্ম্মিত মঠমন্দিরাদি আমরা সচরাচর দেখিতে পাই। তবে রঘুরামরায়ের আবাসভবন ও তৎপ্রতিষ্ঠিত দেবালয়াদির চিহ্নমাত্রও নাই কেন? ইহার এক কারণ পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। বিজয়োন্মত্ত মুসলমান সৈন্যের অত্যাচারেই ঐ সকলগুলি ভগ্নাবস্থায় পতিত হয়। পরে জাহাঙ্গীর বাদসাহের রাজত্ব সময়ে যখন জাহাঙ্গীর নগর (বর্ত্তমান ঢাকা) নির্ম্মিত হয় তখন রায়পুরের ন্যায় রঘুরামপুরের ভগ্নঅট্টালিকাদির মান সন্মানও তথায় নীত হইয়া থাকিবে। এ বিষয়ে বল্লাল বাড়ী সম্বন্ধে যেরূপ জনশ্রুতি আছে, তেমন কোন বৃত্তান্ত শ্রুত হওয়া যায় না।

শ্রীচন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়।

খেয়াল খাতা।

খেয়াল।

বিশ্বখানি সৃষ্টি যে গো খেয়ালে বিধাতার,
খেয়ালে তাই জীবন-খেলা খেলি গো আপনার।
ঋতুর পর আসেরে ঋতু খেয়ালে প্রকৃতির,
কাব্যকলা বিকশে লীলা খেয়ালে ভারতীর।

খেয়ালে গীতি গাহে ভারতী মানস-সর-মাঝে ;
চরণ দোলে বীণার তালে,—কমল-দল নাচে।
গীতির সুর, চরণ-পূত সুরভি বহি আসে ;
পুলকে জাগে কবিতা-লীলা নর-জগত-বাসে।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

নিন্দন্তু নীতিনিপুণা যদি বা স্তুবন্তু
লক্ষ্মীঃ সমাবিশতু গচ্ছতু বা যথেষ্টম্।
অদ্যৈব বা মরণমস্তু যুগান্তরে বা,
ন্যায্যাৎ পথঃ প্রবিচলন্তি পদং ন ধীরাঃ।

নীতিজ্ঞ করুক নিন্দা, অথবা স্তবন
লক্ষ্মী গৃহে আসুন্ বা ছাড়ুন্ ভবন,
অদ্য মৃত্যু হোক্ কিম্বা হোক্ যুগান্তরে
ন্যায় পথ হ'তে ধীর এক পা না সরে॥

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

খেয়াল।

আমরা চিরদিনই শুনিয়া আসিতেছি, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড—এই পরিদৃশ্যমান জগৎ ভগবানের একটী খেয়ালের প্রতিমূর্ত্তি। ভগবানের একবার বটপত্রপৃষ্ঠে চাপিয়া কারণসমুদ্রে ভাসিবার খেয়াল হইয়াছিল। যেমন খেয়ালটী মনে উঠা, অমনি তিনি সেই অপার জলধিজলে ভাসিতে আরম্ভ করিলেন। ভাসিতে ভাসিতে আবার তাঁহার খেয়াল হইল, নাভিসরোবরে একটী প্রস্ফুটিত সহস্রদলের প্রতিষ্ঠা হউক। মনে কথাটা উঠিতে না উঠিতে, নাভিদেশে একটী কমল ফুটিয়া উঠিল। সেই সহস্রদলের সৌরভে মুগ্ধ হইয়া ভগবান কিছুক্ষণ চক্ষু মুদিয়া রহিলেন। যখন চোখ মেলিলেন, তখন দেখিলেন, সেই পদ্মের উপর রক্তবর্ণ চতুর্ম্মুখ, অথচ দ্বিভুজ, অক্ষসূত্র কমণ্ডলুকর একটী অভিনব মূর্ত্তি ফুটিয়া উঠিয়াছে।

"কেহে তুমি ?"

"আজ্ঞে আমি পদ্মের ফাউ।"

"ভাল বুঝিতে পারিতেছি না।"

"একটু চোখ মুছিয়া ভাল করিয়া দেখুন, তাহা হইলেই বুঝিতে পারিবেন।"

ঠাকুর চোখ মুছিলেন কি না বলিতে পারি না, তবে বুঝিতে পারিলেন—হর্ষ-গদগদকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন,—কেও—পদ্মযোনি—বিধাতা,—পিতামহ ?

তখন উভয়ে কিছুক্ষণ ধরিয়া নমস্কারের আদানপ্রদান চলিতে লাগিল।

ঠাকুর আর একবার জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি মনে করে ?"

পদ্মযোনি বলিলেন—"খেয়াল। আপনার খেয়ালে পদ্ম, পদ্মের খেয়ালে আমি—আর আমার খেয়ালে জগৎ।"

পদ্মযোনির মুখ হইতে কথাটী বাহির হইতে না হইতে—চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহতারা, জ্যোতিষ্কমণ্ডলী—আকাশপথের চারিদিকে ঊর্দ্ধশ্বাসে বন্ বন্ করিয়া ঘুরিতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ধরিত্রী—গোরূপা হাম্বারবে কোথা হইতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার পৃষ্ঠে না রহিল কি? প্রস্তর, মৃত্তিকা, জল—পর্ব্বত, প্রান্তর, জলাশয়—তৃণ, গুল্ম লতা, বৃক্ষ—কীট, পতঙ্গ, পশুপক্ষী; সর্ব্বশেষে মানুষ। খেয়ালের আপদ মিটিয়া গেল। ঠাকুর আবার একটী পটোল মাথায় দিয়া একটা এঁদো পুকুরের কল্মীদামের গদীতে শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িলেন।

ঠাকুরের খেয়ালে প্রজাপতি, আর প্রজাপতির খেয়ালে এই বিশ্বসংসার। এ খেয়ালের মর্ম্ম বোঝা সহজবুদ্ধির সাধ্য নয়। ঠাকুরের খেয়ালে জন্মগ্রহণ করিয়া পদ্মযোনি কেমন করিয়া তাঁহার ঠাকুরদাদা হইলেন, এটা বুঝিতে নাকি অনেক তপস্যার প্রয়োজন। কিন্তু সে তপস্যা করে কে?

এসমস্ত বড় কথা বুঝিতে পারি আর না পারি, আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে কিন্তু এটা বুঝিতে পারি যে, বাঙ্গালী-সৃষ্টি পিতামহঠাকুরের একটা উদ্ভট রকমের খেয়াল। বাস্তবিক বাঙ্গালী জাতিটী তাঁহার একটী কবিতারসময়ী সৃষ্টি। এমন একাধারে পরস্পর° প্রতিদ্বন্দ্বীগুণবিশিষ্ট-জাতি জগতের আর কোনও স্থানে দেখিতে পাইবে না।

অথবা গুণই বা বলি কেন? বাঙ্গালীর গুণও বলিতে পারি না, দোষও বলিতে পারি না। গুণ বর্ণনকালে তাহার অশেষ দোষ দেখিতে পাই, আবার দোষের কথা বলিতে গেলে, তাহার অশেষগুণে আকৃষ্ট হইয়া—মুগ্ধ হইয়া, নির্ব্বাক হই। মানবের সৃষ্টিকার্য্যে রত থাকিয়া বাঙ্গালীসৃষ্টিটা বুঝি বিধাতার সর্ব্বশেষের খেয়াল। নেশার শেষ অবস্থায়, তাঁহার কার্য্য অবসাদ বুঝি এক হইয়া গিয়াছিল, জ্ঞানে বুঝি একরাশ মোহ মিশিয়াছিল। সর্ব্বগুণের সার সঙ্কলন করিয়া

এই জাতিটী রচনা করিতে করিতে পিতামহ বোধ হয় বুঝিয়াছিলেন যে, অন্যমনস্কে আর একটী পিতামহ রচনা করিয়া ফেলিয়াছি। তাই লজ্জায় দাঁতে জিব কাটিয়া, এক কলসী দুগ্ধে একবিন্দু গোমূত্র নিক্ষেপ করিয়া দিয়াছিলেন। কাজে কাজেই বাঙ্গালী পুত্রও হইল না, পিতাও হইল না, পিতামহও হইল না—মাঝখানথেকে ত্রিগুণবিশিষ্ট একটী জ্যাঠা হইয়া বসিল। শিবের ন্যায় বাঙ্গালীকে ত্রিগুণবিশিষ্টও বলিতে পার, নির্গুণও বলিতে পার। "কোন গুণ নেই তার কপালে আগুন"। শিবঠাকুরের উদ্দেশ্য নয়, বাঙ্গালীরও উদ্দেশ্য বুঝি নয়।

জ্যাঠা।

ভূত, ভবিষ্যৎ. বর্ত্তমান।

(উন্নতির প্রণালী।)

Schlegel এক জায়গায় বলেছেন:—"The illusion of a past golden age is one of the greatest hindrances to the approach of the golden age that should come—if the golden age is past it was not genuine."

এ কথা কি ঠিক নহে? আমরা অতীত ও ভবিষ্যতকে নিয়েই আছি, বর্ত্তমানকে গ্রাহ্য করি না। অলস, কল্পনাপ্রিয় লোকদের পক্ষেই এরূপ শোভা পায়, যারা কাজের লোক তাদের পক্ষে বর্ত্তমান খুব কেজো জিনিস—বর্ত্তমানই জীবন।

একজন ফরাসি গ্রন্থকর্ত্তা বলে গেছেন—"জীবন কি?—না কতকগুলি কর্ত্তব্য-পরম্পরা"। বর্ত্তমানের প্রতি জাপানীদের বিশেষ অনুরাগ আছে বলেই তাহাদের এত উন্নতি।

ইংরাজীতে একটা প্রবাদ আছে—"টাকাকে সাম্‌লাও, পয়সাগুলা আপনাকে আপনি সাম্‌লাবে। সেইরূপ আমি বলি,

বর্ত্তমানকে সাম্লাও, ভবিষ্যৎ আপনাকে আপনি সাম্লাবে। পূর্ণমাত্রায় বর্ত্তমানের সদ্ব্যবহার করিলে ভবিষ্যৎ ফল ভাল হবেই। বর্ত্তমান ভবিষ্যতের জনক ; বর্ত্তমান বৃক্ষ—ভবিষ্যৎ ফল। বৃক্ষকে যেমন যত্ন করবে ফলও তেমনি ভাল হবে। বর্ত্তমানের প্রতি যে যত উদাসীন থাকবে ভবিষ্যতে তার তত ভাল হবে—এ কথা পাগলের কথা। তার সাক্ষী দেখ, আমরা পরকালের সুখের জন্য ইহকালের কর্ত্তব্যে বিমুখ—সেই জন্যই আমাদের এত দুর্দ্দশা। আমরা বেশী ভবিষ্যৎদর্শী তাই কোন সাহসের কাজে হাত দিতে পারি না—সকল তাতেই ভয়, সকল তাতেই ভাবনা, সকল তাতেই উদ্বেগ। আসল কথা, ভবিষ্যতের প্রতি সারাদিন তাকিয়ে না থেকে "act act in the living present, heart within and God over-head." গাছে যেমন রদ্দুর লাগা চাই, তেমনি মাটীতে জল দেওয়া চাই। আমরা যদি মনে করি, স্বর্গের রদ্দুর যত পাওয়া যায় তারই ব্যবস্থা করা যাক্, পৃথিবীর দিকে দৃষ্টিপাত করে' কাজ নাই—তা হলে কিরূপ ফল দাঁড়ায় ? যা দাঁড়িয়েছে তা তো দেখাই যাচ্ছে। বর্ত্তমান জীবনের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি চেষ্টাই ভাবী উন্নতির মূল। আমরা মনে করি, আর সব নশ্বর কেবল আত্মাই অবিনশ্বর। অতএব আর সব ত্যাগ করে' কেবল আত্মারই উন্নতি চেষ্টা করা যাক্ ; কিম্বা মনে করি, শরীরের সুখই সব, আত্মার দিকে দেখিবার কোন প্রয়োজন নাই ;—কিন্তু এই উভয় ধারণাই ভ্রমাত্মক।

এই জন্যই বৈরাগ্যমূলক সভ্যতা ভারতবর্ষে স্থায়ী হইল না। "গোড়া কাটিয়া আগায় জল" কিরূপে সম্ভবে ? জাপানীরা, সভ্যতামূলে জলসেক করিয়া আসিয়াছে তাই তার আগাও সহজে গজাইতেছে, ক্রমশই উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতেছে। শরীর আগে, তারপর মন, তারপর আত্মা। বাল্যকালে শরীর প্রধান, যৌবনে মন

প্রধান, ও বার্দ্ধক্যে আত্মা প্রধান—ইহাই প্রকৃতির ব্যবস্থা। বনিয়াদ ভাল হলে বাড়ির ভর সইতে পারে। আমাদের শিক্ষাপ্রণালী বিশুদ্ধ নয়; ছেলে-বেলায় যাহাতে শরীর ভাল হয় সে দিকে দৃষ্টি না করে' লেখা পড়ার চাপ বেশী দেওয়া হয়। যৌবনে জ্ঞান ও কাজের প্রতি বেশী ঝোঁক না দিয়ে বৈরাগ্যের প্রতি বেশী ঝোঁক দেওয়া হয়। "পঞ্চাশোর্দ্ধে বনং ব্রজেৎ"—কিন্তু তার পূর্ব্বে বৈরাগ্যের আড়ম্বর করা স্বাভাবিক নহে। প্রথমে মূল—তারপরে ফুল—তারপরে ফল। প্রথমে শরীরের উন্নতি, তারপর মনের উন্নতি, তারপর আত্মার উন্নতি। প্রথম শারীরিক সভ্যতা, তারপর মানসিক সভ্যতা, তারপর আধ্যাত্মিক সভ্যতা। সব ধাপগুলি আনুপূর্ব্বিক না মাড়াইয়া একেবারে আধ্যাত্মিক মঞ্চে লাফ দিতে গেলে পতনের সম্ভাবনা। জাগিয়ে পাকান ফল ও সুপক্ক ফলের আস্বাদে অনেক প্রভেদ।

ভারতের এখন বার্দ্ধক্য দশা উপস্থিত। কালের নিয়মই এই; কি জাতি, কি ব্যক্তি, কি জীবজন্তু, কি বৃক্ষলতা সকলেরই একই নিয়মে জন্ম, একই নিয়মে বৃদ্ধি, আবার একই নিয়মে পুনর্জন্ম। পুরাতন ভারতের নাড়ি এখন আর বড় পাওয়া যায় না—তার ধড়ে প্রাণ নাই বলিলেও হয়। নূতন ভারত জাগিয়া উঠিতেছে। এইবার যেন তাহার উন্নতি-চেষ্টা বিশুদ্ধ প্রণালীতে হয়। এক্ষনে বৈরাগ্যের শিক্ষা না দিয়া কার্য্যের শিক্ষা—গীতা-উপদিষ্ট কর্ত্তব্যের শিক্ষা দেওয়াই প্রথম কর্ত্তব্য। অতীতের মৃত্তিকার মধ্যেই বর্ত্তমানের বীজ নিহিত। সেই জীর্ণ মৃত্তিকায় নূতন সার দিতে হইবে, আশ-পাশের জঙ্গল পরিষ্কার করিতে হইবে, তবেই বর্ত্তমানের বীজ সতেজে অঙ্কুরিত, পরিবর্দ্ধিত, ও বৃক্ষাকারে পরিণত হইয়া অভীষ্ট ফুল-ফলে সুশোভিত হইবে।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুর।

রেণু।

যা কিছু অসম্পূর্ণ, অপরিস্ফুট তারি আবরণ আচ্ছাদনের আবশ্যক— ফুল যতদিন কোরক অবস্থায় থাকে ততদিনই সবুজ পাতার আচ্ছাদনে ঘেরা থাকে। মানুষের মনে প্রেম যখন সম্পূর্ণ এবং সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয় তখনি আমরা ব্যাকুল হয়ে প্রিয়জনের কাছে ব্যক্ত করে বলি, তার আগে কেবল চোখের চাহনিতে মুখের লজ্জারাগে তার আভাষ পাওয়া যায় মাত্র।

সাদা কাগজখানির উপর একটুও কাল কালী ঢেলে পড়লে কি রকম বিশ্রী দেখতে হয়, কিন্তু অনেকটা লালকালী ঢেলে পড়লে কোন হানি হয় না বরং দেখতে ভাল হয়—জীবনভরা অনুরাগ জীবনের শোভা, কিন্তু এতটুকু কলঙ্ক তাকে কত শ্রীহীন করে!

নবোদ্ভিন্ন ধান্যগুচ্ছে যে সুকুমার পীতরাগ দেখা যায়, অপক্ক ধান্যশীর্ষে সেই পীত আবার গাঢ়তর কনকবর্ণে দেখা দেয়। জীবন প্রারম্ভের আশা আর জীবন শেষের আশ্বাসে কেবল একটু মাত্র বর্ণের তারতম্য।

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

সঙ্গীত।

আমার ত বিশ্বাস যে কেবলমাত্র সুরে নিজের ভাব ব্যক্ত করা যায় না। একটা সুর শুন্‌লে একটা ভাব মনে আসে বটে, কিন্তু সেটা কোন বিশেষ ভাব না, যার যে রকম মনের অবস্থা সে সেই রকম করে সুরটাকে দেখে; তাল এবং গদের অথবা বাজনার স্বরের উপর ভাবটা বোধ হয় সম্পূর্ণ নির্ভর করে। এমন কোন সুর নাই যা আস্তে আস্তে গাইলে আনন্দ অথবা দ্রুত রকম গাইলে গভীর দুঃখ বোঝাতে পারে। আর আমার বোধ হয় যে, এমন কোন রাগিনী নাই যাকে আমাদের সকল প্রকার ভাব ব্যক্ত করার কাজে লাগান যায় না। কানাড়া অতবড় জাঁকাল রাগিনী দিয়ে ছিবলেভাব প্রকাশ করা যায় আর খাম্বাজ প্রভৃতি যে সকল রাগিনী গুলকে ছিবলে রকম ভাবেতেই লাগান হয় সে গুলি দ্বারাও খুব মহৎ ভাব প্রকাশ হয়েছে। তাহলে, এ যদি ঠিক হয় যে সুরের উপর ভাব অতটা নির্ভর করে না তা'হলে রাগিনী ঠিক বজায় রাখা যা না, রাখাও তা। যেটাই করা যাক্‌না কেন, গানের যে প্রধান উদ্দেশ্য তার কোনই ক্ষতি হয় না। রাখ্‌লে যে ঢের সুবিধা হয় এবিষয় বোধ হয় কারো সন্দেহ নেই। যথা, গান শিখিবার সুবিধা, গান মনে রাখবার সুবিধা এবং গান তৈয়ারী করিবার সুবিধা। এইজন্য যাঁরা বলেন যে আমাদের দেশ থেকে রাগ রাগিনীর প্রণালী উঠে গেলে গানের অনেক উন্নতি হয়। আমার বোধ হয় তাঁরা ততটা ঠিক বলেন না।

সৌন্দর্য্য।

আমাদের কোন সুন্দর জিনিস দেখ্‌লেই তার সঙ্গে এক হয়ে যেতে ইচ্ছা হয় কেন? সমস্ত সৌন্দর্য্যেরই কেমন একটা একত্ব আছে। খালি যে আমাদের সুখ হয় বলে আমরা একত্ব আছে ভাবি, তা নয়, সুখ ত অনেক জিনিসেই হয়। আর সৌন্দর্য্যে আমাদের সুখের সঙ্গে একটা আকাঙ্ক্ষা আর দুঃখের ভাব আছে,—আমাদের যেন একটা বিশেষ কোন অভাব পূরণ হয়েও হচ্চে না। সুন্দর চেহারা, সুন্দর দৃশ্য, এসব ত আমাদের চোখের কথা—কিন্তু সুন্দর সঙ্গীত, সুন্দর আস্বাদ, এসমস্ত সৌন্দর্য্য ভিন্ন ইন্দ্রিয়ের, কিন্তু সমস্তই এক রকমের। এসবের মধ্যে যা কিছু সুন্দর আছে তা একই সৌন্দর্য্য। কিন্তু এরই মধ্যে আবার ভিন্নতা আছে। আমরা শব্দ, রূপ এবং গন্ধের স্থলে সৌন্দর্য্য শব্দের বিশেষ ব্যবহার করি, কিন্তু স্পর্শ আর আস্বাদন সম্বন্ধে কেবল দূরতঃ তাহার ব্যবহার হয়। স্পর্শ আর আস্বাদন বল্‌লেই কেমন একটু ইন্দ্রিয়গত (material) ভাবের উদ্রেক হয়, আর দৃষ্টি, ঘ্রাণ, ও শ্রবণ-শক্তিতে কেমন একটু অতীন্দ্রিয় (immaterial) ভাব আছে। দৃষ্টিতে সব সময়ে অতীন্দ্রিয় ভাব নাও আসতে পারে কিন্তু যখনই দৃশ্য বস্তুর সৌন্দর্য্য থাকে তখনই তার অতীন্দ্রিয় ভাব আসে। স্পর্শ আর আস্বাদনের অতীন্দ্রিয় ভাব থাকে না; তাই বোধ হয় আমরা এই দুই রকমকেই সৌন্দর্য্য বলতে সঙ্কোচ বোধ করি। এরই সঙ্গে আমার একটা মনে হয় যে চিত্রশিল্পের আর সঙ্গীতের যেমন সৌন্দর্য্য আছে, ঘ্রাণের কেন সৌন্দর্য্য সেই পরিমাণে নেই।

শ্রীলোকেন পালিত।

"কৃষক ও পলিটিসিয়ান্"।

নাজিরাবাদ জেলার বিরাট রাজনৈতিক সভার সভাপতি মিঃ ধুন্ধুমার তাঁহার দুইঘণ্টাব্যাপক ওজস্বিনী বক্তৃতা শেষ করিয়া সভ্যমণ্ডলীর তুমুল করতালি-কোলাহলের মধ্যে বসিয়া পড়িলেন। তখন তাঁহার শরীর ঘর্ম্মাক্ত, চক্ষুদ্বয় হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতেছিল, তাঁহার বিরল-কেশ মস্তকের মধ্যে যেন প্রবল ঝড় বহিতেছিল। তিনি পকেট হইতে শুভ্র, সুগন্ধি-মাখা রুমাল বাহির করিয়া কপাল ও মুখ মুছিতে লাগিলেন এবং তাঁহার চতুঃপার্শ্ব হইতে ব্যজন আরম্ভ হইল।

এবার উদ্যোগকর্ত্তৃগণের সাধুচেষ্টায় অনেক গুলি কৃষক এই মহতী সভার শোভাবর্দ্ধন করিয়াছিল। কিন্তু বসিবার স্থানের অভাবহেতু তাহারা সভামণ্ডপের বাহিরে দাঁড়াইয়া বক্তৃতা শুনিতেছিল। করতালির চটাপট শব্দে তাহাদের মধ্যে একজন সভয়ে সেই সভামণ্ডপের উপরে দৃষ্টিপাত করিয়া অন্যকে কহিল "মেয়া ভাই! ও কিয়ের শব্দ? শিল পরে না ত? আমার তরমুজের থ্যাত বুজি গরাপ অইল!"

"না—ও শিল না, ও হাততালি দেয়।"

"ক্যান্?"

"ওর গো মনে খুব ভারি আল্লাদ অইছে, হেয়ার লাগিয়া হাত-তালি দেয়।"

"আচ্ছা-মেয়া ভাই, ঐ যে দারিওয়ালা মশায় হাত নারিয়া সওয়াল জব করিল সে কোন্ হাকিমির কাছে? কৈ কোন হাকিম ত এহানে দেহি না?"

"হাকিম এহানে আহে নাই—ওনার এই হগল সওয়াল জব খোদ বর লাট সাহেবের দরবারে লেখ্যা পাঠান হবে!"

খোদ বড়লাটসাহেবের নাম শুনিয়া প্রথম বক্তা এনাতুল্লা বিস্ফারিত নেত্রে সভাপতির দিকে তাকাইয়া কহিল—"সাবাস্ বাপের বেটা! মুখ দিয়া যেন খই ফোটে!"

এই সময়ে সভাভঙ্গের উদ্যোগ হইল। সভাপতি মহাশয় গাত্রোত্থান করিয়া বাহিরে আসিবার উপক্রম করিলেন। তখন সেই কৃষকদল তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়া তাঁহার গতিরোধ করিল। একজন মাতব্বর সভাপতিকে বলিল—

"বাবু, আমাগো সেই কথাডার কি অইলো?"

সভাপতির একজন পারিষদ অমনি বলিলেন "কিরে বেটা চাষা! বাবু—তোর বাবু কে? ইনি হইতেছেন মিষ্টার।"

মাতব্বর দেরাস্‌ওল্লা খাঁ যোড়হস্তে সবিনয়ে বলিল "তা আমরা চাষা লোক—আপনারা কলম ধরেন আমরা নাঙ্গল ধরি—আমরা হে কথা—কি রকমে জানমু? (সভাপতি কে) মাষ্টের মশায়! আপনিত উঠিয়া চল্‌লেন, আমাগো কি কইয়া যান?" সভাপতি মহাশয় একটু থামিয়া বলিলেন "কি শুনিতে চাও?"

দেরা।—এই যে দুই দিন আমরা চাষবাস ছারিয়া এহানে আইয়া সোটেলে * খাইয়া আপনাগো সভায় হাজির আছি, আমাগো ক্যান্ তলব করছিলেন তা'ত কিছুই বোল্‌লেন না। ঐ যে একজন কালা রঙের বাবু—আমার কাজলার মত যার দাড়ী—তেনার নামডা যেন কি—আরে—আটাত্তর বাবু, আটাত্তর বাবু—তানি আ'জ এক মাস অইল গ্রামে গ্রামে ঘুর‍্যা আমার গো কইলেন—তোমাগোরে চৌকীদারী ট্যাক্‌সো মাফি হবে—জলকষ্ট নিবারণ হবে—ফুলিসির অতি আচার বারণ হবে—এই রকম আরও কত কথা কইলেন—হেয়া আমরা সগল

* সোটেল=হোটেল।

বুজতি পারি না। তেনার কথা শুন্যা আমরা পাশ্ শো মানুষ আইছি—সোটেলে এই দুইদিন খাইচি,—সোটেলে জাগা না পায়্যা গাছতলায় শুইছি এহন্ আমার গো সেই কথার কি করলেন? আমরা শুনছি আপনি খুব বড় মানুষ—লাট সাহেবের সাতে আপনি কথা কন—ছিরি মুঁহির এট্টা বাণী হোনবার জন্তি আমরা আছি।

সভাপতি। বেশত--তোমরা এসেছ, খুব ভাল হয়েছে। তোমাদের দেখে আমি খুব খুসী হয়েছি। তোমরা আসাতে আমাদের এই সভার গৌরব বৃদ্ধি হয়েছে।

দেরা। কিন্তু মাষ্টের মশায়, ক্যাবল কথায় চিরা ভেজে না—এহন সেই কাজের কি হবে?

সভা।—এখানে কোন কাজ হয় না—এখানে কেবল কথা হয়। আমরা যে সকল রিজলিউসন্ অর্থাৎ মন্তব্য পাশ করিলাম সে গুলি স্বয়ং লাটসাহেবের কাছে পাঠান হবে। তিনি আবার কালেক্টর সাহেবের কাছে পাঠাবেন। পরে তোমাদের চৌকীদারী ট্যাক্স মাপ হবে—পুকুর কাটা হবে—রাস্তা প্রস্তুত হবে—পুলিসের অত্যাচার নিবারণ হবে।

দেরা। আর আমরা যে ট্যাহা দিছি হে ট্যাহায় কিছু অবে না?

সভা। যে সব চাঁদা আদায় হয়েছে তা'দিয়া এই সভার ব্যয় নির্ব্বাহ করা হবে। দেশ বিদেশ থেকে যে সব সভ্য এসেছেন, তাঁহাদের খাওয়ান হচ্ছে।

দেরা। আর আমরা বুঝি ট্যাহা দিয়া চোরের গরে চুরি করছি? এহন গাটির পয়সা খরচা কর‍্যা আবার সোটলে খামু?

এই সময় আর একজন কৃষক মাতব্বরকে বলিল "ক্যামন্ বর মেয়া? তুমি না কইছিলে দশ হাজার ট্যাহা চাঁদা ওঠ্ছে, ইহার মধ্যি আমার গো পাচ টা গ্রামে পাচশ পুষ্কন্নীর জন্তি পাচ হাজার ট্যাহা

দেবে? ট্যাহা নেওয়ার জন্যি ছালা ত আন্‌ছিলে হে ছালা কই? ঐ শোন্‌ এহন কি কয়"।

মাতব্বর কিঞ্চিৎ রুষ্টভাবে সভাপতিকে বলিল—"বাবু, আপনারা এই চাঁদার ট্যাহা গুলান্‌ এই রকম উড়াইয়া দিলেন আমাগো হাতে দিলি আমরা হ্যা দিয়া অনেক কাজ কর্ত্তাম পার্ত্তাম। আর হেই আমোদ কর্‌য়াই যদি খরচ করলেন, তবে আমরা কি চোর অইলাম? আপনারা হ্যার কিছু ট্যাহা দিয়া যদি গাজীর গীত দিতেন, তবে আমরা হেই আমোদের ভাগ পাইতাম। এহন সোটেলওয়ালার ট্যাহাডা কেডা দেয়? হে আমাগো কাল ধর্‌য়া পয়সা আদায় কর্‌য়া ছারবে।

সভা।—সে টাকা তোমরাই দিবে। আমরা আমাদের নিজের কাজ ক্ষতি করিয়া তোমাদের এই উপকার করিতে আসিয়াছি, ইহাই যথেষ্ট। এই দেখ কত দেশ বিদেশ হইতে শত শত ভদ্রলোক মিলিত হইয়াছেন—দেশের জন্য ইহারা প্রাণপণে পরিশ্রম করিতেছেন—

দেরা।—বাবু, বেশী বক্‌বেন না—হেই যে নেংটী পরা দেরাস্‌ তুল্লারে দ্যাহেন—এ যদি মনে করে তবে খোদার কছমে এক দিনের মধ্যি এক লাক মানুষ জর করবার জন্ত পারে। আমি যদি মনে করি তবে দশ দিনের মধ্যি দশ আজার ট্যাহা চাঁদা তোলবার পারি। তবে অমরা মুরুখ্যুলোক চাষা, আপনারা ভদ্রলোক, ন্যাহাপরা জানেন। আপনারা আমাগো চালালিই আমরা চলতি পারি। আপনারা তা করেন না এই ত দুক্‌কু। দ্যাশের জান্য আপনারা পরিছেরম করেন কইলেন; হে কি পরিছেরম আমরা ত দেহি না; আপনারা ক্যাবল জাগায় বইস্যা কথা কন আর পান তামাক খান।

আর একজন কৃষক বলিল—

"তামাক না চুরট্‌।"

দারা। হয়—হয়—চুরট্। আমরা চাষালোক তামাক খাই, ভদ্র-লোকে খায় চুরুট্।

সভা। আমরা সভায় যে কি কাজ করিলাম, তোমরা মুর্খলোক তার কি বুঝিবে? আমরা সভায় যে সব মন্তব্য পাশ করিলাম তাহা লাট সাহেবের কাছে গেলে তোমাদের খুব ভাল হবে।

দেরা। বাবু, হে ত দরখাস্ত! হেয়া ত আমরাই কর্ত্তাম পার্ত্তাম! হেই দরখাস্তের জন্যি এত ট্যাহা খরচ ক্যান্ করলেন?

সভা।—তোমাদের দরখাস্ত ত কেউ শোনে না!

দেরা।—ক্যান্ হোন্‌বে না? আমরা হদি দশ বিশ আজার মানুষ জুট্যা কেলেক্টার সাহেবের কাছে দরখাস্ত করি, তবে তানি আলবত্ আমাগো দরখাস্ত হোন্‌বেন। আপনা গো কথাই কেউ হোনে না; আপনারা উকীল মোক্তার—যে ট্যাহা দেয় তার ই গুণ গান—ট্যাহার জন্যি কালা গরুরে ধলা বানান—আপনাগো কথায় লাট সাহেব বিশ্বাস করবেন ক্যান্?

মাতব্বরের এই বক্তৃতা শুনিয়া সভাপতি মহাশয় বিলক্ষণ বিরক্ত হইয়া সবেগে জলযোগগৃহের দিকে প্রস্থান করিলেন। তাঁহাকে রণে ভঙ্গ দিতে দেখিয়া সেই সকল চাষা লোক "আল্লা,—মমিন!" বলিয়া ডাক ছাড়িল। দেয়াস্ তুল্লা তাহাদিগকে থামাইয়া দিল। পরে সেই কৃষককুল কোন ক্রমে "সোটেলের" দেনা পরিশোধ করিয়া সেই দিনই স্ব স্ব গৃহে ফিরিয়া গেল। তাহাদের এই মহাসভা সম্বন্ধে দুইটী স্মৃতি মানসপটে অঙ্কিত হইয়া রহিল; সেই শিলপড়ার মত চটাপট করতালিধ্বনি আর সভাপতি মহাশয়ের তালে তালে পদ বিক্ষেপ।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন সিংহ।

কলুষ ও কাল।

(১)

লোকালয়ের বাহিরে ছিল পাপের বসতি।
ভুগিত সে বারমাসই অনেক দুর্গতি॥
পবনদেব যখন তার কুটির পানে যান্।
ঝট্‌কা ধরে ঝট্‌কা মেরে দেন বিষম টান্॥
বরুণদেব চাল ফুটিয়ে করেন বরিষণ।
কাঁথা কম্বল ভিজিয়ে তারে করেন জ্বালাতন!
চন্দ্র, সূর্য্য, তারা তার সব খবরই জানে।
উঁকি মেরে চেয়ে আছেন সদাই তার পানে॥
বারমাসিক আমের গাছ সুমিষ্ট ফল তার।
ছিল বৃদ্ধ পাপের, তাই চলিত আহার॥
দেখ্‌তে যেমন খেতে তেমন আম চমৎকার।
গাছভরে' ফল ধরে বড়ই বাহার॥
লোভেপোড়ে চুরি ক'রে লোকে আম খায়।
গাছে চড়ে' আম পাড়ে তলারও কুড়ায়॥
জান্‌তে'পেরে পাপ বুড়ো যখন তাড়া দেয়।
ঝুপ্‌ঝাপিয়ে লাফিয়ে ভয়ে সকলে পলায়॥
লোকেদের অত্যাচারে পাপ হ'ল কাতর।
হেন কালে এলো এক বৃদ্ধ মুনিবর॥
দাড়ি গোঁপ জটাজুট দেখ্‌তে ভয়ঙ্কর।
ছাই-মাখানো আগুন যেন পূত কলেবর॥
সাঁঝেরবেলা এসে মুনি পাপের দুয়ারে।
"অতিথি, অতিথি" বলে ডাকে বারে বারে॥

পাপ তাঁরে দেখে, ভয়ে অতিথি করিল।
বিধিমত সেবা করি মুনিরে তুষিল॥
যা'বার সময় মুনি বলেন "লওরে পাপ, বর"।
পাপ বলে "সদয় যদি, মাগি এই বর—
"—আমি বড়ই কাতর—
"লোকগুলো চুরি করে আম আমার খায়।
"জ্বালাতন করে মোরে তাড়ানো না যায়॥
"আমারে যে না বলিয়া উঠিবে গাছেতে।
"আমার আজ্ঞা বিনা যেন না পারে নামিতে॥
"যদি প্রভু সদয় হ'লে, দাও এই বর।"
"তথাস্তু" বলিয়া মুনি গেলেন আপন ঘর॥

(২)

ভাদ্রমাস বড় গরম গাঁয়ের যুবাগণ।
দলবেঁধে সাঁঝের বেলায় করয়ে ভ্রমণ॥
নদীর পারে চাঁদ উঠেছে পশ্চিম গগনে।
চতুর্থীর সে নষ্টচন্দ্র পড়িল নয়নে॥
চাঁদ দেখে তখন সবে করে আপশোষ।
নানারূপ যুক্তি করে কাটা'তে সে দোষ॥
নষ্টচন্দ্রের দোষ যায় পরের গালি খেলে।
পরের ক্ষতি করার প্রথা তাই আস্‌ছে চলে॥
ভেবেচিন্তে তখন তা'দের যুক্তি হ'ল স্থির।
"আম পাড়িতে যাই চল পাপের কুটীর॥"
"পাপ বুড়া কড়া কড়া দেয় বড় গালি।"
"চল আজি লুটেপুটে গাছ করি খালি॥"

গেল তবে তথায় সবে মনের উল্লাসে।
রাতের বেলায় উঠ্‌লো গাছে আমের বিনাশে ॥
এদিকেতে সুখে, নির্ভাবনায় ঘুমে ভরপুর।
নাক ডাকিয়ে পাপবুড়া শ্রান্তি করে দূর ॥
পাপের ঝাঁপে ছুড়ে তা'রা মারছে আমের আঁটি।
শিলাবৃষ্টি হচ্ছে তবু নাই পাপের সাড়াটি ॥
তখন একজন বলে "ভাই বৃথাই আম পাড়া"।
"সাড়াশব্দ নাইক কোন, বুড়ো গেছে মারা ॥"
"এত গণ্ডগোলে সাড়া দিচ্ছে না যখন।"
"গতিক ভাল বলে বোধ হচ্ছে না তখন ॥"
"লাগ্‌ছে কেমন কেমন" ॥
"গভীর ঘুম ঘুমাচ্ছে বুড়ো"—কহে আর একজন—
"নেমে চলো ঝাঁপ টানিগে উঠিবে এখন।"
"গালি পাড়িবে তখন ॥"
"বেশ কথা" বলে সবে নেমে আস্‌তে চায়।
ডালে ডালে পড়লো বাঁধা ঘট্‌লো বিষম দায় ॥
যথা সাধ্য ধস্তাধস্তি করে নানামতে।
নাম্‌তে কিন্তু পারে না কেউ আমগাছ হ'তে ॥
শেষ রাত্রে ঠাণ্ডালেগে কাঁদে আর কাশে।
জান্‌তে পেরে পাপ বৃদ্ধ মনে মনে হাসে ॥
নাকাসুরের কান্না ক্রমে হাহাকার হ'ল।
গোল শুনে গাঁয়ের লোকের ঘুমভেঙ্গে গেল ॥
কোথা হ'তে কান্না আসে ছুট্‌লো অন্বেষণে ;
দেখ্‌তে দেখ্‌তে উঠ্‌লো তারা পাপের প্রাঙ্গণে ॥
গাছ হ'তে কান্না আসে বিকট কোলাহল।
পলায় ভয়ে লোকসকলে ভেবে ভূতের দল ॥

ব্যাকুল হয়ে মায়ে বলে "ছেলেরা নাই ঘরে।"
"ভূত নয়, যাও দেখগে পড়েছে কোন ফেরে॥"
সাহস পেয়ে পুরুষেরা আবার ফিরে যায়।
এ দিকেও নিশাটুকু অবসান প্রায়॥
ঝুঁঝ্‌কিভোরে গেল সবে পুন গাছ তলে।
দেখলে সবে ডালে ডালে নিজেদের ছেলে॥
শয্যা ত্যজি পাপ বৃদ্ধ উঠেছে তখন।
তলে বসি কচ্ছে বুড়ো মহা আস্ফালন॥
বাপ ভায়েরা কেঁদে তখন পাপের পায়ে ধরে।
নাম্‌তে আদেশ দিল তবে পাপ দয়া করে॥
নেমে এলো ছেলের দল পাপের দয়ায়।
কবি বলে দয়া নয় কেবলমাত্র ভয়॥
ভয়, পাছে থাক্‌লে গাছে আমের বিনাশ।
তাই পেলে ছেলেগুলো বেকসুর খালাস॥
ওই আম গাছে ভূত আছে হ'ল জনরব।
পারৎ পক্ষে যায় না সেথা কোনই মানব॥

(৬)

শীতকালে হু হু বহে উত্তুরে বাতাস।
ঠাণ্ডালেগে পাপের হ'ল বিষম কাশ॥
কাশিতে কাশিতে দম্‌ আটকিয়া গেল।
অমনি আসিয়া মহাকাল দেখা দিল॥
পাপ লয়ে যমালয়ে যাইতে তখন।
সহসা পড়িল আমে কালের নয়ন॥
মনোহর আম দেখে খেতে হ'ল মন।
পাপে তলে রাখি গাছে করে আরোহণ॥

মনসাধে মিষ্ট আম করিয়া ভক্ষণ।
নামিয়া আসিতে আর পারে না তখন॥
মহাকাল বৃক্ষে যদি আবদ্ধ রহিল।
জগতের জীব সব অমর হইল॥
ধরা ভারাক্রান্ত হয়ে' হাহাকার করে।
দেখি দেবগণ অতি পড়িল ফাঁপরে॥
সবে মিলে যুক্তি করে পাপে দিয়া প্রাণ।
কাল নামাইতে তার অনুমতি চা'ন॥
পাপ বলে অনুমতি তবে পারি দিতে।
যদি কাল মোরে আর নাহি চায় নিতে॥
অগত্যা তাহাই কাল করি অঙ্গীকার।
বৃক্ষ হ'তে রক্ষা পেয়ে লয় কার্য্যভার॥
সেই হ'তে পাপবুড়ো অমর হইয়া।
অতি দর্পে ফিরিতেছে জগৎ মথিয়া॥
অমর হয়েছে নাই কোনই ভাবনা।
আয়ু দিয়া আম তার নিচ্ছে কত জনা॥
পাপে, কালে দোঁহে মহা সখ্যতা জন্মিল।
জগতের জীব উভে নাশিতে লাগিল॥
কলুষ কালের কথা অতি পুরাতন।
হরি হরি বল এবে করি সমাপন॥

শ্রীসত্যোপেন্দ্র মল্লিক।

সাময়িক কথা।

সম্প্রতি পণ্ডিতগণের মধ্যে কেহ কেহ বৌদ্ধ ধর্ম্ম সম্বন্ধে ঐতিহাসিকগণের একটি ভ্রান্ত বিশ্বাস দেখাইয়া দিয়াছেন, ওকাকুরা ইহাঁদের অগ্রণী। ইহাঁরা বলেন, হিন্দুধর্ম্ম ও বৌদ্ধধর্ম্ম বলিয়া দুইটা স্বতন্ত্র ধর্ম্মকল্পনা,—আধুনিক ঐতিহাসিকগণের প্রবর্ত্তিত।

বৌদ্ধ ধর্ম্ম।

এই দুই ধর্ম্ম কখনই পৃথক্ ধর্ম্মরূপে ভারতবর্ষে গণ্য হয় নাই, বৌদ্ধভারত, বৌদ্ধযুগ সর্ব্বৈব ঐতিহাসিকগণের কল্পনাসাগরমন্থনোৎপন্ন।

এই মতের অনুকূলে অনেক যুক্তি পাওয়া যাইতেছে; শৈব, গাণপত্য, বৈষ্ণব ও শাক্ত যেরূপ আর্য্যধর্ম্মের অন্তর্গত, বৌদ্ধধর্ম্মও তদ্রূপই ভারতের প্রাচীন ধর্ম্মেরই এক শাখা; বৌদ্ধমত কখনই ব্রাহ্মণকে অবজ্ঞা করে নাই, শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ উভয় শ্রেণীকেই বৌদ্ধগণ তুল্যরূপ সম্মান করিয়াছেন, তাহার ভুরি ভুরি প্রমাণ ইতিহাসে পাওয়া যায়।

তবে একটা বিষয়ে অনৈক্য দাঁড়াইয়াছিল দেখাইতে যাইয়া কেহ কেহ উল্লেখ করেন, বৌদ্ধগণ বেদকে অগ্রাহ্য করিয়াছেন; হিন্দুধর্ম্মের অপর যত শাখা প্রশাখা হইয়াছে তাহার সকল গুলিরই ভিত্তিভূমি বেদ, বুদ্ধ সেই ভিত্তিকে উড়াইয়া দিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহার ধর্ম্ম বিভিন্ন ধর্ম্ম বলিয়া গণ্য হইয়াছে। ভারতপ্রচলিত হিন্দুধর্ম্মের অপর সমস্ত শাখাতেই বেদের দোহাই মান্য হয়, বৌদ্ধমত বেদকে অগ্রাহ্য করিয়া সর্ব্বথা বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। "বেদ বিনিন্দিতা যেন বিষ্ণুনা বুদ্ধরূপিণা" প্রভৃতি প্রচলিত শ্লোক ও জয়দেবের "নিন্দসি যজ্ঞ বিধিবহঃ" প্রভৃতি বাক্যে এই কথা প্রতিপন্ন হয়।

আমাদের দেশে কোন নূতন ধর্ম্ম সম্প্রদায় উঠিলেই তাহা "বেদবিধি গর্হিত" বলিয়া প্রতিপক্ষীয়েরা উড়াইয়া দিতে চাহে। প্রতিপক্ষের উক্তি প্রামাণ্য নহে; বুদ্ধদেব স্বয়ং বেদকে অমান্য করিয়াছিলেন বলিয়া কি প্রমাণ আছে? প্রাচীন বৌদ্ধশাস্ত্র পর্য্যালোচনা করিলে বরং দেখা যায় বৌদ্ধগণ প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন, পশুহনন-বৃত্তি বেদের অনুমোদিত নহে। তাঁহারা শাস্ত্রের নানারূপ ব্যাখা করিয়া স্বীয়মত

প্রতিপন্ন করিয়াছেন,—এরূপ শাস্ত্র ব্যাখ্যা হিন্দুধর্ম্মে বহুকাল যাবৎ চলিয়া আসিতেছে, বিধবা বিবাহ শাস্ত্র-সম্মত এবং বিধবা বিবাহ শাস্ত্র সম্মত নহে, বাদী প্রতিবাদী উভয়েই শাস্ত্রকে আশ্রয় করিয়াই তর্ক উত্থাপন করিতেছেন, পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে ও সপক্ষে সমস্ত যুক্তিই শাস্ত্রকে দোহন করিয়া প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে, সুতরাং পূর্ব্বোক্ত যুক্তি খুব বলবান বলিয়া মান্য করা যায় না, পশুহনন ব্যাপার যদি বেদসম্মত, তবে বৈষ্ণবগণকে হিন্দুধর্ম্ম হইতে এখনই খারিজ করিয়া দিতে হয়।

বৌদ্ধগণ অনেক সময়ে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের নিন্দা করিয়াছেন, কিন্তু হিন্দুধর্ম্মের অর্থ কি ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম? অন্ততঃ অতি পূরাকালে এই ভাবের সাম্প্রদায়িক নামে ভারতীয় ধর্ম্মকে অভিহিত করা হইত না, মহাভারতে এবং অপরাপর প্রাচীন ধর্ম্মপুস্তকে হিন্দুধর্ম্ম ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম প্রভৃতি সাম্প্রদায়িক নাম পাওয়া যায় না; ধর্ম্ম কি? বৈশম্পায়ণের নিকট ইহাই জন্মেজয়ের প্রশ্ন ছিল, ধর্ম্ম যাহা নিত্য সনাতন, তাহাই ভারতবর্ষের ধর্ম্ম, এদেশের সেই প্রাচীন ধর্ম্মকে যদি কোন সংজ্ঞায় অভিহিত করিতে হয় তবে তাহা আর্যধর্ম্ম উপাধি পাইতে পারে; বৌদ্ধধর্ম্ম সেই আর্য ধর্ম্মেরই একটী শাখামাত্র, এবং এই হিসাবে ইহা শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব ও গাণপত্য ধর্ম্মের পার্শ্বেই আর্য্যধর্ম্মের জ্যেষ্ঠ সন্তান বলিয়া স্থান পাইবে।

বিদ্বেষপ্রণোদিত নিন্দাবাদ উদ্ধৃত করিয়া পার্থক্য প্রতিপন্ন করিতে যাওয়া মিথ্যা; বৈষ্ণবগণ শাক্তদিগকে পাষণ্ড বলিয়া গালি দিতেন, বৈষ্ণব ইতিহাসে তাহার সহস্র প্রমাণ আছে; শাক্তগণ চৈতন্য, নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতকে ত্রিপুরাসুরের ত্রিমূর্ত্তিরূপে প্রতিপন্ন করিয়া গিয়াছেন, বটুকভৈরবের নিকট গণপতির প্রশ্ন পাঠ করিলে তাহা জানা যায়। সুতরাং বৌদ্ধ বিদ্বেষ দ্বারা ইহার স্বাতন্ত্র্য কিছুই প্রমানিত হয় না। যাবাদ্বীপের সুপ্রসিদ্ধ বলভদ্র মন্দিরে বৌদ্ধ ও হিন্দু দেবতা মূর্ত্তি একত্র রহিয়াছে,—সেখানে পূজকগণের মধ্যে কোন বিরোধ নাই, শাক্ত ও বৈষ্ণবগণ এখন এক মন্দিরেই পূজা দিয়া থাকেন, হিন্দু পুরোহিত বুদ্ধদেবের পূজক এবং শত শত বৌদ্ধ, হিন্দু পুরোহিতকে মান্য করিয়া বুদ্ধদেবের পূজা দিয়া আসিতেছে।

বৌদ্ধধর্ম্ম বহু স্থানে ব্যাপ্ত হইয়া পড়াতে উহাতে অনেক দেশের ধর্ম্মের প্রভাব পড়িয়াছিল, সেই সমস্ত বিদেশীয় উপকরণ সমেত ইহা পুনরায় আর্য্য ধর্ম্মের কুক্ষীগত হইয়া গিয়াছে, যে স্থান হইতে ইহা জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, সেই স্থানের ধর্ম্ম ইহাকে পুনরায় আত্মসাৎ করিয়া লইয়াছে। বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতীয়ধর্ম্ম হইতে ভিন্ন এই কথা

বলিয়া ঐতিহাসিকগণ অখণ্ডকে খণ্ডন করিতে চেষ্টা পাইতেছেন, আজ আমরা অনায়াসে মনে করিতে পারি, সমস্ত বৌদ্ধ জগত, হিন্দু ধর্ম্মের অন্তর্গত। চীনে দশমহাবিদ্যার পূজা হইতেছে, কালীমূর্ত্তি, ব্রহ্মার মূর্ত্তি চীনে জাপানের বৌদ্ধগণ নিয়ত পূজা করিতেছেন, হিন্দু ধর্ম্মেও আছে, বুদ্ধ স্বয়ং ভগবানের অবতার,—সনাতন আর্যধর্ম্মের শাখা প্রশাখায় কিছু পার্থক্য থাকিতে পারে, কিন্তু সে সমস্তই একজাতীয়; বৌদ্ধধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্ম হইতে কোন কালেও জাতিচ্যুত হয় নাই। বৌদ্ধযুগ বৌদ্ধধর্ম্ম, বৌদ্ধ ইতিহাস প্রভৃতি নাম কল্পনা করিয়া আমরা শুধু ঐতিহাসিক পাতক করিতেছি এমন নহে, ভিন্ন সংজ্ঞা দিয়া ঘরের লোককে বাহিরের বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চাহিতেছি, তাহাতে একটা নৈতিক অপরাধ আছে। বিদেশীদের প্ররোচনায় আমরা গৃহবিচ্ছেদের সূত্রপাত করিতেছি; মিঃ ওকাকুরা এই কথাটি স্মরণ করাইয়া দিয়া আমাদের মহৎ উপকার সাধন করিয়াছেন। সম্প্রতি নিবেদিতাও এইমত সমর্থন করিয়া প্রবন্ধাদি লিখিতেছেন।

শিখেরা কি হিন্দু ?

সম্প্রতি অমৃতসরস্থ স্বর্ণমন্দিরের মহান্ত ঐ মন্দিরে বহুদিবসাবধি যে সকল হিন্দুদেবপ্রতিমূর্ত্তি সংরক্ষিত ও পূজিত হইয়া আসিতেছিল তাহা বরখাস্ত করাতে পঞ্জাবের হিন্দুগণ বড়ই ক্ষুব্ধ হইয়াছেন। মহান্তর এই কার্য্যে এক ঘোর সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে—শিখসম্প্রদায় হিন্দুদিগের অন্তর্গত কি না। ভারতের ইতিহাসে এ প্রশ্ন উত্থাপন আজ নূতন নহে, বহুবার ইহা আলোচিত হইয়া গিয়াছে। পুনরায় স্বর্ণমন্দিরের অধিকারীর অবিমৃষ্যকারিতায় আবার সেই পুরাতন কথা উপস্থিত হইয়াছে।

সে দিন মহান্তর কার্য্যের প্রতিবাদের জন্য অমৃতসরস্থ "সনাতন ধর্ম্মসভা" যে সভা আহ্বান করিয়াছিলেন তাহাতে ঐ ধর্ম্মসভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত লালা হরবংশ লাল, শিখেরা যে হিন্দু তাহাই প্রতিপন্ন করিবার জন্য কতকগুলি প্রাচীন নজির দেখাইয়াছিলেন। তিনি প্রথমেই শিখসম্প্রদায়ের প্রধান ইতিহাসগ্রন্থ "সূর্য্য প্রকাশ" হইতে একটী ঘটনার উল্লেখ করেন। তিনি বলেন "আমরা যে প্রশ্ন মিমাংসার জন্য আজ একত্র হইয়াছি বহুদিন পূর্ব্বে সম্রাট আকবরের দরবারে তাহা একবার আলোচিত হইয়া গিয়াছে।"

"শিখসম্প্রদায়ের তৃতীয়গুরু—অমরদাসের সমসাময়িক হিন্দুগণ তাঁহার বিরুদ্ধে রাজদরবারে এক অভিযোগ আনয়ন করেন।"

অভিযোগের মর্ম্ম এইরূপ :—"আপনোং পনথ করহ বিখ্যাত বেদরীতী কো ত্যাগন করিয়ো। অউর মতি আপনোপর চরিয়ো" ;—আপনি এক নবধর্ম্ম প্রবর্ত্তন করিয়াছেন, বেদরীতী গায়ত্রী ত্যাগ করিয়াছেন। অর্থাৎ হিন্দুগণ বলিতে চাহেন যে, হিন্দুর অবশ্য পালনীয় গায়ত্রী যখন তিনি পরিত্যাগ করিয়াছেন তখন গুরু অমরদাস হিন্দু নহেন, তাঁহার প্রবর্ত্তিত শিখধর্ম্ম হিন্দু ধর্ম্মানুমোদিত নহে। সম্রাট আকবরের আহ্বানে গুরু অমরদাসের প্রতিনিধিস্বরূপ হইয়া, অমৃতসরের স্থাপয়িতা গুরু রামদাস সম্রাট দরবারে ঐ অভিযোগের প্রতিবাদের জন্য উপস্থিত হইলেন। সূর্য্যপ্রকাশে, এইরূপ বিবরণ আছে :—

"বোলে রামদাস সঙ্গ সাহ
পঠে গায়ত্রী হম তুম পাহ
অর্থ সমেত সুনাবহী সারী"
সভা কে বোচ পাঠ তিস পড়ে
পাপ পুন্য সভ ইন সির চড়ে

তাহার পরে রামদাস সর্ব্বসমক্ষে গায়ত্রীমন্ত্র উচ্চারণ করেন এবং তাহার সবিশেষ ব্যাখ্যা করিয়া সভাস্থ সকলকে মুগ্ধ করেন এবং দরবারে প্রকাশ করেন তিনি একজন পরম হিন্দু।"

"সম্রাট আকবর তখন, গুরু অমরদাসের উপর যে মিথ্যা অভিযোগ আরোপিত হইয়াছে বুঝিয়া দরবারে তাঁহাকে একজন অকপট হিন্দু বলিয়া সাব্যস্ত করেন। বহুদিন পূর্ব্বে, শিখদিগের হিন্দুত্ব এইভাবে প্রতিপন্ন হয়।

"শিখদিগের বিরুদ্ধে শুধু এইমাত্র প্রমাণ আছে তাহা নহে, ব্রিটিশ শাসনের প্রারম্ভে, শিখ ও হিন্দু সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা একবার লাহোরে একটি সভায় আহুত হন, সভার উদ্দেশ্য ছিল, শিখগণ পূর্ব্বে কোন্ সাম্প্রদায়িক আইনের দ্বারা শাসিত হইতেছিলেন তাহা সিদ্ধান্ত করা। তাহাতে স্থির হয়, শিখেরা হিন্দু, অতএব হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্রানুমোদিত আইনের দ্বারা তাঁহারা শাসিত হইবেন" (পঞ্জাব সিভিল কোড, তৃতীয় অধ্যায়।)

"পরে, ১৮১৭ খৃঃ অঃ শিখ সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিস্বরূপ হইয়া স্যর বাবা ক্ষেম

সিং বেদী এক মহতি সভায়, জাম্মুর মহারাজের সমক্ষে স্পষ্ট স্বরে স্বীকার করেন যে শিখেরা হিন্দু।

"১৮৯৮ খৃঃ অঃ পাতিয়ালার ভূতপূর্ব্ব মহারাজা রাজেন্দ্র সিং, ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট প্রদত্ত এক উপাধী গ্রহণকালে সেই সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন ;—কোন কোন স্থানে এরূপ গোলোযোগ উঠিয়াছে যে শিখেরা নিজেকে হিন্দু বলিয়া স্বীকার করিতে অসম্মত ; কিন্তু সেটী তাহাদের সম্পূর্ণ ভুল, শিখ সম্প্রদায় হিন্দু হইতে বিচ্ছিন্ন নহে, হইতেও পারে না। মহারাজা রাজেন্দ্র সিং একজন বিশিষ্ট শিখ, তিনি শিখ সম্প্রদায়ের যে একজন নেতৃপদযোগ্য ছিলেন তদ্বিষয়ে সন্দেহও নাই। তাঁহার উক্তি শিখেরা অমান্য করিতে পারেন না।"

সর্দ্দার দয়াল সিংএর সেদিনকার "উইল কেস" ও শিখগণকে হিন্দু প্রমাণিত করিয়াছে। প্রিভিকাউন্সেলে সর্দ্দার দয়াল সিংকে হিন্দু স্থির করিয়া এ উইল-মকদ্দমার নিষ্পত্তি হয়।"

লালা হরবংশ লাল যে কয়েকটী প্রমাণ দেখাইয়াছেন তাহা অতি সারবান। গুরু অমরদাস, দরবারে শত শহস্র জন সমক্ষে যখন নিজেকে হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিয়া গিয়াছেন তখন আধুনিক শিখগণ কি হিসাবে নিজেদের হিন্দুত্ব অস্বীকার করিবেন ? গুরু যাহা নিজের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, শিষ্যেরা তাহা পদে পদে বিধ্বস্ত করিবার প্রয়াস করিতেছেন ; এক্ষেত্রে আমরা শিখগণের গুরুভক্তির প্রশংসা করিতে পারিনা। পাঞ্জাব সিভিল কোডে শিখগণকে স্পষ্টস্বরে হিন্দু বলা রহিয়াছে, তাঁহারাও তদানুযায়ী আইন কানুনের দ্বারা শাসিত হইতেছেন ; তদ্ব্যতীত মহারাজা রাজেন্দ্র সিং, স্যর ক্ষেম সিং প্রভৃতি ইদানীন্তন শিখসমাজের প্রধান ব্যক্তিগণও নিজেদের হিন্দুত্বে সন্দিহান ছিলেন না। যে হিন্দুত্ব শিখদিগের রক্তে মাংসে মিশিয়া গিয়াছে শত চেষ্টা সত্ত্বেও তাহা বর্জ্জন করা অসম্ভব। শিখেরা এককালে হিন্দুধর্ম্ম সংরক্ষণের জন্য প্রাণপণ করিয়াছিলেন—গুরু অর্জ্জুন দেবের দৃষ্টান্ত তাহার জলন্ত প্রমাণ। গুরু টেকবাহাদুর, আরংজেবের হস্তে হিন্দু ও হিন্দুধর্ম্মের জন্য কি নির্য্যাতনই না ভোগ করিয়াছিলেন ; গুরু গোবিন্দ সিং চারিটি পুত্র বিসর্জ্জন দিয়া নিজেও অসীম কষ্ট স্বীকার করিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। পূর্ব্বতন শিখ গুরুদিগের জলন্ত হিন্দুপ্রীতি আমরা এই ভাবেই শিখ ইতিহাসে দেখিতে পাই। কিন্তু আজ তাঁহাদের শিষ্য বলিয়া যাঁহারা গৌরব করেন তাঁহাদের এ দারুণ হিন্দু-বিদ্বেষে—শিখ-ধর্ম্মে কলঙ্ক অর্পিত হইতেছে।

সমর্পণ।

আমার হৃদয় তোমার চরণে
তুমি যদি লহ টানিয়া
বারেকের তরে জীবন মরণে
কারণ লব না জানিয়া ;—
অনন্ত সাগর তটিনীরে টানে
আপনার হৃদে রাখিতে,
বায়ু গাহে মৃদু কুসুমের কানে
পরিমল তার মাখিতে ;—

তা'রা ত কখনো করেনা বারণ—
দেয় শুধু প্রাণ সঁপিয়া ;
শুনিব না আজি আমিও কারণ
দিব শুধু প্রাণ সঁপিয়া !

আমারো হৃদয়ে প্রেম আছে, শ্যাম,
তুমি যদি তাহা লহ গো—
শিরে করি তারে তবদ্বারে আমি
রেখে আসি তুমি কহ গো ;—

শুকতারা জ্বলে ধূসর ঊষায়
তোমার দীপ্ত শিয়রে ;
নবীন জীবনে নবীন ভূষায়
আমি দিব দান প্রিয়রে ;—

বৃথা এতদিন   দিব ব'লে কারে
ঘুরিয়াছি কত খুজিয়া ;—
আমার দেবতা   আমারি দুয়ারে—
আমি ভ্রমিয়াছি খুঁজিয়া !

আজি হেরি তোমা   সহসা দুয়ারে
প্রাণ উঠিয়াছে ভরিয়া ;
বুঝিতে পারিনা   কি দিলে তোমারে
যাবে অশান্তি হরিয়া ;—

তরুণ তপন   তোমারি কারণে
উদয় অচলে উঠে গো ;
শরতের ধরা   বন উপবনে
কুসুমের প্রায় ফুটে গো ;—
প্রীতি প্রেম দিয়া   বাকি সব আর
কার হেতু আমি রাখিব ?—
আমারেই সঁপি   চরণে তোমার
তোমারেই শুধু রাখিব।

শ্রীবীরেশ্বর মুখোপাধ্যায়।

আশা।

জন্মেছি তোমার কোলে, অয়ি মাতৃভূমি,
বেঁচে আছি লভি' তব স্নেহ অবিরল,
চোখে চোখে মোরে সদা রাখিয়াছ তুমি
ঘিরিয়া রেখেছে মোরে তোমার অঞ্চল।
সাঙ্গ যবে হ'বে খেলা, জীবন তপন
অস্তমিত হ'বে যবে পশ্চিম অচলে,
হে জননি শ্রান্তিহরা, জানি গো তখন
বিরাম লভিব তব স্নেহময় কোলে।
কি কাজ করিবে তব!—কোন্ উপহার
তোমার চরণে দিবে,—কি আছে সম্বল!
অযোগ্য পুত্রের, পরে তবু মা তোমার
স্নেহপূর্ণ আশীর্ব্বাদ আছে অবিচল।
তাই আশা জাগে হৃদে—যদি কভু পারি
মুছাতে আঁখির তব এক বিন্দু বারি।

শ্রীরমণীমোহন ঘোষ।

চীনদেশে।

চীনের বিরুদ্ধে পূর্ব্বপশ্চিমের সভ্যতাভিমানী জাতিগণ যখন রণদুন্দুভি পিটিয়া দিয়াছিলেন, তখন ইংরাজ রাজার তরফ হইতে ভারতীয় সৈন্য প্রেরিত হইয়াছিল। এবং তাঁহাদের আহার্য্য সংস্থান লইয়া আমাকেও সেই অজ্ঞাত সুদূর দেশে যাইতে হইয়াছিল। কারণ, আমি কমিসেরিয়েটের বড়বাবু ছিলাম।

যাত্রাকালে বৃদ্ধ পিতামাতার সজলনেত্রে শুভকামনা, তরুণী স্ত্রীর ক্লিন্নমুখে বিরহবেদনা আমাকে একটু কাতর করিলেও তখন আমারা প্রাণে আনন্দ ধরিতেছিল না। তাহার কারণ, গৃহচত্বরের কীট বাঙালীর জীবনে পরের পয়সায় এত দেশ ভ্রমণ ও আশ মিটাইয়া প্রকৃত যুদ্ধ দেখা বড় কম সৌভাগ্যের বিষয় নহে।

আমি বাল্যাবধি পর্য্যটনপ্রিয় ও কিছু বীরভাবাপন্ন ছিলাম। নভেলে প্রেমের সম্ভাষণ অপেক্ষা, ইতিহাসে বীরের অস্ত্রসম্ভাষণ আমার প্রিয়পাঠ্য ছিল। রাধাকৃষ্ণের ছবি অপেক্ষা কৃষ্ণার্জ্জুনের চিত্র আমার মনহরণ করিত।

দুর্ভাগ্যের বিষয় ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট বাঙালীকে যুদ্ধ করিবার সুখ হইতে বঞ্চিত রাখিয়াছেন। আমাদের কাণের কাছে শতবর্ষ ধরিয়া ভীরুত্বের অপবাদ ঘোষণা করিয়া করিয়া সাহস-ক্ষুণ্ণ ও মনকে সন্দিগ্ধ করিয়া তুলিয়াছেন। বাস্তবিক বাঙালী ভীরু কি না ইহা দেখিবার জন্য আমি ব্যগ্র হইয়া রণস্থলের দিকে চাহিতাম; যখন দেখিতাম সন্ধ্যার মলিনিমা উজ্জ্বল করিয়া "ছুটিল একটি গোলা লোহিত বরণ" তখন সে "আলোক পাইয়া আমি পুলকিত মন" না হইলেও হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়াটা যে স্বাভাবিক থাকিত তাহা আমি শপথ করিয়া

বলিতে পারি। কিন্তু যুদ্ধসন্দর্শন আমার ভাগ্যে প্রায়ই ঘটিত না, কারণ হতভাগ্য আমাকে খাদ্যপেয়ের প্রহরী হইয়া রণস্থল হইতে দূরে থাকিতে হইত। ব্যস্ততার পার্শ্বে আমার অলস জড়জীবন বড় কুশ্রী বোধ হইত। আমার এমন কেহ সঙ্গীও ছিল না যাহার সঙ্গে আলাপ করিয়া হৃদয়ভার লঘু করিতে পারি।

আমার এক সঙ্গী ছিলেন লিয়াংফু। ইনি একজন চীনা ভদ্রলোক। ইংরাজেরা ইঁহাকে গোয়েন্দারূপে সংগ্রহ করিয়াছিলেন। প্রথম দর্শনেই লোকটার পরিচয় পাইয়া অবধি সে আমার চক্ষুশূল হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। মনে মনে তাহাকে বলিতাম 'ওরে স্বদেশদ্রোহী ঘৃণ্যজীব, কোন্ স্বার্থের জন্য স্বদেশ ও স্বজাতিকে বিদেশীর কাছে বলি দিতেছিস্। বাঙালী যে ভুলের প্রায়শ্চিত্ত-আয়োজন করিতেছে, আবার তোরা সেই ভুল করিতে চাস্। তোকে ধিক্, শত ধিক্!'

লিয়াংফু কিন্তু আমার সঙ্গে মিশিবার জন্য খুব চেষ্টা করিত। প্রশ্নপরম্পরায় আমাকে উত্যক্ত করিয়া তুলিত। সে যত আমাকে বিরক্ত করিত, আমার মুখ তত বন্ধ হইয়া যাইত। তখন ভায়ার ছোট ছোট গোল-গোল চোখ দুটি বনবিড়ালের চোখের মত জ্বলিয়া উঠিয়া ভয়ঙ্কর দেখাইত।

আমাদের তাঁবুতে মধ্যে একটা বড় ঘর ও দু পাশে দুটা ছোট কুঠরী ছিল। একটা কুঠরা আমার ও অন্যটা লিয়াংফু ভায়ার অধিকারে ছিল। লিয়াংফুভায়া প্রায়ই আমার কামরায় আসিয়া আমার কাগজপত্র ঘাঁটিয়া, বাংলা শিখিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিয়া বড় উৎপাৎ করিত। আমি তাহার ঘরে কদাচিৎ যাইতাম। উভয়ের কুঠরীর মধ্যে বড় ঘরটিতে আমার আপিশ ছিল ও আশেপাশে নানাবিধ খাদ্য ও অখাদ্য দ্রব্য ছড়ান থাকিত।

তাঁবুতে দরজা আঁটিবার যো নাই। পরদা ফেলাই চরম আবরু।

লিয়াংফুভায়া প্রায় পর্দ্দা ফেলিয়া কি লেখা পড়া করিত। আমি স্বাভাবিক কৌতূহলে মাঝে মাঝে উঁকি মারিতাম। প্রায়ই দেখিতাম ভায়া তুলিচিত্রিত কতকগুলি পাতলা কাগজ ঘরের উনানের মধ্যে ফেলিয়া দিয়া একখানা কাগজ চিঠির আকারে ভাঁজিয়া লইয়া বাহিরে যাইবার আয়োজন করিতেছে।

সে বাহিরে গেলে আমি দূরে দূরে থাকিয়া তাহার অনুসরণ করিতাম। ভায়া আমার নিকট কেমন রহস্যময় হইয়া উঠিয়াছিল। স্বদেশদ্রোহীকে বিশ্বাস কি?

আমি অনুসরণ করিতাম বটে কিন্তু সে বনবিড়ালের মত তিন লম্ফে বনান্তরালে অদৃশ্য হইয়া যাইত; আমি অপ্রতিভের মত পায়ের লতা, কাপড়ের কাঁটা ছাড়াইতে ছাড়াইতে ও পাথরে টোক্কর খাইতে খাইতে কোন মতে শিবিরে ফিরিয়া আসিতাম।

একদিন দেখিলাম লিয়াংফুভায়া কি লিখিতে লিখিতে লেখার উপর ব্লটিং কাগজ চাপা দিয়া তাহার উপর মাথা রাখিয়া বড় কাঁদিতেছে। এদিকে হাতের কালীমাখা তুলিটা তাহার গালে দিব্য চীনা অক্ষর রচনা করিতেছিল। ভায়ার সেদিকে লক্ষ্য ছিল না। ক্ষণেক পরে মসিলিপ্ত কপোলে, সৈনিকদের বিদ্রূপহাস্যে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া, বাহির হইয়া গেল। আমি সেদিন সঙ্গে গেলাম না। ভায়ার কামরায় প্রবেশ করিয়া দেখিলাম ব্লটিং কাগজের শুভ্র কলেবরকে উল্কিচিত্রিত করিয়া বহু চৈন অক্ষর সোজা কাৎ হইয়া বসিয়া শুইয়া আছে। একখানা আয়নার সাম্‌নে ব্লটিং কাগজখানা ঘুরাইয়া ফিরাইয়া উল্টা অক্ষরের সোজা প্রতিচ্ছায়া হইতে অনেক অসংলগ্ন কথা বাহির করিয়া ফেলিলাম। মন আহ্লাদে নৃত্য করিয়া উঠিল। অহো দারুণ বিধাতা, আমার অদৃষ্টে যদি রণসম্ভোগ না লিখিয়াছিলে তবে সুলতানের অন্দরে খোজা প্রহরীর মত আমায়

শুধু তাহা আগলাইবার ভার কেন দিয়াছ! এর চেয়ে প্রত্নতত্ত্বের শিলোৎকীর্ণ অদ্ভুত লিপি পাঠ করিতে দিতে, বা বঙ্গের প্রধান ডিটেক্‌টিভের পদ শোভা করিতে দিতে!

যাহা হউক, দগ্ধ অদৃষ্টের জন্য নিষ্ফল বিলাপ না করিয়া অসংলগ্ন বাক্যগুলিকে সংলগ্ন করিয়া অর্থবোধের চেষ্টা করিতে লাগিলাম। 'প্রিয়টিশি', 'বসন্তোৎসবের সময়', 'কমিশেরিয়েট বাবুর তাঁবু', 'আগুন', 'বারুদ' প্রভৃতি অর্থসম্বন্ধ কথা হইতে ভায়ার চিন্তাপ্রণালীর একটা থেই ধরিতে পারিলাম না। চীনপ্রবাসে তদ্দেশীয় ভাষায় আমার যে অধিকার জন্মিয়াছিল তাহাতে অতিকষ্টে বুঝিলাম, 'টিশি' অর্থে 'সুন্দরী'। ভায়ার প্রাণেও প্রেম আছে দেখিতেছি; এই প্রেমের পশ্চাতে মস্ত একটা কিন্তুও আছে বোধ হয়।

রুষ্টরুষ মাঞ্চুরিয়া দখল করেন দেখিয়া অন্যান্য রাজাগণ চীনের প্রতি অসীম দয়া প্রকাশ করিয়া শান্তি ঘোষণা করিলেন। বীরগণের অস্ত্র-সম্ভাষণ থামিয়া গিয়াছে, এখন আমরা অবাধে সর্ব্বত্রই প্রায় বিচরণ করিতাম। যুদ্ধ দেখার সাধ যখন মিটিয়া গেল, তখন গৃহে ফিরিবার জন্য প্রাণটা বড় ব্যাকুল হইয়া উঠিল। আমাদের ছাউনি কুয়েনলুন পর্ব্বতের প্রত্যন্ত প্রদেশে ছিল। কি দারুণ শীত! চারিদিকে শুধু পাথর, গাছ-পালা, জঙ্গল। আমি এখানে একখানা "যাহোক-কিছু-একটা-দূতকাব্য" লিখিয়া ফেলিতে পারিতাম, কিন্তু অস্ত্ররণরণিভীতা কবিতাবধূ বঙ্গের নিরাপদ আম্র-মুকুলসুরভিত কুঞ্জের জন্য অপেক্ষা করিয়াছিল। কিন্তু সহসা শান্তিমন্ত্র উচ্চারিত হইবামাত্র, নৃশংস হত্যা বন্ধ হইবামাত্র কবিতার কোমল প্রাণে আনন্দের যে ঝঙ্কার সাড়া দিব দিব করিতেছিল, তাহা বাড়ীর এক পত্রে একেবারে নির্ব্বাপিত করিয়া দিয়াছিল। সংবাদ পাইলাম আমার পত্নী প্লেগ কবলিত হইয়াছেন। আমি বৃদ্ধ একথা স্বীকার না করিলেও সেই

তরুণী যে আমার "প্রাণেভ্যোঽপি গরীয়সী" ছিল তাহা স্বীকার করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠা বোধ করিতেছি না। কিন্তু সকলের আনন্দের মধ্যে আমার ক্রন্দনটা অশোভন হইবে বলিয়া দরাীমুখোচ্ছ্বসিত উৎসমুখে আপাতত পাষাণ চাপা দিয়া রাখিলাম। কোন অবকাশে জল যে একেবারে উদ্গলিত হইত না, এমন বলিতে পারি না।

আমি শোকার্ত্ত মনকে ব্যাপৃত রাখিবার জন্য পঞ্চামুনি, বুদ্ধ প্রভৃতি দেবমন্দির ও লামা সন্দর্শনে যাইতাম। একদিন বৈকালে বেড়াইতে বাহির হইয়া বহুদূর গিয়া পড়িয়াছিলাম। মন যখন নিজেকে লইয়া ব্যস্ত থাকে তখন অপর ইন্দ্রিয় বা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কত দূর কি করিল তাহার বড় একটা হিসাব রাখে না। সহসা একটা কোলাহল আমার চমক ভাঙ্গিয়া দিল। দেখিলাম, বিস্তীর্ণ হরিৎ প্রান্তর। দূরে একটি চীনা রমণী ক্রন্দনরতা এবং কয়েকজন চীনা ও য়ুরোপীয় যুদ্ধরত। যুদ্ধাবসানে মৃতাবশিষ্ট কয়েকজন চীনা, প্রতিহিংসার লেলিহান্ সঙ্গিন-জিহ্বা বিস্তার করিয়া আমার দিকে ছুটিয়া আসিতে লাগিল। আমিই যে উহার লক্ষ্য তাহা আমি বুঝিতে পারি নাই। পশ্চাতে রমণীকণ্ঠে ধ্বনিত হইল, 'বিদেশী, পলাও'। আমি ফিরিলাম, রমণী হস্তসঙ্কেতে তাহার অনুবর্ত্তী হইতে আদেশ করিল। যে দিকটায় দৌড়িলাম, সে দিকটায় বড় ঘন বন, প্রাণের ভয় ব্যতীত সে পথে আমি এক পাও অগ্রসর হইতে পারিতাম না। কিছুদূর যাইয়া একখানি কুটীর দেখিলাম। রমণী আমাকে তন্মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দ্বারোপান্তে উপ-লাসনসন্নিবিষ্ট হইয়া, ফুল ছিঁড়িয়া মাথায় কাণে পরিতে লাগিল আর গান ধরিয়া দিল। বিদেশী সঙ্গীত, দুর্ব্বোধবাক্যের মধ্যে কল্পনা জড়িত কি এক ভাব আমার মনে আনিয়া, আমাকে বড় মুগ্ধ করে; তাই আমার দেশে সামান্য গাড়োয়ানের কর্কশ কণ্ঠে হিন্দীগানও আমাকে বড় প্রীতি দেয়। আমি চীনা রমণীর কণ্ঠসুধা পান করিতে লাগিলাম।

অবোধ্যগানের কল্পিত অর্থে আমার চিত্ত হারাইয়া গেল। কতক্ষণ যে ঘরে বদ্ধ ছিলাম বুঝিতে পারি নাই।

কিছুক্ষণ পরে একজন চীনা আসিয়া রমণীকে জিজ্ঞাসা করিল, "টিশি, এদিকে একজন বিদেশীকে দেখেছ?" টিশি গান থামাইয়া বলিল 'কৈ? না।' পুরুষটা চলিয়া গেল। টিশির কণ্ঠ আবার বায়ুতরঙ্গে মদিরা ঢালিয়া দিতে লাগিল। এ ইকি লিয়াংফু ভায়ার টিশি?

আমি গৃহে ফিরিবার কথা ভুলিয়া গিয়াছি। টিশিরও কণ্ঠের বিরাম নাই। আবার একটা লোক আসিল, গান থামিয়া গেল, আমি অথণ্ড মনোযোগ দিয়াও তাহাদের অস্ফুট আলাপ শুনিতে পাইলাম না। কপাটের ফাঁকে চোখ দিয়া অতি কষ্টে দেখিলাম আগতপুরুষ স্বয়ং লিয়াংফুভায়া। ভায়া যাইবার সময় অপেক্ষাকৃত শ্রবণসক্ষম উচ্চস্বরে বলিয়া গেল, 'এই চিঠিতে শেষ উপদেশ দিলাম; ধরা পড়ার ভয়ে নিত্য নূতন মতলব করিতে হইতেছে।' টিশি কিছু বলিল না।

টিশি আমার নিকটে আসিল। আমি ধন্যবাদ জানাইলাম। আমি যে লিয়াংফুকে চিনিতে পারিয়াছি তাহা বলিবার জন্য আমার প্রাণ আকুল ব্যাকুলি করিতে লাগিল। আমি সংবৃত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, 'তুমি এখানে একলা থাক'? টিশি ঘাড় নাড়িয়া হাসিয়া বলিল 'না'। আমি ঐ হাসিটুকু ভাষায় অনুবাদ করিয়া বলিলাম, 'তোমার স্বামী থাকেন'। টিশি রজত-ঘণ্টার মত মধুরহাস্যে মুখর হইয়া বলিল 'আমি কুমারী'। আমি অনুবাদের ভ্রম সংশোধন করিয়া তাড়াতাড়ি বলিলাম, 'যিনি এখন তোমার সহিত কথা কহিয়া গেলেন, তিনিই তোমার প্রণয়ী, ভাবীস্বামী'। এবার টিশি আমাকে হাস্যতরঙ্গে প্লাবিত নিমজ্জিত করিয়া দিল। অনেক কষ্টে একটু দম

লইয়া বলিল, 'ও আমার ভাই'। হরি হরি! আমার সব রোমান্স মাটি হইয়া গেল। আমি অপ্রতিভ হইয়া প্রসঙ্গ চাপা দিবার জন্ম বলিলাম, 'টিশি, রাত্রি হইয়াছে, আমি যাই। যতদিন বাঁচিব, আমার কৃতজ্ঞতা, বাঁচিয়া ব্যক্ত করিবার অবকাশ পাইয়াছে বলিয়া, এই বনবাসিনী টিশির পদপ্রান্তে লুণ্ঠিত হইবে'! টিশি বড় গম্ভীর হইয়া পড়িল। দেখিলাম টিশি সকল অবস্থাতেই বড় মনোরম, তাহার নাম অন্বর্থ হইয়াছে। টিশি বলিল, 'আজ তোমায় বাঁচাইয়াছি, কাল হয় ত তোমার মৃত্যু ঘটাইব। যতদিন না দেশে ফিরিয়া যাও কৃতজ্ঞতা জানাইও না'। টিশির প্রত্যেক কথায় এমন একটা মোহিনী ছিল যে আমি তাহার মাদকতায় বিহ্বল হইয়া পড়িলাম। আমি বলিলাম 'টিশি, তোমার মত কোমলহৃদয়া কখন কাহারো মৃত্যুর কারণ হইতে পারে না।' গম্ভীরা টিশি শুধু একটু হাসিল। রমণী! তুমি চিরদিনই জটিল রহস্যময়ী। টিশি বলিল, 'তর্কে প্রয়োজন নাই, দেশে ফিরিবার ইচ্ছা থাকিলে বসন্তোৎসবের রাত্রে শিবিরে থাকিও না'। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কেন টিশি'। টিশি আবার গম্ভীর হইয়া বলিল, 'আমি ঐ টুকু বলিয়াই আমার অধিকার-বহির্ভূত ও কর্ত্তব্যবিরুদ্ধ কার্য্য করিয়াছি। আর কিছু বলিব না, চল তোমায় বনের বাহিরে রাখিয়া আসি'।

শিবিরে ফিরিয়া সে রাত্রিতে আর ঘুম হইল না। নানা অদ্ভুত জটিল চিন্তায় রাত্রি কাটিয়া গেল। আমার প্রত্নতাত্ত্বিক গর্ব্ব খর্ব্ব হইয়া গেল। লিয়াংফুভায়াকে অধিকতর রহস্যাবৃত বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

এখন কি কর্ত্তব্য? কাপ্তেন সাহেবকে বলিব? তাহাতে যদি আমার প্রাণদাত্রী টিশির কোন বিপদ হয়? তাহার নাম বাদ দিয়া বলিলেও যদি ঘটনাসূত্রে সেও জড়িত হইয়া পড়ে? মহা বিপদ,

টিশি উৎসব রজনীতে বাহিরে থাকিতে বলিয়াছে। সেই রাত্রে শিবিরে কোন বিপদ সম্ভাবনা। দূর হোক্, যাহা হইবার হইবে, শোকক্লান্ত মনে আর ভাবিতে পারি না।

উৎসবের দিন আসিল। সন্ধ্যা হইয়া গেল। আটটা বাজিল। এখনো কোন সূত্র বাহির করিতে পারিলাম না। সকলে উৎসবরত, আমি এ কি চিন্তায় পড়িলাম! বাহিরেই যাইব, না, কাপ্তেন সাহেব-কে খবর দিব? উন্মনস্কভাবে বাহিরে যাইতে দেখিলাম, সম্মুখে একজন চীনা। লিয়াংফু মনে করিয়া উপেক্ষাভরে চলিয়া যাইতে দেখিয়া চীনা বলিল 'বিদেশী, তুমি শিবির ছাড়িয়া যাও নাই'? এমন মিষ্টস্বর তাহার চৌদ্দপুরুষে কাহারো ছিল না। এ স্বর টিশির। টিশির পুরুষের পরিচ্ছদ। বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম 'টিশি তুমি এখানে'?

টিশি বলিল, 'লিয়াংফু আমার ভাই। সে তোমাদের নীচ গোয়েন্দা নহে; সে জননীজন্মভূমির লাঞ্ছনার প্রতিশোধপরায়ণ, আমরা সকল অত্যাচারীকে ধ্বংস করিতে কৃতসঙ্কল্প'।

আমি বিস্ময়বিস্ফারিত নয়ন টিশির মুখের উপর স্থাপন করিলাম, বুঝিলাম সে মুখে রহস্যের আভাসমাত্র নাই। তখন বলিলাম, 'মাত্র তোমরা দু'টিতে এই বিপুলসৈন্য কিরূপে ধ্বংস করিবে?'

টিশি বলিল, 'লিয়াংফু সকল তাঁবুতে ডিনামাইট ও বারুদ লুকাইয়া রাখিয়াছে, উৎসবমত্ত প্রহরীগণ তাহা লক্ষ্য করে নাই। এখন শুধু একটি দেশালায়ের স্ফুলিঙ্গ'। টিশির হাতে একটা দেশালাই খস খস করিয়া উঠিল।

আমি আশ্চর্য্য হইয়া বলিলাম, 'তোমরা শুদ্ধ মারা যাবে যে'?

টিশি হাসিয়া বলিল, 'আমাদের মৃত্যুতে কাহারো ক্ষতি নাই, দেশের পরম লাভ। পরের পাদুকালেহী তোমরা, দেশের জন্য মৃত্যুর

অনির্ব্বচনীয় সুখ বুঝিতে পারিবে না। তুমি এখন পলাও, আমার বিলম্ব হইতেছে'।

আমি বলিলাম, 'আমি যদি তোমায় আগুন দিতে না দি'? টিশি অনায়াসে বলিল 'কটিবন্ধের ছোরা নিঃশব্দে তোমার রক্তপান করিবে'।

আমি হাসিয়া বলিলাম, 'পারিবে'? আমি বুঝিয়াছিলাম টিশি আমায় ভালবাসিয়া ফেলিয়াছে। বিধাতা আমার অদৃষ্টে কমিশেরিয়েটের বাবুত্ব লিখিলেও আমার চেহারাখানা কালীঘাট বা অর্টষ্টুডিয়োর ছবির আদর্শে বিদ্রূপের তুলিতে অঙ্কিত করেন নাই।

টিশি বলিল, 'তুমি শিবির ছাড়িয়া যাও'।

আমি হাসিয়া বলিলাম, 'যাইব না, তুমি আগুন দিতে পার দাও'।

টিশি কাঁদিয়া ফেলিল। বড় অভিমানের স্বরে পাতলা লাল ঠোঁট দুখানি উল্টাইয়া উল্টাইয়া বলিল, 'তোমার প্রাণরক্ষা করিয়াছিলাম, আজ বেশ ঋণশোধ করিলে। লিয়াংফু যখন জানিবে, আমি অগ্নিসংযোগ করিতে পারি নাই, মূঢ়া নারীর দৌর্ব্বল্যহেতু একজন বিদেশীর নিকট অবহেলে পরাজিত হইয়াছি, তখন আমার মৃত্যু নিশ্চিত। কিন্তু সে মৃত্যু শ্লাঘ্য নহে'।

আমি লজ্জিত হইয়া বলিলাম, 'টিশি ক্ষমা কর। এতগুলি লোকের প্রাণ বিপন্ন করিয়া আমি আমার তুচ্ছ প্রাণ রক্ষা করিতে পারিব না; সকলের প্রাণরক্ষা করিয়াও তোমাকে বিপন্ন করিতে পারিব না। তোমার সহিত আমিও মরিব। তুমি আগুন দাও'।

টিশি আমার মুখের দিকে চাহিয়া একটু চিন্তা করিয়া বলিল 'বেশ'।

আমাদের পরামর্শ শেষ হইতে না হইতেই একটা ভয়ঙ্কর কোলাহল হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে কাপ্তেন সাহেব ও আরো কতকগুলি লোক

আসিয়া আমাদের পথরোধ করিয়া দাঁড়াইল। আমি একটু থতমত খাইয়া গেলাম; টিশি স্থির গম্ভীর। আমি তাড়াতাড়ি টিশির হাত হইতে দিয়াশালাইটা লইয়া নিঃশব্দে আমার পকেটে ফেলিয়া দিলাম। কাপ্তেন সাহেব বলিলেন, 'বাবু আজ বড় বিপদ; সব তাঁবুতে তাঁবুতে ডিনামাইট ও বারুদ ছড়ান। লিয়াংফু আমাদের মিত্র নহে শত্রু; সে যখন আগুন দিবার উপক্রম করে তখন কয়েকজন সৈনিকের দৃষ্টিতে পড়ে; তাহারা নিরস্ত্র ছিল; তাহাকে ধরিতে গিয়া আহত হইয়াছে; সে পলায়ন করিয়াছে। আমি সকল তাঁবুতে সাবধান করিয়া দিতেছি, যতক্ষণ পর্য্যন্ত না তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া সকলগুলি বিস্ফূর্জ্জ স্থানান্তরিত হয় ততক্ষণ পর্য্যন্ত যেন কোন অগ্নি প্রজ্জলিত না হয়'। তৎপরে টিশির দিকে ফিরিয়া বলিলেন 'এ কে'?

আমি বলিলাম, 'ইনি আমার একজন আলাপী, ইনি স্ত্রীলোক; আমাদের বিপদের কথা শুনিয়া আমাকে সতর্ক করিতে আসিয়াছিলেন। আমরা এই আপনার উদ্দেশেই যাইতেছিলাম।'

টিশি অধর দংশন করিল।

কাপ্তেন সাহেব টিশিকে ধন্যবাদ দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আপনার কোন উপকার করিতে পারি?'

টিশি রোষে ক্ষোভে নিরুত্তর। আমি বলিলাম 'ইনি আমাদের সতর্ক করিয়া স্বদেশের বিরাগভাগিণী হইয়াছেন। ইঁহাকে আমাদের আশ্রয় দিতে হইবে।'

সাহেব উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, 'সে ত অবশ্য। আর কিছু'। আমি হাসিয়া বলিলাম, 'ভাগ্যে আমার সহিত ইঁহার আলাপ হইয়াছিল, তাইত ইনি আমাদের সতর্ক করিতে আসিয়াছিলেন। আমার জন্য আজ ইনি বিপন্না, ইঁহার ভার আমার প্রতি বক্শিশ করিয়া অনুগৃহীত করুন।'

সাহেব হাসিয়া বলিলেন, 'কেন ? তুমি ইহাঁকে লইয়া কি করিবে ? তোমরাত ভিন্নজাতির সংস্পর্শ পর্য্যন্ত ভয় কর।'

আমি বলিলাম, 'সাহেব, আমার যদি সেই ভয়ই থাকিত, তবে সাধ করিয়া হিন্দুর নিষিদ্ধ খাদ্য সরবরাহ করিতে এই চীনামুলুকে আসিতাম না। আমি সম্প্রতি বিপত্নীক হইয়াছি। ইহাঁকে দেশে লইয়া গিয়া পুনরায় সপত্নীক হইব ইচ্ছা করি।'

সাহেব খুব হাসিলেন। টিশি লজ্জায় মুখ নত করিল। আনন্দে আমার চিত্ত ভরিয়া গেল। এবং আমার রুচি দেখিয়া বোধ হয় পাঠকের নাসিকা কুঞ্চিত হইয়া উঠিল।

শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

মহানাটক।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

পথে পরশুরামের সহিত সাক্ষাৎকার।

সেই ধনুর্ভঙ্গ হ'তে বিষম ভৈরব ধ্বনি
স্বর্গমর্ত্ত্য কাঁপাইয়া হইল নিঃসৃত।

প্রলয় মারুতোদ্ভূত কল্পান্ত-অনল-সম
জামদগ্ন্য-রোষানল হ'ল প্রজ্জ্বলিত।
অমনি সহসা মুনি রামের নিকটে আসি
হৈলা উপস্থিত॥

রবি-বিম্ব-বিনির্গত রক্তচ্ছটা-সম যাঁর
দৃষ্টি রোষদীপ্ত,
ক্ষত্র-কণ্ঠ-চ্যুত রক্তে অদ্যাপি কুঠার যাঁর
রহিয়াছে সিক্ত,

তীব্র ভাবে প্রবাহিত নিঃশ্বাস-পবন যাঁর
ভুবন-উৎপাৎ পুন করিছে সূচিত,
টঙ্কারিয়া ধনুর্গুণ ত্রিলোক-বিজয়ী সেই
জামদগ্ন্য হেথা দেখ আসি উপনীত॥

শিখা-স্পৃষ্ট-কঙ্কপত্র তূণদ্বয় পৃষ্ঠে আলম্বিত;
স্নিগ্ধ পূত ভস্মচিহ্নে বক্ষদেশ হয় অলঙ্কৃত;
রুরু-হরিণের চর্ম্মে হইয়াছে অঙ্গ আচ্ছাদন;
মৌঞ্জী-মেখলায় বদ্ধ অধোবাস মাঞ্জিষ্ঠা-বরণ;
পাণিতে কার্ম্মুক শোভে, অক্ষমালা, পিপ্পলের দণ্ড
—ওই দেখ আসিছেন জামদগ্ন্য তাপস প্রচণ্ড॥

আজন্ম ব্রহ্মচারী   স্থূল-ভুজ-স্তম্ভে শোভে
ধনুর্গুণ-আঘাতের চিহ্ন সারি সারি।
সমস্ত ধরণী-চক্র   করিয়াছিলেন জয়
—প্রশংসা-অক্ষর-লিপি যেন গো তাহারি।
ঘন-অস্ত্র-ব্রণ-কিণ   —বক্ষ তাঁর সুকঠিন,
সেই বক্ষে দিয়া শান্   তীক্ষ্ণীকৃত যাঁর বাণ,
ক্ষাত্রনৃপ মৃগরূপী   —সে শিকারে যে কৌতুকী
সেই মুনি সুনিশ্চিত   এবে হেথা উপস্থিত॥
সপ্তসিন্ধু সহ মহী   কার্ত্তবীর্য্য হ'তে যিনি
করিলা অর্জ্জন,
পিতৃবধ-জাত কোপে   ঘোর রণে কণ্ঠ তার
করিয়া ছেদন
কুঠার আঘাতে, যার   সবেগে সহস্র বাহু
করেন খণ্ডন;
—যে সহস্র বাহু দিয়া কার্ত্তবীর্য্য বীর
নিরোধ করিয়াছেন রেবা-নদী-নীর॥

(ক্রোধোদ্দীপ্ত পরশুরাম সন্দিগ্ধ হইয়া, এই হরধনু কোন্ ব্যক্তি ভগ্ন করিল ইহা বারত্রয় বলিলেন)

জামদগ্ন্য।—নিজ-পতি-অস্ত্র বলি'   পার্ব্বতী অর্জ্জিল যারে
প্রীতির সহিত;
যাহারে সাদরে নন্দী   বাসুকীর নির্ম্মোকে
করে আচ্ছাদিত;
ত্রিপুর-ইন্ধন যাহা   —সেই শঙ্করের ধনু
আমি বিদ্যমানে
সে কিনা করিল ভগ্ন   যে জন এ পৃথিবীতে
খ্যাত রাম নামে॥
গর্ভ-হতে বার করি,   খণ্ড খণ্ড করিয়াছি
ক্ষত্রিয়-সন্তান।

এক-বিংশতিবার ক্ষত্র-হীন করিয়াছি
এই ধরাধাম ;
সেই সে ক্ষত্রিয়-রক্তে পিতৃ-হ্রদ সংস্থাপিয়া
ক্রোধানল করেছি নির্ব্বাণ।
এ মোর প্রভাব যাহা জানে ভাল সর্ব্বজন
জান নাকি তুমি তাহা রাম ?
যে ভাঙ্গে হরের ধনু থাকিতে ধরণীমাঝে
এ পরশুরাম,
মোর যশচন্দ্রমারে করে যেই আচ্ছাদিত
কোথা সেই রাম ?

শ্রীরাম।—(সানুনয়ে)

আপনার বাহুবল কিম্বা হরধনু-বল
—কিছুমাত্র মোর কাছে
নহেক বিদিত ;
—সুতরাং অপরাধী ; ক্ষম' এই অপরাধ,
বালক-চেষ্টায় কিগো
গুরুজন নহেন হর্ষিত ?

দেখুন ভগবন্ !—

ছুঁইতে না ছুঁইতেই, হরধনু খানি
ভাঙিল আপনা হতে—কি করিব আমি ?
রত্নহার কি কুঠার যাই কণ্ঠে করি না গ্রহণ ;
জল কি কজ্জল নেত্রে ধরুক মোদের নারীগণ ;
যম কি স্বজন-মুখ যাই দেখি, নাহি তাহে ক্ষতি ;
তবু না প্রকটি মোরা বীরদর্প ব্রাহ্মণের প্রতি।
গো ব্রাহ্মণ বধ করা রঘুবংশী জনদের
নহেক বিহিত ;
শোনো গো পরশুরাম ! কুঠারে কাটো এ কণ্ঠ,
—কর যথোচিত॥

(রামের সহিত পরশুরাম যুদ্ধ করিতে উদ্যত হইলে)

ক্ষমা কর মুনি !

হে ব্রাহ্মণ! তব সহ যুদ্ধ করা দূরে থাক্
নাহি কহি সংগ্রামের কথা;
হীনবল মোরা সবে সর্ব্ব-বলবান-মাঝে
তোমরা যে উচ্চতম মাথা।
রাজন্যের বল—এই এক-গুণ ধনুকই কেবল
আর নবগুণযুক্ত উপবীত ব্রাহ্মণের বল।
স্ত্রীগণের মাঝে যিনি অদ্বিতীয় বীরের জননী
তোমারো জননী সেই দেবী ভগবতী।
তব বাহু-বশীকৃত হলেন কার্ত্তিক যবে,
তাঁর মুখ দেখি হয়ে লজ্জান্বিতা অতি,
তবসম পুত্রলাভে
হল তাঁর স্পৃহা বলবতী॥

লক্ষণ।—(পরশুরামের প্রতি সক্রোধে)

আজ হতে আর্য্য রাম নহেন অগ্রজ মোর,
তাঁহা হতে হইলাম
স্বতন্ত্র আমি অতঃপর।
রঘুকুল নৃপগণ যাহাই বলুন মোরে
দুষ্ট দ্বিজ দমনার্থ
হব আমি বদ্ধ-পরিকর॥
দিনকর-কুলে রাম শ্রোত্রিয় ক্ষত্রিয় হ'তে
লভেছে জনম;
বিশ্বামিত্র ঋষি হ'তে জৃম্ভকাদি দিব্য-অস্ত্র
করেছে গ্রহণ;
সেই বংশে পাছে লোকে করে মোর অপযশ
তাই গুরু ব্রাহ্মণের প্রতি
অস্ত্র উঠাইতে আমি সঙ্কুচিত অতি॥

পরশুরাম।—(শ্রীরামের প্রতি)

হর-ধনু ছিল ভগ্ন হর-ভুজ-নিপীড়ন-বলে ;
তুমি ত নিমিত্ত মাত্র —তব বীর্য্য কোথা এই স্থলে ?
এ ধনু "গরুড়-ধ্বজ" —যাতে আমি ক্ষত্রগণে
করিনু সংহার
কর দেখি আকর্ষণ, তাহ'লে বুঝিব, কত
শকতি তোমার ॥

সেধনু উঠায়ে রাম জুড়ি শর তায়
করিলেন আকর্ষণ মুহূর্ত্তে হেলায়।
সাক্ষাৎ কন্দর্প সম হল তাঁরে বোধ,
ভার্গবের হল সদ্য স্বর্গ-গতি-রোধ ॥

তাড়কারি রামচন্দ্র আকর্ষিলে সেই ধনু,
জনক-দুহিতা সেই সীতা
—অপাঙ্গ-আরক্ত-আঁখি—
মনোভাব লুকাইয়া দেখেন ঈরিষা-ভরে,
—পুনঃ অন্য কন্যাসনে
পরিণয় হয় নাকি ॥

এই বীর জামদগ্ন্য যুঝি' কার্ত্তবীর্য্য-সনে
সহস্র সংখ্যক বাহু
ছেদিল তাহার।
কিন্তু তব করস্থিত ওই শর নিরখিয়া
ব্রাহ্মণ্যে অনুরক্ত
হইল আবার ॥

ধূর্জ্জটির ধর্ম্মপুত্র সেই সে পরশুরাম
—ক্ষত্রিয়-শোনিত-ক্ষুন্ন যাহার কুঠার
করিল পিচ্ছিল অতি সসাগরা বসুমতী,
ত্রিলোকে অভয় দান যে করিল আর,

তাঁর পদ কে করিতে পারিত গো অধিকার
যদি না এ রামচন্দ্র
সূর্য্য-বংশ অবতংশ
আবির্ভূত না হতেন ধরণী মাঝার ॥

রাম।—(জামদগ্ন্য-চরণে নিপতিত হইয়া)।

জমদগ্নি-হতে জন্ম পিণাকী যাঁহার গুরু,
যিনি হর-ভক্ত,
যাঁর বীর্য্য, যাঁর কর্ম্ম কোনরূপে নাহি হয়
বাক্যে পরিব্যক্ত,
দানে যাঁর সীমা নাহি যিনি সপ্তসিন্ধু-মহী
অকপটে করিলেন দান।
আপনি সে জামদগ্ন্য —আপনার কোন্ কর্ম্ম
অলৌকিক নহে, ভগবান্!
রামের প্রভাব জানি', গাঢ়রূপে আলিঙ্গিয়া,
রামে তেজ করিয়া বিন্যস্ত,
সেই জমদগ্নি-পুত্র মহাক্ষত্র-বধ-হতে
তদবধি হলেন নিরস্ত ॥

রামে আলিঙ্গিয়া মুনি চলিলেন আপন আশ্রমে;
দশরথো চলিলেন অযোধ্যায় পুত্রদের সনে ॥
ভার্গবের স্বর্গগতি নিজ-বাণে করি' নিবারণ,
পিতৃ-মাতৃ-কুলজাত সাধুজনে করি' নিমন্ত্রণ,
মান্যতম বিপ্র, আর ক্ষত্রগণে পূজি' যথোচিত
পিতা-সাথে রামচন্দ্র নিজপুরী হৈলা উপনীত ॥

হেরিয়া জানকী রামে পীড়িত মদন-বাণে;
খররশ্মিমালি সূর্য্য, এই অবসরে
অস্তাচল-চূড়াদেশে উঠিয়া হরষভরে
নিপতিত হইলেন পশ্চিম সাগরে ॥

দিনমণি তৎক্ষণাৎ অস্তাচলে করিলে গমন
সুপক্ক নারঙ্গ-তুল্য শশাঙ্ক পূরব দিকে
হল সমুদিত।
শয্যাগারে পশে রাম শুনি গুরুজনের বচন ;
রামে আনন্দিত করি' জানকীও হইলেন
সেথা উপস্থিত ॥
রাঙায়ে পূরব দিক্, ক্লান্ত বিরহিণীদের
কর ন্যস্ত করায়ে কপোলে,
মুদিত করিয়া পদ্মে, বিকসিত কুমুদেরে,
উল্লসিত চকোর-সকলে,
নভ করি' তমোহীন, নাগলোক শোকান্বিত,
কন্দর্পের দর্প আরো
করিয়া বর্দ্ধন,
বিতরিছে নিশানাথ স্বকীয় কিরণ॥
কুমুদ কলিকা-রাজি করি' প্রস্ফুটিত
যুবজন-হৃদয়েরে করি' প্রফুল্লিত
কামিনীগণের মান করি' উথলিত
চক্রবাক-দম্পতীরে করি আকুলিত,
জ্যোৎস্না-আলোক-রশ্মি করি' অঙ্কুরিত
দশদিক সমুদয় করি' ধবলিত
স্বচ্ছন্দে চন্দ্রমা এবে হল সমুদিত ॥

শ্রীরাম।—(সখীর প্রতি)।

কুমুদের ক্লান্তি-হর, দিগ্-বালাদিগের দর্পণ,
আদিরস-দীক্ষা-গুরু, —চকোর-সুহৃদ এই
তুষার-কিরণ
হলে সমুদিত নভে, স্বর্গ মর্ত্ত্য সমস্ত ভুবন
কর্পূরে, চন্দনে কিম্বা পারদের রসে লিপ্ত
হল কি এখন ?

(অনন্তর পিঞ্জর-স্থিতা সারিকা-কর্ত্তৃক সখীগণের আশীর্ব্বাদ পঠন।)

চক্রবাক-ক্রীড়ানাশী তম-সৈন্য-সংহারক
চক্র-অস্ত্র সম ;
কান্তা-সম্ভোগের সাক্ষী গগন-সরসীজাত
রাজহংস যেন ;
কুমুদ-বন-বধূর নিদ্রা সদা যে করে নিরোধ,
স্মর-বাণ-শান যেই, জন্মদেশ যাহার ক্ষিরোদ,
সেই সে শশাঙ্কদেব গগনে উদয়
হোক্ তাঁর জয় জয়, জয় জয় জয় ॥

(সখীগণ প্রস্থান করিলে)

মদনের পঞ্চবাণ লোক মাঝে আছয়ে প্রসিদ্ধ
কিন্তু সে আমার যেগো বহুবাণে করিতেছে বিদ্ধ ;
—এই কথা বলিতে বলিতে ধীরে ধীরে,
নম্রমুখী পুলকিত-তনু জানকীরে
—দ্বারের সমীপ-হতে—তুলি' নিজ অঙ্কে
লইয়া গেলেন রাম শয়ন-পর্য্যঙ্কে ॥
হৃদিস্থিত রামচন্দ্র হৃদয় হইতে পাছে
হন বিনিস্থত,
এই আশঙ্কায় যেন হরিণ-নয়না বালা
—কপট-নিদ্রিত—
রেখেছেন পাণিপদ্ম পয়ধরোপরি ;
তাহে কি অপূর্ব্ব শোভা আহা মরি মরি ॥
মদন-দহন-শুষ্ক চন্দনাক্ত কান্ত ক্লান্ত
কুচান্ত-উপর,
বসায়ে চরণগুলি, উর্দ্ধে বিস্তারিয়া পক্ষ,
বসেছে ভ্রমর।

পুষ্পধনু কন্দর্পের　　পুষ্প-অবশিষ্ট
শর-সম এবে যেন　　হয় তাহে দৃষ্ট॥

পৃথুল জঘন-তার　　মৃদু মন্দ আন্দোলিয়া,
অলকান্ত "কর্ণপূর"　　মৃদু মৃদু সঞ্চালিয়া,
ভুজমূল প্রকটিত　　স্তন-লীলা প্রদর্শিয়া,
জনক-তনয়া সীতা　　—কপট নিদ্রিত—
নিজপতি রামচন্দ্রে　　করে প্রমদিত॥

প্রেম-বশে স্পৃহা মনে,　　তবু ভীত ক্ষণে ক্ষণে
বালিকা-স্বভাব-বশে।
লভিয়া সম্ভোগ-সঙ্গ　　আকুঞ্চিত করে অঙ্গ
নবব্রতী রতি-রসে।
"আহা আহা!—না, না, না, না"—　　মুহু মুহু করে মানা
আলাপিয়া কথা ছল-ভরে।
সুমধুর-স্মিত-হাসি　　কটাক্ষটি পরকাশি'
মনোভাব প্রকটিত করে॥

রম্ভা-কর-সঞ্চারিত　　বীণা-তন্ত্রী সমুত্থিত
মৃদু বাণী সীতা-ওষ্ঠপুটে;
ফুল্ল-পারিজাত-সম　　পরিমল নিরুপম
তাহা হতে চারিদিকে ছুটে;
যে নারী প্রবীণা অতি,　　শুনি তাহা, রসবতী
নবীনা যুবতী হয়ে উঠে॥

সীতা-নেত্র-ভঙ্গিমায়　　মৃগকুল বনে ধায়,
কটি হেরি' সিংহ পশে
গিরি-গহ্বরে।
নিতম্বের হেরি' ভাব　　দূরে যায় দিঙনাগ,
মুখ-পদ্মে হেরি পদ্ম
পশে সরোবরে।

হয় যদি অপমান,　　সাধুরা নিশ্চয়
জীবন অথবা বন　　করেন আশ্রয়॥

রাম।—অয়ি প্রিয়ে! দেখ দেখ ঃ—

বদন দেখিয়া তব সরসী-কমল সব
ভৃঙ্গরূপ জপমালা জপে মন-দুখে।
বেণী হেরি' নাগপতি হইয়া লজ্জিত অতি
নিজ তনু লুকায়েছে আপন কঞ্চুকে ॥
সুবর্ণ হেরি' ও-বর্ণ নিজ দেহ করিয়াছে
অনলে নিঃক্ষেপ।
মণি-বীজ দন্ত হেরি' দাড়িম্ব বিদীর্ণ হ'ল
করিয়া আক্ষেপ ॥
সীতা করে মুহুর্মুহু মধুরতর বচন প্রয়োগ,
পূর্ণ-কাম রাম তাঁরে আলিঙ্গিয়া করেন সম্ভোগ।
যেরূপ সম্ভোগ রাম করিলেন আজ সীতাসনে
কেহ কভু করে নাই, করিতে নারিবে ত্রিভুবনে ॥

ইতি দ্বিতীয় অঙ্ক সমাপ্ত।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সর্ব্বজ্ঞ মিত্র।

১৮২৪ খৃষ্টাব্দে মিঃ হজ্‌সন্‌ নেপাল হইতে অনেক বৌদ্ধ সংস্কৃত গ্রন্থ লইয়া আইসেন। স্রগ্ধরাস্তোত্র ঐ সকল গ্রন্থের অন্যতম। উহাতে তারা দেবীর স্তব লিপিবদ্ধ আছে। এই হেতু ঐ গ্রন্থ তারাস্তোত্র নামেও অভিহিত হইয়া থাকে। ইহাতে সর্ব্বশুদ্ধ ৩৭টী শ্লোক বিদ্যমান আছে। প্রথম শ্লোক এইরূপ :—

বালার্কালোকতাম্রপ্রবরসুরশিরশ্চারুচূড়ামণিশ্রী
সম্পৎ সম্পর্করাগানতিচিররচিতালক্তকব্যক্তভক্তী।
ভক্ত্যা পাদৌ তবার্য্যে করপুট মুকুটাটোপভুগ্নোত্তমাঙ্গ
স্তারিণ্যাপচ্ছরণ্যো নবনুতি কুসুমস্রগ্‌ভিরভ্যর্চ্চয়ামি ॥ ১॥

উল্লিখিত শ্লোক দেখিয়াই বুঝা যায় স্রগ্ধরাস্তোত্রগ্রন্থ স্রগ্ধরা ছন্দে লিখিত। বস্তুতঃ ছন্দের নাম অনুসারেই গ্রন্থের নামকরণ হইয়াছে। স্রগ্ধরা ছন্দ অতি দুরূহ। ইহার প্রত্যেক চরণ একুশ অক্ষরে নিবদ্ধ। ইহার স্বরসংস্থান* এইরূপ :—

— — — — ⌒ — — ⌒ ⌒ ⌒ ⌒ ⌒ ⌒ — — ⌒ —
— ⌒ — —।

স্রগ্ধরাস্তোত্রগ্রন্থের রচয়িতার নাম সর্ব্বজ্ঞ মিত্র। ইহাঁর জন্মভূমি কাশ্মীর। ইনি একজন দানশীল বৌদ্ধ ছিলেন। দানশীলতার জন্য ইহাঁর খ্যাতি সমগ্র ভারতে প্রচারিত হইয়াছিল। ক্রমে তিনি সর্ব্বস্ব দান করিয়া ভিক্ষুব্রত অবলম্বন করেন। একদা তিনি ভিক্ষা করিতে করিতে রাজা বজ্রমুকুটের দেশে যাইতেছিলেন, এমন সময়ে পথমধ্যে এক দরিদ্র বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে দেখিতে পান। উক্ত ব্রাহ্মণ উহাঁকে বলেন

---

* গুরুস্বর —। লঘুস্বর ⌒।

—"মহাশয়, আমি কন্যার বিবাহের ব্যয়নির্ব্বাহ করিতে অসমর্থ হইয়া, কিছু ভিক্ষালাভের প্রত্যাশায় সর্ব্বজ্ঞ মিত্রের নিকট যাইতেছি।" এই কথা শুনিয়া সর্ব্বজ্ঞ মিত্র অত্যন্ত চিন্তিত হইলেন। তিনি বলিলেন—"মহাশয়, ইহা কি আপনার কর্ণগোচর হয় নাই যে সর্ব্বজ্ঞ মিত্র সর্ব্বস্ব দান করিয়া ভিক্ষুব্রত গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি এক্ষণে নিজে ভিক্ষার জন্য রাজদ্বারে উপস্থিত হইয়াছেন?" তাঁহার কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণ নিরাশ হইলেন; তিনি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন ও তাঁহার নয়ন হইতে অশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল। সর্ব্বজ্ঞ মিত্র উঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া বলিলেন "আপনি দুঃখিত হইবেন না, আমার সঙ্গে আসুন, আমি আপনাকে সাহায্য করিতেছি।"

এই সময়ে কোন সিদ্ধ পুরুষ রাজা বজ্রমুকুটকে বলিয়াছিলেন—"মহারাজ, যদি আপনি শত নরমুণ্ডের উপর বসিয়া স্নান করিতে পারেন তাহা হইলে আপনার সর্ব্ব মনোরথ পূর্ণ হইবে।" তদনুসারে রাজা বজ্রমুকুট প্রত্যেক মনুষ্যকে তুলে স্থাপন করিয়া তৎপরিমাণ সুবর্ণের মূল্যে ৯৯টী মানুষ ক্রয় করেন। রাজা অপর একটী মানুষ ক্রয় করিবার উদ্যোগ করিতেছেন এমন সময়ে সর্ব্বজ্ঞ মিত্র উঁহার নিকট যাইয়া আত্মদেহ বিক্রয় করিলেন। তিনি স্বদেহের বিনিময়ে যে সুবর্ণ পাইলেন তাহা পূর্ব্বোক্ত দরিদ্র ব্রাহ্মণকে প্রদান করিয়া উঁহাকে বিদায় দিলেন। পরদিন প্রাতঃকালে সর্ব্বজ্ঞ মিত্র ও অপর ৯৯টী বধ্যপুরুষ বধ্য-সরোবরে নীত হইলেন। তাঁহাদের শিরশ্ছেদের ব্যবস্থা হইতেছে দেখিয়া সর্ব্বজ্ঞমিত্র বিষণ্ণ হইলেন। তিনি আত্মরক্ষা ও অপর ৯৯টী পুরুষের জীবনরক্ষার উপায়ন্তর না দেখিয়া তান্ত্রিক দেবী আর্য্য-তারার শরণাপন্ন হইলেন। তিনি উচ্চৈঃস্বরে তারার স্তব আরম্ভ করিলেন। তিনি তারার স্তব করিতে করিতে যে ৩৭টী শ্লোক বিরচন করিয়াছিলেন তাহাই বর্ত্তমান স্রগ্ধরা স্তোত্রগ্রন্থের ভিত্তি। সর্ব্বজ্ঞ

মিত্রের স্তবে প্রীত হইয়া তারাদেবী উহাঁকে ও অপর ৯৯ বধ্যপুরুষকে আশ্চর্য্যভাবে রক্ষা করিলেন। ক্ষণকালমধ্যে দৃষ্ট হইল উক্ত ১০০ জন বধ্যপুরুষ স্ব স্ব গৃহে নীত হইয়াছে এবং বধ্যসরোবরের তীরে উহাদের দেহের পরিমাণ স্বুবর্ণ রাশিকৃত হইয়া রহিয়াছে।

এই আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিয়া রাজা বজ্রমুকুট বিস্মিত হইলেন; তিনি সর্ব্বজ্ঞ মিত্রের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন।

উল্লিখিত উপাখ্যানটি নিতান্ত আধুনিক নহে। উহা স্রগ্ধরা স্তোত্রের টীকায় লিপিবদ্ধ আছে। বিক্রমশীল মহাবিহারের রাজগুরু পণ্ডিত ভিক্ষু শ্রীজিনরক্ষিত* এই টীকা রচনা করিয়াছেন। প্রথম শ্লোকের আদ্য চরণের প্রারম্ভে "বালার্ক" এই পদ বিদ্যমান থাকায় জিনরক্ষিত-কৃত টীকা বালার্কস্তুতি টীকা নামে অভিহিত হইয়াছে।

উল্লিখিত স্রগ্ধরা স্তোত্র ও উহার টীকা তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছিল। তিব্বতীয় ত্যাঞ্জুর নামক স্বুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থের তন্ত্রাধ্যায়ের "ল" পরিচ্ছেদে এই অনুবাদ দৃষ্ট হয়। স্বুপ্রসিদ্ধ লামা তারানাথ "ধর্ম্মের উৎপত্তি" নামক ইতিহাসগ্রন্থে সর্ব্বজ্ঞ মিত্রের উপাখ্যান কিঞ্চিৎ বিকৃত করিয়া উদ্ধৃত করিয়াছেন। পাগ্‌সাম্ জোন্‌জাঙ নামক তিব্বতীয় গ্রন্থেও (পৃঃ ১০২) এই বিকৃত উপাখ্যান উল্লিখিত হইয়াছে।

---

* জিনরক্ষিত স্বপরিচয় প্রদান করিয়া টীকার প্রারম্ভে লিখিয়াছেন ঃ—

নত্বার্য্যতারাং জগদর্থসারাং ধর্ম্মকরা ধ্যেষণয়া সমাসাৎ।
বালার্ক মাত্রাস্ত করোমি টীকাং স্ফুটামহং শ্রীজিনরক্ষিতঃ কৃতী। ১॥

টীকার শেষ ভাগে লিখিত আছে ঃ—

বিধায় টীকাং যদলস্তি শম্ভোগিরীশ সঙ্কাশমসীমশোভং।
শুভং ময়া তারিণি স্রগ্ধরায়াঃ স্তুতে জগত্তেন ভবাস্তু বুদ্ধম্॥

শ্রীসদ্বিক্রমশীল দেব মহাবিহারীয় রাজগুরু পণ্ডিত ভিক্ষু শ্রীজিনরক্ষিত কৃত বালার্ক স্তুতি টীকা পরিসমাপ্তা॥

সর্ব্বজ্ঞ মিত্রের আবির্ভাব কাল নির্ণয় করা সহজ নহে। পূর্ব্বোক্ত তিনখানি তিব্বতীয় গ্রন্থের মতে তিনি মগধের নালন্দ মহাবিহারে বিদ্যাভ্যাস করেন। কথিত আছে খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে নালন্দ বিহারের ধ্বংস হয় অতএব সর্ব্বজ্ঞ মিত্র নবম শতাব্দীর পূর্ব্বের লোক।

রাজতরঙ্গিণী গ্রন্থের চতুর্থ তরঙ্গের ২১০ শ্লোকে লিখিত আছে জিনাবতার সর্ব্বজ্ঞ মিত্র কয্য বিহারে অবস্থান করিতেন। লাট (গুজরাট) দেশের রাজা কয্য এই বিহার নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। কয্য কাশ্মীরের সম্রাট্ মুক্তাপীড় ললিতাদিত্যের অধীনস্থ সামন্ত নরপতি ছিলেন। মুক্তাপীড় ললিতাদিত্য খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর প্রারম্ভে কাশ্মীরে শাসনদণ্ড পরিচালনা করেন, সুতরাং সর্ব্বজ্ঞ মিত্র অষ্টম শতাব্দীর পূর্ব্বের লোক নহেন এবং পূর্ব্বেই বলিয়াছি তিনি নবম শতাব্দীর পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন; অতএব অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে সর্ব্বজ্ঞমিত্রের আবির্ভাব কাল নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে।

সর্ব্বজ্ঞমিত্রের উপাখ্যান পাঠ করিয়া আমরা দেখিতে পাইলাম খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে কাশ্মীরে তান্ত্রিক ধর্ম্মের কিরূপ প্রবলতা ছিল। এই তান্ত্রিক ধর্ম্মের আবির্ভাবেই বৌদ্ধধর্ম্মের বিলোপ ঘটে ও বৌদ্ধগণ হিন্দু সম্প্রদায়ে মিশিয়া যান।

শ্রীসতীশ চন্দ্র বিদ্যাভূষণ।

ভারতবর্ষে ভাস্কো-ডা-গামা* ।

(১)

একশত-ষাট্ জন আরোহী † সমেত ভাস্কো-ডা-গামার সেণ্ট গ্যাবরিয়েল, সেণ্ট রাফেল, সেণ্ট মিগেল এবং বেরিও পোত যখন সাগর বক্ষে ভাসিল তখন আরোহীবৃন্দ কম্পিতবক্ষে ঈশ্বরের নামে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল, আর তীরে দাঁড়াইয়া পর্ত্তুগালবাসী সকলেই মনে করিল ইহারা দেশের অর্থ নষ্ট করিয়া সমুদ্রের শীতল বক্ষে আশ্রয় লইতে চলিয়াছে; ইহাদিগের মধ্যে হয় ত একজনও আর ফিরিবে না।

আগমন।

তখন য়ুরোপখণ্ডে আবিষ্কারের যুগ চলিতেছিল। ডা-গামার লিসবন নগরী পরিত্যাগের ঠিক পক্ষকাল পূর্ব্বেই জন কেবট (John Cabot) উত্তর আমেরিকা আবিষ্কার করিয়াছেন,—ঠিক এক বৎসর পূর্ব্বেই তিনি অষ্টাদশজন মাত্র সঙ্গী লইয়া আটলাণ্টিক মহাসাগরের পথে ভারত আবিষ্কারের চেষ্টায় বাহির হইয়াছিলেন।

রাজা ইমানুয়েল এবং ভাস্কো-ডা-গামা তাঁহাদের এই অভিযানকে

---

* এই প্রবন্ধ প্রণয়নে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলির সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি :—

(1) History of British India—Sir W. W. Hunter.

(2) Portuguese Discoveries Dependencies—Rev. Alex. J. D. D'orsay.

(3) William Robertson's Works, Vol. XII.

(4) Roteiro the Journal of the Voyage of Vasco Da Gama by Sea to India in the year 1497—Alvarez Velpo.

(5) History of India—Meadows Taylor.

† D'orsay বলেন ১৬০ জন নহে, ২০৮ জন। কিন্তু Alvarez Velpo লিখিত দিনলিপিতে দেখা যায় ১৬০ জন। Sir W. W. Hunter, M. Taylor প্রভৃতিও এই মত পোষণ করেন।

ধর্ম্ম-যুদ্ধাভিযানস্বরূপ মনে করিয়াছিলেন। দেশদেশান্তরে খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারের যে প্রবলেচ্ছা একদিন রাজা হেন্‌রিকে কোষবিমুক্ত উলঙ্গ কৃপাণ হস্তে ও ক্রুশচিহ্নিত পতাকাস্কন্ধে লইয়া, রাজ্যমধ্যে নবজীবন সঞ্চারিত করিবার জন্য উৎসাহিত করিয়াছিল—যে উদ্দাম আকাঙ্ক্ষা ১৪১৮ হইতে ১৪৯৮ পর্য্যন্ত ৮০ বৎসর ধরিয়া তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণের শোণিতস্রোতের সহিত প্রবল বেগে শিরায় শিরায় প্রবাহিত হইতেছিল, ইমান্যুয়েল তাহা সফলীকৃত করিতে কৃতনিশ্চয় হইয়াছিলেন।

রাজ্য বিস্তৃতি, বাণিজ্য এবং ধর্ম্মপ্রচার এই ত্রিবিধ উদ্দেশ্য বুকে লইয়া ভাস্কো-ডা-গামা প্রায় একবৎসরকাল সমুদ্র বক্ষে ভাসিতে ভাসিতে অবশেষে কালিকাটের সন্নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। জ্যৈষ্ঠের* অপরিচ্ছন্ন আকাশতলে সমুদ্রবক্ষে দাঁড়াইয়া অস্তগমনোন্মুখ তপনের মন্দরশ্মিপ্রতিভাত ভারতবর্ষের অস্পষ্ট ছায়াময় বেলাভূমি আলেখ্যবৎ নিরীক্ষণ করিয়া ভাস্কো-ডা-গামা পরম পুলকে নতজানু হইয়া পড়িলেন।

স্থান এবং কাল উভয়ই ভাস্কো-ডা-গামার অনুকূলে ছিল। তিনি যখন ভারতবর্ষে পদার্পণ করেন, তখন সমগ্র ভারতে "দিল্লীশ্বরোবা জগদীশ্বরোবা" প্রচারিত হয় নাই—তখনও মোগলরাজদণ্ডের ভয়ে হিমাচল হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত কম্পিত হইত না;—যে প্রদেশে ভাস্কো-ডা-গামা অবতরণ করিয়াছিলেন সে প্রদেশ তখন পর্ব্বত বেষ্টিত, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজন্যবর্গের অধিকারভুক্ত, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত;—বিশাল ভারতবর্ষের সহিত সে প্রদেশের সম্বন্ধ তখন অতি অল্পই ছিল।

হিন্দুসাম্রাজ্য চেরার অধিপতি চেরামন্ পেরুমল (Cheramán Perumál) যখন হিন্দুধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক ইসলাম মন্ত্রে দীক্ষালাভ

* Sunday, May 20, 1498.

করিয়া সিংহাসন পরিত্যাগপূর্ব্বক বাণপ্রস্থাবলম্বনে মদিনায় প্রস্থান করিয়াছিলেন, তখন সেই বিশাল চেরা-রাজ্যের অংশবিশেষ হিন্দু-'বিজয়নগর' সাম্রাজ্যরূপে ইতিহাসে পরিচিত হইয়াছিল। চের-রাজ্যের সমুদ্রতীরবর্ত্তী অংশ, যাহা মালাবার আখ্যায় ভারতের ইতিহাসে সুপরিচিত, তাহা লইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজাদিগের মধ্যে তখন অনেক যুদ্ধ ও কলহের সৃষ্টি হইয়াছিল। কালিকাটের জামোরিণ তাঁহাদিগের মধ্যে প্রধান বলিয়া পরিগণিত ছিলেন। জামোরিণ যদিও সন্নিকটবর্ত্তী পার্ব্বত্য সামন্তদিগের বন্ধুত্বলাভ করিয়াছিলেন তত্রাচ তিনি সাধারণতঃ 'সমুদ্র-রাজ' নামেই পরিচিত ছিলেন, তাঁহার রাজ্য সুদূর বিস্তৃত ছিল।*

সমুদ্রতীরবর্ত্তী অন্যান্য রাজাগণ হীনশক্তি ছিলেন। হিন্দু-ভূগোলে ভারতবর্ষ যে ৫৬টী ভিন্ন ভিন্ন দেশে বিভক্ত ছিল, কেরল বা চেরা সেই ৫৬ দেশের মধ্যে একটী। মালাবার আয়তনে কেরল দেশের একঅষ্টাংশ মাত্র ছিল। তৎকালে কালিকাট এবং কোচিন মালাবারের দুই প্রধান শক্তি বলিয়া পরিগণিত হইত; কিন্তু আয়তনে ইহারা মালাবারের একষষ্ঠাংশমাত্র ছিল। কেরল সাম্রাজ্যের চিতাভস্মের উপর যখন হিন্দুরাজ্য বিজয়নগর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তখন, শুনিতে পাওয়া যায়, বিজয়নগরের অধীনে তিন শত বন্দর ছিল। সেই সকল বন্দরের কোনটীই কালিকাট অপেক্ষা ক্ষুদ্র ছিল না।

ঈশ্বরানুগ্রহে পর্ত্তুগীজগণ প্রথমেই মালাবার তীরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। মালাবারই বাণিজ্যবিস্তার, স্বদেশসেবা,

---

* It was then the most flourishing place on the Malabar Coast, the Zamorin or Emperor making it the capital of a very extensive state.

Memoirs of Hindustan—J. Rennel, p. 27.

ধর্ম্মপ্রচার, নবসাম্রাজ্য সংস্থাপন প্রভৃতি উদ্দেশ্য সিদ্ধির উপযুক্ত স্থান ছিল ;—হয় ত ভারতবর্ষের অন্য কোন স্থানে উপনীত হইলে ভারতে ভাস্কো-ডা-গামার এবং সেই সঙ্গে পর্ত্তুগালের প্রতিষ্ঠালাভ ঘটিত না।

মালাবারের সামন্তগণ সংখ্যায় অত্যল্প ছিলেন, শক্তিতেও ক্ষুদ্র ছিলেন ;—তাঁহারা একটী ক্ষুদ্র য়ুরোপীয় শক্তির সহিতও যুদ্ধে সমকক্ষ ছিলেন না। বৈদেশিক বণিকগণ সর্ব্বদা মালাবার তীরে আশ্রয়লাভ করিত। সামুদ্রিকবাণিজ্য হইতেই মালাবারের সামন্তরাজকোষাগার গুলি পূর্ণ হইত ; তাই তাঁহারা বৈদেশিক বণিকদিগকে আশ্রয় দিতে কুণ্ঠিত হইতেন না বরং আগ্রহই প্রকাশ করিতেন।

খ্রীষ্টান এবং ইহুদিগণ বহুদিন হইতেই তাঁহাদিগের রাজ্যমধ্যে বাস করিতেছিল, সামন্তরাজগণ স্বদেশে বৈদেশিক ধর্ম্মপ্রচারের বিঘ্ন ঘটাইতেন না। মালাবারে তখন ধর্ম্মের বন্ধন অনেকাংশে শিথিল ছিল, তখন নানা ধর্ম্ম নানা মূর্ত্তি ধারণ করিয়া আত্ম-প্রকাশে ব্যস্ত ছিল। খ্রীষ্টান, মুসলমান, ইহুদি প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বণিকগণ তখন মালাবারে অবাধে বাণিজ্য করিবার স্বাধীনতা পাইত। উত্তর ভারতের ন্যায় মালেবারে তখনও সনাতন হিন্দুধর্ম্মের দৃঢ় প্রতিষ্ঠা হয় নাই ; তখন নেয়ারজাতি অর্দ্ধহিন্দু, নিকটবর্ত্তী পার্ব্বত্যজাতি কোন ধর্ম্মই মানিত না, সামন্তগণও তখন অর্দ্ধহিন্দু বলিয়া পরিচিত। কতিপয় ব্রাহ্মণ মিলিয়া তখন মালাবার তীরে একটী সনাতন হিন্দুধর্ম্ম সম্প্রদায় সংগঠিত করিয়াছিল—সে সম্প্রদায় ক্ষুদ্র ও হীনশক্তি ছিল ; তবে ব্রাহ্মণগণ অন্যান্য ভারতীয় খ্রীষ্টানের ন্যায় * রাজাদিগের মন্ত্রীত্ব করিতেন এরূপ শুনিতে পাওয়া যায়।

---

* In 1442 an Indian Christian acted as Prime Minister to the king of Vijaynagar.—The Suzerain Hindu State of Southern India.—Sir W. W. Hunter.

Cf. Voyage of Abd-er-Razak.

তাই যখন পর্তুগীজ বণিকসম্প্রদায় মালাবার তীরে বাণিজ্য করিতে চাহিয়াছিল, তখন সমুদ্রতীরবর্ত্তী রাজন্যবর্গ মহানন্দে তাহাদিগকে সে স্বাধীনতা প্রদান করিয়াছিলেন। মালাবার উপকূল-স্থিত বন্দরগুলি সেকালে প্রাচ্যপ্রতীচ্য বাণিজ্যের সন্ধিস্থল বলিয়া পরিচিত ছিল। এমন কি মিসরীয় বণিকগণ, যাহারা সিংহলে অথবা মালাক্কা দ্বীপে বাণিজ্য করিতে আসিত, তাহারাও ভারত মহাসাগর উত্তীর্ণ হইয়া পারস্য উপসাগর বা লোহিত সাগরের পথে মালাবারে জাহাজ না বাঁধিয়া যাইত না।

যখন সুদূর পর্ত্তুগাল হইতে পর্ত্তুগীজ বণিকগণ আসিয়া ভারতের উপকূলে মহোল্লাসে পর্ত্তুগালের বিজয় পতাকা উড়াইয়া দিল, তখন ভারতের অন্তর্ব্বর্ত্তী হিন্দুরাজ্য বিজয়নগর যদিও ধনেজনে, সৌভাগ্যে সম্পদে, গৌরবে সম্ভ্রমে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিল তথাপি নবোত্থিত মুসলমান নরপতিগণ কর্ত্তৃক সর্ব্বদাই বিধ্বস্ত ও বিপর্য্যস্ত হইত। মালাবার ও সমুদ্রতীর, বৈদেশিক বণিক্ ও বৈদেশিক ধর্ম্মপ্রচার প্রভৃতির দিকে দৃষ্টিপাত করিবার অবসর তখন বিজয়নগরের ছিল না। বিজয়নগর তখন অন্তরে অন্তরে তেলিকোটার ভীষণ শ্মশানের জন্য প্রস্তুত হইতে-ছিল—তখন তাহার অতুলসম্পদ, অমিতবিক্রম বোধ হয় তেলিকোটার অতি তীব্র চিতানলে চিরদগ্ধ হইবার জন্য ধীরে ধীরে মৌনাবলম্বনে মন্ত্রমুগ্ধ অজগরের ন্যায় অগ্রসর হইতেছিল।

তখন দক্ষিণের মুসলমান রাজ্য এক একবার ভাঙ্গিয়া চূর্ণবিচূর্ণ হইতেছিল আবার সেই ভগ্নাবশেষের উপর নূতন নূতন মুসলমান সাম্রাজ্য নবোত্থান লাভ করিতেছিল। ইতিহাসপ্রসিদ্ধ সেই ভামনি বংশ তখন ধীরে ধীরে লুপ্ত হইয়া যাইতেছিল আর তাহার স্থানে আদিলশাহি বারিদসাহি প্রভৃতি পঞ্চ মুসলমানসাম্রাজ্য সন্তর্পণে মস্তক উত্তোলন করিয়া প্রতিষ্ঠালাভের জন্য সভয়ে চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিতেছিল।

উত্তর ভারতে তখন দুৰ্দ্ধর্ষ আফগান শক্তি ধীরে ধীরে ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছিল ; দিল্লি তখন পর্য্যন্তও চতুর্দ্দশ শতাব্দীর ভীষণ ঘূর্ণাবর্ত্তের বিভীষিকায় ভীত, তখন পর্য্যন্তও তৈমুরলঙ্গের স্মৃতি বিলুপ্ত হয় নাই। চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে তৈমুরলঙ্গ-ঘূর্ণাবর্ত্ত দিল্লির যে ধ্বংশ সম্পাদন করিয়াছিল, পঞ্চদশ শতাব্দীতেও সেই ধ্বংশরাশি দূরে সরাইয়া ফেলিয়া মোগলগৌরব সম্যক্ পূর্ব্বপ্রতিষ্ঠালাভে সমর্থ হয় নাই। দিল্লির সুলতানগণ তখন শক্তিহীনহস্তে শাসনদণ্ড পরিচালন করিতেছিলেন—স্ব স্ব রাজ্যের সীমা অতিক্রম করিবার সাহস তখন তাঁহাদিগের ছিল না।

তাই পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে ভাস্কো-ডা-গামা যখন মালাবারে উপনীত হইলেন তখন তিনি প্রভূত সন্মান লাভ করিলেন, জামোরিণ শুল্কের প্রত্যাশায় তাঁহাকে মনে মনে বরণ করিয়া লইলেন—তাঁহার প্রাসাদে ডাগামার অভ্যর্থনার আদেশ হইয়া গেল।

খৃষ্টানদিগের ন্যায় আরবগণ তখন ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠিত, সে সময় 'মোফলাস্' বা 'ম্যাপিলাস্' নাম সন্মানের চিহ্ন স্বরূপ বিবেচিত হইত—মালাবারে আরবদিগের স্বাধীনবাণিজ্যের ব্যবস্থা ছিল। মালাবারতীরবর্ত্তী আরব-সন্তানগণ তখন দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিল। একদল ভারতের শান্তিসুখে লিপ্ত হইয়া কোরাণের সহিত যে কৃপাণের একদিন অতি ঘনিষ্ট সম্বন্ধ ছিল, সে কথা বিস্মৃত হইয়াছিল ; আর একদল কৃপাণ ও কোরাণে মহম্মদের শিষ্যত্বের পরিচয় দিতে ব্যস্ত ছিল। এই দ্বিতীয় সম্প্রদায় বানিজ্য অপেক্ষা ধর্ম্মের নামেই অধিক উল্লসিত হইয়া উঠিত—ধর্ম্মপ্রচারের সুযোগ পাইলে ক্ষিপ্তের মত হইত—কাফেরদিগকে দেখিতে পারিত না। আরবগণ দেখিল মালাবারে,—কালিকাটবন্দরে এক দল নবীন বণিকের আগমন হইয়াছে ; তাহাদের বেশভূষা, আহার ব্যবহার, ভাষা প্রভৃতি সবই নূতন। আরব

সন্তানগণ শুনিল কোথায় কোন সাগরপারে পর্ত্তুগাল, ইহারা সেই স্থান হইতে আসিয়াছে। তাহারা এই আগন্তুকদিগকে "ফিরিঙ্গি" আখ্যায় আখ্যাত করিল।

এই ফিরিঙ্গিবণিকসম্প্রদায়ের আগমন ইসলামসেবকদিগের ভাল লাগিল না। তাহারা বেশ বুঝিল যে, কালে লোহিতসাগরের পথে আরবের সহিত ভারতের বাণিজ্য "ফিরিঙ্গি" কর্ত্তৃকই লুপ্ত হইয়া যাইবে। কিসে 'ফরিঙ্গি বণিক বিধ্বস্ত হইবে, বিতাড়িত হইবে, জামোরিণের বিষদৃষ্টিতে পতিত হইবে, তাহারা নিয়ত সেই চেষ্টাতেই ব্যস্ত হইয়া পড়িল, অবশেষে মানসসিদ্ধির জন্য কি প্রকারে জামোরিণের মন্ত্রণাসভার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল সে কাহিণী পরে বর্ণিত হইবে।

এদিকে সেণ্ট গ্যাবরিয়েলের ডেকের উপর বসিয়া ভাস্কো-ডা-গামা তখন কত আকাশকুসুম দেখিতে ছিলেন, তিনি এ সকল কিছুই বুঝিতে পারিলেন না—কি প্রকারেই বা বুঝিবেন?

(২)

তালি প্যাগোডা।

ক্লান্ত, তরঙ্গবিধ্বস্ত, ঝটিকাতাড়িত, পর্ত্তুগীজগণ দেখিল তাহাদিগের চক্ষের সম্মুখে এক নূতন রাজ্যের মায়াদ্বার সহসা যেন মন্ত্রবলে উন্মোচিত হইয়াছে; এদেশে শীত নাই, কুয়াসা নাই, দারিদ্র্য নাই—এখানে সবই নূতন, সবই আশ্চর্য্য। তাহারা বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে দেখিতে লাগিল মালাবারের নাগরিকগণ কৃষ্ণবর্ণ; তাহাদিগের কেশ ও শ্মশ্রু দীর্ঘ,—কেহ কেহ বা মুণ্ডিত মস্তক, কেহ বা জটাধারী। কেবল খৃষ্টত্বের * চিহ্নস্বরূপ কাহারও কাহারও মস্তকে একগুচ্ছ কৃষ্ণকেশ বাতাসে কম্পিত হইতেছে।

* Alverez Velpo তাঁহার দিনলিপিতে হিন্দুদিগকে খৃষ্টান আখ্যায় বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। প্রঃ লেঃ।

সেই দীর্ঘ কেশগুচ্ছের অগ্রভাগ কুঞ্চিত হইয়া বক্রভাবে উর্দ্ধদিকে উঠিয়াছে। "নেটিভ" দিগের কর্ণে বহু ছিদ্র, সেই সকল ছিদ্রে স্বর্ণ অলঙ্কার দুলিতেছে; তাহাদিগের কটি হইতে উর্দ্ধদেশ সম্পূর্ণ উলঙ্গ, কিন্তু যে বসনে কটিদেশ আবৃত তাহা অতি সুন্দর ও সূক্ষ্ম। ধনবানদিগের এইরূপ পরিচ্ছদ—সাধারণলোকে যে যেমন ইচ্ছা সে তেমন বেশ পরিধান করে। রমণীগণ প্রায়ই কুৎসিতা, খর্ব্বাকৃতি এবং ক্ষীণাঙ্গী। তাহাদিগের কণ্ঠে ভারি ভারি স্বর্ণাভরণ প্রতি অঙ্গ-সঞ্চালনে ক্রীড়া করিতেছে, বাহুমূলে বাউটী শোভিতেছে, পদাঙ্গুলে মূল্যবান প্রস্তরসন্নিবিষ্ট অঙ্গুরীকগুলি রৌদ্র কিরণে ঝকমক্ করিতেছে। দেখিতে কুরূপা হউক কিন্তু রমণীগণ কোমলস্বভাবা, ভদ্র, সর্ব্ববিষয়ে অজ্ঞ এবং অতিশয় লোভপরবশ।

ভাস্কো-ডা-গামা মালবারতীরে উপনীত হইয়াই অনুসন্ধানে জানিয়াছিলেন জামোরিণ স্থানান্তরে অবস্থান করিতেছেন। দুই জন ফিরিঙ্গি দূত সংবাদ লইয়া জামোরিণের নিকট উপস্থিত হইয়া ভাস্কো-ডা-গামার আগমনবার্ত্তা জানাইয়া বলিল 'পর্ত্তুগালের অধিপতি পত্রসহ তাঁহার একজন নৌ-সেনাপতিকে ভারতবর্ষে প্রেরণ করিয়াছেন। মহারাজের আদেশমাত্রেই তিনি পত্র লইয়া রাজদরবারে আসিতে পারেন।' জামোরিণ তখন অধিক শুল্কলাভের আশায় উল্লসিত। তিনি তৎক্ষণাৎ বহুমূল্য বস্ত্র উপহার দিয়া দূতদ্বয়কে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে আদেশ করিলেন এবং পর্ত্তুগাল নৌ-সেনাপতির সহিত সাক্ষাৎ মানসে স্বয়ং কালিকাটে যাত্রা করিলেন।

পরদিন প্রত্যুষে ভাস্কো-ডা-গামা তের জন সঙ্গী সমভিব্যাহারে জামোরিণের রাজসভায় গমন করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। পর্ত্তুগীজ ভেরীবাদক ভেরীনিনাদ করিয়া উঠিল—ধীর বাতাসে পর্ত্তুগালের বিজয়-নিশান ভারতের বক্ষের উপর উড়িতে লাগিল।

জামোরিণ একজন "ভালি" (রাজ্যের প্রধান অমাত্য) প্রেরণ করিয়াছিলেন। পর্ত্তুগীজগণ আপন আপন উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া পোত হইতে পতাকা-শোভী তরণী সহযোগে বেলাভূমিতে অবতরণ করিলেন। অবতরণ-ঘাটেই দুইশত যোদ্ধা লইয়া ভালি মহাশয় অপেক্ষা করিতেছিলেন। যোদ্ধৃপুরুষগণ সকলেই সশস্ত্র ছিল—কাহারও হস্তে কৃপাণ, কাহারও হস্তে শাণিত বর্ষাফলক, কাহারও হস্তে তীক্ষ্ণ কুঠার। সকলেই ডা-গামাকে বহু সন্মানের সহিত অভিবাদন করিল। রাজার আদেশে একখানি শিবিকা প্রস্তুত ছিল, * তিনি সেই শিবিকায় আরোহণ করিলেন, সঙ্গীগণ সঙ্গে সঙ্গে পদব্রজে চলিল।

কপ্পাকত্তার [Capua] ভিতর দিয়া কালিকাটের পথ। কপ্পাকত্তার একজন ধনাঢ্যের গৃহে সকলের বিশ্রামের স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। ভোজনের জন্য তথায় অন্ন, ঘৃত এবং সুসিদ্ধ মৎস্য প্রস্তুত ছিল। কপ্পাকত্তা হইতে কালিকাটে যাইতে হইলে কিয়দ্দূর নৌকায় যাইতে হয়। তরণী প্রস্তুত ছিল,—ফিরিঙ্গিগণ আহার সমাপন করিয়া পুনরায় নৌকায় উঠিলেন।

তখন মালাবারের প্রান্ত হইতে প্রান্তান্তর পর্য্যন্ত একটা ভয়ানক চাঞ্চল্য উপস্থিত হইয়াছিল। সকলেই শুনিল সমুদ্রপার হইতে একদল অদ্ভুত জীব আসিয়াছে,—উহারা তাহাদিগেরই মত হাসে, তাহাদিগেরই মত কথা কহে, তাহাদিগেরই মত চলিয়া বেড়ায় কিন্তু উহাদিগের পোষাক পরিচ্ছদ অভিনব, ভাষা অভিনব ও নিতান্ত দুর্ব্বোধ্য—উহারা ফিরিঙ্গি! স্বয়ং "ভালি" আসিয়া ফিরিঙ্গিকে মহা সমাদরে রাজসভায় লইয়া যাইতেছেন, সিপাহীগণ সশস্ত্র পাহারা দিতেছে! এই সকল শুনিয়া জনসাধারণের কৌতুহল এতই বর্দ্ধিত

---

* সে কালে আপন গৃহে শিবিকা রাখিবার জন্য রাজকর দিবার প্রথা ছিল। সুতরাং শিবিকা, সম্মানের চিহ্নস্বরূপ পরিগণিত হইত বলিয়া অনুমান হয়।

হইয়াছিল যে তাহারা দলে দলে কেহবা ভেলায় চড়িয়া জলপথে, কেহবা পদব্রজে, কেহবা সাজসজ্জাবিহীন অশ্বপৃষ্ঠে তীরভূমি দিয়া শতে শতে, সহস্রে সহস্রে ছুটিয়া চলিতে লাগিল ; এমন কি রমণীগণও ছোট ছোট শিশুসন্তানগুলি বক্ষে লইয়া "ফিরিঙ্গি" দর্শন মানসে সেই খালের তীর দিয়া ছুটিতেছিল ;—সকলেরই মুখে এক কথা "ফিরিঙ্গি" ! "ফিরিঙ্গি" !

তরণী হইতে অবরোহণ করিয়া ফিরিঙ্গিগণ সর্ব্বপ্রথমেই একটী দেবমন্দিরে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়া দেখিলেন মন্দিরটী অতি বৃহৎ এবং খোদিতপ্রস্তরময়। মন্দিরের ছাদ ইষ্টক বিনির্ম্মিত। সিংহদ্বারের পার্শ্বে, অর্ণবযানের প্রধান গুণবৃক্ষের ন্যায় উচ্চ একটী পিত্তলস্তম্ভ, সেই স্তম্ভের উপর একটী বিহগমূর্ত্তি স্থাপিত—দেখিলে মনে হয় যেন একটী মুরগী বসাইয়া রাখিয়াছে।* প্রবেশদ্বারের অপর পার্শ্বে আর একটী স্তম্ভ বিদ্যমান। ঠিক মধ্যভাগ সরু চুড়াবিশিষ্ট আর একটী মন্দির ; ইহাও খোদিত-প্রস্তরে গঠিত। এই মন্দিরদ্বার এত সঙ্কীর্ণ যে কোনপ্রকারে একজন মনুষ্য প্রবেশ করিতে পারে। সম্মুখেই প্রস্তর বিনির্ম্মিত সোপানশ্রেণী পিত্তলদ্বারাভিমুখে প্রসারিত। মন্দিরাভ্যন্তরে একটী ক্ষুদ্র মূর্ত্তি শোভা পাইতেছে।

সিংহদ্বারের প্রাচীরগাত্রে সাতটী ছোট ছোট ঘণ্টা ঝুলিতেছে। এই স্থানে বসিয়া ভাস্কো-ডা-গামা এবং তাঁহার সঙ্গীগণ প্রথম উপাসনা করিলেন। ফিরিঙ্গি বণিকগণ তখন বুঝিতে পারেন নাই যে, যে দেবীমূর্ত্তি সমক্ষে তাঁহারা নতজানু হইয়া উপাসনা করিলেন সে মূর্ত্তি মেরির নহে তাহা গৌরীর।

* অনেক হিন্দু-মন্দিরের পুরোভাগে স্তম্ভের উপর গরুড়ের মূর্ত্তি সংস্থাপিত থাকে, সেই জন্য সেই স্তম্ভের নাম গরুড়স্তম্ভ। প্রঃ লেঃ।

ফিরিঙ্গিগণ কেহই মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশাধিকার পাইলেন না, কারণ পূজক "কোয়াফি" (ব্রাহ্মণ) ভিন্ন কাহারও সে অধিকার ছিল না। এই সকল "কোয়াফি" দিগকে দেখিয়া তাঁহারা মনে করিলেন ইহাঁরাই এ চর্চ্চের 'বিশপ' বা 'ডিকন' বা 'প্রিষ্ট' হইবেন। তাঁহাদিগের এ ধারণা হইবার কারণও বিদ্যমান ছিল। পর্ত্তুগীজ 'ডিকন' দিগের "Stobs"এর মত কোয়াফিদিগের বাম-স্কন্ধের উপর এবং দক্ষিণ বাহুর নিম্নভাগ দিয়া এক গাছি সূত্র (ব্রাহ্মণের পৈতা) ঝুলিতেছিল।

কোয়াফিগণ তাঁহাদের নিয়মানুসারে ফিরিঙ্গিদিগের গাত্রে গঙ্গাবারি প্রক্ষেপ করিয়া তাঁহাদিগকে চন্দন উপহার দিলেন। তাঁহারা দেখিলেন এই অভিনব খ্রীষ্টানসম্প্রদায়ের রাজ্যে প্রত্যেক খ্রীষ্টানই কপালে, বক্ষে, কণ্ঠপার্শ্বে এবং বাহুনিম্নে এই চন্দন লেপন করিয়াছেন।

'চর্চ্চ' হইতে বাহির হইবার সময় তাঁহারা দেখিলেন মন্দিরগাত্রে অনেক সাধুদিগের মূর্ত্তি অঙ্কিত আছে, কিন্তু এ সকল মূর্ত্তি বেলেম গির্জ্জার 'এপসল' দিগের মূর্ত্তির মত নহে। ইহাদিগের মস্তকে মুকুট, বাহু চারিটী, কাহারও কাহারও বা দশনগুলি এতই বৃহৎ যে বদন হইতে প্রায় এক ইঞ্চি পরিমাণ বাহিরে আসিয়া পড়িয়াছে। মন্দির গাত্রে এই সকল এবং অন্যান্য কুদৃশ্য মূর্ত্তি অঙ্কিত দেখিয়া তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন; সেণ্টরাফেল পোতের কাপ্তেন ডোয়াম ডি সা মন্দিরাভ্যন্তরে উপাসনাকালীন ভাস্কো-ডা-গামাকে বলিয়াছিলেন "If these are devils, I adore the Living God." যাহা হউক ফিরিঙ্গিবণিকগণ মনে করিলেন এ নূতন দেশের ধর্ম্মমন্দিরও নূতন, সুতরাং সে বিষয় অধিক চিন্তা না করিয়া তাঁহারা হিন্দুর 'তালি প্যাগোডায়' নিশ্চিন্ত মনে মেরির আরাধনা করিয়া শান্ত ও সন্তুষ্ট চিত্তে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

(৩)

তালি প্যাগোডা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া ফিরিঙ্গিগণ সম্মুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তখন পথিপার্শ্বে জনতা এতই বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে পথ চলা দুঃসাধ্য। প্রধান অমাত্যের কনিষ্ঠ ভ্রাতা রাজাদিষ্ট হইয়া মহা সমারোহে তাঁহাদিগের অভ্যর্থনার জন্য আগমন করিয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গে জয়ঢাক, ভেরী, বংশী, ব্যাগপাইপ প্রভৃতি লইয়া আরও অনেকে আসিয়াছিল। বন্দুকহস্তে সিপাহীগণ অগ্রে অগ্রে বন্দুক আওয়াজ করিতে করিতে চলিতে লাগিল, গুরু গম্ভীরে জয়ঢাক বাজিয়া উঠিল, মালাবার তীর ও কালিকাট কম্পিত করিয়া ভেরী নিনাদিত হইল, বংশী, ব্যাগপাইপ প্রভৃতি সমস্বরে বাজিয়া উঠিয়া "ফিরিঙ্গিবণিক"দিগের আগমন বার্ত্তা বিঘোষিত করিল—তাঁহারা সবিস্ময়ে দেখিলেন স্পেন নরপতির অদৃষ্টে স্পেনে বসিয়াও এত সম্মানলাভ ঘটে না।

রাজদর্শন।

ক্রমেই জনস্রোত বর্দ্ধিত হইতে লাগিল—রাজপথে আর স্থান সঙ্কুলান হয় না; শেষে সকলে গৃহের বাতায়নমুখে, ছাদের উপরে, এমন কি, কেহ কেহ বৃক্ষশাখায় আশ্রয় লইল। প্রায় দুই সহস্র সিপাহী অস্ত্রেশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া সেই কল-কোলাহলপূর্ণ জনস্রোতের সহিত মিশিয়া গেল।

ফিরিঙ্গিবণিকগণ সন্ধ্যার প্রাক্কালে জামোরিণের রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করিলেন—প্রবেশমুখে রাজ্যের প্রধান অমাত্যবর্গ তাঁহাদিগকে অভিনন্দন করিয়া লইয়া চলিলেন। প্রাসাদের সর্ব্বশেষ দ্বারদেশে একজন বৃদ্ধ খর্ব্বকায় ব্রাহ্মণ পুরোহিত দণ্ডায়মান ছিলেন, তিনি ভাস্কো-ডা-গামাকে আলিঙ্গন করিলেন। ফিরিঙ্গিরা মনে করিলেন, ইনিই এই খ্রীষ্টানরাজ্যের 'বিশপ',—এ দেশের রাজপুরোহিত। এইরূপে ফিরিঙ্গিবণিকগণ জামোরিণের প্রাসাদকক্ষে প্রবেশ করিয়া রাজসভা-

গৃহে যাহা দেখিলেন তাহাতে চমৎকৃত হইয়া উঠিলেন—তাঁহারা মনে করিলেন এ দেশে এত সম্পদ, এত অর্থ, এত সমৃদ্ধি!

বিস্ময়বিস্ফারিতনেত্রে সঙ্গীসহ ভাস্কো-ডা-গামা দেখিতে লাগিলেন কক্ষমধ্যে একখানি সবুজবর্ণের মখমল বিস্তৃত, সেই মখমলের উপর একখানি মূল্যবান গালিচা শোভা পাইতেছে আর তাহার উপর অতি সুন্দর সূক্ষ্ম তুষারধবল একখানি শ্বেত আস্তরণ চারিদিকে অনেকগুলি উপাধান। সেই সুন্দর শয্যার উপর একটী কারু-কার্য্যময় মসনদে সমগ্র মালাবারের অধিপতি কালিকাটের জামোরিণ পাত্রমিত্রসহ উপবিষ্ট। তাঁহার হস্তে একটী বৃহৎ স্বর্ণপাত্র—তাম্বুল চর্ব্বনান্তে তিনি সেই স্বর্ণপাত্রে নিষ্ঠিবন পরিত্যাগ করিতেছিলেন। জামোরিণের দক্ষিণভাগে আর একটা গোলাকার স্বর্ণপাত্রে বহুতর তাম্বুল এবং সুর দেশীয় কতকগুলি রৌপ্যছুরিকা সজ্জিত ছিল। সেই স্বর্ণ-পাত্রটীর ব্যাস এত বড় যে উভয়বাহু প্রসারণ করিলে অতি কষ্টে উহা ধরিতে পারা যায়। তাম্বুলপাত্রের সন্নিকটে দাঁড়াইয়া একজন অমাত্য মধ্যে মধ্যে জামোরিণের হস্তে তাম্বুল তুলিয়া দিতে ছিল। মসনদের ঊর্দ্ধদেশে সুবর্ণখচিত চন্দ্রাতপ তাঁহার অতুল সম্পদের অন্যতম পরিচয়স্বরূপ সভাগৃহের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতেছিল।

যখন ভাস্কো-ডা-গামা সেই কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন তখন জামোরিণ দেশপ্রথা অবলম্বনে যুগ্মপাণি ঊর্দ্ধে উত্তোলন পূর্ব্বক তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন * এবং দক্ষিণ হস্ত প্রসারণে ইঙ্গিত করিয়া তাঁহাকে সেই চন্দ্রাতপ নিম্নে আহ্বান করিলেন। তাম্বুলপাত্রবাহী এবং নিকট আত্মীয় ভিন্ন আর কেহই রাজার অত সন্নিকটে অগ্রসর হইতে

* By clasping his hands and raising them up towards heaven as the Christians do to God, and whilst raising them, opening and clenching his fists repeatedly.—The Journal.

পারিত না, তাই ভাস্কো-ডা-গামাও অধিক দূর অগ্রসর হইলেন না। পুনরায় জামোরিণ সকলকে উপবেশন করিতে ইঙ্গিত করিলে তাঁহারা নিকটবর্ত্তী একখানি শিলাসনে উপবেশন করিলেন।

যাঁহারা অপার সাগরপথে কোন্ অজানিত অনাবিষ্কৃত দেশ হইতে নির্ভয়ে সহস্র সহস্র যোজন পথ অতিক্রমপূর্ব্বক তাঁহার সিংহাসনতলে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, তাঁহাদিগের অসীম বীরত্ব ও সাহস দেখিয়া জামোরিণ মোহিত হইয়াছিলেন—প্রীত হইয়াছিলেন। তিনি রাজপ্রাসাদেই ফিরিঙ্গিবণিকদিগের যথোচিত অভ্যর্থনার আদেশ দিয়াছিলেন। অবিলম্বে হস্তমুখপ্রক্ষালনের জন্য সুমিষ্ট শীতল বারি ও আহারের জন্য ফল-মূল আনিয়া উপস্থিত হইল। সভাগৃহে বসিয়া ভাস্কো-ডা-গামা ও তাঁহার সহচরবর্গ যতক্ষণ হৃষ্টচিত্তে আহারে ব্যাপৃত ছিলেন, জামোরিণ আনন্দের সহিত তাহা দেখিতেছিলেন এবং পার্শ্বচরদিগের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন। আহার সমাপ্ত হইলে তিনি গামাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—

"এখানে যাঁহারা উপস্থিত আছেন তাঁহারা সকলেই উচ্চপদস্থ ব্যক্তি; আপনার কি আবশ্যক তাহা ইঁহাদিগের নিকট প্রকাশ করিলে ইঁহারাই সে সমুদয় আবশ্যকদ্রব্য আনিয়া দিবেন।"

ভাস্কো। "আমি পর্ত্তুগালাধিপতির দূত মাত্র। আমি মহারাজের জন্য দুইখানি পত্র লইয়া আসিয়াছি, উহা অন্যের নিকট দিবার আদেশ নাই। আমার প্রভু এই পত্র প্রেরণ করিয়াছেন।"

জামো। "ভাল, চলুন আমরা কক্ষান্তরে যাই।"

পরমুহূর্ত্তেই জামোরিণ ও ডা-গামা অন্য কক্ষে প্রবেশ করিলেন। তথায় সুবর্ণখচিত মস্নদে উপবেশন করিয়া জামোরিণ পুনরায় ডা-গামাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"আমার রাজ্যে আপনার কি প্রয়োজনে আগমন?"

ভাস্কো। "আমি পর্ত্তুগাল অধিপতির দূত। পর্ত্তুগাল অধিপতি সেই প্রদেশের অনেক রাজন্যবর্গ হইতে সমধিক সমৃদ্ধিশালী। পর্ত্তুগালের নরপতি জানেন যে ভারতবর্ষে তাঁহারই তুল্য, খ্রীষ্ট-ধর্ম্মাবলম্বী নরপতিই সিংহাসনে অধিষ্ঠিত, তাই ভারতবর্ষ আবিষ্কারের জন্য তিনি প্রতিবৎসরই পর্ত্তুগাল হইতে জাহাজ প্রেরণ করিতেছিলেন। আমরাও সেই উদ্দেশ্যেই এখানে আসিয়াছি। আমাদিগের দেশে যথেষ্ট পরিমাণে স্বর্ণ ও রৌপ্য পাওয়া যায়, তাহা পাইবার প্রত্যাশায় আমরা ভারতবর্ষে আসি নাই—আসিবার প্রয়োজনও নাই। এতদিন পর্য্যন্ত অন্যান্য অর্ণবযানের কাপ্তেনগণ দুই এক বৎসর ভারতবর্ষের অন্বেষণে সমুদ্রমধ্যে ঘুরিয়াই আহার্য্য নিঃশেষ হইলে ভগ্নমনে পর্ত্তুগালে ফিরিয়া যাইতেন। পর্ত্তুগালের বর্ত্তমান অধিপতি ইমানুয়েল এবার তিনখানি নবীন অর্ণবপোত নির্ম্মাণ করাইয়া আমাকেই ভারতবর্ষানুসন্ধানে প্রেরণ করিয়াছেন। ভারতবর্ষে না আসিয়া আমি যদি অর্দ্ধপথেই প্রত্যাবর্ত্তন করিতাম তাহা হইলে রাজা ইমানুয়েল আমাকে বধ করিতেন। তাঁহার সেইরূপই আদেশ ছিল। পর্ত্তুগাল অধিপতি, মহারাজের হস্তে প্রদান করিবার জন্য দুইখানি পত্র দিয়াছেন, আর মুখেও বলিয়া দিয়াছেন যে তিনি ভারতের খ্রীষ্টান অধিপতির বন্ধু ও ভ্রাতা। পত্র দুইখানি আমি আগামী কল্য সঙ্গে করিয়া আনিব।"

জামো। "স্বাগত! আমার রাজ্যে আমি আপনাদিগকে সাদরে অভ্যর্থনা করিতেছি। পর্ত্তুগাল অধিপতিকে আমার ভ্রাতা এবং বন্ধুস্বরূপ পাইলে আমিও পরম পুলকিত হইব। আপনি যখন স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন, তখন আমিও সেই সঙ্গে আমার একজন দূত প্রেরণ করিব।"

এইরূপ আরও অনেক কথাবার্ত্তায় ক্রমে রাত্রি অধিক হইয়া পড়িলে ভাস্কো-ডা-গামা জামোরিণের নিকট হইতে বিদায় লইয়া তাঁহার সঙ্গীদিগের সমীপে উপস্থিত হইলেন। প্রাসাদের বারান্দায় পিত্তল-নির্ম্মিত একটী বৃহৎ ঝাড়ে কতকগুলি দীপ জ্বলিতেছিল। সেই দীপাবলিশোভিত বিস্তৃত বারান্দায় ডা-গামার সহচরগণ অধীরভাবে অবস্থান করিতেছিলেন।

রাত্রি তখন প্রায় এগারটা। ফিরিঙ্গিবণিকগণ রাজনির্দ্দিষ্ট বাস-স্থানে গমনের জন্য প্রস্তুত হইলেন;—তখন মুষলধারে বৃষ্টি হইতেছিল। অপেক্ষা না করিয়া তাঁহারা সেই বৃষ্টির মধ্যে শত শত কৌতুহলী দর্শকমণ্ডলীপরিবেষ্টিত হইয়া গমন করিতে লাগিলেন। জামোরিণ প্রেরিত একজন সম্ভ্রান্ত মুর পথপ্রদর্শকস্বরূপ সঙ্গে সঙ্গে যাইতেছিলেন। অনেক দূর পদব্রজে অগ্রসর হইয়া তাঁহারা সেই ধনাঢ্য মুরের গৃহে উপনীত হইয়া দেখিলেন, বাটীর ভিতর একটী উন্মুক্ত স্থানে একটী মঞ্চ রহিয়াছে, সেই মঞ্চের উপর ইষ্টক নির্ম্মিত ছাদ। কতকগুলি লেপ মঞ্চের উপর রক্ষিত হইয়াছে, দুইটী বৃহৎ ঝাড়ে তৈলের দীপ জ্বলিতেছে। দীপগুলি লৌহনির্ম্মিত—প্রত্যেকটীতে চারিটী করিয়া সলিতা, চারিটী অগ্নিমুখসদৃশ জ্বলিতেছে; সেই বৃহৎ প্রদীপ হইতে অতি তীব্র আলোক বিচ্ছুরিত হইয়া চতুর্দ্দিক আলোকিত করিয়া তুলিয়াছে।

তথায় অল্পকাল অপেক্ষা করিতে না করিতেই ভাস্কো-ডা-গামার জন্য একটী অশ্ব আনীত হইল। অশ্বের কোন সাজসজ্জা ছিল না দেখিয়া ডা-গামা পদব্রজেই আপন গন্তব্যস্থানে অগ্রসর হইলেন—অশ্বারোহণ করিলেন না। তাঁহারা বিশ্রামাগারে উপনীত হইবার পূর্ব্বেই জাহাজ হইতে তাঁহাদিগের কয়েকজন সঙ্গী ভাস্কো-ডা-গামার শয্যা ও কতক কতক নিতান্ত আবশ্যক জিনিসপত্র আনিয়া অপেক্ষা করিতেছিল।

ফিরিঙ্গিগণ মহানন্দে তাঁহাদিগের মালাবারের প্রথম রজনী অতিবাহিত করিলেন। তখন কে জানিত যে এই বণিকসম্প্রদায় একদিন মালাবারে একচ্ছত্র বণিক বলিয়া জগতে সুপরিচিত হইবেন—একদিন পর্ত্তুগালের কাব্যে, ইতিহাসে জয়যুক্ত হইয়া তাঁহারা সমগ্র য়ুনানীমণ্ডলীর প্রশংসাভাজন হইবেন? তখন কে মনে করিয়াছিল যে একদিন ফিরিঙ্গির দুর্গে, দুর্গপ্রাকারে মালাবারতীর কণ্টকিত হইয়া উঠিবে—ইহাঁদিগের বাণিজ্যে ও বাণিজ্যতরণীসমূহে ভারতবর্ষের সহিত অন্য জাতির বাণিজ্যসম্বন্ধ শিথিল হইয়া পড়িবে? তখন কে জানিত যে, যে মালাবারের অধিবাসীগণ আজ ফিরিঙ্গিবণিকদিগকে আশ্রয় প্রদান করিল, রাজার অধিক সন্মান প্রদর্শণ করিল—যে জামোরিণ নূতন অতিথিদিগকে দেখিয়া মুগ্ধচিত্তে আপন ভবনে, রাজসভাগৃহে তাঁহাদিগের অভিনন্দন করিলেন, অল্পকালমধ্যে তাঁহারাই মালাবার সিংহাসনের পরম শত্রুরূপে বজ্রনিনাদী-কামান হইতে অনলবর্ষণে মালাবার ধ্বংশ করিতে প্রয়াস পাইবেন—অবশেষে মালাবারে জাতীয় বিজয়পতাকা উড্ডীন করিয়া, পূর্ব্ব আতিথ্য স্মরণ পূর্ব্বক অধিবাসীদিগের নাসাকর্ণ ছেদন করিয়া সগর্ব্বে ধনরত্ন লুণ্ঠন করিবেন এবং পণ্যপূর্ণ শত শত বাণিজ্যতরণী পর্ত্তুগালে প্রেরণ করিয়া দেশের শ্রীবৃদ্ধি করিবেন? কিন্তু কালে এইরূপই ঘটিয়াছিল।

(৪)

উপঢৌকন।

আশায়, আকাঙ্ক্ষায়, উদ্বেগে উদ্বেলিতহৃদয় ভাস্কো-ডা-গামা যখন ভারতবর্ষ-আবিস্কারের গৌরবের সুখস্বপ্ন দেখিতে দেখিতে অজ্ঞাত সমুদ্রজলে অন্ধকার অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া, নরপতি ইমান্নুয়েলের উৎসাহবাক্যে হৃদয় মধ্যে বল সঞ্চয় করিয়া সমুদ্রযাত্রা করিয়াছিলেন, তখন নানা দেশের রাজন্যবর্গকে উপঢৌকন দিবার জন্য নানা সামগ্রীও সঙ্গে লইয়াছিলেন।

কোরিয়া (Correia) বলেন তখন ভাস্কো-ডা-গামার সঙ্গে অনেক বহুমূল্য সামগ্রী ছিল—বহুমূল্য পণ্যসম্ভারে সজ্জিত হইয়া ডা-গামার তরণী সমুদ্রে ভাসিয়াছিল। কোরিয়ার বর্ণনার সহিত আল্‌ভারেজের দিন-লিপির মিল দেখা যায় না। পর্ত্তুগাল পরিত্যাগের পর হইতেই আল্‌ভারেজ দিন-লিপি লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন—সেই দিন-লিপি "রটেরো" (Roteiro) নামে জগতে পরিচিত। দিন-লিপি পাঠে জানা যায় ভাস্কো-ডা-গামার জাহাজে প্রচুর পরিমাণে খাদ্যসামগ্রী ছিল—দড়িদড়া, শৃঙ্খল, লঙ্গর, গুণবৃক্ষ প্রভৃতিও আবশ্যকের অতিরিক্ত ছিল কিন্তু তরণী সজ্জিত করিতে ইমানুয়েল অধিক অর্থব্যয় করেন নাই। সেকালে পর্ত্তুগালে একখানি সাধারণ অর্ণবযান নির্ম্মাণ করিয়া ভারতবর্ষে পাঠাইতে সকলপ্রকারে ব্যয় ৬১,১৪০ মুদ্রা লাগিত। *

পর্ত্তুগাল হইতে একবার ভারতবর্ষে আগমন ও প্রত্যাগমনের উপযোগী সমুদ্রপোতের ব্যয়ই যখন এত লাগিত, তখন যে অর্ণবযান সর্ব্বপ্রথমে ভারতবর্ষ আবিষ্কার করিবার জন্য যাত্রা করিয়াছিল তাহার আয়োজনে কত ব্যয় হইয়াছিল তাহা সহজেই অনুমান করিতে পারা যায়। সুতরাং বহুমূল্য উপঢৌকনে তরণী সজ্জিত করিবার জন্য ইমানুয়েল যে তখন অধিক অর্থব্যয় করিয়াছিলেন তাহা সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। আর কাহার জন্যই বা তখন উপঢৌকনরাশি সংগ্রহ করিয়া পাঠাইবেন? যখন ভাস্কো-ডা-গামা পর্ত্তুগাল হইতে যাত্রা করিয়াছিলেন তখন কি কেহ মনে করিয়াছিলেন যে কোন

* The ordinary cost of construction and equipment of a single vessel intended for India, with the pay of the Captain and crew *for one voyage*, was calculated at £4076.—Sir W. W. Hunter's History of British India, Vol. I.

দিন তাঁহার সেণ্টরাফেল বা সেণ্টগ্যাবরিয়েল ভারতবর্ষের পাদমূলে আসিয়া দাঁড়াইবে ?

যাহা না হইলে চলিবেনা ডা-গামার সঙ্গে তখন তাহাই ছিল। কয়েকটী অনলবর্ষী কামান, উপযুক্ত পরিমাণ গোলা বারুদ এবং আরবি ভাষাভিদ্ নাবিক, ইহাই ডা-গামা সঙ্গে লইয়াছিলেন। আর ছিল, অষ্টাদশজন হতভাগ্য রাজবন্দী তাহারা "ডিগ্রেডাডো" (Degradadors) নামে পরিচিত ছিল। পূর্ব্বকৃত গুরুতর অপরাধের নিমিত্ত ইহাদিগের প্রত্যেকের উপরেই প্রাণদণ্ডের আদেশ ছিল। কোন নূতন স্থানে জাহাজ লাগিলেই প্রথমে ইহাদিগকে নামাইয়া দেওয়া হইত। স্থানের অবস্থা, দেশের অবস্থা, অধিবাসীদিগের ব্যবহার ও চরিত্র প্রভৃতি নানা তথ্য সংগ্রহ করিবার জন্য ইহারাই প্রথমে জাহাজ পরিত্যাগ করিয়া ক্ষুদ্র তরণী আরোহণে তীরে আসিত। অনেক সময় নূতন স্থানের নূতন অধিবাসীদিগের হস্তে লাঞ্ছিত ও নিপীড়িত হইয়া অনেককে প্রাণ বিসর্জ্জণ দিতে হইত। যাহার অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হইত, পরিত্যক্ত অবস্থায় বিদেশে বিপদের মধ্যে থাকিয়া সেই হতভাগ্য যখন নূতন দেশের ভাষা ও রীতিনীতি শিক্ষা করিয়া ভবিষ্যৎ আবিষ্কারের পথ সুগম করিয়া দিত—তখন রাজার অনুগ্রহে তাহার মুক্তিলাভ ঘটিত। ভাস্কো-ডা-গামার সঙ্গেও তাই " ডিগ্রেডাডো " ছিল—তিনি আফ্রিকার উপকূলে অনেককে পরিত্যাগও করিয়া আসিয়াছিলেন। যাহা হউক, এই প্রকারে সজ্জিত হইয়া ডা-গামা ভারত আবিষ্কারে যাত্রা করিয়াছিলেন ; কোরিয়া বর্ণিত বহুমূল্য উপঢৌকনাদির কথা দিন-লিপিতে দেখা যায় না।

ভারতবর্ষের পথে আফ্রিকার যে সকল স্থানে ডা-গামা জাহাজ বাঁধাইয়াছিলেন সেই সকল স্থানের অধিবাসীগণ দলে দলে সেই

অভিনবদৃশ্য দেখিবার জন্য বিস্ময়বিহ্বলচিত্তে সাগরতীরে আসিয়া দাঁড়াইত। ডা-গামা তাহাদিগকে লোহিত বর্ণের টুপি, ছোট ছোট ঘণ্টা প্রভৃতি দিয়া বিদায় করিতেন;—তাহারা সেই সকল সামগ্রী বহুমূল্যজ্ঞানে গ্রহণ করিয়া তৎপরিবর্ত্তে দ্বিরদরদবিনির্ম্মিত অলঙ্কারাদি দিয়া প্রফুল্লচিত্তে করতালি দিতে দিতে গৃহে ফিরিয়া যাইত এবং আর সকলকে ডাকিয়া দেখাইত 'দেখ আমি কি আনিয়াছি'! কোন কোন স্থানে পীতবর্ণ কাচখণ্ডের বিনিময়ে ভাস্কো-ডা-গামা প্রচুর পরিমাণে কুক্কুট, মেষ, কপোত প্রভৃতি প্রাপ্ত হইতেন। এইরূপে যখন তিনি প্রথমে মোম্বাসায় পৌঁছেন তখন মোম্বাসার রাজার নিকটে একটী প্রবাল-শাঁখা পাঠাইয়াছিলেন—ইহাই তাঁহার বহুমূল্য উপঢৌকন!

কালিকাটে পৌঁছিবার অব্যবহিত পূর্ব্বে মেলিণ্ডিতে আসিয়া ডা-গামার সহিত তিনখানি ভারতীয় বাণিজ্য পোতের সাক্ষাৎ হইয়াছিল। এইস্থান হইতে একজন পথপ্রদর্শক লইবার মানসে তিনি মেলিণ্ডির মুসলমান অধিপতির সহিত বন্ধুত্ব সংস্থাপনে চেষ্টিত ছিলেন। তৎকালে মেলিণ্ডি একটী সমৃদ্ধিশালী নগর বলিয়া পরিচিত ছিল। মেলিণ্ডির মুসলমান অধিপতি নীলবর্ণের সাটিনের রাজবেশ পরিধান করিয়া, বহুমূল্য শিরস্ত্রাণে সুশোভিত হইয়া ডা-গামার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন; তাঁহার সঙ্গে তখন গদি (cushion) দেওয়া দুইখানি পিত্তল-সিংহাসন এবং রক্তবর্ণের সাটিনের চন্দ্রাতপ আসিয়াছিল। তাঁহার শরীর-রক্ষক-ভৃত্যের কটিদেশে রৌপ্যকোষমধ্যে তীক্ষ্ণধার তরবারি ঝুলিতেছিল। ধনবান বন্ধুর সম্মানরক্ষার্থ ডা-গামা অবশ্য তাঁহাকে মূল্যবান্ উপহারই প্রদান করিয়াছিলেন। আল্‌ভারেজ লিখিয়া গিয়াছেন মেলিণ্ডির অধিপতির জন্য নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি প্রেরিত হইয়াছিল:—একটী বৃহৎ অঙ্গরাখা, দুইটী প্রবাল-শাঁখা

একটী বিলাতী টুপি, দুইখণ্ড চারখানার-বস্ত্র (lambis), কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘণ্টা এবং তিনটী জলপাত্র।

জামোরিণের সহিত সাক্ষাৎ করিবার পরদিন প্রভাতে ভাস্কো-ডা-গামা বাছিয়া বাছিয়া সর্ব্বোৎকৃষ্ট সামগ্রীগুলিই উপঢৌকন দিবার জন্য বাহির করিয়াছিলেন। যদি তাঁহার সঙ্গে কোরিয়া-বর্ণিত মূল্যবান দ্রব্যাদিই থাকিত তাহা হইলে জামোরিণের জন্য বারখানি চারখানার-বস্ত্র, রক্তবর্ণের চারিটী হুড (hood), ছয়টী বিলাতী টুপি, চারিটী প্রবাল-শাঁখা, ছয়টী পাত্র এবং মধুপূর্ণ দুইটী ও তৈল পূর্ণ দুইটী সর্ব্বসমেত চারিটী ধাতু নির্ম্মিত কৌটা উপঢৌকন-স্বরূপ বাহির করিতেন না।* ভাস্কো-ডা-গামা হয়ত মনে করিয়াছিলেন এতগুলি দ্রব্য একত্রে দেখিলে জামোরিণ অবশ্য তৃপ্তই হইবেন।

রাজ্যের নিয়মানুসারে দুই জন প্রধান অমাত্যের নিকট সংবাদ প্রেরিত হইল পূর্ব্বে তাঁহাদিগকে না দেখাইয়া কিছুই জামোরিণের নিকট প্রেরিত হইত না। তাঁহারা আসিয়া ভাস্কো-ডা-গামার রাজোপহার দর্শন মাত্রেই উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিলেন। হাসিতে হাসিতে বলিলেন "এ সকল সামগ্রীর কার্য্য নহে—এ সমুদয় রাজার নিকট পাঠাইতে পারা যায় না। মক্কার অতি দীনদরিদ্র আসিয়াও ইহা অপেক্ষা অনেক অধিক দিয়া থাকে। যদি সত্য সত্যই জামোরিণ সমীপে উপঢৌকন পাঠাইবার ইচ্ছা হয় তাহা হইলে সুবর্ণ

---

* M. Taylor যে তালিকা দিয়াছেন তাহা একটু স্বতন্ত্র। নিম্নে তালিকা প্রদত্ত হইল :—

Four pieces of scarlet cloth, six hats, four branches of coral, six almasars, a parcel of brass, a box of sugar, two barrels of oil and one of honey, were selected from the stock, and, as may be supposed, these homely articles were laughed at. History of British India, p. 217.

পাঠাইবার প্রয়োজন। এই দীন উপহার গ্রহণ করিতে জামোরিণ নিতান্ত অক্ষম হইবেন। এ সকল দ্রব্য আমরা রাজদরবারে পাঠাইব না।”

রাজ-অমাত্যের কথা শুনিয়া ভাস্কো-ডা-গামা নিতান্ত বিষণ্ণ হইলেন। গম্ভীর ভাবে বলিলেন, “আমি কনকস্তূপ সঙ্গে লইয়া এদেশে আসি নাই—ভারতে বাণিজ্য করাও আমার উদ্দেশ্য নহে। আমি শুধু পর্ত্তুগালাধীপের দূতরূপে আসিয়াছি। আমার যাহা আছে তাহারই মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট সামগ্রী আমি জামোরিণের জন্য বাহির করিয়াছি। পর্ত্তুগালের নরপতি ইমান্নুয়েল এ সকল সামগ্রী প্রেরণ করেন নাই—এ সমস্তই আমার নিজের।* আবার যখন পর্ত্তুগালের দূত এদেশে আসিবেন তখন নরপতি ইমান্নুয়েল তাঁহার সহিত অনেক বহুমূল্য উপঢৌকন প্রেরণ করিবেন। যদি রাজাধিরাজ জামোরিণ নিতান্তই এ সকল সামগ্রী গ্রহণ না করেন তাহা হইলে আমি আর কি করিব? বাধ্য হইয়া আমার জাহাজে ফিরিয়া যাইব।” রাজ-অমাত্যগণ সে কথা শুনিলেন না। এই সামান্য উপহার তাঁহারা কোন ক্রমেই জামোরিণের নিকট পাঠাইতে সম্মত হইলেন না। কতকগুলি মুর বণিক সেই সময় তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল; তাহারাও বলিল “এ সকল সামান্য দ্রব্য জামোরিণের উপযুক্ত নহে।” ভাস্কো-ডা-গামা চিন্তান্বিত হইলেন।

নিরুপায় ফিরিঙ্গিবণিক শেষে বলিলেন “যদি তোমরা নিতান্তই আমার উপঢৌকন রাজগোচরে পাঠাইবেনা স্থির করিয়াছ, আমাকে তাঁহার নিকট লইয়া চল। তাঁহাকে যাহা বলিবার আছে তাহা বলিয়া আমি আমার জাহাজে ফিরিয়া যাই।” তাহাও হইল না।

* কোরিয়া-বর্ণিত বহুমূল্য উপঢৌকনের কথা যে অলীক ভাস্কো-ডা-গামার কথাই তাহার অন্যতম প্রমাণ। প্রঃ লেঃ।

এ বিষয় জামোরিণের সহিত পরামর্শ করিয়া তাহারা উত্তর দিবে বলিয়া প্রস্থান করিল। ডা-গামা হতাশহৃদয়ে সেই স্থানে বসিয়া রহিলেন। অপেক্ষা করিতে করিতে সমস্ত দিন অতিবাহিত হইল, কেহই আর আসিল না। তাঁহার সহচরগণ "নেটিভের" বাঁশীর গান শুনিয়া, নৃত্য ও গীতে সে রজনী যাপন করিলেন। ডা-গামার হৃদয় নানাবিধ সন্দেহে আন্দোলিত হইতে লাগিল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন এদেশের লোক কি শঠ! কি প্রবঞ্চক!

পরদিন প্রত্যুষে পূর্ব্বকথিত মুরগণ আসিয়া ভাস্কো-ডা-গামা ও তাঁহার সঙ্গীদিগকে রাজপ্রাসাদে লইয়া চলিল। তখন প্রাসাদের চতুর্দ্দিকে শস্ত্রধারী সিপাহীগণ সতর্ক পাহারায় নিযুক্ত ছিল। প্রাসাদ-কক্ষে প্রায় চারি ঘণ্টা অপেক্ষা করিবার পর সংবাদ আসিল ডা-গামা দুই জন সঙ্গীর অধিক লইয়া রাজদর্শনে যাইতে পারিবেন না—সে দুইজনেরও পূর্ব্বে পরিচয় প্রদান করা আবশ্যক। তিনি তাহাতেই সম্মত হইয়া একজন দোভাষী ও আর একজন সহযাত্রী সমভিব্যাহারে জামোরিণ-দরবারে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন।

কক্ষান্তরে জামোরিণের সম্মুখে নীত হইলে পর জামোরিণ কহিলেন—

"আমি মনে করিয়াছিলাম আপনি গত কল্যই আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিবেন, কৈ আসিলেন না ত?"

ভাস্কো। "পথশ্রমে বড়ই পরিশ্রান্ত হইয়াছিলাম, তাই আসিতে পারি নাই। সে ক্রটী মার্জ্জনা করুন।"

জামো। "সে দিন আপনি বলিয়াছিলেন যে একটী মহাসমৃদ্ধিশালী দেশ হইতে আসিয়াছেন; কিন্তু কৈ, আমার জন্য কিছুই আনেন নাই? যে পত্রের কথা বলিয়াছিলেন তাহাও ত দিলেন না।"

ভাস্কো। "রাজাধিরাজ! আমি আপনার উপযুক্ত কোন দ্রব্যই সঙ্গে আনিতে পারি নাই; আমি ভারতবর্ষের অন্বেষণে বাহির হইয়াছিলাম মাত্র—এ কেবল আবিষ্কারের যাত্রা। যখন পর্ত্তুগালের জাহাজ পুনরায় এদেশে আসিবে তখন আপনার উপযুক্ত উপহারও অবশ্যই আসিবে। পত্রখানি আমার নিকটেই আছে, আজ্ঞা পাইলেই তাহা দিতে পারি।"

জামো। "কি বলিলেন? আপনি আবিষ্কার করিতে আসিয়াছেন? কি আবিষ্কার? পাথর না মানুষ? যদি মানুষ দেখিতে আসিয়া থাকেন তবে কিছুই সঙ্গে আনেন নাই, সে কি?"

* * * * *

এইরূপ কথোপকথনান্তর ভাস্কো-ডা-গামা নরপতি ইমানুয়েলের পত্র বাহির করিলেন। লিপিদ্বয়ের মধ্যে একখানি আরব্য ভাষায় লিখিত ছিল। পত্র পাঠে জামোরিণ অত্যন্ত প্রীত হইয়া ডা-গামাকে ভারতে অবাধ বাণিজ্যের অধিকার প্রদান* করিয়া বলিলেন—

"আপনার দেশ হইতে কোন্ কোন্ সামগ্রী বাণিজ্যের জন্য রপ্তানী হইয়া থাকে?"

ভাস্কো। "নানাবিধ বসন, গম, লৌহ, পিত্তল প্রভৃতি অনেক দ্রব্যই রপ্তানী হয়।"

জামো। কোনরূপ পণ্যদ্রব্য আপনার সঙ্গে আছে কি?"

ভাস্কো। "আজ্ঞা হাঁ। সকল প্রকার পণ্যেরই নমুনামাত্র সঙ্গে

---

* The letters sent by the king of Portugal, one of which was fortunately written in Arabic, were, however, honourably received by the Zamorin, who gave permission to De Gama to open trade.—History of British India—M. Taylor.

করিয়া আনিয়াছি ; আদেশ পাইলেই জাহাজ হইতে নামাইয়া আনিতে পারি।”

জামো। “ভাল, আপনি সঙ্গীগণসহ অবিলম্বে জাহাজে গমন করুন। নিরাপদস্থানে জাহাজ রক্ষা করিয়া সুবিধামত পণ্যদ্রব্য বিক্রয় করিতে থাকুন।”

জামোরিণের ভরসা ছিল ফিরিঙ্গিদিগের অর্থে রাজকোষ অবিলম্বে পূর্ণ হইবে †, তাই তিনি পূর্ব্বাপর বিবেচনা না করিয়াই মালাবার তীরের সকল বন্দরেই ভাস্কো-ডা-গামাকে বাণিজ্য করিবার অধিকার প্রদান করিলেন ; জামোরিণ সেইদিন যে ভ্রম করিয়াছিলেন বহুকালেও তাহার সংশোধন হয় নাই। ভাস্কো-ডা-গামা আশাতীত অধিকার লাভ করিয়া নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করিলেন বটে, কিন্তু সে সৌভাগ্য কতদিন স্থির ছিল ? অতি অল্পকালমধ্যেই তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে ভারতে বাণিজ্য করিতে হইলে অগ্রে বল-সঞ্চয় করা প্রয়োজন। ফিরিঙ্গিবণিকদিগের সে কাহিনী ইতিহাসে সুপরিচিত। [ক্রমশঃ]

শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য।

---

† The Zamorin of Calicut received them graciously and looked forward to an increased customs-revenue from their trade. —Sir. W. W. Hunter's British India.

ইংরাজস্বার্থ এবং দেশের হিত।

এদেশের যখন ভারতবর্ষ নাম ছিল, তখন অধিবাসীরা দেশটাকে আমাদের দেশ বলিতে পারিতেন। সেত অতি প্রাচীন কালের কথা; ত্রয়োদশ শতাব্দীরও পূর্ব্বের কথা। তাহার পর দেশের নাম হইল হিন্দুস্থান, তখনও এদেশের অধিবাসীরাই দেশটাকে আমাদের দেশ বলিতেন; কারণ যাহাদের পূর্ব্বনিবাস যেখানেই থাকুক, রাজা প্রজা সকলেই এদেশের অধিবাসী হইয়া গিয়াছিলেন। এখন দেশের নাম বৃটিশ-ইণ্ডিয়া। প্রাচীন ভারতবর্ষ অথবা হিন্দুস্থানের অধিবাসীদিগের বংশধরেরা আর এ দেশকে আমাদের দেশ বলিতে পারেন না। বলিলে, রাজবিদ্রোহের উদ্যোগের অপরাধ হয় কি না, তাহা হাইকোর্টের সরকারী এড্‌ভোকেটকে জিজ্ঞাসা করিলে হয়।

এদেশ, ভারতবর্ষ নহে, হিন্দুস্থান নহে—ইহা বৃটিশ ইণ্ডিয়া এবং আমরা তথাকার অধিকারহীন সানুগ্রহ-রক্ষিত প্রজা। এই অতি সহজ এবং সুস্পষ্ট কথাটি ভুলিয়া যাই বলিয়া, আমরা ইংরাজসরকারের অনেক বিধিব্যবস্থা লক্ষ্য করিয়া বৃথা চিৎকার এবং নিস্ফল আন্দোলন করিয়া থাকি।

পেটেণ্ট-ঔষধ-বিক্রেতা বিজ্ঞাপনে লিখিয়া দেন, যে তাঁহার ঔষধ ক্রয় করিলে "উপকার হইবে"। উপকার হইবে, একথাটি সত্য; কিন্তু সে উপকার ক্রেতার কি বিক্রেতার, একথা বুঝিতে না পারিয়া অনেক বুদ্ধিহীন ক্রেতা অসন্তুষ্ট হইয়া থাকেন। ইংরাজসরকার যখন বৃটিশ ইণ্ডিয়ার শাসন এবং পালনের জন্য কোন বিধান করেন, তখন যদি কেহ লুপ্ত ভারতবর্ষ অথবা সাবেক হিন্দুস্থানের বংশধরদিগের হিত বা অহিতের কথা লক্ষ্য করিয়া উহার সমালোচনা করেন, তবে

তিনি নির্ব্বোধ। শাসনকর্ত্তারা কোন ব্যবস্থাকে যখন "উপকারী" বলেন, তখন উহাকে অহিতকর প্রপঞ্চ মনে করিবার পূর্ব্বে যদি "কাহার ?" এই বীজমন্ত্রটি উচ্চারণ করা যায়, তাহা হইলেই মায়ামোহ কাটিয়া যাইবে।

যাহারা লোকবিশেষ বা জাতিবিশেষের উপকারের জন্য ব্যস্ত, তাহারা অদূরদর্শী। ইংরাজ দূরদর্শী ; তিনি সর্ব্বদাই বৃটিশ-ইণ্ডিয়ার হিতসাধনে নিযুক্ত। যদি ঐ মুখ্য কার্য্যের ফলে গৌণভাবে কোন জাতিবিশেষের উপকার হয়, ভালই ; না হইলেও ক্ষতি নাই। ইংরাজ বাহুবলে এদেশ জয় করিয়াছেন, কাজেই দেশটি যাহাতে চিরদিনের মত সুরক্ষিত থাকে, তাহা তাঁহাকে করিতেই হইবে। এই শাসন এবং রক্ষাকার্য্যের সুবিধার জন্য রেল চাই, টেলিগ্রাফ চাই, ডাকবিভাগ চাই। মনে কর যদি আমরা সকলেই থিয়সফির মহিমায় যোগবল-সম্পন্ন হইতাম, এবং ঐ ব্যবস্থাগুলি আমাদের প্রয়োজনে না লাগিত, তাহা হইলেও সুদৃঢ় এবং শান্তিপূর্ণ একচ্ছত্র রাজত্বের জন্য ইংরাজকে ঐগুলি প্রতিষ্ঠিত করিতে হইত। তোমার আমার সুবিধা এইরূপ সর্ব্বত্রই গৌণভাবে হইয়া থাকে।

বাঙ্গালী বলিয়া একটা জাতি গঠিত হওয়া উচিত কি না, ইহা বৃটিশ ইণ্ডিয়ার উদার রাষ্ট্রনীতির সমস্যা নহে। আমরা যাহাকে বঙ্গদেশ বলিতাম বা বলিতে চাই, যদি সে দেশের প্রত্যেক ক্ষুদ্র বিভাগের লোকের ভাষা, অন্য বিভাগের লোকের নিকট দুর্ব্বোধ্য হইলে, বৃটিশ ইণ্ডিয়ার ভিত্তি দৃঢ়তর হয়, তবে একটা ক্ষুদ্র জাতীর কথায় কে কর্ণপাত করিবে? ইংরাজের হিতকর হইলে, দেশটা দ্বিখণ্ডিত কেন, শতধা বিভক্ত হইতে পারে। উহাতে ক্ষুদ্র জাতিবিশেষের যে সকল অনিষ্ট হইবে, সেইগুলিই যদি শাসনের জন্য প্রয়োজনীয়, তবে নিশ্চয়ই তাহা সযত্নে লক্ষ্য করিয়া নূতন বিধি প্রণীত হইয়াছে। আন্দোলনের সময় যখন

আমরা অনিষ্টগুলি (বৃটিশ ইষ্টগুলি) প্রদর্শন করিয়া বলিব যে আমাদের যুক্তিগুলি অত্যন্ত অকাট্য, তখন নিশ্চয়ই বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট মুখ লুকাইয়া হাসিবেন। একের অনিষ্ট যখন অন্যের ইষ্ট, তখন আমাদের উপায় কি?

যখন বৃটিশ ইণ্ডিয়াকে ভারতবর্ষ বলিয়া স্বপ্ন দেখি, যখন পূর্ব্বসীমান্তে একটা প্রদেশকে বাঙ্গালিজাতির দেশ বলিয়া কল্পনা করি, তখনই গোলে পড়ি। বড় লাট যখন বলেন, যে আমরা আমাদের উপকার যতটা না বুঝি তিনি তাহা অপেক্ষা অধিক বুঝেন, তখন আমরা উক্তবিধ স্বপ্ন এবং কল্পনার মোহে জড়িত হইয়া ভাবি, "যে মা'র চাইতে ভালবাসে তাকে বলি একটু খারাপ কিছু"। কিন্তু লাট সাহেবের কথা যে অক্ষরে অক্ষরে সত্য তাহাতে আমার বিশ্বাস আছে। তিনি "খারাপ কিছু" নহেন, তিনি বৃটিশ ইণ্ডিয়ার মঙ্গলময় বিধাতা।

কেহ কেহ বলিতে পারেন, যে যদি সেই কথাই হয়, তবে গবর্ণমেণ্ট তাহা স্পষ্ট করিয়া বলেন না কেন? এবং দেখিতে পাওয়া যায়, যে উল্টাপদ্ধতিতে গবর্ণমেণ্ট বুঝাইতে চেষ্টা করেন, যে বিধিবিশেষ জাতিবিশেষের মঙ্গলের জন্যই রচিত। কেন যে গবর্ণমেণ্ট তাহা করেন, তাহার কৈফিয়ৎ দিবার জন্য তিনি বাধ্য নহেন। সেটা তাঁহার স্বভাব। এই স্বভাবের কথাটাও আমাদের ভাল করিয়া বুঝিয়া লওয়া উচিত। দেবতার স্বরূপ চিন্তা করিলে নির্ব্বাণ মুক্তি হয় কি না, তাহা অদৃশ্য কথা; কিন্তু শাসনকর্ত্তাদের স্বরূপ বুঝিতে পারিলে যে উহা সুলভ হয়, তাহা প্রত্যক্ষ।

স্বরূপনির্ণয় করিতে হইলে ইংরাজজাতির একটা মৌলিক প্রকৃতির প্রতি প্রথম লক্ষ্য করা উচিত। ইংরাজেরা স্বভাবতঃ অত্যন্ত দাম্ভিক, এবং পরের গুণ বা মাহাত্ম্য দর্শনে অত্যন্ত অনুৎসাহী। একথা অনেক ইংরাজই স্বীকার করিয়া থাকেন; ষ্টিভেনসন্ সাহেবের প্রবন্ধগ্রন্থে ইহার

বিস্তারিত আলোচনা দেখিতে পাই। এই জন্যই দেখিতে পাই যে, যদিও এদেশ ইংরাজের, তবুও এদেশের প্রত্নতত্ত্ব অন্যান্য ইউরোপীয় জাতির পণ্ডিতেরা যত উদ্ধার করিয়াছেন, ইংরাজেরা তাহার শতাংশের একাংশও করেন নাই। যাহাকে বিদ্যার জন্য বিদ্যালাভ বলে, প্রত্নতত্ত্ব উদ্ধারের জন্য নিঃস্বার্থ অনুসন্ধান বলে, সে ভাবটি প্রায়শঃ ইংরাজদিগের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় না। যদি প্রত্নতত্ত্ব করিতে গেলে কোন একটা শাসনকার্য্যের সুবিধা হয়, তবে ইংরাজ তাহা করিতে অগ্রসর হয়েন; সঙ্গে সঙ্গে যদি প্রত্নতত্ত্বটা ফুটিয়া উঠে, ভালই। শ্রীরাধা দেখিলেন যে শ্রীকৃষ্ণ কদাপি তাঁহার কুঞ্জে আসেন না অথচ তাঁহার জন্য মালা না গাঁথিলেও নয়, তখন তিনি একদিন সজিনাফুলের মালা গাঁথিলেন। উদ্দেশ্য এই, যদি কৃষ্ণ আসেন, ভালই; না আসিলে ভাজিয়া খাওয়া যাইবে। ইংরাজের প্রত্নতত্ত্ব যে অনেক স্থলে এইরূপ তাহার দৃষ্টান্ত দিতেছি। দৃষ্টান্তটি এই প্রবন্ধের বিশেষ উপযোগী; অবান্তর কথা নহে।

যদি দেশ জয় করিবার উদ্দেশ্যে বা বানিজ্যের সুবিধার জন্য কেহ কোন দেশে যায়, তবে দেশের লোকেরা কদাপি তাহাকে কোন সংবাদ দিবে না। সেরূপ স্থলে যদি নিঃস্বার্থ ভৌগলিক অনুসন্ধান আরম্ভ করা যায়, তবে ফললাভ হয়। ভৌগলিক তত্ত্বের নামে যদি তিব্বতের পথঘাটের কথা ভাল জানা যায়, এবং সঙ্গে সঙ্গে চুম্বির মহিমা এবং সুলভতার কথা বলা যায়, তাহা হইলে তিব্বত অভিযানের অনেক পূর্ব্বেই অনুসন্ধানের সুফল ফলিয়া যায়। অনেক সময়ে এই নিঃস্বার্থ অনুসন্ধানের অর্থ সহসা বুঝিয়া উঠিতে পারা যায় না। বাঙ্গালার ভাষাভেদ ঘটাইবার প্রস্তাবের বহুপূর্ব্বে গ্রিয়ারসন্ এবং রিজ্‌লি. বাঙ্গালা ভাষার প্রকৃতি সম্বন্ধে যে সকল কথা লিখিয়াছিলেন, তাহা তখন অনেকেই ভ্রমাত্মক বলিয়া বুঝিয়াছিলেন বটে; কিন্তু ঐ নিঃস্বার্থ

তত্ত্বের দোহাই দিয়া পরে যে একটা বৃহৎ অনুষ্ঠান করা হইবে তাহা প্রায়শঃ কাহারো মাথায় প্রবেশ করে নাই। সংস্কৃত কখনও কথা কহিবার ভাষা ছিল কি না, এই বিষয়ে প্রসিদ্ধ রাপসন্ (Rapson) সাহেব রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটিতে একটি চমৎকার প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন; এবং সুবিজ্ঞ টমসন্ তাহার পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন। গ্রিয়ারসনকে নাকি দেখাইতে হইবে, যে একালের বাঙ্গালা সাহিত্যের ভাষা একটা কৃত্রিম ভাষা, এবং প্রাদেশিক ভাষায় গ্রন্থাদি রচিত হইলে বাঙ্গালা সাহিত্যের অধিক উন্নতি হইবে, কাজেই তিনি সেই সভাতেও গোড়াপত্তন করিয়া রাপসনের প্রবন্ধের বিশেষ প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। ইংলণ্ডের প্রাদেশিক ভাষাগুলি সাহিত্যের আদর্শ-ভাষার চাপে মরিয়া গিয়া দেশময় একটা ভাষা কিরূপ প্রচলিত হইয়াছে, তাহার দৃষ্টান্ত দিয়া যখন টমসন বলিলেন, যে সেকালের বিভিন্ন প্রাকৃত ভাষাগুলির সহিত সংস্কৃত ভাষার অতিশয় নৈকট্য, এবং যে কোন প্রাকৃত জানিলে অনায়াসে সংস্কৃত বুঝিতে পারা যাইত, তখন গ্রিয়ার্শন এবং ফ্লিট্ (Fleet) অনেক বাজে কথা বলিয়া, এবং ভারতবর্ষীয় অভিজ্ঞতার দোহাই দিয়া একটা অযৌক্তিক প্রতিবাদ উপস্থিত করিলেন। ঐ দৃষ্টান্ত সত্য বলিয়া গ্রহণ করিলে বঙ্গদেশের সাহিত্যের ভাষাকে অকৃত্রিম এবং উপযোগী বলিয়া স্বীকার করিতে হইত। কাজেই এত বিতণ্ডা, এবং এতটা নিঃস্বার্থ ঐতিহাসিক গবেষণা! "প্রয়োজনমনুদ্দিশ্য ন মন্দোঽপি প্রবর্ত্ততে", কথাটা এই সকল তত্ত্ববিদেরা বিশেষ করিয়া বুঝিয়া লইয়াছেন।

যাঁহারা কোন অনুষ্ঠানের পূর্ব্বে এমন করিয়া দৃঢ় ভিত্তিস্থাপন করেন, তাঁহাদের উদ্দিষ্ট কার্য্য কি আমরা কোন প্রকারে বাধা দিতে পারিব? যতই আন্দোলন করি, যতই চিৎকার করি, কিন্তু,—ন্যায্যাৎ পথঃ-প্রবিচলন্তি পদং ন ধীরাঃ। তবে উপায় কি? যদি বৃটিশ ইণ্ডিয়ার

মঙ্গলের জন্য যে সকল বিধি ব্যবস্থা হয়, তাহাতে আমরা পীড়িত হই, আমরা করিব কি ?

বঙ্গদেশে দেখিতে পাই যে অনেক অনার্য্য নিম্নশ্রেণীর জাতি, ব্রাহ্মণদিগকে আদর্শ করিয়া ব্রাহ্মণ্য রীতি নীতি অবলম্বন করিয়াছে। ধোবারাও বিধবা বিবাহ দেয় না, এবং অবস্থা ভাল হইলে উহাদের বিধবারা একাদশীও করে। ছোটনাগপুর অঞ্চলে এবং অনার্য্যবহুল অন্যান্য স্থানে এখনও অনেক অনার্য্যেরা হিন্দু প্রতিবেশীর আচার এবং ধর্ম্ম ধীরে ধীরে গ্রহণ করিয়া অল্পাধিক পরিমাণে হিন্দুদিগের সহিত অলক্ষ্যে মিলনের উপায় করিতেছে। বঙ্গ প্রভৃতি দেশের বিষময় ফল দেখিয়া ইংরেজ সরকার এই মিলনকে প্রার্থনীয় মনে করেন না। প্রত্নতত্ত্ব এবং জাতিতত্ত্বের গভীর গবেষণা প্রদর্শন করিয়া রিজলী এবং গেট সাহেব আদমসুমারির রিপোর্টে আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন, যে হায় হায়! অনার্য্যেরা ভ্রমে পড়িয়া আপনাদের জাতীয়ত্ব হারাইতেছে এবং প্রাচীন ঐতিহাসিক নিদর্শন নষ্ট করিতেছে। উহারা যখন দলে দলে খৃষ্টান হয় তখন এই মহাত্মাদের অশ্রুপাত হয় না ; কিন্তু ব্রাহ্মণের আদর্শ, স্বদেশের আদর্শ, গ্রহণ করিলে যত দুঃখের উদ্রেক হয় ; এবং ইতিহাসের কথা মনে পড়ে। আমাদের দেশের নিম্নশ্রেণীর লোকদিগের উপর উচ্চশ্রেণীর প্রভাব যত কম পরিমাণে বিস্তৃত হয়, ততই তাহা বৃটীশ সিংহের উদার রাষ্ট্রনীতির অনুকূল হয়। আমরা পথও চিনি ঘাটও চিনি, ইতিহাসও বুঝি প্রত্নতত্ত্বও বুঝি, কিন্তু কি বলিব মরিয়া আছি।

মহাত্মাদের ভারতীয় ধর্ম্মজ্ঞান যে কত সূক্ষ্ম তাহা ১৯০১ সালের সেন্সস্ রিপোর্ট হইতেই দেখাইতেছি। ঐ রিপোর্টের প্রথম খণ্ডের প্রথম ভাগের অষ্টম অধ্যায়ে ভারতের ধর্ম্মতত্ত্বের ইতিহাস আছে। শ্রীপঞ্চমী পূজাটা কি, ইহার তীক্ষ্ণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া সাহেব বাহাদুর তাঁহার আর্দালিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, যে পূজাটা কি ?

আর্দালিও তাহার ইতিহাস দিল। আর্দালির মুখে শ্রীপঞ্চমীর ইতিহাস কথা শুনিয়া পাঠকেরা বিস্মিত হইতে পারেন বলিয়া কথা কয়টি রিজ্‌লি সাহেবের নিজের ভাষায় উদ্ধৃত করিতেছি :—

I asked one of the ordarlies what worship he had done on this particular occasion and he was good enough to give me, knowing that I was interested in the subject, a minute description of the ritual observed.

আর্দালির মুখে যখন শুনিলেন যে তাহারা দোয়াত সাজাইয়া পূজা করিয়াছিল, তখন সাহেবের বিস্ময় হইল; তিনি ভাবিলেন যে "why it was that in the centre of the altar was placed as the principal fetish a common English glass inkpot with a screw-top." তিনি দেখিলেন যে আর্দালিরা কৃষক জাতি; উহাদের লাঙ্গল পূজা করা উচিত, দোয়াত পূজা করিল কেন? প্রথমে ইংরাজি টুকুই তুলিতেছি।

I asked my informant who is a small landowner, in one of the Hill States near Simla, what he meant by worshipping an imported inkpot when he *ought to have worshipped a country-made plough.* He admitted the anomaly, but justified it by observing that after all he drew pay from the department; that the inkpot was the emblem of the Government; and that he left the plough in the Hills. These are the lower aspects of Hinduism.

আর্দালিটার সিমলা অঞ্চলে কিছু জমি ছিল সেই জন্য জিজ্ঞাসা করিলেন, যে তাহার যখন লাঙ্গল পূজা করা উচিত ছিল, তখন দোয়াত পূজা করিল কেন? কি যে উচিত ছিল তাহা প্রত্নতত্ত্ববিদের পূরো জানা! আর্দালি স্বীকার করিল যে তাহার ভুল হইয়াছে। বটেই ত! সে বেচারাকে যদি জিজ্ঞাসা করিতেন, যে তুই পূজা না

করিয়া দোয়াতটা গিলিয়া খাইলি না কেন, তাহা হইলেও যে সে ভুল স্বীকার করিত তাহা সাহেব বাহাদুর বুঝিলেন না। কিন্তু যাহা হউক আর্দালি, সাহেবকে খুসী করিয়া দিল। সে বলিল, সরকার বাহাদুর যখন অন্নদাতা, তখন সরকারের পূজা করা চাই। বিলাতি দোয়াতটা গবর্ণমেণ্টের প্রতিমা; তাই উহার পূজা হইল। উহার রাজভক্তিতে মুগ্ধ হইয়া সাহেব যে উহাকে অচিরাৎ ডিপুটিগিরি দিয়া রায়বাহাদুর করিবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। এখন যদি রিজ্‌লি সাহেব তাঁহার চাপরাসীর বাড়াতে সনন্দীভৃঙ্গী মহাদেবের পূজা দেখেন, তাহা হইলে অনুসন্ধানে জানিতে পারিবেন, যে তাহারা রিজ্‌লি, গেট্‌ এবং কর্জনের প্রতিমূর্ত্তি পূজা করে।

এই শ্রীপঞ্চমী পূজা প্রসঙ্গেও ব্রাহ্মণের উপর কটাক্ষ করিতে ভুলেন নাই। The Brahman recited various cabalistic formulæ, supposed to be texts from the Vedas...attacked a vast mass of sweetmeats......and ate as much as he could. হায়, ভারতের গরিব ব্রাহ্মণ! মৃত, পদদলিত ব্রাহ্মণকে লইয়া আর এই নিষ্ঠুর বিদ্রূপ কেন সাহেব? তুমি তামাসা করিলে তোমাকে উল্টাইয়া তামাসার কথা শুনাইতে যে সাহস পায় না তাহাকে লইয়া রঙ্গরস কেন? তোমার sense of humour তো শ্রীপঞ্চমীর ইতিহাসেই জানা গিয়াছে! তুমি অন্যায় করিলে যে তাহার প্রতিশোধ লইতে পারে না, তাহাকে পীড়ন করা কাপুরুষতা।

এদেশের প্রত্নতত্ত্ব এবং জাতিতত্ত্বে যাঁহাদের জ্ঞান এত প্রখর; আর্দালি না থাকিলে যাঁহারা কোন তত্ত্ব উদ্ধার করিতে পারেন না, তাঁহাদেরই গবেষণায় যদি বঙ্গদেশের ভাষাবিচ্ছেদ এবং অঙ্গচ্ছেদ ঘটে, তবে উপায় কি?

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

কোরিয়া-রমণী।

কোরিয়া দেশের অন্তঃপুরের সংবাদ যত কম পাওয়া যায় তেমন আর কোন দেশেরই নহে। বাস্তবিকই কোরিয়া উপদ্বীপ যেমন কোন দেশেরই সংস্পর্শে নেই তেমনি তদ্দেশবাসী স্ত্রীলোকগণেরও অন্তঃপুরের বাহিরে বহির্জগতের কারুর সঙ্গে কোন সম্পর্ক আছে বলিয়া বোধ হয় না। সে দেশে স্ত্রী-অবরোধপ্রথা এতই কঠোর। এমন কি, চিকিৎসককেও কোরিয়া-রমণীর কক্ষে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় না। জাপানী ডাক্তার মাসানো এই দৃঢ় অবরোধ ভঙ্গ করিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। অবশেষে, নিজে যেখানে প্রবেশাধিকার পাইলেন না সেই কোরিয়ারমণীর অন্তঃপুরে আপনার স্ত্রীকে পাঠাইলেন। এবং চিরাবরুদ্ধ অন্তঃপুরে কি রহস্যময় অদ্ভুত ব্যাপার আছে তাহা ভাল করিয়া শুনিয়া লইবার জন্য স্ত্রীকে আদেশ দিলেন। ডাক্তার-মহিলার অনুকম্পায়, যে কোরিয়ার অন্তঃপুরের সংবাদ, যে রমণীর মুখচ্ছবি বায়ুরও অনধিকার ছিল ক্রমে তাহার অস্পষ্ট ছায়া সাধারণে প্রকাশিত হইয়া পড়িল।

কোরিয়ায় স্ত্রী-অবরোধ এত কঠোর হইলেও সেখানে স্ত্রী-সম্মান অক্ষুণ্ণ আছে। স্ত্রী যখন সন্তানসম্ভবা হন, ভবিষ্যৎ বংশের জননী বলিয়া তখন পুরুষের নিকট যেরূপ আদর ও সম্মান প্রাপ্ত হন, তাহাতে কোরিয়াবাসীর রমণীসম্মানের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলেই কোরিয়াবাসীরা সদর দরজায় একটী দড়ি ঝুলাইয়া দেন। যদি পুত্র জন্মে তবে ঐ দড়ির শেষাংশে এক টুকরা কয়লা এবং একটা পাতা বাঁধিয়া দেওয়া হয়। কন্যা জন্মিলে দড়ি অম্নিই থাকে। কোরিয়া দেশের লোকেরা কন্যাকে সংসারের মধ্যে গণ্য করেন

না। যদি একজনকে জিজ্ঞাসা করা হয়—আপনার কয়টী সন্তান, তাহা হইলে তিনি কেবল পুত্রের সংখ্যাই উল্লেখ করেন। খুব পীড়াপীড়ি বা বিশেষ ভাবে অনুসন্ধান করিলে তবে তাঁর কন্যা আছে কি না ও তার সম্বন্ধীয় কথা জানা যায়। সাত বৎসর বয়স অবধি মেয়েদের নিজের নামেই ডাকা হয়; তারপর তাদের আর কোন নাম থাকে না, কেবল অমুকের কন্যা, অমুকের ভগ্নী, অমুকের স্ত্রী এই ভাবে পরিচিত হয়।

শিশু যখন সবেমাত্র হাঁটিতে শিখে তখন তার তত্ত্বাবধারণের জন্য একটা কুকুরকে তার সঙ্গী করিয়া দেওয়া হয়। কুকুরটাকেও এমন ক'রে শিক্ষিত করা হয় যে সদাসর্ব্বদা সে শিশুর সঙ্গে সর্ব্বত্র যাওয়া-আসা করে, খেলিয়ে বেড়ায়। খুব গরীব হইলেও কেরিয়া বাসীরা এ নিয়মের ব্যতিক্রম করে না। শিশুদিগের মানসিক শক্তির বিকাশ সম্বন্ধে এ দেশবাসীর এক অদ্ভুত বিশ্বাস আছে। তাহাদের ধারণা, আলোকের উজ্জ্বল রশ্মি-প্রভাবে বালকের মানসিক অবস্থাও উজ্জ্বল হয়; সেইজন্য তাহারা কথনও ছেলেমেয়েদের ঘরের আলো নির্ব্বাণ করে না।

আট বছর বয়স হইলেই ছেলে ও মেয়েদের আর একত্রে রাখিয়া শিক্ষা দেওয়া হয় না। ভবিষ্যতের কার্য্যোপযোগী নানারকম শিক্ষা বালকেরা পায়। এবং সম্ভ্রান্তবংশীয় ধনী কন্যাদের শিক্ষা কেবল ধর্ম্ম ও নীতিবিষয়ক উপদেশ এবং পৈত্রিক ধর্ম্মানুসঙ্গিক আচার ব্যবহার শিক্ষাতেই পর্য্যবসিত হয়। আর দরিদ্রের কন্যা, কুটীরে বসিয়া পরিচ্ছদ প্রস্তুত ও সূচের কার্য্য শিক্ষা করে। এ দেশের নিম্নশ্রেণীর স্ত্রীলোকেরা সূচি-কার্য্যে খুব পটু। বার্লিণ ও ব্রুসেলের যাদুঘরে ইহাদের কৃত যে সমস্ত সূচি-কার্য্য রক্ষিত আছে, তাহা দেখিলে ইহাদের দক্ষতা বেশ বুঝা যায়। ইহাদের রেশমি কাপড়ের উপর জরির কারু-কার্য্য অতি সুন্দর ও বিশেষ প্রশংসাজনক। বার্লিনের যাদুঘরে কোরিয়াদেশী শ্বেতবর্ণের

এক প্রকার পরিচ্ছদ রক্ষিত আছে। শুনিতে পাওয়া যায়, কোরিয়াবাসীরা এ পোষাকের বড়ই পক্ষপাতী। পূর্ব্বে, ইহা শোক-পরিচ্ছদরূপে ব্যবহৃত হইত। একজন আত্মীয়ের মৃত্যুতে এই শ্বেতবর্ণ পোষাক একাদিক্রমে তিন বৎসর কাল পরিবার নিয়ম। এক সময়ে, দশ বৎসরের মধ্যে কোরিয়ায় তিনজন রাজার মৃত্যু হয়। তাহাতে দেশশুদ্ধ লোককে বারম্বার এই পরিচ্ছদ ধারণ করিতে হয়; আত্মীয়স্বজনের মৃত্যুত আছেই, তাহার উপর একজনের মৃত্যুতে তিন বৎসরকাল এই পোষাক পরিতে হয়, কাজেই অন্য পরিচ্ছদ পরিধান করিবার অবসর কোরিয়াবাসীর অদৃষ্টে খুব কমই ঘটিত। সেইজন্য, মিছামিছি অপর পরিচ্ছদ প্রস্তুত করিয়া ব্যয়ভার বৃদ্ধি করিবার আবশ্যক নাই বুঝিয়া কোরিয়াবাসীরা বারোমাস ঐ সাদা পোষাক পরিতে আরম্ভ করে।

পোষাক প্রস্তুতের ভার স্ত্রীলোকদিগের উপরই আছে। পোষাক পরিচ্ছন্ন করিবার এক অদ্ভুত প্রণালী আছে। পোষাক ধৌত করিবার সময় তাহা ভিন্ন ভাগে খুলিয়া ফেলা হয় এবং ঐ দেশে যে কাপড়-কাচা কাষ্ঠদণ্ডের ব্যবহার প্রচলিত আছে তাহাতে খুব আছড়ান হয়—যতক্ষণ পর্য্যন্ত না কাপড় হইতে এক প্রকার স্বর্ণাভা বাহির হইতে থাকে। বর্লিন যাদুঘরে পোসাক কাচিবার একটা কাষ্ঠদণ্ড আছে। সেটা দেখিতে, একধার-চেপ্টা মাঝারি গোছের মদের বোতলের মত।

অন্য দুই এক জাতির মত এ দেশের বালকদের অপেক্ষা বালিকারা একটু বেশি বয়সে পুষ্টাঙ্গী হয়, সেইজন্য প্রায়ই স্ত্রী স্বামী অপেক্ষা বয়সে কিছু বড় হয়।

এ দেশের বিবাহপদ্ধতি বেশ কৌতুহলোদ্দীপক। বর প্রথমে তাহার মনোনীত বালিকার পাণি প্রার্থনা করিয়া তাহার কোন বন্ধুর দ্বারা কন্যার পিতৃসমীপে একখানি পত্র পাঠায়। কন্যাপক্ষীয়েরা যথা

সময়ে সে পত্রের উত্তর দেয়। পাত্রের প্রার্থনা গ্রাহ্য হইলে তখন উভয়ের জন্ম-কোষ্ঠীর আদান প্রদান হইতে থাকে। পাত্র ও পাত্রীর জন্মতারিখ লগ্ন দেখিয়া পঞ্জিকার সাহায্যে বিবাহের জন্য একটা শুভদিন ঠিক করা হয়। বিবাহকার্য্য কন্যার বাড়িতেই সম্পন্ন হইয়া থাকে। সদর দরজার সিঁড়ির নিম্নে একটা স্থান ঠিক করা হয়, সেখানে বিবাহমণ্ডপ প্রস্তুত হয়। বিবাহের দিন বর নানা বেশ-ভূষায় সজ্জিত হইয়া অশ্ব বা যানারোহণে পিতার সাহত কন্যা-গৃহে আসিয়া উপস্থিত হয়। প্রথমে সদর দরজার বাহিরেই অবতরণ করে এবং উত্তরদিকে মুখ ফিরাইয়া সেস্থান হইতে বিবাহস্থলে আগমন করে। পাত্রীর সম্মুখে উপস্থিত হইলে নতজানু হইয়া তাহার সমক্ষে একটি হংসী উপহারস্বরূপ রাখিয়া দুইবার অভিবাদন করে এবং তাহার পরেই উঠিয়া পূর্ব্বমুখ হইয়া কিছুদূরে দাঁড়াইয়া থাকে। পাত্রীকে এই হংসী প্রদান করিবার একটা কারণ আছে। শুনা যায়, এক বনে এক শিকারী একটি হংস বধ করে, সেই হংসের স্ত্রী তাহার ভর্ত্তার মৃত্যুস্থানে প্রত্যহ একবার করিয়া আসিত। হংসী উপহার দিবার অর্থ এই, যে পাত্রী ঐ হংসীর ন্যায় স্বামীভক্তিপরায়ণা হউক। উপহার প্রদান শেষ হইলে, বর ও কন্যা প্রতিজ্ঞামন্ত্র উচ্চারণ করে, তাহারা বলে "আজ আমাদের কেশ বন্য হংসীর পুচ্ছের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ; যদিচ ইহা কখন শ্বেতবর্ণ ধারণ করে, তথাপি আজ আমরা পরস্পরে যেমন বিশ্বাসী, সেদিন পর্য্যন্তও তেমন থাকিব।"

ইহার পরেই, পাত্রীকে কোরিয়ান্ রমণীর পূর্ণপরিচ্ছদে সজ্জিত করিয়া দেওয়া হয়। মুখে পাউডার মাখান হয়; ভ্রূযুগ চিত্রিত এবং ওষ্ঠ রঙান হয়। পারাডাইস্-পক্ষী-অঙ্কিত তিনটি বড় সোনার কাঁটা মাথার চুলে গুঁজিয়া দেওয়া হয় এবং সেই সঙ্গে একটা হাল্কা টুপিও আঁটিয়া দেওয়া হয়। নানা বর্ণে চিত্রিত ঝক্‌মকে কাঁচলি, বেগুনি

রঙ্গের সুদৃশ্য ওড়না, সাদা রঙ্গের চওড়া কোমর বন্ধ এবং একটি লাল টুকটুকে ঘাঘরা দিয়া কন্যার গাত্র আবরিত করা হয় তা ছাড়া, হাতে সাদা কফ্, পায়ে সাদা রেশমি মোজা ও রেশমি জুতা, লাল সবুজ বা বেগুনি রঙ্গের থাকে।

বিবাহ সময়ে, তিনজন সুসজ্জিত বাঁদির গাত্রে ভর দিয়া, ধীরপদে পাত্রী সিঁড়ি দিয়া নামিয়া, নিম্নে বিবাহমণ্ডপে দণ্ডায়মান হয়। পাত্রী পূর্ব্বদিকে মুখ করিয়া দাঁড়ায় এবং তাহার মুখ হস্তস্থিত পাখাতে আবৃত করে। এরূপ অবস্থায় পাত্রকে দুইবার অভিবাদন করিতে হয় এবং পাত্র ও পাত্রীকে দুইবার প্রত্যভিবাদন করে। তৎক্ষণাৎ দুইজন বাঁদি, একটি লাল বস্ত্রে এবং আর একটি সবুজ বস্ত্রে আবৃত দুইটী মদ্যপূর্ণ পেয়ালা বর ও কন্যাকে দিয়া যায়। তাহারা দুইজনেই এক সময়ে একত্রে চুমুক দেয়। এই হইলেই বিবাহের নিয়ম সব শেষ হইয়া যায়।

তখন বর ও তাহার পিতাকে বিবাহভোজে ডাকিয়া আনা হয়, পাত্রীর আত্মীয়স্বজনেরা সকলেই এ ব্যাপারে যোগ দেন। ভোজন শেষ হইলে বর নিজ বাড়িতে একলাই চলিয়া যায়। পাত্রী তাহার পর এক শুভদিন দেখিয়া শ্বশুরালয়ে যাত্রা করে।

এই সময় হইতেই কোরিয়ারমণীর কঠোর অবরোধবাস আরম্ভ হয়। স্বামী ব্যতিত অপর কোন বিবাহিত পুরুষের সমক্ষে বাহির হওয়া একেবারে নিষিদ্ধ—এমন কি বাড়িরও কোন পুরুষের সমক্ষে নহে।

বহুদিন পূর্ব্বে কোরিয়ান্ রমণীদিগের প্রত্যহ রাজপথে বাহির হইবার একটা প্রথা ছিল। অনেক রাত্রে, সহরের সব দরজা বন্ধ হইয়া যাইলে পুরুষেরা নিজ নিজ কক্ষ হইতে আর বাহির হইতে পাইতেন না, তখন রমণীবৃন্দ পুরুষ-বর্জ্জিত রাজপথে বায়ু সেবন করিতেন। কখনও

বা আমস্তক সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করিয়া, ছোট কাগজের ল
করিয়া এর-ওর-বাড়ি বন্ধুসম্মিলনে বাহির হইতেন।
শয়নকক্ষে আবদ্ধ থাকিতেন, আর রমণীগণ বৈঠকখানা আলো ..সময়
বসিয়া আমোদ-প্রমোদ করিতেন। কিন্তু কোরিয়ান্ স্ত্রীলোকের ভাগ্যে বহুদিন এ সুযোগ রহিল না। অন্তঃপুর-পিঞ্জর হইতে বাহির হওয়া তাঁহাদের দুঃসাধ্য হইয়া উঠিল। রমণীগণ একাকিনী রাজপথে, তস্করেরা এ লোভ সম্বরণ করিতে পারিল না; রাশি রাশি রত্নাভরণ চুরি যাইতে লাগিল। এ কার্য্যে বাধা দিবার পুলিশদিগেরও সুবিধা ছিল না। কাজেই তখন আপনা-আপনি সে প্রথা উঠিয়া গেল।

আজকাল কদাচিৎ কখন উচ্চবংশীয় রমণীকে অনেক রাত্রে স্বামী সমভিব্যাহারে সর্ব্বাঙ্গাবৃত হইয়া রাজপথে ভ্রমণ করিতে দেখা যায়। নিম্নশ্রেণীর স্ত্রীলোকদিগকে কখন কখন দিনেও পথে দেখা যায়, কিন্তু তাহাদেরও আগাগোড়া সর্ব্বাঙ্গ ঢাকা।

তুকারামের আত্মকাহিনী।

কি ভাবে ও কি উদ্দেশে তুকারাম দেবসেবায় প্রবৃত্ত হয়েন তাহা তিনি নিম্নলিখিত "অভঙ্গে"* ব্যক্ত করিয়াছেন। ইহাতে তাঁহার অকপট ব্যবহার, বিনয়-নম্রতা ও সত্যনিষ্ঠার বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া যায়।

শোনো সাধুগণ সবে, —আমি যে পতিত অতি ;
এত প্রীতি—এত যত্ন কেন কর আমা প্রতি ?
সাক্ষী মোর অন্তরাত্মা —হয় নি মোর উদ্ধার ;
এক ভাব ধরি আমি —অন্য লোকে ভাবে' আর।
সাংসারিক কষ্টে পড়ি' গরু চরাইনু মাঠে ;
যথেষ্ট হ'ল না তাহে, তাই প্রবেশিনু মঠে।
সর্ব্বস্বান্ত বিধি-বশে ; যা' কিছু ছিল আমার
ব্রাহ্মণে, যাচকে দিয়া করিনি ত্যাগ স্বীকার।
ছাড়িলাম আত্মজনে প্রিয়া, পুত্র আর ভাই,
তাই এই হীন দশা —মন্দবুদ্ধি আমি তাই।
না পারি' দেখাতে মুখ পশিনু বন-মাঝার ;
হ'নু যে বিজন-বাসী এই শুধু হেতু তার।
দয়ামায়া গেল সব পড়িয়া পেটের দায়
ডাক্ দিলে কেহ, শুধু "হাঁ" বলি' দিতাম সায়।
পূজিতেন বাপ দাদা তাই পূজি আমি এবে
তুকা বলে, ভক্তিভাবে অন্যে যেন পূজে' দেবে।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুর।

---

* পূর্ব্ব প্রবন্ধে আমি লিখিয়াছিলাম, "অভঙ্গ" অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত, কিন্তু ইহা ঠিক নহে। অনেক অভঙ্গে মিলও আছে।

ঘরের কথা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

আন্‌ছে—নিচ্ছে—খাচ্ছে, দরজায় দু'বেলা এঁটোপাত পড়ছে, "জয়-রাধে-কৃষ্ণ" হৃষ্টমুখে ফিরছে, খঞ্চিপোশ ঢাকা থালা মধ্যে মধ্যে বাড়ীতে ঢুকছে, বাড়ীর ভিতর হ'তে বেরুচ্ছে, মান সম্ভ্রম এক রকম বেশ বজায় আছে ;—মানুষ বেঁচে থাকতে বোঝা যায়না যে তার কত আয়, সঙ্গতি কত, চলবে কত দিন। জ্ঞাতি প্রভৃতি আত্মিয়েরা বা ঘনিষ্ট প্রতিবাসীগণ—"এই অহঙ্কার যায় ভেঙ্গে"—"এই প'ড়ে দেখ না দর্পে ছাই"—ইত্যাদি ফলিত জ্যোতিষের মত্ সতত ব্যক্ত করা সত্বেও লোকটার দিন দেখতে দেখতে এক রকম স্বচ্ছন্দে কেটে যায় এবং সে নিজেও মনে করে এবং পরিবারবর্গ ও অপর সাধারণেও ভাবে যে চিরদিনই তার এমনি যাবে। কিন্তু যেই লোকটা চোখ বুজে, গৃহসংসারের এক মাত্র "চাকরের" যেই অনন্ত "ফর্লো" ছুটি মঞ্জুর হয়, সেই বুঝা যায় সব ফাঁক সব ফরসা ; সম্ভ্রমের ঠাটখানি বেচারা আপনি মাথায় করে বসে ছিল, অন্য খুঁটি ছিল না, আপনিও পড়লো ঠাটখানিও ভূমিসাৎ হলো। তখন দেখা যায়, মাগী বুদ্ধিশুদ্ধি হারিয়ে একশিশি মালিসের আরক খেয়ে মুখ গুঁজড়ে পড়েছে, ছেলেপুলেগুলো কান্না ভুলে গিয়ে আপনা-আপনি মুখ চাওয়া-চাওয়ি কচ্ছে, শেষ দশ টাকার নোটখানি ভাঙিয়ে আট টাকা জগবন্ধু ডাক্তারকে দেওয়া হ'য়েছে বাকি দুই টাকার জগসুপ এসেছিলো—এখন উপায়, সৎকার হয় কি করে ? মনে করবেন না যেখানে বিশ পঁচিশ টাকা আয়ের উপর সব নির্ভর ছিল সেই খানেই এই দশা, দুশো আড়াইশো বা ততোধিকেও এই পরিণাম।

বিজ্ঞ মহাশয়েরা এসব অপরিণামদর্শিতার ফল, উড়ুন-চুড়ে লোকের হাল বলে গম্ভীর ভাবে মাথা নাড়বেন না। চোখের পরদা রেখে সংসার করতে গেলে অনেক সময়েই ঘটনা এইরূপ দাঁড়ায়; বিশেষ যাকে গোড়া থেকে চালা বেঁধে সংসার পাততে হয়েছে। তবে যে নিরে-নব্ব‌ইয়ের ধাক্কা পেয়েছে অথবা টাকা জমাব বলে চক্ষুবুজে কোমর বেঁধে লেগেছে তার কথা স্বতন্ত্র। আমাদের মিত্রজা একটু বেশী রাত্রে বাড়ী ফিরতেন, আসবার সময় তামাক খাওয়ার জন্য মোড়ের দয়েহাটা থেকে অকটু আগুণ চেয়ে আনতেন, অন্য পাত্রাভাবে গয়লারা আপনাদের চালের একখানা করে খোলা নিয়ে আগুণ টুকু মিত্রজার হাতে দিত; আমি দেখেছি কুড়ুনির মা (মিত্রজার গৃহলক্ষ্মী) একবার বর্ষাকালে সাত টাকা কয় আনার পুরাণো খোলা কলুদের খোকার মাকে বিক্রয় করেন।

এখন রাজু দে'কে শিল নোড়া ধুচুনি কুলো কিনে সংসার বাঁধতে হয়েছিল, তার উপর বেচারা অতি আহাম্মক, অর্থাৎ একটু চক্ষুলজ্জা ছিল, দশজনের একজন হব বলে একটু অভিমানও ছিল, আবার কপালগুণে কুড়ুনির মার মত গৃহলক্ষ্মীও ছিল না; সুতরাং মতি চৌধুরীর খোঙারি ভাঙ্গিবার পয়সা কয় গণ্ডা কেড়ে নিয়ে ছিরে গেঁজেল যখন রাজুর জন্য খাট কিনে এনে তার জ্ঞাতি বান্ধব ও দেশস্থ লোকজনকে সংবাদ দিলে তখন প্রকাশ হলো যে মা ষষ্ঠীর কৃপায় তাঁদের সকলের কুললক্ষ্মীগণই এককালে অন্তঃস্বত্ত্বা হয়েছেন, (এই জন্যই স্ত্রীকে সহধর্ম্মিণী বলে, সময় অসময়ে কত কাজে লাগে দেখছ—আত্মীয়ের সৎকারে যাবনা বল্লে কতটা নিন্দে হতো, লক্ষ্মীদের গর্ভের উর্ব্বরতার দোহাই দিয়ে স্বামী বেচারীরা লোকতঃ ধর্ম্মতঃ রক্ষা পেলে)। অম্বিকে খুড়োর আজ তিন বৎসর গৃহশূন্য। সেই ঝড়ের রাত্রে রাজু একলা এক দিকে কাঁধ দিয়ে খুড়ীকে পুড়িয়ে আসে, সে সময়

খুড়ো মহাশয় শোকে বিহ্বল হওয়ায় ঘাটখরচা রাজু নিজে থেকেই নির্ব্বাহ করে, পরে পরিবারের অস্তিমকথা পড়লেই খুড়োর চোখ ছল-ছল করতো বলে চক্ষুলজ্জাগ্রস্থ ভ্রাতস্পুত্র আর এপর্য্যন্ত সে টাকার কথা মুখে আনতে পারে নাই, ঘড়া ঘটী বাঁধা দিয়েও যখন নিজের চিকিৎসার খরচ চালিয়েছে তখন পর্য্যন্তও না; কিন্তু আজ খুড়োর আপশোষের আর সীমা নাই; এমন অঘটন ঘটবে, রেজো আবাগে এত সকাল সকাল ফাঁকি দেবে জানলে কি তিনি তরগুদিন বাতশিরার র‍্যাম্বরামের জন্য মালাইতলার তাগা ধারণ করেন। এখন তো আর উপায় নাই, বাবা-ঠাকুরের হুকুম শ্মশানের ধোঁয়া গায়ে লাগলেই চৌদ্দ পুরুষ নরকস্থ হবে; রেজোর চৌদ্দপুরুষ তাঁর চৌদ্দপুরুষ তো আর ভিন্ন নয়, অলপ্পেয়ে ছোঁড়া বেঁচে থাকলে সে কখনই খুড়োকে তার সৎকার করতে যেতে দিত না; আহা হা রেজোরে! রেজোরে! তোর মনে এই ছিল, বুড়োকে কাঁদালি, পুজোর সময় এক জোড়া করে ধুতি চাদরটা দিতিস তাও আর পরতে দিলিনি—যাক্ যাক্ কেউ কারু নয়—খালি ভোজের বাজি—অসারে খলুসংসারে মিছে মায়া—এক পক্ষী নানা বৃক্ষে, ইত্যাদি, ইত্যাদি!!

যাকে দাহ করে একখান নূতন বস্ত্রও কোমরে উঠবেনা, যার শ্রাদ্ধে কেঁধেল ভোজনের ফলারটারও বড় আশা নাই, যাহ'তে আর কখনও কোন উপকারের প্রত্যাশা নাই, যার স্ত্রীপুত্রের নাম সংসারের চেনা-পরিচয়ের খাতা থেকে চিরদিনের জন্য খারিজ হতে চলো, যার সৎকার করে এলে কথাটা পাড়ায় তোলাপাড়া হয়ে দুটো সুখ্যাতি হওয়ারও সম্ভাবনা নাই, তার শববহন করে কাঁধে ব্যথা করতে ব্যবস্থা আমিতো কোন শাস্ত্রে দেখি নাই। ইংরাজি এটিকেটেও এ নিয়ম নাই। তা থাকলে যে হরেন এমন ভাল ছেলে, বিয়ে পাশ করেছে, ফুটবল খেলায় মেডিক্যাল কলেজের সাহেবের ছেলের দলকে জিতেছে,

এত পরোপকারী যে যুবতী বিধবাদের চুলের ফিতা বিতরণ করবার জন্য দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে চাঁদা তুলেছে, নিমতলার কাঠগোলায় আগুণ লাগবার রাত্রে ম্যাজিষ্ট্রেট মার্সডেন সাহেবের পাশে পাশে কুড়ুল নয়ে ছুটোছুটি করেছে, সুরেন বাঁড়ুর্য্যের জেল হ'তে এক মাস কামিজের উপর কাল ফিতা বেঁধে. খালি পায়ে বেড়িয়েছে; সেই হরেন আজ আপনার পিসতুত ভায়ের সৎকারের সময় নিজের হারিকেন ল্যাম্পটা ঘাটে নে'যাবার সময় দিতনা? যদি বলেন যে বৌমা রাত্রে ছাদে যাবেন কি হাতে করে—তা এর চেয়ে বড় বড় স্বার্থত্যাগ, আত্মবিসর্জ্জন হরেন দেশের জন্য অনেকবার করেছে।

মতিটা মাতাল, ছিরেটা গেঁজেল আর কামারদের শিবেটাতো জন্মবখাট, তাই বাহাদুরী করে হরিবোল দে গেল! ঘোর কলি ঘোর কলি, ধর্ম্ম-কর্ম্ম জাত-জন্ম কিছুই আর রইল না! কামার হয়ে কায়েতের মড়াটা ছুঁয়ে ফেল্লে, আর বামুনের ছেলে হ'য়ে মতেটা পৈতেগাছটার মানও রাখলেনা—সচ্ছন্দে গিয়ে খাট ধরলে। তা'কি জান, কেউতো এখন কাকেও মানেনা—আর কলিকাতা সহরে এক ঘরে ক'রে কাউকে শিক্ষা দেওয়ারও সুবিধা নাই। মাগীরইবা কি আক্কেল—ঐ রেজোর বৌএর, আবাগের বেটী স্বামীর পরকালটা ভাবলি না, অজাতককে দেহটা ছুঁতে দিলি। চুলোয় যাক্ চুলোয় যাক্—এই মাঝের বাড়ীর সঙ্গে দেশের খিড়্কির তেঁতুল গাছটা নিয়ে ডায়মণ্ড হার্ব্বরের মুন্সুবিতে যে মোকর্দ্দমাটা চলছে সেইটে নিষ্পত্তি হয়ে গেলেই—অম্বিকা খুড়ো শ্রীবৃন্দাবনে গিয়ে বাস করবেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

কি অলক্ষণ! কোথাও কিছু নাই কিনা এক মৃত্যুর কথা অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার নতা করে একটা পরিচ্ছেদ পূর্ণ করলে? অমন করে থেকে

থেকে মরার কথা মনে করে দিওনা বলছি, তাহ'লে ভাল হবেনা কিন্তু। আমি মরা দেখতে চাইনা, মরার কথা শুনতে ভালবাসিনা, যে পথ দিয়ে মড়া নিয়ে যায় সে পথ মাড়াইনা। মরার মূর্ত্তি চোখে পড়বার ভয়ে আমি কুমারটুলির ঘাটে ইঁট কিনতে যাইনা, দু'পয়সা চড়া দাম দিয়ে চাঁপাতলায় যাই তবু নিমতলার ঘাটে কাট কিনিনা। রাস্তা দিয়ে ঘোল ডেকে যায় আমি হরিবোল মনে ক'রে কানে আঙুল দিই, হরিবোলের বিকট শব্দে আমার সর্ব্বশরীর কেঁপে উঠে। একবার থিয়েটার দেখতে গিয়ে একটা লোক মরে সশরীরে স্বর্গে যাচ্চে দেখি, তা'তে আমার ভয়ানক জ্বর হয়, একুশ দিন ভুগি, সেই অবধি আর নাট্যশালার দরজায় পা দিইনা। মরার কথা তোল কেন? ওকথা মনে করার প্রয়োজন কি? মরার কথা শুনলে কি আর কাজকর্ম্ম চলে, মরবার কথা মনে হলে কি আমি রাত্রি জেগে পিনালকোডের সেক্সন, প্রপার্টি-আইনের ডিশিসন মুখস্থ করে উকীলি পাশ করতে পারতেম। কে যেত মক্কেলের মাথা খেতে যদি মনে পড়তো যে মরতে হবে? পৈত্রিক ভদ্রাসন ভাগ করার জন্য যখন দাদাতে আমাতে উঠানের মাঝখানে দড়ি ফেলি তখন মরার কথা মনে হলে আমার হাত কাঁপিত না? হাঁ শুনেছি বটে কেউ কেউ মরে—কেউ কেউ কেন এমন অনেকে মরে, তা যারা মরে তারা মরে, আমার তাতে কি? এই আমি সিঁতের উপর সামলা এঁটে বুকের ছাতি ফুলিয়ে কাছারি যাই, ওয়াটের বুট পায়ে দিয়ে মস্‌মস্‌ করে বিশ্‌ সেকেণ্ডের মধ্যে হাইকোর্টের তেতলায় উঠি, আমার কি মরে যাওয়া সম্ভব? কত লোককে যে দেখে-নেব বলে শাসিয়ে রেখেছি—আমি মলে তা'দের জব্দ করবে কে? সিঙ্গিদের বাগান খানা ফোরক্লোজ করে নিতে হবে, ভট্টচার্য্যিদের ভিটেয় ঘুঘু চরাতে হবে, কবে বাবাকে মাসহারা দিয়াছিলেন বলে দাবি করে আজও অহঙ্কারে আমায় বাবু

বলেনা, তার নাবালক নাতিকে হ্যাণ্ডনোট কাটাতে হবে, আর উনি এলেন কিনা মরার কথা মনে করে দিতে। যদি পৃথিবীতে মরার নিতান্তই প্রয়োজন হয়, তা হলে বুড়োরা মরুক, রুগীরা মরুক, দুঃখী, ইতর, অভদ্রলোক মরুক, উপায়হীন, অধ্যবসায়হীন, উত্তেজনা-উদ্দীপনা-প্রতিভা-প্রতিষ্ঠাহীন দুর্ব্বল লোক মরুক। মৃত্যুর সঙ্গে আমার সম্পর্ক কি? আমার দেহে বল কুলায় না, হৃদয়ে তেজ ধরে না, অভিলাষের অন্ত নাই, আশার শেষ নাই, সাধের সীমা নাই, প্রতিভা ছাপিয়ে উঠেছে, প্রতিষ্ঠা ছড়িয়ে পড়েছে, অনুরাগ পায়ে ধরছে, সোহাগ গড়িয়ে পড়ছে। শরতশশীর আমার যৌবন দিন দিন ফুটে উঠছে, জ্যাকেটের বোতাম কাটছে, কুন্তলীন মেখে চুলের রাশিতে ঢেউ খেলতে আরম্ভ হইয়েছে, কটাক্ষে ভুবন লোটে, হাসিতে জ্যোৎস্না ফোটে, স্পর্শে শিরায় শিরায় বিদ্যুৎ ছোটে। শরতকে মাষ্টার রেখে ইংরাজি পড়াব, বিবি রেখে পিয়ানো শেখাব, খোঁপায় তার ক্যামেলিয়া দেব, গলায় মুক্তার শেলি দেব, কাণে হীরার দুল দোলাব। মাকে একবার কিছু খোরাকি দিয়ে কাশী পাঠাতে পাল্লে মনমোহিনীকে মোহিনী সাজে সাজিয়ে ভারি রাতে ফেটিং চড়ে বেড়াতে বেরুব, কখন বা দু'জনে ফুটন্ত চাঁদের আলোয় পানসির ছাতে গুণগুণ করে মৃদুমধুরস্বরে "সাধের তরণী আমার কে দিল তরঙ্গে" গাইতে গাইতে ধীর তরঙ্গে দুলতে দুলতে ভাসতে থাকব। অনন্ত অনন্তকাল এই সুখ উপভোগ করবো। কেন করবোনা? আর আমি কেন? কে এ পৃথিবীতে মরবার কথা ভাবে? জজ যখন বেঞ্চিথেকে আসামীর উপর ফাঁসীর হুকুম দেন তখন কি তিনি নিজের মৃত্যুর কথা মনে করেন, কৌন্সলি যখন ভদ্রলোককে সাক্ষীর কাটরায় অবমাননা করে তখন কি মরার কথা মনে করে, সাহেব যখন নেটিভের

রাজা হওয়ার চাঁদার জন্য জমীদারী বন্ধক দেয় তখন কি তারা মরতে হবে মনে আনে, আর পুরোহিতঠাকুর যখন যজমানের শ্রাদ্ধের ষোড়শ লয়ে টানাটানি করেন তখন কি ব্রাহ্মণ নিজের শ্রাদ্ধের কথা ভাবেন? কিন্তু এরাও মলে মরতে পারে, যমের যদি এত গরজ তবে একে একে সবাইকে নিতে পারে, তা বলে আমায়ও যে মরতে হবে তার মানে কি? এই কোটি কোটী মনুষ্য, অসংখ্য অসংখ্য পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ সকলকে যদি মরতে হয়, দলে দলে পালে পালে সবাই যদি মৃত্যুর কবলে অগ্রসর হয়, তাহলে আমি এই ভয়ানক ভিড়ের ভিতর থেকে, এই বিষম গোলমালের মাঝ থেকে একলাটী পাশ কাটিয়ে সরে থাকতে পারবোনা?—আমার জন্যই যে যম চোখ চেয়ে বসে আছে এমনতো আর নয়, তা সে বুঝবে, যম বুঝবে, আমার কত আশা, কত অভিলাষ, কত ভোগের পিপাসা, ভদ্রলোক একটা মানুষের মনের কথা বুঝবে, অত নজর করবেনা। মোদ্দাৎ তুমি আর মরার কথা তুল' না, একশবার ঐ কথা নিয়ে তোলাপাড়া কল্লে কার উপর দৃষ্টি পড়তে কার উপর পড়ে যাবে। ঐ মরার কথাটা ছেড়ে দিয়ে কি বলছিলে বল। লোকটা কে? রাজু দে—কৈ ভাল চিন্তে পাচ্ছি না যে; কোথায় বাড়ী, কি জাতি, কেমন লোক, কি করতো?—বেশী বর্ণনার ছটা চালাওতো এখন থাক, কাছারির বেলা হলো, ওবেলা এসে শোনা যাবে—যদি বাসায় মক্কেলের ভিড় না হয়।

ক্রমশঃ।

শ্রীঅমৃতলাল বসু।

চন্দ্রোদয়* ।

উদিল শারদ শশী অমিত প্রভায়,
বেষ্টিত তারকাগণে সচিব সহায়,
বিছায়ি ভুবন'পরে জোছনা বিতান
অনেক সহস্রকরে শোভে দীপ্তিমান ।
যেমন বিরাজে হংস স্বচ্ছ সরোবরে
যেমন বিরাজে সিংহ গিরীন্দ্র কন্দরে,
যেমন বিরাজে বীর সমরসঙ্গরে,
বিরাজিলা চন্দ্র তথা সুনিল অম্বরে ।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ।

---

* চন্দ্রশ্চ সাচিব্যমিবাস্থ কুর্ব্বন্
তারাগণৈর্মধ্যগতো বিরাজন্
জ্যোৎস্না বিতানেন বিচিত্য লোকান্
অভ্যুত্থিতানেক সহস্র রশ্মিঃ
হংসো যথা রাজতি পুষ্করস্থঃ
সিংহো যথা রাজতি কন্দরস্থো
বীরো যথা রাজতি সঙ্গরস্থো
ররাজ চন্দ্রোঽপি তথাম্বরস্থঃ ।

রামায়ণ ।

এক না অনেক?

বারোয়ারিতলায় হাতীর সং বাহির হইয়াছিল। করিবরের পদচতুষ্টয় পেণ্টেলুনে মণ্ডিত, প্রকাণ্ড শুণ্ড পেণ্টেলুনে আবৃত, সে বিপুল দেহ বিরাট অঙ্গরক্ষণীতে আচ্ছাদিত। দেহ-গৌরবে হস্তী চিরদিন মর্য্যাদাশালী, সুতরাং তাহার পেণ্টেলুনের বাড়া-বাড়ি দেখিয়া আমার মনে প্রীতির সঞ্চার হইবারই কথা। কিন্তু তাহার কামিজ সম্বন্ধে নিদারুণ দৈন্য দর্শনে আমার মনে বড়ই দুঃখ হইয়াছিল। হায়, যাহার এতগুলি পেণ্টেলুন তাহার গাত্রে একটী বই কমিজ ছিল না! করিবর সমগ্র মেলা পর্য্যটনে প্রবৃত্ত হইলেন। বিস্ময়পুলকিত মানব সন্তানগণ পিপীলিকাশ্রেণীবৎ তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ উল্লাসধ্বনি সহকারে অগ্রসর হইতে লাগিল। করিবর এইরূপে সমগ্র মেলা পর্য্যটন করিলেন। আমি কিন্তু এতক্ষণ তাঁহার সঙ্গ পরিত্যাগ করি নাই। অবশেষে তিনি স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন;—ও হরি! এই কি সেই হাতী? এই যে আমাদের বামা, শ্যামা, মাধো, সেধে আরও কে কে! চারিজন মনুষ্য চারি খানি পা, একজন লোক শুণ্ড, আর চারি জন মনুষ্য উদর, বক্ষ, পৃষ্ঠ মস্তক ইত্যাদি। এই আমাদের হস্তী, এই হস্তী দেখিবার জন্য এত উল্লাস এত ব্যগ্রভাব। আমাতে আর এই হস্তীতে অণুমাত্রও প্রভেদ নাই, ইহার হস্তিত্ব কেবল বাহ্যাকারেই পর্য্যবসিত। ইহা দর্শন করিয়া আমার মনে জীবদেহের গঠনপ্রণালীর কথা সহসা জাগিয়া উঠিল। কতকগুলি প্রাণি-শরীর মিলিয়া যেমন এই হস্তীর দেহ গঠিত হইয়াছিল, মানব, পশু, পক্ষী কীট পতঙ্গ প্রভৃতি সমুদায় প্রাণিগণের দেহও সেইরূপ কতকগুলি জীবদেহের সমবায়ে সংগঠিত। সে এক অদ্ভুত ব্যাপার!

আমরা সহজ দৃষ্টিতে দেখিতে পাই, জীব-দেহ চর্ম্ম, মাংস, অস্থি-মজ্জা, রস প্রভৃতি বিভিন্ন আকারের পদার্থ দ্বারা নির্ম্মিত। এক খণ্ড চর্ম্ম একখণ্ড অস্থি, এক খণ্ড মাংস দেখিলে আমরা অতি সহজেই সেগুলি চিনিয়া লইতে পারি। কিন্তু অনুবীক্ষণযন্ত্রের সাহায্যে দৃষ্টিপাত করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, এই সমস্ত বিভিন্ন আকারের শরীর-উপাদানের গঠণপদ্ধতির মূলে কি চমৎকার সামঞ্জস্য কি বিস্ময়কর বৈষম্যহীনতা বিদ্যমান রহিয়াছে। জীব-দেহের বিভিন্ন আকারের সমস্তগুলি পদার্থই কেবল কতকগুলি সজীব কোষ (cell) এবং কোষ-মধ্যবর্ত্তী-পদার্থ দ্বারা গঠিত।

কোষগুলি কি? প্রটোপ্লেজম্ একপ্রকার অর্দ্ধতরল অর্দ্ধকঠিন পদার্থ, দেখিতে ঠিক জেলির ন্যায়। জীবশরীর এবং উদ্ভিদদেহস্থিত কোষ সমষ্টি ভিন্ন অন্যত্র এই পদার্থ দৃষ্টি গোচর হয় না। বৈজ্ঞানিকগণ রাসায়ণিক বিশ্লেষণপ্রক্রিয়া দ্বারা ইহার উপাদান স্থির করিয়াছেন, কিন্তু এই সমস্ত উপাদানগুলি সমষ্টিকৃত করিয়া ইহার প্রস্তুত-প্রণালী অদ্যাপি স্থির করিতে সমর্থ হন নাই। এই প্রটোপ্লেজম্ই জীব-দেহ গঠণের মূলপদার্থ। কোষগুলি এই পদার্থের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ। প্রটোপ্লেজম্ এইরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভিন্ন হইয়া সর্ব্বশরীরে পরিব্যপ্ত থাকে, এবং অস্থি, মজ্জা, মাংস প্রভৃতি শরীর-উপাদানগুলি গঠণ করে। প্রত্যেক কোষই সজীব সুতরাং এক একটী কোষকে এক একটী কীট বলা যাইতে পারে। কোষ-মধ্যবর্ত্তী-পদার্থ কি? যে পদার্থ দুই কোষের মধ্যস্থল অধিকার করিয়া রহিয়াছে, তাহাকে কোষ-মধ্যবর্ত্তী-পদার্থ বলা যায়। ইহারা কোষ হইতেই উৎপন্ন হয়। এবং প্রত্যেক কোষের বহির্দ্দেশ হইতে পৃথক্ হইয়া চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী কোষ সমূহের চাপে বিভিন্ন আকার ধারণ করিয়া থাকে। ইহারা অধিকাংশ স্থলেই সূত্রবৎ। কোষের বহির্দ্দেশ হইতে বহুবার ক্ষরিত হইয়া বহুবিধ

সূত্র প্রস্তুত হয় এবং সূত্রগুচ্ছবৎ, কোষ-মধ্যবর্ত্তী-স্থান অধিকার করিয়া থাকে। ঐ সমস্ত কোষ-মধ্যবর্ত্তী-স্থানসমূহে অবিরাম রক্ত সঞ্চালিত হইতেছে, এবং রক্ত হইতে নানাবিধ পদার্থ কোষ মধ্যবর্ত্তী পদার্থে সংযোজিত হইতেছে। এই সমস্ত বাহ্যপদার্থ লিপ্ত হওয়াতে কোষ-মধ্যবর্ত্তী-পদার্থ স্থানবিশেষে বিভিন্ন আকার ধারণ করিয়া শারীরিক উপাদানগুলিকে স্থূল দৃষ্টিতে পৃথক্ করিয়া রাখিয়াছে। প্রাণিগণের অস্থি কেমন কঠিন এবং শুভ্র, চর্ম্ম কেমন দৃঢ় অথচ নরম, মাংস কেমন স্থূল এবং কোমল! ইহার কারণ আছে। রক্তের মধ্যে ক্যালসিয়ম ফস্ফেট্ নামক একটী পদার্থ রহিয়াছে উহা দেখিতে চূণের ন্যায়। এই পদার্থ একত্র করিয়া চাপ দিলে প্রস্তরবৎ কঠিন হইয়া পড়ে। রক্তস্থিত এই পদার্থ কোষ-মধ্যবর্ত্তী-পদার্থে অণুপরমাণুক্রমে সংযোজিত হইয়া অস্থির কাঠিন্য এবং শুভ্রতা বিধান করিতেছে। যে কোষ-সমূহে চর্ম্ম নির্ম্মিত হয়, উহাদের মধ্যবর্ত্তী-পদার্থ সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম দৃঢ় সূত্রবৎ, এবং উহাদের মধ্যে কিরাটীন নামক একপ্রকার পদার্থ থাকে। এই জন্যই চর্ম্ম দৃঢ় এবং নরম। কিন্তু মাংসের কোষ-মধ্যবর্ত্তী-সূত্রগুলি অপেক্ষাকৃত স্থূল এবং কোমল হওয়াতে প্রাণিগণের মাংস ঈদৃশ স্থূল ও কোমল হইয়া রহিয়াছে। ফলতঃ কোষ ও কোষ-মধ্যবর্ত্তী-পদার্থই শরীর গঠনের মূল উপাদান। যে শরীরে কোষের সংখ্যা যত অধিক, সেই জীব তত বৃহৎ। হস্তীর শরীরে অশ্ব অপেক্ষা অধিকতর কোষ বর্ত্তমান রহিয়াছে, এবং এই হেতু হস্তীর আকার অশ্ব অপেক্ষা বৃহৎ। আবার অশ্বে কুক্কুর-শরীর অপেক্ষা অধিক কোষ বিদ্যমান, এই জন্যই অশ্ব কুক্কুর অপেক্ষা বৃহৎ। যত ক্ষুদ্র প্রাণী ততই কোষের সংখ্যা অল্প। কোষের সংখ্যা ক্রমশঃ অল্প হইয়া, আমরা অবশেষে এমন একটী আনুবীক্ষণিক প্রাণী দেখিতে পাই, যাহার দেহ কেবল একটীমাত্র কোষদ্বারা গঠিত। এই প্রাণীকে বৈজ্ঞানিকগণ "এমিবা"

নামে অভিহিত করিয়াছেন। এই প্রাণীর শারীরিক ক্রিয়া বহুকোষ-সমন্বিত প্রাণীশরীরের এক একটী কোষের শারীরিক ক্রিয়ার সম্পূর্ণ অনুরূপ। জন্ম, আহার, বংশবৃদ্ধি এবং মৃত্যু কোন বিষয়ে কিছুমাত্রও বৈলক্ষণ্য নাই। এমিবা জলে সঞ্চরণ করে, জীবদেহের কোষপুঞ্জও ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে সমর্থ। যে সমস্ত স্থানের কোষ-মধ্যবর্ত্তী-পদার্থ কঠিন এবং সূত্রবৎ, সেই সকল স্থানের কোষশ্রেণী কঠিন এবং সূত্রবৎ কোষ-মধ্যবর্ত্তী-পদার্থে বেষ্টিত ও আবদ্ধ হইয়া থাকে, সুতরাং বন্ধন বশতঃ স্থানান্তরিত হইতে পারে না। কিন্তু পরমেশ্বর তাহাদিগকে ভ্রমণের ক্ষমতা হইতে বঞ্চিত করেন নাই। শোণিতের কোষ-মধ্যবর্ত্তী-পদার্থ তরল, এ নিমিত্ত শোণিতস্থিত কোষগুলি ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে পারে।

এমিবা জলে সঞ্চরণ করিবার সময়ে, নিকটস্থিত শরীরপোষণোপ-যোগী পদার্থ শরীরের ভিতরে লইয়া যায় এবং তদ্দ্বারা জীবনধারণ করে; দেহস্থিত কোষগুলিও রক্ত হইতে শরীর পোষণোপযোগী পদার্থ গ্রহণ করিয়া জীবিত থাকে। আমাদের ভুক্ত দ্রব্য রক্তে পরিণত হইয়া সর্ব্ব শরীরে সঞ্চালিত হয়; শোণিতের মধ্যেই কোষগণের খাদ্য বর্ত্তমান রহিয়াছে। সুতরাং আমরা দেখিতেছি যে, কোষগণেরই পুষ্টি রক্ষার্থ আমরা আহার করি। শ্বাস-বায়ু ইহাদেরই পোষণের জন্য অবিশ্রান্ত রক্তশোধন কার্য্য সম্পাদন করিতেছে। বলা বাহুল্য, রক্তসঞ্চালন-কারী হৃদ্‌পিণ্ড, শ্বাসযন্ত্র, এবং পাকযন্ত্র, ইহারাও কোষপুঞ্জ এবং কোষ-মধ্যবর্ত্তী-পদার্থদ্বারা নির্ম্মিত এবং রক্তদ্বারা পুষ্ট হইয়া জীবিত রহিয়াছে।

প্রাণীগণের শরীর, জীবনের নির্দ্দিষ্টকাল পর্য্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। এই সেদিন আমরা উপেন বাবুকে ক্ষুদ্র বালকটী দেখিয়াছি; আজ তিনি হস্তীপৃষ্ঠে আরোহণ করিলে বালকেরা কোন্‌টা ফেলিয়া কোন্‌টাকে

দেখিবে অর্থাৎ হাতীটাই দেখিবে কি আমাদের উপেন বাবুর প্রকাণ্ড দেহটিই অবলোকন করিবে, তাহা ভাবিয়া ঠিক করিতে পারে না। ইহারও কারণ প্রাণিদেহের কোষসমষ্টি। কোষগুলির একটী দুইটীতে বিভক্ত হয়, দুইটী চারিটিতে বিভক্ত হয়, চারিটি আটটিতে বিভক্ত হয়; এইরূপে তাহারা ক্রমশঃ দ্বিগুণিত হইয়া থাকে। জীবনের নির্দ্দিষ্টকাল পর্য্যন্ত কোষসমূহের সংখ্যা এইরূপে বর্দ্ধিত হয়, এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে প্রাণীদেহও তদনুরূপ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। এই প্রকারে ক্ষুদ্রকায় শিশু ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে পাইতে বলিষ্ঠকায় যুবকরূপে পরিণত হয়। এমিবা নামক এক-কোষ-বিশিষ্ট প্রাণীর সংখ্যাও এইরূপে বৃদ্ধি পাইয়া থাকে এবং এই পদ্ধতিতেই তাহাদের বংশ বৃদ্ধি হয়। ইহা হইতে আমরা স্পষ্টই দেখিতে পাই যে, জীবদেহ এমিবা জাতীয় কতকগুলি কোষ অর্থাৎ কীটের দ্বারা গঠিত। এই যে কাণ্ডদেহ এই যে কুসুম-কোমল-লাবণ্য-শোভিত সুকুমার কলেবর, ইহার সমস্তই কীট রাশিতে পরিপূর্ণ, সমস্তই পুঞ্জীকৃত কীট! নরনারীর দেহে কীট, মুখে কীট, সর্ব্ব শরীরে পোকা কিল্-বিল্ করিতেছে!

এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, রাম বা শ্যামকে কিম্বা অশ্ব অথবা হস্তীকে একটি প্রাণী বলিতে আমাদের অধিকার আছে কি না? রামের মৃত্যু হইল; তুমি পরীক্ষা করিয়া দেখিলে, তাহার হৃদ্‌পিণ্ডের ক্রিয়া স্থগিত হইয়াছে, শ্বাসযন্ত্র বায়ু আকর্ষণ করিতেছে না, এবং বক্ষঃগহ্বরস্থ বায়ু নির্গত হইতেছে না, স্নায়ুমণ্ডল নিশ্চেষ্ট ও বোধশক্তিরহিত হইয়াছে, সঞ্চলনশক্তি নিবৃত্ত হইয়াছে, শরীর শীতল হইয়া গিয়াছে এবং দেহখানি কাষ্ঠখণ্ডের ন্যায় ভূপতিত রহিয়াছে দেখিয়া তুমি বলিবে রাম মরিয়াছে। তুমি সেই অবস্থাতেই তাহার দাহকার্য্য সমাধা করিবে। কিন্তু যখন প্রাণিগণের দেহের কার্য্য রুদ্ধ হইয়া যায়, তখনও তাহাদের শরীর সম্পূর্ণরূপে প্রাণশূণ্য হয় না, তখনও শরীর

গঠণকারী-কোষসমুদায় জীবিত থাকে। প্রাণীর মৃত্যু হইলে শরীরাভ্যন্তরস্থ বহু কোষ তখনই মৃত্যুমুখে পতিত হয় বটে, কিন্তু তখনও অধিকাংশ কোষই জীবিত থাকে এবং আহার বিহারাদি কার্য্যে সমর্থ থাকে। হৃদপিণ্ড, শ্বাসযন্ত্র, মস্তিষ্ক প্রভৃতি যন্ত্রনিচয় নিষ্ক্রিয় থাকা নিবন্ধন কোষদিগের খাদ্যদ্রব্যের বিশেষ অভাব হয়। খাদ্যাভাব হইলে কাজে কাজেই কোষসমূহ ক্রমে জীবনহীন হইতে আরম্ভ করে। কিন্তু কোষগণ কখন জীবনহীন হইয়া পড়িবে তাহার কোন অবধারিত সময় নাই। যখন পচনক্রিয়া আরম্ভ হইবে, তখনই বুঝিতে হইবে যে জীবদেহস্থিত কোষপুঞ্জের মৃত্যু আরম্ভ হইয়াছে, যে যে স্থান পচিয়া যাইতেছে, সেই সেই স্থানের কোষগণ প্রাণহীন হইয়া পড়িতেছে। যখন জীবদেহ সম্পূর্ণরূপ পচিয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়, তখনই আমরা নিশ্চয়রূপে বলিতে পারি যে, দেহটি সম্পূর্ণরূপে প্রাণহীন হইয়াছে। অতএব আমরা জীবদেহের ক্রিয়াবিকারজনিত মৃত্যুকে জীবের দৈহিক মৃত্যু, এবং কোষসমূহের মরণজনিত মৃত্যুকে আনবিক মৃত্যু নামে অভিহিত করিতে পারি।

জীবদেহগঠণকারী কোষ এবং কোষময় জীব, উভয়েই প্রাণী। এক একটি কোষের স্বাধীনবৃত্তি থাকিলেও, তাহারা কোষময় জীবের মস্তিষ্কের ইচ্ছানুসারে পরিচালিত হয়। একজন সাহেব যখন মনে করে যে, তাঁহার একখানি ভ্রমরকৃষ্ণপাদুকাশোভিত অমলশ্বেতস্ফটীক ধবলচরণ উর্দ্ধে তুলিয়া কোনও কৃষ্ণাঙ্গের পৃষ্ঠে নিক্ষেপ করিতে হইবে, অমনি তাঁহার পদগঠণকারী কোষশ্রেণী উর্দ্ধদিকে উত্থিত হয়, এবং পর মুহূর্ত্তেই প্রবল বেগে কালা আদমীর পৃষ্ঠদেশে নিক্ষিপ্ত হয়। আবার কৃষ্ণাঙ্গ যখন ইচ্ছা করেন যে তাঁহার দক্ষিণহস্ত মুষ্টিবদ্ধ হইয়া সবলে সাহেবের মুখমণ্ডলে পতিত হউক, তৎক্ষণাৎ তাহার হস্তগঠণকারী কোষসমূহ আকুঞ্চিত ও দৃঢ় হইয়া সাহেবের

নাসায় প্রবল বিক্রমে পতিত হয়। মস্তিষ্কই যাবতীয় প্রাণীর ইচ্ছা এবং শারীরিক ক্রিয়াসমূহের মূল কারণ। মস্তিষ্ক সেনাপতি, কোষগণ সেনাসমূহ। কোষসৈন্যগণ মস্তিষ্কসেনাপতির আজ্ঞাবহ হইয়া দলে দলে যুগপৎ পরিচালিত হইতেছে। বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ বলেন, মস্তিষ্কই আমাদের জ্ঞান এবং মানসিক বৃত্তিনিচয়ের মূলাধার। জ্ঞান এবং বৃত্তিনিচয়ের গুণে কোষসমষ্টিগঠিতপ্রাণী, একটি কোষ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকৃতির উন্নত জীব। দার্শনিক পণ্ডিতগণ বলেন, এই কোষময় জীবদেহে জীবাত্মা অধিষ্ঠান করিতেছেন, এই জীবাত্মার আদেশে মস্তিষ্ক প্রতিনিয়ত কার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছে। ফলতঃ মস্তিষ্ক হইতে স্নায়ুমণ্ডল সমস্ত শরীরে ব্যাপৃত রহিয়াছে, এবং এই স্নায়ুমণ্ডল মস্তিষ্কের আজ্ঞাবহন করিয়া স্থানবিশেষের কোষসমষ্টিকে কার্য্যে নিয়োগ করিতেছে। মস্তিষ্কও সজীব কোষসমূহ এবং কোষ-মধ্যবর্ত্তী-পদার্থ দ্বারা গঠিত।

অতএব কোন প্রাণীকে আর "একটি প্রাণী" বলা চলে না। যাহাকে একটি প্রাণী বলিয়া নির্দ্দেশকরি, সেই প্রাণিটী কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণীর সমষ্টি। কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণীর একত্র সমবায়ে একটি উচ্চশ্রেণীস্থ প্রাণীর সৃষ্টি হইয়াছে। সুতরাং এক একটি প্রাণীকে প্রাণিপুঞ্জ বলা যাইতে পারে।

শ্রীহেমন্তনাথ মহলানবীশ।

আমাদের ঐতিহাসিক ভাণ্ডার।

জেলা মুর্শিদাবাদ, থানা মৃজাপুরের অন্তর্গত খারিয়র গ্রাম। এই গ্রামে একটি অতি পুরাতন মস্‌জিদ্‌ ভগ্ন অবস্থায় বিরাজিত আছে। এই মস্‌জিদের নির্ম্মাতা কে, তৎসম্বন্ধে স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যে এইরূপ প্রবাদ প্রচলিত আছে যে;—দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মা কর্ত্তৃক এই মস্‌জিদ্‌ একরাত্রের মধ্যে নির্ম্মিত হয়। মস্‌জিদের নির্ম্মাণপ্রণালী, ইষ্টকোপরি ক্ষোদিত লতা-পাতা ও ঝাড় এবং গ্রামবাসী জনসাধারণের অজ্ঞতাই ঐরূপ অদ্ভুত প্রবাদের মূল বলিয়া অনুমিত হয়।

খারিয়রের মস্‌জিদ্‌।

এই মস্‌জিদের দৈর্ঘ্য ৪৬, বিস্তার ৩২ এবং বারান্দার ছাদের উচ্চতা ২৪ ফিট। পূর্ব্বে ইহার উচ্চতা আরও বেশি ছিল। অভ্যন্তর ভাগ বর্গক্ষেত্রাকার, ইহার প্রত্যেক পার্শ্বের দৈর্ঘ্য ২০ ফিট। দেয়ালের ভিৎ ৬ ফিটের কম নহে। ইহাতে এখনও আটটি স্তম্ভ বর্ত্তমান রহিয়াছে। ইহাদের প্রত্যেকের বেড় অন্যূন ১৬ ফিট হইবে। মস্‌জিদের ভিত্তি কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরদ্বারা নির্ম্মিত। নিম্নভাগ হইতে ৭ ফিট ঊর্দ্ধে ৬½ ইঞ্চ বিস্তারের কৃষ্ণপ্রস্তর নির্ম্মিত আর একটি বন্ধনী আছে। অভ্যন্তর ভাগের ছাদ একটিমাত্র গুম্বজ দ্বারা নির্ম্মিত ছিল তাহা এক্ষণে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। বারান্দার ছাদে তিনটি গুম্বজ; দুই পার্শ্বের দুইটির কতকাংশ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। মধ্যভাগের গুম্বজটি এখনও অভগ্ন অবস্থায় রহিয়াছে। এই মস্‌জিদ্‌টি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইষ্টকদ্বারা নির্ম্মিত। এই সকল ইষ্টকের গাত্রে নানা প্রকার ফুল, লতা, পাতা ও ঝাড়

মস্‌জিদের নিকটেই একটি ইষ্টক নির্ম্মিত আস্তানা আছে। লোকে ইহাকে বড়খাঁ-গাজিসাহেবের আস্তানা কহিয়া থাকে। গ্রামবাসী জনসাধারণ পীরসাহেবের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাবান্। গ্রামবাসী একজন লোকের মুখে পীরসাহেবের অমানুষীশক্তি সম্বন্ধে কয়েকটি গল্প শুনিলাম।

গাজিসাহেবের আস্তানায় দুইখানি আরবী অক্ষর ক্ষোদিত প্রস্তর বসান আছে। গ্রামবাসী লোকের মুখে শুনিলাম, প্রস্তর দুইখানি মস্‌জিদে লাগান ছিল। মস্‌জিদ্ হইতে তাহা পড়িয়া গেলে পীরের আস্তানার খাদেম (সেবাইত) আস্তানার গাত্রে প্রস্তর দুইখানি লাগাইয়া দিয়াছেন। ইহার মধ্যে একখানি আমার প্রিয় বন্ধু বোন্‌হা নিবাসী মুন্সী মহম্মদ এহশান সাহেব পড়িয়া দিয়াছেন। ছোট খানি এখানে কেহ পড়িতে পারে নাই। প্রস্তর দুইখানির লিপি উদ্ধার হইলে তাহা হইতে কোনও ঐতিহাসিক তথ্য নিরাকৃত হইবার সম্ভাবনা।

কথিত মুন্সিসাহেব বড় প্রস্তর লিপিখানি পাঠ করিয়া তাহার যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা নিম্নে লিখিত হইল।

"নবি (প্রেরিত পুরুষ) বলিয়াছেন, নবী আল্লা হইতে ও মস্‌জিদ্ নবী হইতে হইয়াছে। আল্লা নবী ও মস্‌জিদ্‌কে আমাদিগের স্বর্গের জন্ম মৌজুদ করিয়াছেন।

এই মস্‌জিদ্ সৈয়দ সুলতান আশরক হোশেইনীর পুত্র সুলতানশ্রেষ্ঠ সংসারকে ছায়াদানকারী জয়শীল নরপতি হোশেনশাহের (ঈশ্বর তাঁহার সিংহাসন ও রাজ্যকে চিরকাল স্থায়ী রাখুন) রাজত্বকালে ৯০০ হিজরীতে গওশখাঁ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইল।"

মস্‌জিদের নিকটস্থ আস্তানা সম্ভবতঃ গওশখাঁর সমাধি এইরূপ অনুমান করা যায়।

মুর্শিদাবাদজেলার গ্রামে গ্রামে বহু ঐতিহাসিক কীর্ত্তি রহিয়াছে।

খারিয়রগ্রামের দুই ক্রোশ পশ্চিমে "শেখের দীঘি"। এই দীঘির দৈর্ঘ্য প্রায় ১ মাইল ও বিস্তার ½ মাইল। দীঘি খননের সন তারিখ ইত্যাদি সম্বলিত একখানি প্রস্তর-লিপি ইহার পূর্ব্ব-দক্ষিণ পাড়ে ছিল। উহা এক্ষণে এসিয়াটিক মিউজিয়মে রক্ষিত হইয়াছে। এই দীঘিটি হোসেন-সাহ খনন করিয়াছিলেন।

খারিয়র গ্রামের পাঁচ মাইল পূর্ব্বে চাঁদপাড়া গ্রাম। কথিত আছে, গৌড়েশ্বর সৈয়দ-আলাউদ্দিন-হোশেনশাহ এই গ্রামে স্বীয় বাল্যজীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। বাহমানীরাজ্য সংস্থাপয়িতা হোশেনশাহ-বাহমনী সম্বন্ধে যেরূপ কিম্বদন্তী ইতিহাসে স্থানলাভ করিয়াছে, চাঁদপাড়া অঞ্চলে গৌড়েশ্বর হোসেনসাহ সম্বন্ধেও অবিকল সেইরূপ প্রবাদ প্রচলিত আছে। এই সকল প্রবাদ হইতে সত্য মিথ্যা নিরাকরণ করা দুরূহ।

কথিত আছে, হোশেনসাহ স্বীয় বাল্যপ্রভু চাঁদঠাকুরকে চাঁদপাড়া গ্রাম একআনা মাত্র রাজস্ব ধার্য্যে প্রদান করিয়াছিলেন; তদনুযায়ী গ্রামের নাম "একআনা চাঁদ পাড়া" হয়। আজিও লোকে "চাঁদপাড়া" শব্দ উচ্চারণ করিবার সঙ্গে সঙ্গে "এক আনা" শব্দ উচ্চারণ করিয়া থাকে।

যাহাহউক, চাঁদপাড়া গ্রাম যে পূর্ব্বে বিশেষ সমৃদ্ধিসম্পন্ন ছিল তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। গ্রামের ধ্বংশপ্রাপ্ত বহুল অট্টালিকা রাশিকৃত ইষ্টক স্তূপ প্রভৃতিই তাহার সাক্ষীস্বরূপে বিরাজ করিতেছে।

খারিয়র গ্রামের দুইক্রোশ দক্ষিণে স্বনাম প্রসিদ্ধ "সাগরদীঘি"। ইহার দৈর্ঘ্য প্রায় ১¼ মাইল এবং বিস্তারও অন্যূন ১ মাইল হইবে। "বিক্রমপুরের প্রাচীনকীর্ত্তি" শীর্ষক প্রবন্ধে লেখক মহাশয় "রামপাল দাঘি" সম্বন্ধে যেরূপ প্রবাদের উল্লেখ করিয়াছিলেন, সাগরদীঘি সম্বন্ধেও তদনুরূপ একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে। এবং উক্ত প্রবাদ হইতেই, দীঘির নাম সাগরদীঘি হইয়াছে, সাধারণের

এইরূপ বিশ্বাস। উক্ত প্রবাদের মূলে কোনও সত্য নিহিত আছে কি না জানি না। বোধ হয় দীঘিটি বৃহদাকার বলিয়া উহার নাম সাগরদীঘি হইয়াছে। এই দীঘি প্রসিদ্ধ হিন্দুরাজা মহীপাল খনন করিয়াছিলেন।

বীরভূমজেলার অধীন রামপুরহাটমহকুমার অন্তর্গত কলেশ্বর-গ্রাম। গ্রামটী নিতান্ত ক্ষুদ্র নহে। উহার দক্ষিণে, অনতিদূরে একটী প্রাচীন শিব-মন্দির আছে। মন্দিরটী, পূর্ব্বাভিমুখে অবস্থিত। তাহার সম্মুখে পশ্চিমাভিমুখে, ও বামপার্শ্বে দক্ষিণাভিমুখে আরও দুইটী ক্ষুদ্র-ইষ্টকালয় আছে। মধ্যস্থলে এক অনতি বৃহৎ প্রাঙ্গন, প্রাঙ্গনের উত্তর-পূর্ব্ব কোণে একটি প্রকাণ্ড বট-বৃক্ষ; ও দক্ষিণে এক অতি সুন্দর পুষ্করিণী। পুষ্করিণীর তীরে, অনেকগুলি তালবৃক্ষ শ্রেণী-বদ্ধ-রূপে দণ্ডায়মান রহিয়াছে।

কলেশ্বরের শিব-মন্দির

বিগত বৎসর বৈশাখ মাসে, আমার এক বন্ধুর বিবাহ হয়। বিবাহ যে গ্রামে হইয়াছে, তাহা কলেশ্বরের নিকটবর্ত্তী; এবং আমাদের গ্রাম হইতে তথায় যাইতে হইলে কলেশ্বর-মন্দিরের নিকট দিয়াই যাইতে হয়। বিবাহের দিন অপরাহ্ন সাড়ে চারি ঘটিকার সময় আমাদের বরযাত্রিক-দল, বিশ্রামার্থ ও শিব-সন্দর্শন-মানসে, উক্ত মন্দিরপ্রাঙ্গনে উপস্থিত হ'ন। কিন্তু তৎকালে মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ ছিল, এজন্য সকলকেই তথায় সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অবস্থান করিতে হইয়াছিল।

মন্দিরের সম্মুখদিকে এক উচ্চ, সুদীর্ঘ ও সুবিস্তৃত বারাণ্ডা; এবং উঠান হইতে বারাণ্ডায় উঠিবার জন্য প্রশস্ত সোপানাবলী রহিয়াছে। মন্দিরের দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকেও দুইটী বারাণ্ডা আছে;

কিন্তু সে দুইটীর বিস্তার, সম্মুখস্থ বারাণ্ডার বিস্তার অপেক্ষা অনেক অল্প।

আমরা বারাণ্ডায় না উঠিয়া, সর্ব্বপ্রথম সোপানেই বসিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলাম। ক্ষণকাল পরে তথায় এক ব্যক্তি আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম যে, সে একজন পাণ্ডা; আরও জানিলাম যে, তাহাদের সংখ্যা বার, এবং মন্দির-মধ্যস্থ শিব-লিঙ্গ, কলেশ্বর নামে অভিহিত। সে আমাদের নাম ও বাসস্থান জিজ্ঞাসা করিয়াই বলিল, "আপনারা আমার সঙ্গে আসুন, আমি মন্দিরের দরজা খুলিয়া দিতেছি।" তাহার কথা সমাপ্ত হইতে না হইতেই, আমরা বারাণ্ডায় উঠিলাম। তখন সে মন্দিরের সম্মুখস্থ দরজা খুলিয়া দিল। আমরা দরজার নিকটে গিয়া দেখি যে, সেস্থান হইতে মন্দিরের মেজে প্রায় ৮।১০ হাত নীচে; এবং মেজে নামিবার জন্য কতকগুলি সিঁড়ি আছে। সিঁড়ি দিয়া, মেজে নামিলাম। নামিয়া দেখিলাম যে, মেজের ঠিক মধ্যস্থলে একটী শিব-লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। শিব-লিঙ্গটী, মেজে হইতে সওয়া হাত উচ্চ এবং প্রায় একহাত পরিধি-বিশিষ্ট ও উৎকৃষ্ট কৃষ্ণ-প্রস্তরদ্বারা নির্ম্মিত। সমীপস্থ পাণ্ডার মুখে অবগত হইলাম, যে প্রত্যহ দিবাভাগে পাঁচ পোয়া পরিমিত আতপান্নের ও সন্ধ্যার সময় পাঁচসের করিয়া দুগ্ধের ভোগ হইয়া থাকে। এই "ভোগ" পাণ্ডাদিগকে দিতে হয়, এজন্য বৎসরে এক মাস করিয়া তাহাদের পালা আছে। পূজাদি সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন করিতে হইবে বলিয়া যিনি শিব-লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, তিনি পাণ্ডাদিগকে একশত চুয়াল্লিশ বিঘা নিষ্কর জমি দান করিয়া গিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত যে লোকটী মন্দির পরিস্কারাদি কার্য্য করে; এবং যে একটা লোক প্রাতে ও সন্ধ্যাবেলায় ঢাক বাজায়, তাহাদেরও প্রত্যেকের তিন বিঘা করিয়া দেবোত্তর-জমি আছে।

মন্দিরের মেজেটী পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বটে, কিন্তু দেওয়ালের অনেক স্থানের চূণ খসিয়া গিয়াছে। দক্ষিণ ও পশ্চিমদিকেও দুইটী দরজা, এবং মেজে হইতে দরজা পর্য্যন্ত কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সিঁড়ি সংযুক্ত রহিয়াছে। কিন্তু দরজা দুইটীর অবস্থা এতদূর খারাপ যে সর্ব্বদাই বন্ধ করিয়া রাখিতে হয়, নতুবা পড়িয়া যাইবার বিশেষ সম্ভাবনা। দরজাগুলির কবাট, চৌকাট অতি সুন্দর। সমস্ত শালকাষ্ঠে নির্ম্মিত; এবং বেশ উচ্চ ও প্রশস্ত। প্রত্যেক কবাটের উচ্চতা প্রায় ৫।৬ হাত, বিস্তৃত অন্যূন দুই হাত হইবে। এই তিনটী দরজা ভিন্ন মন্দিরের মধ্যে আলোক প্রবেশের অন্য কোনও উপায় নাই; তাহাতে আবার দুইটী দরজাও একরূপ অকর্ম্মণ্য। এজন্য মন্দিরমধ্যে দিনেও প্রায় অন্ধকার। আমরা যে সময়ে মন্দির-মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলাম, তখন অন্ধকার আরও ঘনীভূত হইয়া আসিতেছিল, সুতরাং শীঘ্রই আমাদিগকে মন্দিরের বাহিরে আসিতে হইল।

তখনও সূর্য্যাস্ত হয় নাই; কিন্তু রৌদ্র ফুরাইয়া গিয়াছে। কেবল মন্দিরের চূড়াদেশ ও তালবৃক্ষের অগ্রভাগগুলি, অস্ত-গমনোন্মুখ-সূর্য্যের হেমাভ-কিরণে এক অপূর্ব্ব-শ্রী ধারণ করিয়াছিল। সেই সময়ে মন্দিরের চতুঃপার্শ্ব ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিতে আমাদিগের বড় ইচ্ছা হইল। দেখিলাম যে মন্দিরটী ৬০।৭০ হাত উচ্চ; এবং দৈর্ঘ্যে ৩০।৪০ হাত, ও প্রস্থে ২০।২৫ হাত হইবে। যেরূপ ইষ্টকে গাঁথান হইয়াছিল, তাহা ১১ ইঞ্চ দীর্ঘ; এবং ৫॥০ ইঞ্চ প্রশস্ত ও ৩✓০ ইঞ্চ বেধ-বিশিষ্ট। পূর্ব্বে যে বারাণ্ডার কথা বলা হইয়াছে, তাহার উপরেও তদনুরূপ আর তিনটী বারাণ্ডা; বৃহৎ বৃহৎ স্তম্ভের উপর সংরক্ষিত; এবং মন্দিরের উত্তরদিকে, তথায় উঠিবার নিমিত্ত তিনহাত প্রশস্ত সোপানাবলী। সোপানারোহণ করিয়া, মন্দির-সংলগ্ন সেই

অত্যুচ্চ বারাণ্ডায় উঠিলাম। সেখানে গিয়া দেখি যে, মন্দির নির্ম্মাতা, শিল্প-নৈপুণ্যের যথেষ্ট পরিচয় প্রদান করিয়াছে।

সম্মুখস্থ বারাণ্ডার উভয় পার্শ্বে, পরস্পর সম্মুখীনভবে (অর্থাৎ একটি উত্তরাভিমুখে ও অপরটী দক্ষিণাভিমুখে) দুইটী ক্ষুদ্র মন্দির, এবং প্রত্যেক মন্দিরে এক একটী করিয়া শিব-লিঙ্গ সংস্থাপিত রহিয়াছে। মূল মন্দিরটী সেই স্থান হইতেই ক্রমশঃ চূড়াকৃতি ধারণ করিয়াছে, এবং উহার গায়ে চুণের দ্বারা গঠিত নানাবিধ বিচিত্র প্রতিমূর্ত্তি সকল সংলগ্ন হইয়া আছে। অপর দুইটী বারাণ্ডায় এ সমস্ত কিছুই নাই বটে; কিন্তু বারাণ্ডাগুলির প্রান্তভাগে যে ইষ্টকনির্ম্মিত কার্ণিশ ছিল তাহা যে অত্যন্ত মনোহর ধ্বংশাবশেষ দেখিয়াও, একথা বেশ বুঝা যাইতেছে। শুনিলাম যে, সাধারণ লোকেই বলে, ঐ সম্মুখস্থ বারাণ্ডা-সংযুক্ত কার্নিশের ঠিক মধ্যস্থলে, মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা রাজা রামজীবনের নাম খোদিত ছিল; এবং মন্দির নির্ম্মাণ করিতে লক্ষাধিক টাকা ব্যয়িত হইয়াছিল।"* কিন্তু ইহা ব্যতীত আরও এক কথা এই যে, কলেশ্বরের পাণ্ডারা যে সমস্ত দেবোত্তর জমি ভোগ করিয়া আসিতেছে তাহার একখানি অতি জীর্ণ দানপত্র আছে। তাহাতেও নাটোরাধিপতি † রাজা রামজীবনের নামোল্লেখ দেখা যায়। অতএব কলেশ্বর মন্দিরের সহিত যে রাজা রামজীবনের অতি নিকট সম্বন্ধ ইহা নিতান্ত মিথ্যা কথা নহে। নাটোরাধিপতি রাজা রামজীবন যে কত বৎসর হইল লোকান্তরিত হইয়াছেন তাহা ঠিক করিয়া বলিতে না পারিলেও একথা বলিতে পারা যায় যে, একশত বৎসর মধ্যে তিনি জীবিত ছিলেন না। সুতরাং

* কল্লেশ্বর ও তাহার পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহে এই প্রবাদ প্রচলিত আছে।

† নাটোর, রাজসাহী জেলার অন্তর্গত।

কলেশ্বর মন্দির যে একশত বৎসর পূর্ব্বে নির্ম্মিত হইয়াছিল তাহাতে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। আর মন্দিরটী যে প্রাচীন তাহা দেখিলেই অনায়াসে বুঝিতে পারা যায়; অনেক স্থান ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে ও ফাটিয়া গিয়াছে। এমন কি, যদি আর কিছুদিন মন্দিরটী অসংস্কৃত অবস্থায় থাকে, তাহা হইলে একবারে ভূমিসাৎ হওয়াই সম্ভব।

মন্দিরের সম্মুখে যে ভগ্নপ্রায় গৃহটী আছে তাহা ১০।১১ হাত দীর্ঘ, ৫।৬ হাত প্রশস্ত ও ৮।৯ হাত উচ্চ হইবে। ঘরের জানালা বা দরজা কিছুই নাই; কেবল একটী উপর দিকে খিলান্‌করা প্রবেশ পথ আছে মাত্র। বামপার্শ্বে যে গৃহ আছে, তাহাও আকৃতিতে ঠিক ঐ প্রকার; তবে তাহার আরও ভগ্নাবস্থা। পূর্ব্বোক্ত গৃহে একখানি পাষাণে খোদিত দুর্গার প্রতিমূর্ত্তি আছে; শেষোক্ত গৃহে সেরূপ কিছুই নাই। পূর্ব্বেই যে বটবৃক্ষের কথা বলিয়াছি তাহার নিকটে রাশি রাশি ইষ্টক পড়িয়া আছে; ইহাতে বোধ হয় যে, মন্দিরের নির্ম্মাণ-কালে উক্ত বৃক্ষের মূল-দেশ ইষ্টকদ্বারা বাঁধান হইয়াছিল। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া বেড়াইতেছি এমন সময়ে সহসা গভীর শব্দে কাঁসর-ঘণ্টাদি বাজিয়া উঠিয়া মন্দিরকে প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিল। তখন আমরাও মন্দিরের সম্মুখস্থ বারাণ্ডায় উঠিয়া নীরবে আরতি প্রভৃতি দর্শন ও শিব-বন্দনাদি শ্রবণ করিয়া ভক্তি-পুলকিত চিত্তে তথায় আভূমি প্রণত হইলাম। তদনন্তর রাত্রি প্রায় সাড়ে সাত ঘটিকার সময় মন্দির পরিত্যাগ করিয়া গন্তব্য স্থানাভিমুখে যাত্রা করিলাম।

তৃষিতের আবাহন।

শুষ্ককণ্ঠে, পিপাসায় হ'য়ে ঊর্দ্ধমুখ
চেয়ে আছে বিশ্ব-প্রাণ একান্ত উন্মুখ
আকাশের পানে।
কোথা, কোথা বারিধারা?
আজি ধরা কাঁপিতেছে সুখ-শান্তিহারা
অসহ উত্তাপে।
ওই অসীম অম্বরে
বাষ্পাকারে বারিরাশি আছে থরে থরে
অদৃশ্য সাগর সম। তাহে, এ তিয়াস
মেটেনা, মেটেনা কভু।
প্রতপ্ত নিশ্বাস,
কণ্ঠাগতপ্রাণ এই ক্ষিতি-বক্ষ হ'তে
উঠি'ছে প্রবলবেগে ;—সমীরণ-স্রোতে
কাঁপি'ছে প্রকৃতি আজি প্রলয়ের কোলে।
কোথায় জীবন-ধারা? গগনের তলে
এস, এস কৃষ্ণ মেঘ ধীর গরজনে ;—
স্নিগ্ধ কর এ জগতী সফল বর্ষণে।

শ্রীদেবকুমার রায়চৌধুরী।

সাময়িক কথা।

কয়েক বৎসর হইল পুণায় একটি হিন্দু-বিধবা-আশ্রম সংস্থাপিত হইয়াছে। যে সমস্ত উচ্চবংশীয় হিন্দু বিধবাগণের মধ্যে বিধবা বিবাহ প্রচলিত নাই, তাঁহাদিগকে এই আশ্রমে রাখিয়া জীবিকা অর্জ্জনোপযোগী মোটামুটী বিদ্যা শিক্ষা প্রদান করা হইয়া থাকে। পুণাসহরবাসী মহাত্মা ভাণ্ডারকা'র প্রমুখ অনেক মহোদয় ইহার পৃষ্ঠ-পোষক ও পরিচালক। এতদ্ব্যতীত মিসেস্ রানাডে, মিসেস্ তিলক প্রভৃতি অনেক শিক্ষিতা রমণী ইহার তত্ত্বাবধারণ করিয়া থাকেন।

পুণার হিন্দু-বিধবা-আশ্রম।

এ আশ্রমে বিধবাগণ চারি প্রকার নিয়মে প্রবিষ্ট হইতে পান :—

(১) যাঁহাদিগের অভিভাবকগণ সমস্ত খরচ বহন করেন।

(২) যাঁহাদিগের অভিভাবক কেবল পরিচ্ছদ ও খুচরা-খরচ দেন।

(৩) যাঁহারা কোন প্রকার বৃত্তি পাইয়া থাকেন।

(৪) আশ্রম যাঁহাদিগের সমস্ত ভার বহন করেন।

এ আশ্রমের যাবতীয় গার্হস্থ্য কর্ম্ম আশ্রমবাসী বিধবাগণের দ্বারাই সম্পাদিত হইয়া থাকে। অল্পবয়স্কারা এই ভাবে গৃহকর্ম্মে সুপটু হয়। জাঁতা পরিচালন ও পেসন প্রভৃতি শ্রমসাধ্য কর্ম্ম শারীরিক সামর্থ অনুযায়ী ইহাঁদিগকে দৈনিক অর্দ্ধ-ঘণ্টার অনধিক কাল পর্যান্ত করিতে হয়। সাংসারিক কার্য্য সম্পাদনে পাছে পড়া শুনার ব্যাঘাত হয় সেই জন্য সমস্ত দিনের মধ্যে দেড়ঘণ্টা কাল ঐ কার্য্যের জন্য নির্দ্দিষ্ট আছে। সকলকে পালা করিয়া কাজ করিতে হয়।

ইহাঁদিগের দৈনন্দিন কার্য্য-প্রণালী অতি সুন্দর ও সুশৃঙ্খল। শয্যাত্যাগের জন্য প্রাতে সাড়েপাঁচটা হইতে সাড়েছয়টার মধ্যে তিনবার ঘণ্টাধ্বনি হইয়া থাকে। বয়স্থাদিগকে ছয়টার পূর্ব্বে এবং অল্পবয়স্কাগণকে সাড়েছয়টার মধ্যে গাত্রোত্থান করিতে হয়। ঠিক সাড়েছয়টার সময় সকলে পালা অনুসারে সাংসারিক কর্ম্ম আরম্ভ করেন। স্নানাদি সমাপ্ত হইলে পাঁচ মিনিট কাল ধর্ম্মানুষ্ঠান হয়। কেহ কেহ

তুলসী-পত্র পূজা করেন, কেহ বা ভগবদ্গীতা পাঠ করেন। তাহার পর দুই ঘণ্টা পড়াশুনা হয়। দশটার সময় প্রাতরাশের ঘণ্টা পড়ে। এগারটার সময় স্কুল আরম্ভ হয়। আরম্ভে পনর-মিনিট কাল ধর্ম্মসম্বন্ধীয় শিক্ষা প্রদত্ত হইয়া থাকে; অনেক সময় গীতা হইতে শ্লোক পাঠ করিয়া তাহার ব্যাখ্যা করা হয় এবং তদ্বিষয়ক আলোচনা হইতে থাকে। যাঁহাদিগের পক্ষে গীতা-পাঠ শক্ত এমন অল্পবয়স্কাদিগকে কেবল গীতার শ্লোক মুখস্থ করিতে দেওয়া হয়। ইহার পরে স্কুলের কার্য্য আরম্ভ হয়। প্রায় সাড়ে চারিটার সময় স্কুল বন্ধ হয়। বৈকালে যৎকিঞ্চিৎ সাংসারিক কার্য্য ও একটু-আধটু ভ্রমণের পর, ছয়টার সময় আবার সান্ধ্য-ভোজনের ঘণ্টা পড়ে। রাত্রি সাড়েসাতটার সময় পুস্তকাদি পাঠ আরম্ভ হয়। পাঠ শেষ হইলে ধর্ম্মসম্বন্ধীয় বা নৈতিক গান গীত হইয়া থাকে। বয়স্থারা একটু অধিক রাত্রে শয়ন করেন এবং তাঁহাদিগকে প্রতিরাত্রে নয়টার সময় একবার স্কুল "হলে" যাইতে হয়—সেখানে এক-কণ্ঠে মহাজন-পদাবলী গীত হইতে থাকে। দশটার সময় শয্যা-গ্রহণের নিয়ম। ইহাঁদের কাহাকেও পারিবারিক আচার নিয়ম প্রতিপালনে বাধা দেওয়া হয় না। উচ্চ ও নিম্ন জাতি বলিয়া এখানে কোন বিচার নাই। কেবল আহারের সময় তাহা লক্ষ্য করা হয়—ভিন্ন শ্রেণীর ভিন্ন পংক্তিতে উপবেশন করেন। সকলের জন্যেই এক প্রকার আহারীয় প্রস্তুত হয়।

ইহাঁদিগকে প্রথম বৎসরে একটু-আধটু লিখিতে পড়িতে এবং সমান্য অঙ্ক-বিদ্যা শেখান হয়। মারাঠী চতুর্থ-ভাগ পড়িতে পারিলে তবে কবিতা, ইতিহাস, ভূগোল ও ইংরাজী পড়ান হয়। ইতিহাস ও ভূগোল মানচিত্রের সাহায্যে মুখে মুখে শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। সকলকেই ইংরাজী পড়িতে হইবে এমন কোন নিয়ম নাই। চতুর্থ-ভাগ শেষ হইলে ইংরাজি-উচ্চ-শিক্ষার উপযোগী পুস্তক পড়ান হয়। কিন্তু ভাষা এবং গণিত শিক্ষার উপরই সমধিক দৃষ্টি রাখা হয়। এ সকলের সঙ্গে সূচী-কার্য্যও শিক্ষা করিতে হয়। এ আশ্রমে নিয়ম আছে, সকলকেই নিজের পরিধেয় জামা নিজেকেই প্রস্তুত করিতে হইবে।

এই আশ্রমের গত বৎসরের বার্ষিক বিবরণী পাঠে জানা যায়, যে গত বৎসর ঐ আশ্রমে ৩৮ জন প্রবিষ্ট হইয়া ছিলেন। আয়-ব্যয়ের-হিসাব তালিকায় দেখা গেল, মোট আয় ৩৯৮২৯ টাকা এবং মোট ব্যয় ৯১৮৮ টাকা। দুই এক বৎসরের মধ্যে এই আশ্রমের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে। এখন এ আশ্রমের স্কুল ও বাস বাটী

হইয়াছে। চারিজন বিদুষী রমণী এই আশ্রমের জন্য নিঃস্বার্থভাবে অক্লান্ত পরিশ্রম করিতেছেন। অনেকেও অর্থ সাহায্যে বিশেষ উপকার করিতেছেন।

গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য লালায়িত অনেক হিন্দু-বিধবার ইহাতে উপকার হইবে আশা করা যায়। ইতিমধ্যে আশ্রম হইতে প্রায় কুড়িজন বিধবা স্বোপার্জ্জনে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। তাঁহাদিগের অনেকেই শিক্ষকতা এবং ধাত্রীর কার্য্য করিতেছেন। এবং এখন আশ্রমে আরো পনর জন এমন শিক্ষিতা রমণী আছেন যাঁহারাও উপার্জ্জনক্ষম।

গ্রন্থসমালোচনা।

অহল্যা বাই—শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বসু প্রণীত।

অহল্যার জীবনে আলো ও ছায়ার তারতম্য বড় সুতীব্র। অজ্ঞাতনামা আনন্দরাও পল্লীপাঠশালায় কুমারী অহল্যার অধ্যয়নাদির ব্যবস্থা করিয়া কোন প্রকারে কায়ক্লেশে জীবিকার সংস্থান ও সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছিলেন, কে জানিত, প্রবল প্রতাপান্বিত মল্‌হররাও-হোলকার সেই অখ্যাত পল্লীতে শিবির স্থাপন করিয়া গ্রামপরিদর্শনচ্ছলে স্বীয় একমাত্র পুত্র খণ্ডেজির জন্য অহল্যা-বাইকে বধূরূপে মনোনীত করিয়া আসিবেন? এই ঘটনা আশ্চর্য্য হইতেও আশ্চর্য্য, যেহেতু অহল্যা সুন্দরী বলিয়া পরিচিতা ছিলেন না, তিনি শ্যামাঙ্গী ও কৃশদেহা ছিলেন, থাকিবার মধ্যে তাঁহার সুশ্যামমুখে একটি অখণ্ড পুণ্যের দীপ্তি প্রতিভাত ছিল, সেই দীপ্তি মল্‌হররাও-হোলকারকে আকৃষ্ট করিয়াছিল। এই বিবাহ এরূপ অচিন্তনীয় ও অভূতপূর্ব্ব ছিল, যে অহল্যার পিতা আনন্দরাও হর্ষোচ্ছ্বাসে এই উপলক্ষে তাঁহার সর্ব্বস্ব ব্রাহ্মণগণকে বিলাইয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু অহল্যাকে ভগবান্ সুখের জন্য সৃষ্টি করেন নাই, একবার সুখের উত্তুঙ্গশীর্ষে স্থাপন করিয়া তাঁহাকে গাঢ় দুঃখের গহ্বরে নিক্ষেপ করিবেন, এই ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছিলেন। অষ্টাদশবর্ষ বয়সে অহল্যা বিধবা হন; খণ্ডেজি কুম্ভেরীদুর্গ অবরোধকালে নিহত হইলেন, অহল্যা একটি কন্যা ও একটি পুত্র লইয়া রাজপ্রাসাদে ভিখারিণী সাজিলেন; তিনি স্বামীর সঙ্গে সহমৃতা হইতে উদ্যত হইয়াছিলেন, মল্‌হররাওর কাতরোক্তিতে তিনি সে ইচ্ছা ত্যাগ করিলেন।

স্বামীর অভাবে রাজপ্রাসাদ আর পর্ণকুটীর উভয়ই হিন্দুরমণীর নিকট তুল্য। কিন্তু অহল্যার পতিবিয়োগই চূড়ান্ত কষ্টের কারণ হয় নাই,—ইহার অব্যবহিত পরেই মল্‌হররাও প্রাণত্যাগ করেন, এবং অহল্যার দুর্বৃত্ত পুত্র সিংহাসনে আসীন হইয়া নানাপ্রকারে মাতার মনঃপীড়ার কারণ দিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অবশেষে সেই পুত্রটিও অল্পদিনের মধ্যে প্রাণত্যাগ করিলেন

হইলেন, সুতরাং অহল্যার জীবনে সুখের কিছুই রহিল না। অন্য কোন রমণী হইলে এই শোকসাগরে ভাসিয়া যাইতেন; অহল্যা এই দুঃসহ শোকরাশিকে উপেক্ষা করিয়া কঠোর হস্তে রাজ্যশাসন করিয়াছেন, তাঁহার রাজ্য অরাজক দেখিয়া বহুব্যক্তি পাপ অভিসন্ধির বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহার রাজ্য আক্রমণার্থ বিপুলবাহিনী লইয়া ইন্দোরের সমীপবর্ত্তী হইয়াছিলেন। অহল্যা সমস্ত রাজন্যবর্গকে সাহায্যার্থ আমন্ত্রণপূর্ব্বক বিষম শোককে হৃদয় হইতে কিছুকালের জন্য অপসারিত করিয়া—শত্রুকে ভীতি-প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাঁহার শোকপাণ্ডুর মুখমণ্ডল কর্ত্তব্যবুদ্ধিতে ক্ষণতরে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল,—যাঁহারা মনে করিয়াছিলেন অহল্যা পুত্রশোকাতুরা অসহায়া বিধবা—তাঁহারা দেখিলেন তদবস্থায়ও অহল্যার কৃশ ও শোকশিথিল মুষ্ট উদ্যত হইয়া দৃঢ়ভাবে বল্লম ধরিতে কুণ্ঠিত নহে। যিনি অন্নপূর্ণা তিনিই অসুরঘাতিনী এবং এই জন্যই অহল্যাকে তদ্দেশবাসীরা মূর্ত্তিমতী ভগবতী বলিয়া পূজা করিয়া থাকে।

অহল্যা নামের সঙ্গে অন্নপূর্ণা ভাবটিই অধিকতর উদিত হয়,—তাহা হওয়া স্বাভাবিক, কারণ ভারতের এমন প্রসিদ্ধ তীর্থ নাই যে স্থানে অহল্যার অকাতর রত্নমুষ্টি বর্ষিত হয় নাই, সন্তানহারা মাতাকে জগতের সন্তানেরা আপনার করিয়া লইয়াছিল। যেখানে দুঃখীর কাতরোক্তি বা দীর্ঘ-নিঃশ্বাস পড়িত, অহল্যার পরদুঃখ-কাতরহৃদয় সেই দিকে উন্মুখ হইয়া থাকিত। তাঁহার মত দানশীলা রমণী এদেশে ঐতিহাসিকযুগে বিরল, তাঁহার মত নিষ্ঠা ও পবিত্রতা, অল্প রমণীই দেখাইতে পারিয়াছেন কিন্তু তাঁহার অপূর্ব্ব মহিমা এই ছিল—যিনি পূজামন্দিরে ও অতিথি-শালায় দেবীরূপিণী তিনি কর্ম্মশালা বা রণক্ষেত্রে হইতে সুদূরে ছিলেন না—কর্ত্তব্যের আহ্বান যে দিক হইতে আসিত সেই দিকেই তিনি সাড়া দিতেন। কোন সময়, তিনি পূজার ফুল চন্দনার্দ্র করিয়া ভক্তিভরে ইষ্টদেবের চরণে স্থাপন-যোগ্য করিতেছেন, কখন বা আতুর ও দুঃখীকে সন্তানবৎ পালন করিতেছেন, কখন বা রাজসভায় মন্ত্রীদের বিচারশক্তিকে পরাস্ত করিয়া স্বীয় সূক্ষ্ম অথচ সরল রাজনীতির পরিচয় দিতেছেন, কখনও বা যুদ্ধের জন্য উদ্যোগী হইতেছেন। এই কর্ম্মশালায় তিনি বিশ্রাম প্রার্থনা করেন নাই, শোকদুঃখের আগুনে পুড়িয়া তাঁহার চরিত্র কষিত স্বর্ণের ন্যায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। এই পুণ্যবতী রমণীর জীবনচরিত লিখিয়া যোগীন্দ্র বাবু আমাদিগের ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন।

দ্রৌপদী—শ্রীমতী জগদীশ্বরী দেবী প্রণীত।

আধুনিক কবিগণের কোমল-কোমল পদাবলীর ভিতর অনেক সময় কোনও রূপ ফলপ্রাপ্তির ভরসা না পাইয়া পাঠকগণ কাব্যশাস্ত্রের প্রতিই কতকটা বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন, তাঁহারা কবিতা-পুস্তক হাতে পাইলেই ভাবেন, ইহার মধ্যে কতকগুলি ফুলপল্লব ও তারার বর্ণনা আছে। আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি, জগদীশ্বরী দেবীর "দ্রৌপদী" সেই ধরণের কাব্য নহে। ইহাতে "ক্রোধবিস্ফূর্জ্জিত তাড়িত-প্রবাহ", "সহস্র-কর-বিধৃত-কলস-আবর্জ্জিত", "মৌঞ্জীর আঘ্যাত" প্রভৃতি কথা আছে। পুস্তকখানি অভিধান দেখিয়া পাঠ করিতে হইবে এবং পাঠ শেষে এই সমাসকণ্টকিত কাব্য-রাজ্য হইতে ফুলপেলবের বনে যাইবার জন্য প্রাণে ব্যাকুলতা না হইয়া যাইবে না; ফলপ্রাপ্তি না হইলেও সেখানে ফুল-পত্রের অভাব নাই, কিন্তু এ যে বেহদ্দ কাঁটার বন! গ্রন্থকর্ত্রী যদি কাব্য-শালা হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া রন্ধনশালার ভারগ্রহণ করেন, তবে অনেক উপাদেয় সামগ্রী প্রস্তুত হইতে পারে—সে স্বাভাবিক পন্থা ছাড়িয়া তিনি ভিন্ন উপায়ে লোকরঞ্জনের প্রয়াসী হইয়া মোটেই ভাল করেন নাই।

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন।

মহানাটক।

তৃতীয় অঙ্ক।

সীতা-সহ রামচন্দ্র কিছুদিন ভোগ-সুখ
সম্ভোগ করিলে যথোচিত,
অন্ধমুনি "শ্রবণে"র ভীষণ সে শাপ-কাল
ক্রমে আসি' হল উপস্থিত।
সহস্র-কিরণ-মালি সূর্য্যদেব অকস্মাৎ
ম্লান প্রভা করিল ধারণ;
মহা-অনর্থের হেতু সুপ্রচণ্ড উল্কাপিণ্ড
নভ-হতে হইল পতন;
ভূতধাত্রী বসুমতী থর থর বিকম্পিত,
দিগ্-ভাগ ধূসর-বরণ;
দিবসে বহুল তারা উদয় হইল নভে,
অসময়ে সূর্য্যের গ্রহণ;
রক্তময়ী বিন্দুবৃষ্টি, মধ্যাহ্নে কাকের ডাক,
কুক্কুরের ক্রন্দনের ধ্বনি;
চারিদিকে ফেরু-পাল বিচরিছে, মুহুর্মুহু
ঘোষে' ঘোর প্রলয়-অশনি॥
ইতি মধ্যে দশরথ রামের সুনীতি রাশি
করিয়া দর্শন,
যৌবরাজ্যে অভিষেক করিতে তাঁহারে এবে,
হল তাঁর মন॥

সুমন্ত্র।—(বহির্নিস্থত হইয়া নাগরিকদিগের প্রতি)।

বার্দ্ধক্য হেরিয়া নিজ, আর রামে মনে করি'

অভিষেক-মহোৎসব আদেশি' কহিল রাজা,
—আনন্দ করহ পুরজন !

রাম-অভিষেকে যত তরুণীর দল
প্রমত্ত উল্লাস-ভরে হইল বিহ্বল ;
তাহাদের বক্ষ-হতে স্খলিত হইয়া হেমঘট্
সোপান-উপরে পড়ি বাজি উঠে ঠঠং ঠঠং ঠট্ ॥

কৈকেয়ী।—(স্বগত) কি অনর্থ উপস্থিত ! (পরে রাজার নিকটে আসিয়া প্রকাশ্যে)।

মহারাজের জয় হোক্ !

দশরথ।—কৈকেয়ি ! এই খানে এসো।

কৈকেয়ী—(সভামধ্যে আসিয়া)।

রাজন্ ! রাজ্য-অভিষেক-হতে হওগো বিরত ;
নিষ্কলঙ্ক রঘুকুলে এ নহে সঙ্গত :—
ভূ-পুত্রী যাহার পত্নী —শোনোগো নৃপতি !—
সে রাম কেমনে বল হইবে ভূপতি ?

তাছাড়া—এই বধূ সীতাই যত অমঙ্গলের হেতু। কেন না, এঁর আগমনের পর হতেই, পদে পদে মহোৎপাৎ-সকল দেখা যাচ্চে ; ওকে দূর করে দেও, আর আমাকে পূর্ব্ব-স্বীকৃত দুইটি বর প্রদান কর। প্রথম—সীতা ও লক্ষণের সহিত রামের বন-প্রয়াণ, দ্বিতীয়—ভরতের চক্রবর্ত্তিত্বে অভিষেক।

দশরথ।—হা রামচন্দ্র ! প্রাণাধিক-প্রাণ ! তোমার উপর একি বিপদ উপস্থিত হল ! তোমার পত্নী ভূ-পুত্রী, তথাপি পৃথিবী-পরিগ্রহণ তোমার পক্ষে অনুচিত মনে করে', কৈকেয়ী তোমাকে রাজ্যভার গ্রহণ করতে নিবারণ করচেন। (মূর্চ্ছিত)।

সুমন্ত্র।—(স্বগত) মহারাজেরও দেখছি এই অভিপ্রায় ; এখন তবে আমি স্বয়ং গিয়ে শ্রীরামচন্দ্রকে এই বৃত্তান্ত নিবেদন করি।

(প্রস্থান।)

(রামের নিকটে আসিয়া)

শ্রীরামচন্দ্রের জয় হউক! আমি আপনার ভৃত্য সুমন্ত, আপনার নিকট একটি কথা নিবেদন কর্‌তে ইচ্ছা করি।

বাসবের সখা সেই　　জরাগ্রস্ত রাজা দশরথ,
তব হস্তে রাজ্যলক্ষ্মী　　সমর্পিতে হইলে উদ্যত,
মাঙ্গল্যের অনুষ্ঠান　　করে যত পুরবাসী সবে,
কলাবতী বারাঙ্গণা　　মত্ত নৃত্য-গীতের উৎসবে;
কৈকেয়ী শুনিয়া তাহা　　হয়ে উপনীত,
মাগিলেন দুটি বর　　পূরব-স্বীকৃত :—
অবলম্বি' বন্যবৃত্তি,　　শিরে ধরি' জটারাশি,
সীতা ও অনুজ-সহ　　হোক রাম বনবাসী
চউদ্দ-বৎসর।

সমুন্নত রাজ্য এই—　　সর্ব্ব-অনুচর-সাথে—
হউক বিন্যস্ত, মোর　　পুত্র ভরতের হাতে
—মাগি এই বর॥

নৃপতি এ নিরদয়　　বচন শুনিয়া,
পড়িলেন ভূমিতলে　　বিহ্বল হইয়া।

এখন আপনার যেরূপ অভিপ্রায়। (সুমন্ত্রের প্রস্থান)

রাম।—(লক্ষণের প্রতি) ভাই লক্ষণ! তুমি ততক্ষণ তোমার ভ্রাতৃ-জায়াকে নিয়ে অগ্রসর হও, আমি পিতাকে প্রণাম করে' এখনি আস্‌চি।

পিতা দশরথে নমি',　　মাতৃগণে করিয়া প্রণাম,
মৈথিলী-লক্ষণ-সহ　　রাম বনে করেন প্রস্থান॥
দেখিলেন সীতা যবে—　　বনে যাইতেছে রাম
পিতার আজ্ঞায়,
তিনিও যাবেন বলি'　　গেলেন শ্বশ্রূর কাছে,
লইতে বিদায়।

প্রথমে কৌশল্যা-পদে তার পর স্থমিত্রার
পদযুগে করিয়া প্রণাম ;
পরে, শুক সারিকা, ও পিককুলে সম্বোধিয়া,
—রাম-সনে করিলা প্রস্থান ॥

কৌশল্যা ।—(সীতার প্রতি)
জানকি বাছাটি মোর ! পালিয়াছ শিশুকালে,
বধুজন-উচিত নিয়ম ;
যৌবনে যেতেছ বনে, চরম বয়সে তুমি,
না জানিগো হইবে কেমন ॥

স্থমিত্রা।—(লক্ষণ প্রতি)
দশরথ বলি' রামে করিবেক জ্ঞান,
ভাবিও সীতারে তুমি আমার সমান ।
অযোধ্যা বলিয়া ভেবো অরণ্য-ভবন,
যথাস্থখে এবে পুত্র করহ গমন ॥

(রামের প্রতি)
বালিকা জনক-স্থতা, স্থকুমার তোমরা দুজনে,
দক্ষিণের দিগ্বিভাগ পরিপূর্ণ নিশাচরগণে ;
তাই বৎস স্নেহভরে বারম্বার করি তোমা মানা
—নীতিতে স্থদক্ষ তুমি —সে দক্ষিণে যেওনা যেওনা ॥
তোমারে মিনতি করি —মুহূর্ত্ত বিশ্রাম কর
রাম তুমি আমার ভবনে ;
কি জানি সহসা যদি পরিবর্ত্ত হয় সেই
উনমত্ত বৃদ্ধের বচনে ॥

পৌরগণ ।—
যার নবগুণ গ্রাম সেই রাম ত্যজিলে এই নগরে,
হইল সজ্জনগণ নিমগন তরুণ-শোক-সাগরে ;
সপর্ব্বত ধরাতল টলমল তবু না টলে কৈকেয়ী,
কুলিশ বড়িশ প্রায় হায় হায় নারী-হৃদয় নিশ্চয়ি ॥

তিন চারি পদ গিয়া পুর-পরিসর-মাঝে
শিরীষ-কোমলা সীতা
সদ্য-শ্রান্ত শ্রমে,
বলিতে লাগিল রামে "আর কত দূর ?"—তাহে
প্রথমাশ্রু দেখা দিল
রামের নয়নে ॥

রাম।—(ধরণীর প্রতি)

অরুণ-নখ-অঙ্গুলী চরণ-পঙ্কজ স্নিগ্ধ
চলিতে চলিতে সদ্য
হতেছে স্খলিত ;
পৃথ্বি ! তব কন্যা ইনি, ত্যজ নিজ কঠিনতা
যে স্থলে করেন সীতা
চরণ স্থাপিত।

জননি অবনি ওগো ! করহ শ্রবণ
—অরণ্যে জানকী আজি করেন গমন।

পথিক-বধূরা পথে সাদরে করিলে প্রশ্ন
"কুবলয়-দল-শ্যাম
কে ইনি তোমার ঠাকুরাণি"?
স্মিত-বিকসিত-গণ্ড, লজ্জায়-বিশ্রান্ত-নেত্র,
সীতা কহিলেন স্পষ্ট
"ইনি মোর পূজ্যপাদ স্বামী"।

"মৃদু-মৃদু চল' ওগো ভূমিতল কুশাঙ্কুর-ময় ;
বস্ত্রাঞ্চল দেও মাথে, ভানুতাপ খর অতিশয়।"
এইরূপে বধূগণ পথিমধ্যে ভাসি' অশ্রুনীরে
দিল উপদেশ, আর দেখিতে লাগিল জানকীরে।
প্রথম-পথিক এই রামচন্দ্র আজি এ কাননে,
অনুসরি' পদ তাঁর একা চলে সীতা তাঁর সনে।

দিগ্‌দিগন্ত পর্য্যটিয়া পথ-কষ্ট কিছু নাহি গণি'
চলে সীতা রাম-সাথে,
নবোদিত ইন্দু-সাথে ক্ষীণ-কান্তি যেমতি রোহিণী।

রাম।—(সীতার প্রতি)

সম্মুখে প্রস্তর-খণ্ড সারি সারি—কর পরিহার,
হেথায় কণ্টকী-লতা, আর কুশ-বনের বিস্তার ;
তাই বলি, ওগো দেবি, এ অরণ্য-স্থানে
উঠায়ে-উঠায়ে পা চল' সাবধানে।
বাঁকাইয়া গ্রীবাদেশ নত কর মাথা,
মস্তক-উপরে দেখ প্রসারিত লতা।
সম্মুখে দেখগো, এক মাতঙ্গ বিচরে,
এই খানে থামো দেবী ক্ষণেকের তরে।
যাহা চিন্তা করি মনে —হেথা হতে দূরে চলি যায় ;
মনেও না ভাবি যাহা —আসে তাহা সহসা হেথায়।
যে আমি বসিব প্রাতে বসুধার রাজ-সিংহাসনে,
জটিল তপস্বী হয়ে সেই আমি যাই কিনা বনে !

সুমন্ত্র।—(রামের অনুগমন করিয়া, পরে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া দশরথের প্রতি)

আপনার কথা-মত রাজ্য ত্যাগ করি' অবিলম্বে
গেলা বনে রঘুবীর সীতা ও লক্ষণে লয়ে সঙ্গে।
পৃষ্ঠে তূণ, হস্তে আর ধনুর্ব্বাণ করিয়া ধারণ
রাম-ভদ্র-সাথে চলি' গিয়াছেন অনুজ লক্ষণ।

দশরথ।—অভিষেক-তরে আমি আহবান করিনু যাহারে
তারে কি না অবশেষে পাঠাইনু বনের মাঝারে।
আকারে বিকৃতি তার কি হল না জানি,
নারিনু করিতে লক্ষ্য কিছু মাত্র আমি।
হৃদয় হইতে বৎস করনি গমন,
সর্ব্বদিকে তোমারেই করি নিরীক্ষণ।

গিয়াছে চলিয়া বৎস করি অনুমান,
সন্তাপ-অনলে তাই দহে এই প্রাণ।
বনে গিয়াছেন রাম —সুমন্ত্রের মুখ-হইতে শুনি',
শাপ-কাল সমাগত দশরথ মনে মনে গণি',
"হা রাঘব"—এই মাত্র উচ্চারণ করি' এক বার,
দীরঘ নিশ্বাস ফেলি' তার পর না ফেলিল আর।

পৌরজন।—সূর্য্যকুলে জন্ম যার, ভূপালের অগ্রগণ্য,
দশরথ পিতা;
সত্যপরায়ণা সতী অকপট প্রণয়িনী
যাহার সে সীতা;
লক্ষ্মণ অনুজ যার, বাহুবলে যার কেহ
নাহিক সমান;
স্বয়ং প্রত্যক্ষ বিষ্ণু —বিধি হতে বিড়ম্বিত
হল সেই রাম;
কি বিচিত্র, অন্য জনে যদি বিড়ম্বনা করে
বিধি হয়ে বাম।
স্বয়ং নারায়ণ বর, কন্যা নিজে লক্ষ্মী ভগবতী;
ঘটক কৌশিক মুনি; পুরোহিত বশিষ্ঠ সুমতি;
শ্রীজনক কন্যাদাতা; দান-কালে, একাদশ
রাশি-'পরে ছিল গ্রহগণ;
কি কহিব হত-বিধি কি তোর ভবিতব্যতা
—রামো বনে করিল গমন!

মন্ত্রিগণ-আনীত ভরত ও কৈকেয়ী।

ভরত।—বল মা, কোথায় পিতা করিলা গমন?
কৈকেয়ী।—গিয়াছেন, সুরপতি ইন্দ্রের ভবন।
ভরত।—কি হেতু গেলেন হায় তিনি স্বর্গলোকে?
কৈকেয়ী।—স্বর্গধামে গিয়াছেন তিনি পুত্র-শোকে।

ভরত।—চার পুত্র মাঝে তাঁর, কোনটি বল' সে ?
কৈকেয়ী।—শোনো বলি—তুমি যার অনুজ বয়সে।
ভরত।—কি হল তাঁহার শীঘ্র বল মা আমায়।
কৈকেয়ী।—গিয়াছে চলিয়া সে যে অরণ্যসীমায়।
ভরত।—কেন, কেন ? কি কারণে ?
কৈকেয়ী। —রাজার আজ্ঞায়।
ভরত।—তিনি কি যাইতে বনে বলেন তাঁহায় ?
কৈকেয়ী।—বচনে আবদ্ধ হয়ে আমার নিকট।
ভরত।—কি ফল হইল লাভ, কহ মোরে ঝট্।
কৈকেয়ী।—ভরত ! হইলে তুমি ধরণীর নাথ ;
ভরত।—সর্ব্বনাশ ! সর্ব্বনাশ ! একি বজ্রপাত !

(স্বগত)

এই নীচাশয়া নারী হইয়াও সদ্বংশ-জাত,
খল ক্রুর অতিশয়— ব্যবহারে রাক্ষসীর মত ;
রসাল-শোভিত বনে সুভীষণ বিষবল্লী-প্রায়
কেন গো কেকয়-সুতা আবির্ভূতা হইল হেথায় ?
গুরুজন-পাদপদ্মে ভক্তি-ভরে সদা যাঁর
মস্তক নোয়ায়,
যাঁর চারু রাজবেশ, বিশ্বজন আনন্দিত
হ'ত হেরি' যাঁয়,
অভিরাম সেই রামে মুনিবেশ পরাইল
কইকেয়ী হায় !

(শ্রীরাম-সমীপে ভরতের যাত্রা।)

মাল্য-সম পিতৃ-আজ্ঞা ধরি' নিজ-মস্তক উপরে
শ্রীরাম গেলেন বনে ; তাঁর প্রতি গাঢ় ভক্তিভরে
লক্ষণো করিল ত্যাগ মাতা-সহ আত্মীয় স্বজনে।
ভরত।—তব সাথে—শোনো আর্য্য— থাকিব আমিও এই বনে ;
লক্ষণ সে শিশু অতি— সে তোমায় সেবিবে কেমনে ?

আর শোনো, নৃপতিও সন্তাপিত হয়ে তব শোকে
ইহলীলা সম্বরিয়া গিয়াছেন চলি' স্বর্গলোকে।

শ্রীরাম।—(ভরতের প্রতি)

পরস্ত্রীকে মাতৃবৎ হেরিবে নয়নে,
না করিবে লোভ কভু অপরের ধনে ;
কোরো না মর্য্যাদাভঙ্গ শিষ্টাচার করিয়া লঙ্ঘন ;
নীচ জন-প্রতি যেন ক্ষণমাত্র নাহি যায় মন ;
রিপুগণ-প্রতি শৌর্য্য বিপদেতে ধৈর্য্য, আর
বিনয় সম্পদে,
—এই সাধুজন-মার্গ অনুসরি' চোলো ভাই
তুমি পদে পদে।
সজ্জন-সঙ্গম-বাঞ্ছা, পরগুণে অনুরাগ,
নম্রভাব গুরুজন-প্রতি ;
বিদ্যায় আসক্তি দৃঢ়, লোক-অপবাদ-ভয়,
নিজপত্নী-পরে সদা রতি ;
ভকতি ঈশ্বর-পদে, আত্ম-সংযমে বল,
দুর্জ্জনের সঙ্গ পরিহার ;
—এ সব নির্ম্মল গুণ যাঁহাতে বসতি করে
তাঁরে আমি করি নমস্কার।
"নর-সাধারণ এই ধর্ম্ম-সেতু সর্ব্বকালে করিবে রক্ষণ"
—নমি' নমি' পুনঃ পুনঃ, যাচে রাম ভাবী নৃপগণের সদন॥

ভরত।—হায় হায় জননী-গো! প্রজ্বলিত হুতাশন
যত-ইচ্ছা দহুক আমায় ;
বজ্র, শৈল, অসি, বাণ আঘাত করুক মোরে
—সে সমস্ত সহিব হেলায় ;
কিন্তু না সহিতে পারি শ্রীরামচন্দ্রের এই
পাদপদ্ম-বিয়োগ-ব্যথায়।

রাম।—শোনো বলি, বনবাস না করে ব্যথিত মোরে তত
—অথবা সে প্রেয়সীর পাদপদ্ম-যুগলের ক্ষত—
যতটা ব্যথিত আমি সেই পিতৃ-বান্ধব-প্রিয়জন
রামানুজ ভরতের হেরি' রাজ্যে অরুচি ভীষণ॥

শিরে ধরি' জটাজাল, বল্কল করিয়া পরিধান,
ভরত সীতার পদে সাষ্টাঙ্গে করিলা প্রণাম।
ভরতেরে দেখি' সীতা কাঁদিয়া উঠিল তারস্বরে,
বিহঙ্গ-সঙ্কুল-তরু বিকম্পিত উদ্বেগের ভরে।
শৈলেন্দ্র সে চিত্রকূট সেও এবে হইয়া বিহ্বল
শত-প্রস্রবণ-ধারে বরষিল নয়নাশ্রুজল।

শোনো বলি, তুমি আর্য্য, রাজ্য কর অলঙ্কৃত,
আমি এ অরণ্য-বাস করিনু স্বীকার ;
পিতৃ-আজ্ঞা পালনের ব্রতফল আমা হতে
করহ গ্রহণ তুমি, মোরে দিয়ে ভার।
—এইরূপ কহিলেও রাম যবে নিজ রাজ্যে
ফিরিবারে না করিল মন
তখন ভরত, লয়ে রামের পাদুকা-যুগ
অযোধ্যায় করিল গমন।

রামের পাদুকাযুগে অভিষিক্ত করি' যথোচিত
ভরত আপন পুরী নন্দীগ্রামে হইল উপনীত।
প্রতীক্ষা করিয়া থাকি' রাম-আগমন
ভরত করেন এবে বসুধা পালন।

দেখিয়া আশ্রম দেশ, চিত্রকূট-ভূমি ত্যজি'
চিরকাল তরে,
বিরাধেরে বধি' হেথা, অগস্ত্যের কথা শুনি'
রাম অতঃপরে

পঞ্চবটী-বনভূমে করিয়া গমন
করিলেন তথা নিজ বসতি স্থাপন।
দণ্ডক-অরণ্য-স্থিত তরুণ ময়ূর যত
* সশম্প জলদ বলি'
রামচন্দ্রে করি' অনুমান,
সুচারু-কলাপ-রাজি কাঁপাইয়া ঘন ঘন
করিতে লাগিল নৃত্য
হর্ষভরে তারা অবিরাম।
রামের প্রেরিত হয়ে অনুজ লক্ষ্মণ যবে
স্বর্ণ-বর্ণ কর্ণিকার ফুল
আনিলা বিপিন-হতে —করিলেন সীতা তারে
আপন ভূষণ কর্ণ-তুল।

সীতা।—(রামের প্রতি গমন সময়ে)।
তব পদ-রজ-মুক্ত পাষাণ-গঠিত-দেহ
ধর্ম্মপত্নী অহল্যারে
লভিল গৌতম।
বিন্ধ্যাদ্রি-প্রস্তরোপরি বিচরিছ এবে নাথ,
আরো কত মুনি পাবে
কলত্র আপন।

(নদী দেখিয়া লক্ষ্মণ নাবিককে আহ্বান করায় নাবিকের প্রবেশ।)

নাবিক।—(শ্রীরামের প্রতি)।
মানুষীকরণ রেণু আছে ও-চরণযুগে
—সুপ্রসিদ্ধ এই কথা
সর্ব্বলোক-মাঝে।

---

* শম্পা = বিদ্যুৎ—সীতা বিদ্যুৎ-স্বরূপা।

ক্ষালন করিব আমি ও পদ-পঙ্কজ-তব,
কাষ্ঠ পাষাণেতে প্রভু
কিবা ভেদ আছে ?
অহল্যা সে ভর্ত্তৃশাপে ধরিল পাষাণ-তনু ;
হয়তো এই তরীখানি
কোন মুনিপত্নী-শাপে এবে দারুময়ী।
তব পাদপদ্মস্পর্শ -অনুগ্রহ করি' লাভ
মানবী-তনুশ্রী নিজ—
করিবে ধারণ পুন এ তরী নিশ্চয়ি।

মায়া বিস্তার করি' সূর্পনখা সমুদ্যত
চিত্ত মোর করিতে হরণ।
—লক্ষ্মণ বুঝিয়া ইহা তখনি নাসিকা তার
খড়্গ দিয়া করিল ছেদন।
রাবণ-ভগিনী সেই সূর্পনখা হইয়া কুপিত
খরদূষণাদি লয়ে পুন সেথা হল উপনীত।
করভ-দশন-রুচি স্মিতহাস্য ফুটিয়াছে
প্রেমভরে সীতার কপোলে ;
রঘুনাথ মুহূর্ত্তেক হেরি' সেই পুলকিত
উল্লসিত বদন কমলে,
নিশাচর-সৈন্যদের কোলাহল করিয়া শ্রবণ
নিজ জটাজুট-গ্রন্থি দৃঢ়রূপে করিলা বন্ধন।
চতুর্দ্দশ-সহস্রক প্রচণ্ড রাক্ষসগণে
এক বাণে সংহারিয়া শ্রীরাম সমরাঙ্গণে
ত্রিশিরা-রাক্ষস, খরে দুর্জ্জয় দূষণে
—টঙ্কারিয়া ধনু, সবে বিনাশিলা রণে।
সীতারূপ হৃদ্যসুধা —সূর্পণখা-প্রমুখাৎ
করিয়া শ্রবণ
রাবণ ছলিতে রামে মারীচ-রাক্ষসে তথা
করিলা প্রেরণ।

মারীচ।—(স্বগত) যমদণ্ডের ন্যায় যাঁর দোর্দণ্ড, আর সমস্ত চণ্ডাংশু-বংশের যিনি আখণ্ডল স্বরূপ—তিনি সেই রামচন্দ্র। আর মহেন্দ্র-বিজয়ী এই লঙ্কেশ্বর। সুতরাং আজ আমার জীবন নিশ্চয়ই শমন-ভবনের অতিথি হবে।

মরিব রামের হাতে,　　রাবণেরো হাতে মোর,
জানিতেছি, মরণ নিশ্চয়।
উভয়েরি হাতে যদি　　—ললাট-লিপির বশে,—
আমাকে-গো মরিতেই হয়।
বরঞ্চ মরণ ভালো　　রাঘবের হাতে, তবু
রাবণের হাতে কভু নয়।

ভুঞ্জি স্বাদু ফলমূল　　কিছুকাল সেথা রাম
সীতা ও লক্ষ্মণ সনে করিলে যাপন,
রাবণ-প্রেরিত এক　　কুরঙ্গ কনকময়
সহসা জনক-সুতা করিলা দর্শন।
"মৃগপতি-পরাক্রম　　তুমি যে গো প্রিয়তম
—অদ্ভুতাঙ্গ মৃগটিরে
দেও মোরে আনি।"
—জানকীর বাক্যে রাম　　লয়ে হস্তে ধনুর্ব্বাণ
স্বর্ণমৃগ পিছে ধায়
বাধা নাহি মানি'।

রাম।—দেখ ভাই লক্ষ্মণ, আমি যতক্ষণ এই কনক কুরঙ্গকে হনন করে' না আসি, ততক্ষণ তুমি তোমার ভ্রাতৃ-জায়ার রক্ষণাবেক্ষণ কোরো।

এক হস্তে শর, আর　　অন্য হস্তে ধনু, রাম
করিয়া ধারণ,
লতা দিয়া বাঁধি জটা,　　করিতে লাগিলা বনে
মৃগ অন্বেষণ।
আসে মৃগ হস্ত-পাশে,　　চরিয়া বেড়ায় ঘাসে,
তবু তারে ছোঁয়া নাহি যায়।

থামে লভি' গুল্মলতা, আঘ্রাণিয়া কচি পাতা
পুনঃ পুনঃ চারি দিকে চায়।
যায় চলি যত্র-তত্র, শিঙে চুল্‌কায় গাত্র,
পলায় বা সুদূর দিগন্তে।
কভু বা দাঁড়ায়ে রয় কভু ছোটে বনময়
কভু বা সে অরণ্যের প্রান্তে।

সীতা।—মৃগ-অন্বেষণে নাথ বিলম্ব করেন কি কারণে?
এ ভীষণ বনভূমি পূর্ণ ক্রুর-নিশাচরগণে।
বারম্বার কহিতেছি, তবুও না যাও তুমি
জ্যেষ্ঠেরে খুঁজিতে;
কি আশ্চর্য্য হায় হায়! লক্ষ্মণ, নাহি কি হয়
শঙ্কা তব চিতে?

ধনু-কোটি দিয়া আঁকি রেখা ভূমি-পরে,
রাখিয়া সীতারে সেই গণ্ডির ভিতরে,
পাদপদ্মাঙ্কিত সেই রাম-পদ করিয়া দর্শন
নিতান্ত অনিচ্ছাক্রমে চলিলেন সুমিত্রা-নন্দন।
স্বর্ণমৃগ-ছলনায় রামচন্দ্র অতি দূরে নীত
অনুজ লক্ষ্মণ এবে তাঁর পিছে চলিলা ত্বরিত।
ভিক্ষু-বেশী রাবণ সে সুযোগ পাইয়া হেন কালে
ভয়ে ভয়ে সাবধানে পশে গিয়া সেই পর্ণশালে।
কি কষ্ট হা ধিক্ ধিক্! কহি এইরূপ
রাবণ গোপন করে আপনার রূপ।

রাম-পরিত্যক্ত বাণে প্রতিহত হ'ল যবে
কুরঙ্গ-হৃদয়,
মারীচ নামক রক্ষ তাহা হতে তৎক্ষণাৎ
হইল উদয়।
ভিক্ষুবেশী রাবণো সে রতন-কুণ্ডল-রাজি
স্বকপোলে করিয়া স্ফুরিত

কুম্ভকর্ণাগ্রজ সেই দশানন-মূর্ত্তি নিজ
ক্ষণমাত্রে করে প্রকটিত।
দিব্যবাণে যবে রাম হয়ে বদ্ধলক্ষ্য,
বিদ্ধ করিলেন সদ্য স্বর্ণমৃগ-বক্ষ,
ছদ্মবেশী ভিক্ষু সেই রাজা দশানন
সেই সে আশ্রম-দেশে করে আগমন।
"সূর্য্যকুল-অবতংশে! জনক-রাজর্ষি-বংশে
সাধ্বী বলি' তুমি গো প্রখ্যাত;
দেও মোরে ভিক্ষা সতি! —আমি যে ক্ষুধিত অতি"
—রাবণ কহিল এই মত।

সীতা কহিলেন :—

লও ভিক্ষা, করি দান এই নিরমালা-দাম
হরিপদরজ-বিমিশ্রিত;
সকল সৌভাগ্য-কেতু, সর্ব্ব-বাঞ্ছা সিদ্ধি-হেতু
জানিবে গো ইহারে নিশ্চিত।
(তুলসী প্রদর্শন)
কপট ভিক্ষুক ও গো! কটাক্ষ-ভঙ্গিতে তব
মনে হয়, আসিয়াছ
অন্বেষিতে অসতী ললনা।
ভিক্ষা দিতে সাধ্য নাই কৃতাঞ্জলি হয়ে তাই
কহিতেছি, কেন বৃথা
যাচিতেছ, কর মোরে ক্ষমা॥

রাবণ।—"হে ধর্ম্মিনি! দেও ওই নির্ম্মাল্য" "কহিলে রাবণ,
লক্ষণ-চিহ্নিত সেই রেখা, সীতা করিলা লঙ্ঘন;
অমনি রাবণ তাঁরে উঠাইল করতলোপরে;
রাম ও লক্ষণে সীতা ডাকিতে লাগিল সকাতরে।
বনে বনে করে রাম মৃগ অন্বেষণ
পিছে পিছে ধায় তার অনুজ লক্ষণ।

সাতা নীতা হলে এবে' রক্ষপুরী লঙ্কাদ্বীপ পানে,
—ইন্দ্রজিৎ, ইন্দ্রে জিনি' ইন্দ্রানীরে আনে যেই স্থানে।
কনক-বরণী সীতা হয়ে অতিশয় ভীতা
রামচন্দ্রে ডাকে সকাতরে।

কোথা হে রঘুনন্দন ত্রিলোক-জনবন্দন
রক্ষা কর, রক্ষা কর মোরে।

ওগো রাম রমণীয়! মহাবীর আত্মীয়,
দেখা দেও, কর মোরে রক্ষা।

ওহে নাথ রঘুপতি আমি যে কাতর অতি,
কেন মোরে করিছ উপেক্ষা?

এইরূপে নানামত সীতাদেবী ভাষে'
দশানন লয়ে তারে উঠিল আকাশে।
স্থাপিত হইলে সতী রাবণের রথের উপর,
অঙ্গের ভূষণগুলি উন্মোচন করিয়া সত্বর
ফেলিলেন স্থানে স্থানে; —কোথাও বা নূপুর, কঙ্কণ,
কোথাও বা উত্তরীয়, কোথাও বা হার সুশোভন।

জটায়ু।—এদিকে শ্রীরামচন্দ্র হানিছেন মৃগোপরে
নিদারুণ বাণ;
অনুজ লক্ষ্মণ বীর তিনিও তাঁহার পিছে
বনে ধাবমান;
ওদিকে জনক-সুতা ভিক্ষুকের করতলে
ভিক্ষা দেন আনি;
করি সঞ্চরণ ব্যোমে এ সমস্ত যুগপৎ
দেখিলাম আমি:—

মারীচ শীকারে ব্যগ্র রাম ও লক্ষ্মণ বন-পথে
কেমনে এ হরিণাক্ষী আসিল গো রাবণের রথে।

রাবণ।—(জটায়ুকে আকাশ হইতে নাবিতে দেখিয়া)

একি গো মৈনাক-গিরি অব্যাহত মার্গ মোর
রোধিছে গগনে ?
কোথায় শকতি তার ? সে যে ডরে বাসবেরো
কুলিশ-পতনে !
গরুৎমান সেও ভালো জানে মোরে—তার সেই
ভ্রুভুটির সনে।
হাঁ বুঝেছি জটায়ু এ জরাগ্রস্ত বিহঙ্গমপতি
মোর হাতে মরিবারে বাঞ্ছা এর হয়েছে সম্প্রতি।

জটায়ু।—(রাবণের প্রতি)

জন্ম তব ব্রহ্মকুলে, অর্চ্চণা করিলে হরে
নিজমুণ্ড করিয়া কর্ত্তন।
তোমার অসীম শক্তি —ওই তব বাহুদণ্ডে
বাসবেরে করিলে দলন।
কেলি-কন্দুকের-মত' হেলায় তুলিয়া তুমি
কৈলাস করিলা উৎপাটন।
তাই বলি, হে রাবণ লজ্জা কি হয় না তব ?
—রাঘব-পত্নীরে তুমি
চোর-সম করিছ হরণ ?
ব্রহ্মকুলে জন্ম তব তপশ্চর্য্যা অনুপম
অলৌকিক বীর্য্যের আধার।
ত্রিলোক-বিজয়ী তুমি, সুরাঙ্গনাদের স্বামী,
ঐশ্বর্য্য অহো কি অপার !
কি চাহ অধিক আর ? সীতার তুমি যে এবে
করিছ হরণ
—শোন্ ওরে পশুমতি ! সবান্ধবে হবি তুই
সমূলে নিধন।

হে রাবণ অ-বিদুষ দোষ তব করিলাম ক্ষমা,
বীরপতি-রতা সীতা —ছাড়ো ওঁরে, করি এ প্রার্থনা।
জটায়ু আমার নাম, সখা মোর রাজা দশরথ,
তোমায় মিনতি করি, এই খানে রাখো তব রথ।

(জটায়ুর বাক্য অগ্রাহ্য করিয়া রাবণ গমন করিলে)

পরদার-চোর ওরে পাপিষ্ঠ রাবণ।
ধীরে ধীরে কোথা তুই করিস্ গমন?
থাম্ ওরে থাম্ হেথা; বাস যার মলয়াদ্রি-তটে
স্বয়ং জটায়ু সেই আসিয়াছে দাথ্-রে নিকটে।
ছেড়েদে সীতারে তুই, নতুবা ও বক্ষ তব
প্রচণ্ড এ তুণ্ডে ছিঁড়ি
করি খান্ খান্,
তাহা হতে বিনিস্থত শোণিতের উষ্ণ ধারা
রক্তলুব্ধ গৃধ্রগণে
করাইব পান।

(সীতাকে আশ্বস্ত করিয়া রাবণের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ)

ভয় নাই বাছা সীতা, আমা-হতে দূরে যেতে
না পারিবে দুরাত্মা রাবণ,
দুর্বৃত্ত রাক্ষস ওরে! রাঘব-পত্নীরে হরি'
কোথা তুই করিস্ গমন?
চঞ্চুর প্রহারে, আমি —ধমনী সহিত—তোর
মুণ্ডগুলি করিয়া ছেদন।
নভস্তলে নিক্ষেপিয়া, যত দিক্‌পালগণে
উপহার করিব অর্পণ।
পাপিষ্ঠ রাক্ষস ওরে! হর-শির-অধিষ্ঠিতা
শশি-লেখা প্রায়
রাঘব-বধূ যে সীতা —তারে তুই চুরি করি'
যাস্‌রে কোথায়?

গরুড় যেমতি সেই সুধাহারী নাগগণে
করিল নিধন
আমিও তেমতি তোর দীপ্তচূড়ামণি যুত
দশটি আনন
প্রখর নখরাঘাতে খণ্ড খণ্ড করি', অদ্য
করিব ছেদন।
জানি তোমা দশানন ! প্রবল দোর্দণ্ডে তব
উঠাইলে কৈলাস-পর্ব্বত।
সেই তুমি এবে কেন সীতারে সাগর-পারে
লয়ে যেতে হয়েছ উদ্যত ?
দিশি দিশি নিপতিত শরজাল হতে বুঝি
দূরে থাকিবার তরে
করেছ মানস ?
নির্লক্ষ্য-বাণযুদ্ধ নহেক তোমার যোগ্য,
সম্মুখ সমরে যুঝি'
দেখাও সাহস।

যুদ্ধ।

ভাঙে ধ্বজা, ভাঙে অক্ষ, ভাঙে যুগ, ভাঙে চক্র,
অশ্বগণে পক্ষি-রাজ নাশে'।
তর্জ্জন গর্জ্জন করে, টানাটানি করি' ধরে,
অপমান করে কটুভাষে।
কভু নীচে, কভু উর্দ্ধে মাতে' ঘোরতর যুদ্ধে,
পথরোধ করয়ে আকাশে।
রাবণ হইয়া ক্রুদ্ধ শিলাখণ্ড সম দৃঢ়,
চপেটা-আঘাত-এক করিয়া সবলে
পিষিলা বিহঙ্গরাজে ; স্বল্পপ্রাণ-অবশিষ্ট
জটায়ু সে নিপতিত হইয়া ভূতলে
—রাম ! রাম ! রাম ! রাম ! শুধু এই নাম,
মন্ত্র সম উচ্চারিল মুখে অবিরাম।

রথভঙ্গকারী সেই পক্ষিরাজে, রক্ষরাজ, হানি' এক চড়,
শ্বাসমাত্র-অবশেষ দেখি' তারে —বিলুণ্ঠিত ভূমির উপর,
সীতারে লইয়া শীঘ্র লঙ্কাপুরী করিয়া গমন,
অশোকের বনে তাঁরে সহরষে করিলা স্থাপন।

জটায়ুর।—দশরথ-সখা-ঋণ তিলমাত্র নারিনু শুধতে;
রাবনের হস্ত হতে জানকীরে নারিনু রাখিতে;
রামচন্দ্র-মুখচন্দ্র না পারিনু করিতে দর্শন;
অকৃতী এ জটায়ুর ভাগ্যহীন বিফল জনম।

রাম।—একাকিনী জানকীরে রাখিয়া কুটীর-সীমায়,
আকুল হইয়া ভাই কেন তুমি, আসিলে হেথায়?

লক্ষণ।—আসিতে বিলম্ব তব হল' যবে বীর,
নারিনু থাকিতে শুনি'— কটূক্তি দেবীর।

মারীচ রাক্ষসে বধি' এক বাণে, কুটীরেতে ফিরি'
কি হইল রাঘবের পর্ণশালা সীতাশূন্য হেরি'?
মায়ামৃগ করি' বধ কুটীরে আসিয়া রাম
খোঁজেন সীতায়।
তিন কোণ শূন্য হেরি' নারিলা হেরিতে আর
চতুর্থ টী হায়।
মহাবীর শ্রীরামের বিক্রম কীর্ত্তন করি'
এ মহানাটক খানি রচিলা হনুমান।
শ্রীমধুসূদন মিশ্র রচিয়া তৃতীয় অঙ্ক,
"বৈদেহী-হরণ" এই দিল তার নাম।

ইতি তৃতীয় অঙ্ক।

ভারতবর্ষে ভাস্কো-ডা-গামা।

(৫)

সেকালে আরেবিয়া হইতে তাম্র, বোজোয়ার প্রস্তর, ছুরি, গোলাপজল, তুতিয়া, পশম-বস্ত্র, রক্তবস্ত্র, পারদ প্রভৃতি অনেক দ্রব্যই কালিকাটে আমদানি হইত। বাণিজ্য-সম্বন্ধে মালাবার তীরে মুসলমানদিগের একাধিপত্য ছিল। তাহারা সর্ব্বদা ফিরিঙ্গি বণিকদিগের গতিবিধি, কার্য্যকলাপ লক্ষ্য করিতেছিল। রাজার সহিত ভাস্কো-ডা-গামার বাণিজ্য সম্বন্ধে যে কথাবার্ত্তা হইয়াছিল তাহা তাহাদিগের নিকট পৌঁছিতে বেশি বিলম্ব হইল না।

রাজদরবারে পর্ত্তুগাল নাবিকের এত সম্মান,—তাহাদিগের উপর জামোরিণের এত অনুগ্রহ দেখিয়া, তাহারা বড়ই সন্দিগ্ধচিত্ত হইয়া উঠিল। যখন তাহারা শুনিল, ফিরিঙ্গি বণিক শুধু কালিকাটে নয় মালাবার তীরে যত বন্দর ছিল সকল বন্দরেই তাহাদিগের ন্যায় বাণিজ্যের সমান অধিকারে অধিকারী হইয়াছে, তখন মুসলমান বণিক-সম্প্রদায় নিতান্ত ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। ভারতবর্ষের সীমা হইতে ফিরিঙ্গি-দিগকে যে কোন প্রকারে দূর করিবার চেষ্টায় তখন মুসলমানগণ নানাবিধ উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিল।

সে সময় সমুদ্রতীরে জলদস্যুভীতি অত্যন্ত প্রবল। দলে দলে জলদস্যু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরণীসংযোগে সমুদ্র মধ্যে এবং তীরে ঘুরিয়া বেড়াইত; সুবিধা পাইলেই নিশ্চিন্ত বণিকদিগকে আক্রমণ করিয়া তাহাদিগের পণ্যপূর্ণ বাণিজ্যতরণীসকল লুণ্ঠন করিয়া লইয়া যাইত,—কাহাকেও বা হত্যা কাহাকেও বা গুরুতররূপে আহত করিত;—শেষে অগ্নিসংযোগে সেই সকল লুণ্ঠিত বাণিজ্যতরণী ভস্মসাৎ করিয়া

দিয়া অন্ধকারে সমুদ্রের ভিতর কোথায় লুকাইত তাহার সন্ধান হইতনা। ইহাতে যে কেবল বণিকদিগকেই ক্ষতিগ্রস্থ হইতে হইত তাহা নহে, রাজকোষও ক্ষতিগ্রস্থ হইত॥

সেই সকল জলদস্যুদিগের সহিত অনেক সময় বণিকদিগের ও সিপাহীদিগের যুদ্ধ হইত। কিন্তু জলযুদ্ধে প্রায়ই দস্যুগণ বিজয়-লাভ করিয়া বিজয়োল্লাসে বণিকদিগকে শুদ্ধ করিয়া দিত। সময় বুঝিয়া মুসলমান বণিকগণ রাজঅমাত্যদিগের মধ্যে এই দস্যুভীতি বর্দ্ধিত করিয়া তুলিল। * অর্থে কিনা হয়* ? অর্থবলে মুসলমান বণিক সম্প্রদায় রাজ্যের প্রধান প্রধান অমাত্যদিগকে বুঝাইয়া দিল যে ফিরিঙ্গিরা এদেশে বাণিজ্য করিতে আসে নাই—এদেশ লুণ্ঠন করিতে আসিয়াছে ; উহারা বণিক নহে—জলদস্যু—সাধারণ দস্যুদল অপেক্ষা সুসজ্জিত ও ভীতিপ্রদ !

দুঃভার্গ্যক্রমে ডা-গামার জাহাজ সাধারণভাবের ছিলনা—পোতমধ্যে কামান ছিল, গুলি-গোলা ছিল, অন্যান্য যুদ্ধোপকরণ প্রচুর পরিমাণে ছিল। মুসলমানগণ এই সকল অর্ণবপোত ফিরিঙ্গিদিগের লুণ্ঠনব্যবসায়ের উপযোগী বলিয়া রাজঅমাত্যদিগের মতিভ্রম ঘটাইতে লাগিল! তাঁহারাও সন্দিগ্ধচিত্তে দেখিলেন, বণিকের সঙ্গে আবার এত অস্ত্র শস্ত্র কেন—এত কামান বারুদ কেন—এত যুদ্ধোপকরণইবা কেন? তখন ফিরিঙ্গিদিগের আচার ব্যবহার সবই যেন সন্দেহজনক বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। তাহারা যেন মালাবারতীর লুণ্ঠন করিতেই আসিয়াছে। অমাত্যগণ স্থির সিদ্ধান্ত করিলেন ভাস্কো-ডা-গামা ও তাঁহার সহচরগণ সকলেই জলদস্যু। ইহাদিগের অত্যাচারে হয়ত শীঘ্রই মালাবারের বাণিজ্য বিলুপ্ত হইয়া যাইবে,—বিদেশী বণিক

* They therefore bribed the ministers of the king to denounce the Portuguese Admiral as a piratical adventurer. D'orsay.

আর কেহ মালাবার তীরে আসিবেনা। তবেইত সর্ব্বনাশ! রাজকোষ পুষ্ট হইবে কেমন করিয়া? নানারূপ যুক্তি ও তর্কের পর শেষে সিদ্ধান্ত হইল যে ফিরিঙ্গি, বণিকসম্প্রদায় নহে, দস্যুই নিশ্চিত—উহাদিগের তরণী বাণিজ্যের জন্য নহে—যুদ্ধের জন্য! সুতরাং উহাদিগকে বিতাড়িত করিতেই হইবে। কিন্তু তখন জামোরিণের আদেশে ফিরিঙ্গিগণ অবাধ-বাণিজ্য করিবার অধিকারী! রাজঅমাত্যগণ মুসলমানদিগের সহিত মিলিত হইয়া একটা উপায় নির্দ্ধারণে ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন। অর্থের জয় হইল!

এদিকে, ভাস্কো-ডা-গামা তখন পর্য্যন্তও এ সকল কিছুই বুঝিতে পারেন নাই; জামোরিণের আদেশে তিনি প্রত্যূষে শিবিকা আরোহণে প্যান্‌ড্যারাং অভিমুখে যাত্রা করিলেন,—প্যান্‌ড্যারাংএর সন্নিকটেই তাঁহার জাহাজগুলি বাঁধা ছিল। গামা শিবিকারোহণে ও সহচরগণ পদব্রজে যাইতেছিলেন। প্যান্‌ড্যারাংএ পৌঁছিতেই সূর্য্যাস্ত হইয়া গেল। ডা-গামা তখনই আপন জাহাজে যাইবার মানসে ভালির নিকটে নৌকা চাহিলেন কিন্তু তিনি গামার অনুরোধ রক্ষা করিলেন না। বিফল-মনোরথ ভাস্কো-ডা-গামা বিরক্ত হইয়া বলিলেন,—"যদি এখনই নৌকা না দেন, তাহা হইলে আমি রাজার নিকটে যাইয়া সমস্ত কথা বলিয়া দিতেছি। তাঁহারই আদেশ মত আমরা জাহাজে যাইতেছি জানিবেন।" বিরক্তির ভাব দেখিয়া রাজ-অমাত্যগণ তাঁহাদিগকে সমুদ্রতীরাভিমুখে লইয়া চলিল।

রাজকর্ম্মচারীদিগের ব্যবহার দেখিয়া ভাস্কো-ডা-গামা ইতিপূর্ব্বে সন্দিহান হইয়াছিলেন,—তিনি তাঁহার ভ্রাতাকে সংবাদ দিবার জন্য গোপনে স্বদল হইতে তিন জনকে প্রেরণ করিলেন। ক্রমেই রাত্রি অধিক হইতে লাগিল,—নৌকা আর মিলিল না; অগত্যা তাঁহারা একজন মুর নাগরিকের গৃহে আশ্রয় লইলেন। রাজকর্ম্মচারীগণ প্রস্থান করিলেন।

পরদিন প্রাতে কতকগুলি মুর সেইস্থানে আসিয়া উপনীত হইলে ডা-গামা তাহাদিগের নিকট তরণী চাহিলেন; তাহারা গোপনে কিছুক্ষণ পরামর্শ করিয়া কহিল—"আপনি যদি আপনার জাহাজগুলি তীরের আরও নিকটে আনেন তবেই জাহাজে যাইতে পারিবেন।"

ভাস্কো। "যদি আমি এখন জাহাজগুলি নিকটে আনিবার আদেশ পাঠাই, তাহা হইলে আমার ভ্রাতা হয়ত মনে করিবেন, আপনারা আমাকে বন্দী করিয়া বলপূর্ব্বক এই আদেশ বাহির করিয়া লইয়াছেন। তিনি হয়ত তখনই জাহাজ খুলিয়া পর্ত্তুগাল অভিমুখে যাত্রা করিবেন।"

মুর। "আমরা অত জানিনা; আপনি যদি জাহাজ আরও নিকটে না আনিতে পারেন, তাহা হইলে জাহাজে যাওয়ার আশা পরিত্যাগ করুন।"

ভাস্কো। "আপনারা কি জানেন না যে, আমি মহারাজের বিশেষ নিদেশ ক্রমেই জাহাজে যাইতেছি। আমাকে বাধা দিয়া যদি আপনারা রাজাজ্ঞার অপমান করেন, আমি অবিলম্বে রাজার নিকট সকল কথা ব্যক্ত করিব।"

মুরগণ হাসিয়া বলিল,—"রাজার নিকট যাইতে ইচ্ছা হইলে চেষ্টা করিতে পারেন, কিন্তু সে পথ আমরা রুদ্ধ করিয়াছি; এই দেখুন, চারিদিকের অর্গল দৃঢ়বদ্ধ—বাহিরে সিপাহীরা পাহারা দিতেছে!"

এতক্ষণে ভাস্কো-ডা-গামা বুঝিলেন যে তিনি সহচরবৃন্দসহ মুরহস্তে বন্দী। জাহাজগুলি তীরের নিকটে না আনিলে আর তখন মুক্ত হইবার উপায় নাই। ডা-গামা মুরদিগের কথাবার্ত্তায় অনুমান করিলেন জাহাজ নিকটে আসিলেই তাহারা সকলে হয়ত আক্রমণ করিয়া দ্রব্যাদি লুণ্ঠন করিয়া লইবে, শেষে সকলের প্রাণবধ করিয়া পলায়ন

করিবে! ডা-গামা স্থির করিলেন, তাঁহাদিগের অদৃষ্টে যাহাই থাকুক কিছুতেই জাহাজ কূলে ভিড়াইবার আদেশ দিবেন না।

ক্রমে ক্রমে ক্ষুৎপিপাসায় অনেকে কাতর হইয়া উঠিতে লাগিল—ক্ষুধার যন্ত্রণা অসহ্য অথচ কোনরূপ আহার্য্য পাইবার উপায় নাই! মুরগণ হাসিয়া কহিল, 'মর আর বাঁচ, তাহাতে আমাদের ক্ষতি বৃদ্ধি নাই; আমরা তোমাদিগকে কিছুতেই ছাড়িব না।' সকল চেষ্টাই বিফল হইল। ফিরিঙ্গিগণ হতাশভাবে আপন আপন অদৃষ্ট-চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় তাঁহাদিগের পূর্ব্বপ্রেরিত একজন চর জাহাজ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া সংবাদ দিল যে, পূর্ব্ব দিন সন্ধ্যা হইতেই নিকোলস্-কোয়েলো নৌকা সংগ্রহ করিয়া তীরে অপেক্ষা করিতেছে। এই কথা শুনিবামাত্র ডা-গামা অতি সঙ্গোপনে চর প্রেরণ করিয়া জাহাজ দূরে রাখিবার আদেশ জানাইলেন। প্রভুর আদেশ পাইয়াই নিকোলস্ জাহাজগুলি দূরে লইয়া যাইতেছিল, কিন্তু সেকথা গোপন থাকিল না। ধূর্ত্ত মুরগণ অবিলম্বে তরণী লইয়া জাহাজের পশ্চাদ্ধাবন করিল, কিন্তু ধরিতে না পারিয়া ভগ্নমনোরথে ফিরিয়া আসিল!

পরদিনও মুক্তির কোন উপায় দেখা গেল না,—ফিরিঙ্গিগণ বন্দিভাবেই মুর-নাগরিকের গৃহে দিন যাপন করিলেন। উদ্বেগ, সন্দেহ, শঙ্কা তাঁহাদিগকে আকুল করিয়া তুলিতে লাগিল। ক্রমে রজনী অধিক হইতে লাগিল, শস্ত্রধারী সিপাহী-সংখ্যাও ততই বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। মুক্ত তরবারি, তীক্ষ্ণ বাণ, সুদৃঢ় কার্ম্মুক, উজ্জ্বল কুঠার প্রভৃতি লইয়া সিপাহীগণ বন্দীদিগকে ঘিরিয়া রাখিল। তাহাদিগের ব্যবহার ও কথাবার্ত্তায় অত্যন্ত ক্রোধ প্রকাশ পাইতেছিল। বন্দীগণ মনে করিলেন, ইহারা হয়ত গভীর নিশীথে সকলকেই বধ করিবে অথবা বন্দীভাবেই প্রত্যেককে পৃথক স্থানে প্রেরণ করিবে;—তখন

মুক্তির আর উপায় থাকিবে না। ফিরিঙ্গিগণ তখন একমনে ভাবিতে লাগিলেন—'হা ঈশ্বর! এ কি করিলে?'

এইরূপ শত্রুপরিবৃত সঙ্কট-সঙ্কুলস্থানে ভয়ে ও উৎকণ্ঠায় বিনিদ্র-রজনী প্রভাত হইয়া গেল। কয়েকজন রাজকর্ম্মচারী আসিয়া জানাইলেন, 'কোন বাণিজ্য তরণী মালাবার তীরে আসিবামাত্রই রাজবিধি-অনুসারে তখনই বাণিজ্যদ্রব্যাদি তীরে নামাইতে হয় এবং নাবিক-দিগেরও তীরে আসিয়া অবস্থান করিতে হয়। পণ্যগুলি নামান শেষ না হইলে কাহারও পোতমধ্যে যাইবার আদেশ নাই।'

রাজকর্ম্মচারীদিগের কথা শুনিয়া ডা-গামা তৎক্ষণাৎ তাঁহার কতকগুলি অত্যাবশ্যক জিনিষের জন্য তাঁহার ভ্রাতার নিকট পত্র লিখিলেন এবং অন্যান্য দ্রব্যাদিও তীরে নামাইবার আদেশ দিলেন। তিনি মনে করিলেন ধূর্ত্ত মুরদিগকে এইবার ধূর্ত্ততায় পরাজিত করিব।

ভাস্কো-ডা-গামার বিড়ম্বনার সময় ফুরাইয়া আসিয়াছিল। তিনি সহচরবৃন্দসহ মুক্ত হইয়া আপন অর্ণবযানে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ অবশিষ্ট দ্রব্যাদি আর নামাইতে দিলেন না। যে সকল সামগ্রী তীরে নামান হইয়াছিল সে সমুদায় রক্ষার্থ দুইজন সহচর প্যান্ড্যারাংকুলে অবস্থান করিতে লাগিল।

জাহাজে ফিরিবার ৪.৫ দিন পরে ভাস্কো-ডা-গামা জামোরিণের নিকট পত্র লিখিয়া সকল সমাচার জ্ঞাপন করিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে লিখিলেন যে, রাজাজ্ঞায় যে সকল দ্রব্য জাহাজ হইতে তীরে আনিয়া রক্ষিত হইয়াছিল মুরগণ সে সমস্তই লুণ্ঠন করিয়া লইয়াছে। পত্রোত্তরে জামোরিণ কয়েকজন বণিক এবং একজন বিশিষ্ট নাগরিক প্রেরণ করিলেন। বণিকগণ দরদস্তুর করিয়া পণ্যসম্ভার ক্রয় করিবার জন্য আদিষ্ট হইয়াছিল। জামোরিণ আরও আদেশ দিয়াছিলেন যে

দুষ্টবুদ্ধি মুরগণ, ফিরিঙ্গি বণিকদিগের দ্রব্যাদির সন্নিকটে আসিলেই যে কেহ তাহাদিগের মুণ্ডচ্ছেদ করিতে পারিবে, তাহার আর বিচার হইবে না! তখন পর্য্যন্তও ভাস্কো-ডা-গামা জামোরিণের কোন কু-অভিসন্ধি বুঝিতে পারেন নাই।

জামোরিণ প্রেরিত বণিকগণ প্রায় সপ্তাহ কাল তথায় থাকিল বটে, কিন্তু কিছুই ক্রয় করিল না—কেবল লুণ্ঠন করিল। মুরগণ আর সে দিকে বড় অগ্রসর হইত না; যখনই কোন ফিরিঙ্গি কার্য্যব্যপদেশে জাহাজ হইতে তীরে অবতরণ করিত তখনই দলে দলে দুষ্ট মুরসম্প্রদায় দূরে দাঁড়াইয়া নিষ্ঠিবন ত্যাগ করিতে করিতে চীৎকার করিয়া বলিত—"পর্ত্তুগাল! পর্ত্তুগাল!!"

(৬)

প্যানড্যারাং উপকূলে ফিরিঙ্গি বণিকদিগের যে দ্রব্যগুলি নামান হইয়াছিল সে সমুদয় জামোরিণ-প্রেরিত বণিকগণ কর্ত্তৃক লুণ্ঠিত হইল দেখিয়া ভাস্কো-ডা-গামা বিব্রত হইলেন; তিনি বুঝিলেন এদেশে এসকল দ্রব্য বিক্রীত হইবার সম্ভাবনা নাই,—তাই তিনি অবিলম্বে সে সংবাদ জামোরিণের নিকট প্রেরণ করিলেন।

তখন জামোরিণ একজন 'ভালি' পাঠাইলেন এবং তাঁহাকে আদেশ করিলেন, 'রাজসরকারের ব্যয়ে কুলি-মজুরের পৃষ্ঠে ভাস্কো-ডা-গামার যাবতীয় পণ্যদ্রব্য কালিকাটে প্রেরিত হউক।' সুতরাং তাহাই হইল। কিন্তু জামোরিণের উপর নির্ভর করিয়াই ডা-গামা ক্ষান্ত থাকিলেন না; তিনি আদেশ করিলেন, দলের সকলেই এক একবার করিয়া কালিকাটে যাইবে এবং তথায় থাকিয়া জিনিষপত্র রক্ষণাবেক্ষণ করিবে।

তখন রাজ্যমধ্যে একটা গোলোযোগ উপস্থিত হইয়াছিল,—মুসলমান বণিকসম্প্রদায়ই তাহার মূল। তাহারা কোন ক্রমেই ডা-গামাকে বিদায় করিতে পারিল না দেখিয়া নিতান্ত অস্থির হইয়া পড়িল।

শেষে, ক্রমে-ক্রমে জামোরিণের দরবারে পর্য্যন্ত ফিরিঙ্গি বণিক সম্বন্ধে আলোচনা উপস্থিত হইল। মক্কায় তখন পর্ত্তুগাল বণিকের নাম প্রসিদ্ধ ছিল। যে সকল মুরবণিক মক্কা, আফ্রিকা প্রভৃতি স্থান হইতে কালিকাটে বাণিজ্যব্যপদেশে আগমন করিত, তাহারা জামোরিণকে কোনক্রমে বুঝাইয়া দিল যে, এই ফিরিঙ্গি-জলদস্যু কালিকাটে থাকিতে,—কি মক্কা, কি ক্যাম্বে, কি আফ্রিকা কোন স্থান হইতেই, আর বণিক-সম্প্রদায় বাণিজ্য করিবার জন্য মালাবারতীরে আসিবে না। রাজ-অমাত্যগণ মুরদিগের অর্থ উদরস্থ করিয়া সেইরূপই প্রকাশ করিল। জামোরিণ দেখিলেন, তাইত! ফিরিঙ্গিদিগকে আশ্রয় দিয়া, বাণিজ্য করিবার অধিকার দিয়া ভাল হয় নাই! ইহারা যদি কোন ক্রমে একবার মালাবারের সহিত বাণিজ্য-সম্বন্ধ সংস্থাপন করিতে পারে তাহা হইলেই সর্ব্বনাশ হইবে;—বাণিজ্যশুল্কই জামোরিণের প্রধান ভরসা ছিল। জামোরিণ ভীত হইলেন,—সকলের সঙ্গে সঙ্গে তিনিও তখন বিপন্নিবারণের উপায় নির্দ্ধারণে ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন।*

এদিকে ফিরিঙ্গি বণিকগণ প্রত্যহ একজন বা দুইজন করিয়া কালিকাটে যাতায়াত করিতে লাগিল। এইরূপে নাগরিকদিগের সহিত তাহাদিগের সদ্ভাব ক্রমেই বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। আলভারেজ তাঁহার দিন-লিপিতে লিখিয়া গিয়াছেন:—

"কালিকাটে যাতায়াত কালে খ্রীষ্টান (হিন্দু!) অধিবাসীদিগের নিকট আমরা যথেষ্ট সদ্ব্যবহার পাইতাম। যদি কোনদিন শয়নের বা

---

* But in short time, as if he (the zamorin) had been inspired with foresight of all the calamities now approaching India by this fatal communication opened with the inhabitants of Europe, he formed various schemes to cut off Gama and his followers.

W. Robertsons Works—vol. XII.

আহারের জন্য আমরা কেহ কেহ তাহাদিগের গৃহদ্বারে অতিথি হইতাম তাহা হইলে তাহারা অত্যন্ত প্রীত হইত। অনেকে রুটী এবং মৎস্য বিক্রয় করিবার জন্য জাহাজের উপর আসিত, আমরা সর্ব্বদা তাহাদিগকে আদর অভ্যর্থনা করিতাম। যখনই কোন নাগরিক তাহার শিশুসন্তান অথবা ক্রীতদাস সঙ্গে লইয়া জাহাজে আসিত, আমরা তাহাদিগকে আহার করিতে দিতাম। যাহাতে নাগরিকদিগের সহিত আমাদিগের সৌহার্দ্দ্য বৃদ্ধি হয় এবং দেশের মধ্যে আমাদিগের প্রশংসা ঘোষিত হয় সেই জন্যই আমরা প্রধানতঃ এই সকল করিতাম।

ভিখারীর দল আমাদিগকে বড়ই বিব্রত করিত। এমন কি কখন কখন রাত্রিতেও তাহারা আসিয়া জাহাজের উপর উপস্থিত হইত—আমরা নিরুপায় হইতাম; কিছুতেই তাহাদিগকে বিদায় করিতে পারিতাম না। সত্যই, এদেশের লোকসংখ্যা যত,—দেশে সে পরিমাণ আহার্য্য নাই। জাহাজের পাইল সংস্কারের জন্য অনেক সময় আমরা তীরে যাইতাম। মধ্যাহ্ন-ভোজনের জন্য তখন পকেটে বিস্কুট থাকিত। আহারের সময় বালক, যুবক, বৃদ্ধ, স্ত্রী-পুরুষ ভিক্ষুক এত আসিয়া জুটিত যে তাহারা আমাদিগের হস্ত হইতে সেই বিস্কুট কাড়িয়া লইয়া খাইয়া ফেলিত;—আমরা শুধু চাহিয়া দেখিতাম আর প্রায় সমস্ত দিন অনশনে কাটাইয়া দিতাম।

যখনই আমরা কালিকাটে যাইতাম তখনই প্রকাণ্ড বিপণীতে বিক্রয়ের জন্য নানা রকম দ্রব্য লইয়া যাইতাম। সে সমস্ত আমাদিগের নিজস্ব,—সরকারী নহে। টিন, কামিজ, বলয়, ছোট ছোট ঘণ্টা প্রভৃতি অনেক দ্রব্য আমাদিগের ছিল। কিন্তু সে সকল জিনিষের দাম হইত না। আমরা নিতান্ত অল্প মূল্যে সে সকল সামগ্রী বিক্রয় করিয়া ফেলিতাম। আবশ্যকবোধে কেহ এসকল দ্রব্য ক্রয় করিত না। সুদূর "পর্ত্তগালের জিনিষ" এই বলিয়া যাহা বিক্রীত হইত

মাত্র। ক্রয় বিক্রয় শেষ হইলে যখন আমরা জাহাজে ফিরিতাম তখন আমাদিগকে কেহই কিছু বলিত না,—আমরা নির্ব্বিঘ্নে চলিয়া আসিতাম।"

যাহা হউক, ফিরিঙ্গিদিগের সহিত স্থানীয় অধিবাসীবৃন্দের সদ্ভাব ক্রমেই বর্দ্ধিত হইতে লাগিল দেখিয়া ভাস্কো-ডা-গামা স্থির করিলেন, এখন আর আশঙ্কার কারণ নাই; এখন একজনের জিম্মায় কতকগুলি জিনিষপত্র রাখিয়া সকলে দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারেন। সেই মর্ম্মে ডা-গামা জামোরিণের নিকট পত্র লিখিলেন এবং তাঁহাকে কতকগুলি সামগ্রী উপঢৌকনস্বরূপ প্রেরণ করিলেন।

ডিওগো-ডিয়াজ (Diogo Diaz) ভাস্কো-ডা-গামার পত্র লইয়া জামোরিণ-দরবারে গিয়াছিলেন। চারিদিন বসিয়া থাকিবার পর জামোরিণের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ ঘটিল; জামোরিণ ক্রুদ্ধ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি কি চাও?"

প্রত্যুত্তরে, ডিওগো-ডিয়াজ ডা-গামার পত্র বাহির করিয়া জামোরিণের সম্মুখে স্থাপন করিলেন এবং কহিলেন যে, তিনি তাঁহার জন্য কতকগুলি উপঢৌকনও সঙ্গে আনিয়াছেন।

জামোরিণ পরুষভাবে কহিলেন, "আমি সে সকল জিনিষ কিছুই দেখিতে চাহি না,—পণ্যরক্ষকের নিকট রাখিয়া যাও। যদি তোমাদিগের 'য়্যাডমিরাল' কালিকাট পরিত্যাগ করিতে চাহেন তবে তাঁহাকে বলিও আমি তাঁহার নিকট ছয় শত জিরাফিন্ (৪০ পাউণ্ড ১০ শিলিং) চাই। যে বিদেশী কালিকাটে আসিয়া বাস করে তাহাকে ইহাই দিতে হয়,—কালিকাটের এইরূপ নিয়ম।"

জামোরিণের আদেশ শুনিয়া ডিওগো সবিনয়ে অভিবাদন পূর্ব্বক বিদায় গ্রহণ করিলেন। চিন্তাকুল ডিওগো যখন রাজপ্রাসাদ হইতে বহির্গত হইতেছিলেন তখন আরও কয়েকজন রাজকর্ম্মচারী প্রাসাদ

হইতে বহির্গত হইয়া ফিরিঙ্গিদিগের গুদামে যাইয়া উপস্থিত হইল। সেখানে তখন পণ্যদ্রব্যাদি রক্ষার জন্য কয়েকজন মাত্র ফিরিঙ্গি অবস্থান করিতেছিল। কর্ম্মচারীগণ তথায় সিপাহী-পাহারা বসাইয়া আদেশ দিল, বন্দী-ফিরিঙ্গিগণের মধ্যে কেহ যেন গুদামের বাহির হইতে না পারে, নগরমধ্যে ঘোষণা প্রচারিত হইল কেহ যেন তরণী লইয়া ফিরিঙ্গিদিগের জাহাজের নিকট না যায়। নিয়মভঙ্গের জন্য বিশিষ্ট দণ্ডেরও ব্যবস্থা যে না হইয়াছিল এমন বোধ হয় না।

হতভাগ্য বন্দীগণ ভাস্কো-ডা-গামার নিকট সংবাদ প্রেরণ করিবার জন্য আকুল হইয়া উঠিল। কিন্তু কে সংবাদ লইয়া যাইবে,—কেই বা তরণী দিবে? অবশেষে একটী বালক স্বীকৃত হইল। তখন সন্ধ্যার প্রাক্কাল। সন্ধ্যা অতীত হইলে সেই বিশ্বাসী বালক ধীবরদিগের একখানি ক্ষুদ্র তরণী আরোহণে রজনীর অন্ধকারে অলক্ষিতে জাহাজে যাইয়া উপস্থিত হইল। মুহূর্ত্তমধ্যে ফিরিঙ্গিগণ শুনিল আবার কয়েকজন বন্দী হইয়াছে!

ভাস্কো-ডা-গামা সংবাদ সংগ্রহে নিযুক্ত হইয়া জানিলেন, ফিরিঙ্গি-দিগকে বন্দী করিয়া হত্যা করিবার জন্য জামোরিণ মুরবণিকসম্প্রদায় কর্ত্তৃক নির্ব্বন্ধাতিসহকারে অনুরুদ্ধ হইয়াছেন। ভাস্কো-ডা-গামা শিহরিয়া উঠিলেন। দুই দিবস ধীরে ধীরে চলিয়া গেল,—ডা-গামা কোন উপায়ই করিতে পারিলেন না। তীর হইতে কোন নৌকাই আর জাহাজের নিকটে আসিল না।

ডা-গামা আপন অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া সহচরদিগের বিপদে আকুলহৃদয়ে সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন। তৃতীয় দিবসে, চারিটী বালক কতকগুলি মূল্যবান্ প্রস্তর বিক্রয়ার্থ জাহাজে আসিল। ডা-গামা তাহাদিগের এতই যত্ন করিলেন যে বালকচতুষ্টয় মুগ্ধ হইল এবং প্রত্যাগমনকালে গামার বন্দী বন্ধুদিগের জন্য পত্র লইয়া গেল।

যখন নাগরিকগণ দেখিল, ফিরিঙ্গিগণ জামোরিণ কর্তৃক অত্যাচার-পীড়িত হইয়াও সেই বালক কয়েকটীকে কিছুই বলে নাই বরং যত্নই করিয়াছে তখন আবার ক্রমে ক্রমে দুইজন দশজন করিয়া ব্যবসায়ী দ্রব্যাদি লইয়া পূর্ব্ববৎ ফিরিঙ্গিদিগের জাহাজে গমনাগমন করিতে লাগিল। যাহারাই আসিত, ডা-গামা এবং তাঁহার সহচরগণ তাহাদিগকেই অবস্থাতিরিক্ত আদর যত্ন করিতে লাগিলেন। এইরূপে কয়েকদিন অতিবাহিত হইল।

যখন সকলের মনেই বিশ্বাস জন্মিল যে, ফিরিঙ্গিগণ কিছুতেই কাহারও সহিত অন্যায় ব্যবহার করিবে না অথবা কাহারও কোন প্রকার অনিষ্ট করিবে না তখন একদিন প্রায় ২৫ জন লোক জাহাজে আসিয়া উপস্থিত হইল; ডা-গামা অনুসন্ধানে জানিলেন উপস্থিত দর্শকদিগের মধ্যে ছয়জন কালিকাটের সম্ভ্রান্ত নাগরিক। ডা-গামা এই সুযোগ ত্যাগ না করিয়া অবিলম্বে তাঁহাদিগকে এবং সেই সঙ্গে আরও প্রায় ১২।১৩ জন লোককে বন্দী করিয়া ফেলিলেন। অবশিষ্ট ভীত দর্শকবৃন্দ ড-গামার আদেশে পত্র লইয়া তীরে গমন করিল।

মুরগণ যখন শুনিল যে, কালিকাটের কয়েকজন বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক বন্দীরূপে ফিরিঙ্গিদিগের জাহাজে আবদ্ধ হইয়াছে তখন তাহারা বড়ই ব্যস্ত হইয়া উঠিল। তীরে, বন্দীকৃত ফিরিঙ্গি বণিকদিগের অনিষ্টাশঙ্কা কিয়ৎপরিমাণে দূর হইল। দুই একদিন পর ডা-গামা পুনরায় লিখিলেন,—"আমরা পর্ত্তুগাল চলিলাম, কিন্তু সত্বরই আবার কালিকাটে ফিরিয়া আসিব; তখন তোমরা দেখিও আমরা জলদস্যু কি অন্য কিছু।"

পত্রপ্রেরণান্তর ডা-গামার অর্ণবযান নোঙ্গর তুলিয়া কিছুদূর অগ্রসর হইল; তীরে দাঁড়াইয়া কালিকাটের ব্যথিত অধিবাসীবর্গ এবং ব্যগ্র-মুরবণিকসম্প্রদায় দেখিতে লাগিল, ফিরিঙ্গিগণ সহচরদিগকে শত্রুরাজ্যে

পরিত্যাগ করিয়াই প্রস্থান করিতেছে,—আর অল্পক্ষণ পরেই হয়ত দূর সমুদ্রে অদৃশ্য হইয়া যাইবে।

ভাস্কো-ডা-গামার অদৃষ্ট! তিনি ভারতবর্ষের ছায়া পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না। বাতাস উঠিয়াছিল, থামিয়া গেল,—কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া ডা-গামা জাহাজ বাঁধিতে বাধ্য হইলেন; মূরগণ দেখিল এখনও সময় আছে।

(৭)

জামোরিণ, রাজপ্রাসাদে ধূর্ত্ত মুর এবং অমাত্যগণ পরিবেষ্টিত হইয়া হয়ত ফিরিঙ্গিনিধনোপায়নির্দ্ধারণে ব্যগ্র ছিলেন এমন সময় তাঁহার নিকট সংবাদ আসিয়া পৌঁছিল যে, ফিরিঙ্গিগণ কৌশলে তাঁহার কতকগুলি বিশিষ্ট প্রজাকে বন্দী করিয়া পর্ত্তুগাল অভিমুখে যাত্রা করিয়াছে, তখন তিনি অত্যন্ত ব্যস্ত হইলেন। সদলবল ভাস্কো-ডা-গামার নিধন বা ফিরিঙ্গি-দলন করিবার যে কল্পনা তিনি মনে মনে করিয়াছিলেন এক নিমেষে তাহা ভাসিয়া গেল। জামোরিণ কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইলেন।

কিছুক্ষণ পরে তিনি ডিওগো-ডিয়াজকে আহ্বান করিয়া মহা সমাদরে তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন এবং স্নেহ-সম্ভাষণে কহিলেন,—

"ডিওগো! য়্যাডমিরাল আমার লোকজনদের বন্দী করিলেন কেন?"

ডিওগো। "মহারাজ! আপনার আজ্ঞায় আমরা বন্দী হইয়া রহিয়াছি বলিয়াই বোধ হয় এইরূপ ঘটিয়াছে।"

জামোরিণ অবশেষে সকল অপরাধ তাঁহার পণ্যরক্ষকের স্কন্ধে আরোপ করিবার চেষ্টা করিয়া কহিলেন,—

"ডিওগো, তোমার বন্ধুদিগকে লইয়া তুমি জাহাজে ফিরিয়া যাও। য়্যাডমিরালকে বলিও তিনি যেন আমার লোকজনদের ছাড়িয়া দেন।

আমার রাজ্যমধ্যে তিনি যে প্রস্তরস্তম্ভ স্থাপন করিতে কহিয়াছিলেন উহাদিগের সঙ্গে যেন সেটাও প্রেরণ করেন। তুমিত এখন স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছ না,—তোমাদিগের পণ্যসম্ভার রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত থাকিয়া এই দেশেই কিছুকাল বাস করিবেত? যাহা হউক, এই পত্রখানা লইয়া যাও; য়্যাডমিরাল যেন ইহা তাঁহার নরপতির হস্তে প্রদান করেন।”

ডিওগো-ডিয়াজ জামোরিণের কথামত লৌহলেখনী-সংযোগে তালপত্রে সেই লিপিখানি লিখিতে লাগিলেন;—

“ভাস্কো-ডা-গামা নামক একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি আপনার রাজ্য হইতে আমার রাজধানীতে আসিয়াছেন। তাঁহার ব্যবহারে আমি সাতিশয় পরিতুষ্ট হইয়াছি। আমার রাজ্যমধ্যে দারুচিনি, অভ্রক প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার মসল্লা এবং নানাবিধ বহুমূল্য প্রস্তর পাওয়া যায়। আপনি সুবর্ণ, রৌপ্য, প্রবাল এবং লোহিত রং পাঠাইবেন।”

* * * * *

উক্ত পত্র লইয়া ডিওগো-ডিয়াজ এবং তাঁহার বন্ধুগণ ভাস্কো-ডা-গামার নিকট উপস্থিত হইলেন, তখন পর্য্যন্ত ডা-গামা সুবাতাসের অপেক্ষায় জাহাজ বাঁধিয়া বসিয়াছিলেন। ডা-গামা সহচরদিগকে প্রাপ্ত হইয়া আর তাঁহাদিগকে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে দিলেন না, কালিকাটের গুদামে যে সকল দ্রব্য ছিল সে সমুদয় সেই স্থানেই পড়িয়া রহিল। বন্দী বিনিময়ে কালিকাটের বিশিষ্ট নাগরিকগণ মুক্ত হইলেন,—তীরে যে সকল দ্রব্য অরক্ষিত অবস্থায় রহিল তৎসমুদয়ের প্রতিভূস্বরূপ অবশিষ্ট দ্বাদশজন বন্দী মুক্তি লাভ করিতে পারিল না।

মন্দ মন্দ বাতাস বহিতে লাগিল,—ডা-গামার জাহাজ অধিকদূর অগ্রসর হইতে পারিল না। ক্রোধোন্মত্ত মুরগণ ৭০ খানি সুসজ্জিত তরণী লইয়া জাহাজের অনুসরণ করিল। সেই সকল তরণীতেও কামান

ছিল ; মুরগণ তরণীগাত্রে গুলিনিক্ষেপ করিবার ছিদ্র মধ্যে পশম দিয়া ও লালবস্ত্রে ছিদ্রের মুখগুলি আবৃত করিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিল। ভাস্কো-ডা-গামা মুহূর্ত্ত মধ্যে সে ধূর্ত্ততা বুঝিতে পারিলেন ; তাঁহার অর্ণবযান হইতে মুহুর্মুহু গুলি বর্ষিত হইতে লাগিল—শত্রুপক্ষ আর অধিকক্ষণ টিঁকিতে পারিল না। সেই সময়ে ভীষণ ঝটিকা উঠিয়া ভাস্কো-ডা-গামার জাহাজগুলি সমুদ্র মধ্যে অনেক দূর ভাসাইয়া লইয়া গেল, আক্রমণকারীরা হতাশহৃদয়ে ফিরিয়া আসিল। সেই দিন, সেই কোন্ এক মুহূর্ত্তে "ফিরিঙ্গি বণিক" ভারতবর্ষের বক্ষ লক্ষ্য করিয়া কামানের গোলা নিক্ষেপ করিয়াছিল—যদিও সে বহুদিন, কিন্তু আজ পর্য্যন্তও তাহার ক্ষতচিহ্ন বর্ত্তমান রহিয়াছে।

সুবাতাসে ভাস্কো-ডা-গামা স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলেন,—কর্ত্তব্যপালনে যে আত্মসুখ হয় ডা-গামার তাহা সম্পূর্ণই হইয়াছিল। তিনি ও তাঁহার সঙ্গীগণ আনন্দে মত্ত হইয়া ভারত মহাসাগরের উত্তাল-তরঙ্গ-ভঙ্গ তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া সুদূর স্বদেশাভিমুখে ছুটিয়াছিলেন ; কিন্তু পথিমধ্যে তাঁহার দুইখানি জাহাজ ধ্বংশপ্রাপ্ত হইল, তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা মৃত্যুমুখে পতিত হইল,—তাঁহার অর্দ্ধেক নাবিক সাগরের শীতল গর্ভে স্থান লাভ করিল।

ভাস্কো-ডা-গামা পুনরায় লিসবন নগরে ফিরিয়া আসিলেন। অভিযানে যে ব্যয় হইয়াছি তাহার ৬০ গুণ লাভ হইল দেখিয়া পাশ্চাত্য বাণিজ্যজগতে একটা মহা হুলুস্থূল পড়িয়া গেল। সমগ্র পর্ত্তুগাল আনন্দে মাতিয়া উঠিল, গৃহে গৃহে জয়ধ্বনি হইতে লাগিল, নরপতি ইমানুয়েল্ উচ্চপদমর্য্যাদায় ভাস্কো-ডা-গামাকে ভূষিত করিলেন। তাঁহার শুভাগমন সংবাদে যখন সমস্ত দেশ আনন্দে সজীব হইয়া উঠিয়া তাঁহার অভ্যর্থনার আয়োজন করিতেছিল তখন তিনি বিষণ্ণ হৃদয়ে সমুদ্রের জলহীন বেলাভূমিতে বসিয়া তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও বীরসহচরদিগের

মৃত্যু স্মরণ করিয়া অশ্রুবর্ষণ করিতেছিলেন। সে তপ্তঅশ্রু আর কেহ দেখিল না—দেখিবার অবসরও প্রাপ্ত হইল না; কারণ একদিন যে ভারতে বাণিজ্যকল্পে পর্ত্তুগালের সহস্রাধিক অর্ণবপোত * যাতায়াত করিত, ভাস্কো-ডা-গামা তাহারই প্রথম বীজ বপন করিয়া আসিয়াছিলেন।

তখন পর্ত্তুগালের প্রত্যেক অধিবাসীর হৃদয়মধ্যে যেন একটী নবশক্তি সঞ্জীবিত হইয়া তাহাদিগকে কর্ম্মের পথে উৎসাহিত করিতেছিল; ইমানুয়েল তখন আত্মবিস্মৃত হইয়াছিলেন।

কেবল যে পর্ত্তুগালই এই আবিষ্ক্রিয়া নির্নিমেষ নয়নে নিরীক্ষণ করিতেছিল তাহা নহে; য়ুরোপের সকল জাতিরই আগ্রহদৃষ্টি তখন ভাস্কো-ডা-গামার উপর নিপতিত ছিল। ভারতবর্ষের ধনসম্পদের দিকে সকলেরই দৃষ্টি ছিল,—সকলেই তখন সে কনক-স্বপ্নে মুগ্ধ; তাই ভারতবর্ষ গমনের এই নূতন পথ আবিষ্কৃত হইল দেখিয়া য়ুরোপীয় বাণিজ্য-জগতে একটা মহা গোলযোগ উপস্থিত হইল; ভারত-মহাসাগরের সুবর্ণ-তীরে যে সকল অমূল্য নিধি পড়িয়াছিল কে সে সমুদয় আহরণ করিবে, তখন পাশ্চাত্য জাতির মনে এই চিন্তাই প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল! তখনকার যুগে যে জাতি সর্ব্বাগ্রে যে দেশ আবিষ্কার করিতে পারিত সে দেশের বাণিজ্যে সেই জাতিরই পূর্ণ অধিকার হইত,—পর্ত্তুগাল তাই ভারতের দিকে প্রলুব্ধদৃষ্টিতে চাহিতেছিল—একশত মুদ্রায় ছয় সহস্র মুদ্রা লাভ সুতরাং কাহারইবা না লোভ হয়?† যে কোহিনুর এতদিন ইমানুয়েল স্বপ্নে দেখিতেন এখন তিনি

৩

* See W. Robertson's Works, Vol. XII.

† Correia estimates the king of Portugal's profit on Vasco-da-Gama's expedition at *six thousand per cent;* although *the spices*

যেন উহা বক্ষে ধারণ করিলেন আর উহার বিমল আভায় সমগ্র পর্তুগাল আলোকিত হইয়া উঠিয়া য়ুরোপখণ্ডকে চমৎকৃত করিল।

---

brought back were not of the first quality. ডা-গামা যদি উৎকৃষ্ট দ্রব্যাদি সঙ্গে লইয়া যাইতে পারিতেন তাহা হইলে হয়ত আরও অধিক লাভ হইত।

ভাস্কো-ডা-গামার লিসবন প্রত্যাগমনের অব্যবহিত পূর্ব্বে লিসবন নগরের বাজার দর নিম্নে প্রদত্ত হইল।—

		£.	s.	d.
All spice	per lb.	0	0	3
Cinnamon	,,	0	3	2
Cloves...	,,	0	3	6¾
Ginger	,,	0	2	1¼
Mace	,,	0	5	2¾
Nutmegs	,,	0	1	$8\frac{11}{12}$

নিম্নে আলেকজান্দ্রিয়ার বাজার দর প্রদত্ত হইল :—

[১০ ফানুয়েন = 1*s.* 4½*d*].

All spiceper	128 lbs.	15 Fanoens.
Cinnamon	,,	£1. 16*s.* 6*d.*
Cloves	,,	20 Fanoens.
Ginger	,,	11 Fanoens.

[তৎকালে কালিকাটে ৫ কুইণ্টাল অথবা ৬৪০ পাউণ্ডের দাম—২০ ফানুয়েন।]

Nutmegs	per 128 lbs.	16 Fanoens.
Wax	,,	25 ,,
Musk ... ৩⅓ মাসা অথবা ৫০ গ্রেন	,,	1 ,,
Incense	per 129 lbs.	2 ,,

[মক্কায় ৫ কুইণ্টাল অথবা ৬৪০ পাউণ্ডের দাম—২ ফানুয়েন]।

তখন কার ১ ফারাজেলা (Farazella) গড়ে ওজনে ৩০ পাউণ্ড এবং ১ ক্রুজাডো (cruzado) গড়ে ২ শিলিং ৩ পেন্স হিসাবে।

কালিকাটে।

(১৪৯৮ এবং পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসর)

	পাউণ্ড	শিলিং	পেন্স
১ হন্দর অথবা ১ মন ১৪ সের ৭½ ছটাক তাম্র ...	০	২৫	২½
১ পাউণ্ড গোলাপজল	০	০	২$\frac{৯}{১০}$
৩০ পাউণ্ড তুতিয়া	১	১১	৬½
১ খানি লৌহ ছুরি	০	০	১$\frac{৩}{৪}$

লিসবন এবং ভিনিস উভয়ে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিতে ভারতের দিকে চাহিতে লাগিল। ডা-গামার প্রত্যাবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গেই ভিনিসিয়গণ বুঝিতে পারিল যে, তাঁহাদিগের অদৃষ্ট ভাঙ্গিয়াছে। যে অর্থে, যে ধন-সম্পদে তাহাদিগের স্বদেশ সমৃদ্ধিশালী হইয়াছিল, তাহারা বুঝিল যে সে ধনরত্ন আর তাহাদিগের নহে,—এখন তৎসমুদয় পর্ত্তুগালের। আর পর্ত্তুগাল দেখিল অনন্ত অপার রত্নাকরের কোন্ এক প্রান্তসীমায় তাহাদিগের জন্য কত অজ্ঞাত ধনরত্ন যেন এতদিন লুক্কায়িত ছিল, তাহারা এক মায়ামন্ত্র বলে সেই অনন্ত ধনরত্নরাশি লাভ করিয়াছে,—যেন এতদিন তাহারা নিদ্রিত ছিল, কমলার কোমল-কমলকর-স্পর্শে নিদ্রাভঙ্গে চাহিয়া দেখিল অমূল্য রত্নরাশি তাহাদিগের গৃহদ্বার আলোকিত করিয়া সম্মুখে বিস্তৃত রহিয়াছে,—এখন কুড়াইয়া লইতে পারিলেই হয়!

কভিলহাম একদিন যাহার সূত্রপাত করিয়াছিলেন ভাস্কো-ডা-গামা

ইংলণ্ডে।

	পাউণ্ড	শিলিং	পেন্স
১ হন্দর অথবা ১ মন ১৪ সের ৭½ ছটাক তাম্র ...	৩	১৪	৬ (১৫৭৫ সাল)
৬ পাইন্ট গোলাপজল	৩	৩	০ (১৫৩৬ সাল)
১ হন্দর তুতিয়া	১	৫	২¼ (ঐ)

কালিকাটে।

(১৪৯৮ এবং পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসর)

১ খণ্ড পশম বস্ত্র	পাউণ্ড	শিলিং	পেন্স
Camlet	০	১৫	৯
৩½ ফিট রক্তবস্ত্র	০	৪	৬
৩০ পাউণ্ড পারদ	১	২	৬

ইংলণ্ডে।

	পাউণ্ড	শিলিং	পেন্স
১ খণ্ড Camlet...	০	১৫	৯ (১৫৩৬ সাল)
১ গজ রক্তবস্ত্র	০	৫	০ (ঐ)
৩০ পাউণ্ড পারদ...	১	২	৬ (ঐ)

এখন তাহা কার্য্যে পরিণত করিলেন। এখন পর্ত্তুগালের সম্মুখে একটী অতি-বিস্তৃত কর্ম্মক্ষেত্র অকস্মাৎ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল; সেই কর্ম্মক্ষেত্র বহুকাল ধরিয়া পর্ত্তুগালের কামানগর্জ্জনে বিকম্পিত হইয়াছিল,—বহুকাল পর্য্যন্ত পর্ত্তুগালের বাণিজ্যতরণী পূর্ণ করিয়া রত্ন তুলিয়া দিয়াছিল, বহুকাল ধরিয়া তাহার চরণ সেবায় নিযুক্ত ছিল। পর্ত্তুগালের দুরদৃষ্ট যে, সে এত সমৃদ্ধি রক্ষা করিতে পারিল না। একদিন যাহার বাণিজ্যতরণী উত্তমাশয় অন্তরীপ হইতে ক্যাণ্টন নদীতীর পর্য্যন্ত সকল স্থানের সকল বন্দরেই যাতয়াত করিত,—একদিন যে বাণিজ্য রক্ষার্থ ফিরিঙ্গিগণ অগণিত দুর্গ, পরিখা, কুঠি প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিয়াছিল, আজি ভারতবর্ষে তাহাদিগের অতি দরিদ্র চিহ্নমাত্র বর্ত্তমান রহিয়াছে;—গৌরবশ্রীর ভস্মাবশেষমাত্র এখন পর্ত্তুগালের বিজয়কাহিনীর স্মৃতিটীকে সন্তর্পণে সঞ্জীবিত রাখিয়াছে।

একদিন এই ভারতবর্ষে পর্ত্তুগালের বাণিজ্য, অবাধ ও অপরিসীম ছিল,—পর্ত্তুগালের প্রতিদ্বন্দ্বী বলিতে কেহই ছিলনা। ফিরিঙ্গি বণিকগণ ভারতবর্ষে আসিয়া যে সকল দ্রব্য ক্রয় করিত সে সকল দ্রব্যের মূল্য নিরূপণ, বিক্রেতার ইচ্ছাধীন ছিলনা,—ক্রেতার অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিত; একদিন তাহারা যে ভারতবর্ষ হইতে যাহাই অমূল্য, যাহাই দুষ্প্রাপ্য, যাহাই আবশ্যক তাহাই লইয়া যাইত তাহাতে কথাটী বলিবারও কেহ ছিলনা,—আজ তাহাদিগের কথা স্মরণ করিলে দুঃখ হয়;—পর্ত্তুগালের অধঃপতনের জন্য সহানুভূতি হয় না, কারণ সে আপনার চরণে আপনি কুঠারাঘাত করিয়াছিল,—গোয়ায় রাজ্য সংস্থাপন করিয়া নিজের ধ্বংশের পথ সুপরিষ্কৃত করিয়াছিল! জগতের ইতিহাসে সেরূপ ধ্বংশ-কাহিনী বিরল নহে।

শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য।

ঘরের কথা।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

গেছে—গেছে—গেছে? কি পরিচয় দিলে? উকিল বুঝি—ও বাবা, তা কে জানে, তা হলে কি ছাই আমি মরার কথা তুলি! কি সর্ব্বনাশ! একেবারে জেরার চোটে, বক্তৃতার দাপটে, আমায় অস্থির করে তুলেছিল আর কি। বাস্তবিক, কাজটা আমার ভাল হয় নাই; জোয়ান ছোকরা ওরা, যৌবনের শ্রাবণে ঢল্-ঢল্ প্রাণের কিনারা ছাপিয়ে উঠেছে, একুল ওকুল তর্‌তর্ টল্ টল্ কচ্চে, যে দিকে চাও লালে লাল, একটানা পেয়ে বাসনার পানসি এখন আশার সাগরের দিকে নক্ষত্রবেগে ছুটেছে, এ সময় বানচালের কথা ভাল লাগবে কেন?

তা যাক্, এখন গেছেতো আবার এলেই কি জেরা তুলবে, এই বেলা যা বল্‌ছিলেম তা বলে নিই।

রাজচন্দ্র দে—দাস দে—কায়স্থ, বাড়ী দক্ষিণ-ডায়মণ্ডহারবরের এলাকায় কি একটী গ্রামে। অনেক কষ্ট পেয়ে সুপারিশের সুপারিশ তস্য সুপারিশ নিয়ে, বড় বাবুর কাছে দেড় বৎসর হাঁটাহাঁটি উমেদারি করে, তাঁর ছেলের কাপি লিখে দিয়ে, কাল মেয়েকে পরী বলে, মাথায় ক'রে বাজার বয়ে, অবশেষে বাবুর এক জায়গার একজনকে সঙ্গে করে শ্রীক্ষেত্রে রথ দেখিয়ে এনে তারই অনুগ্রহবলে শিয়ালদহের রেলে মালগুদামে রাজচন্দ্রের একটী ১৫৲ টাকা মাহিনার চাকরী হয়।

লোককে বাধ্য করিতে রাজচন্দ্রের বিশেষ ক্ষমতা ছিল। স্বার্থ-সিদ্ধির কৌশল নয়—বাধ্য করা, লোকের মনস্তুষ্টি করা, পরের কাজ

মাথায় করিয়া লওয়া, অভ্যাসগুণে তাহার স্বভাব,—স্বভাব কেন বলি, ব্যাধিকের মধ্যেই দাঁড়িয়েছিল। অপরের জন্য পরিশ্রম করায়, হ'লো সে কাজে নিজের অবস্থা মত দুই চারি পয়সা খরচ করায় রাজচন্দ্রের রাগ অপমান কষ্ট বা বিরক্তি দূরে থাকুক বরং কেউ তাহাকে দায়ে অদায়ে না ডাকিলে তাহার মনে একটু অভিমান হইত। যাহার সঙ্গে একটু ভাল রকম জানাশুনা হইল, সে যে দে-মহাশয়কে পর ভাবিবে ইহা তাঁহার প্রাণে সহ্য হইত না। তা ইহাতে ছোট বড় বিচার ছিল না। রবিবারের অবকাশ উপেক্ষা করিয়া, যেমন উল্লাসের সহিত সাহেবের ঘোড়ার শুকনো ঘাস কিনিবার জন্য রাজচন্দ্র বাগবাজারে ছুটিত তেমনি উল্লাসের সহিত একটা কুলির মায়ের হাঁপানির ঔষধ আনিতে মালপাড়ায় দৌড়িত, বরং শেষ কার্য্যের জন্য সেরূপ সুবিধা বুঝিলে রাহা-খরচটা নিজের গাঁট হইতে দিত। যার এমন স্বভাব, সে কেননা মাস দুই তিনের মধ্যে আফিশে পসার জমাইয়া ফেলিবে? এমন সৌখিন দোকানীর খদ্দেরের অভাব কি? নীলু বাবুর একটা সুবিধা দরের দেরাজ চাই, রাজচন্দ্র আনিয়া দিবে; ভৈরব ঘোষ এক সপ্তাহের ছুটী লইয়া বাড়ী যাইবে, রাজচন্দ্র তার মার্কা দেওয়ার কাজ চালিয়ে দেবে; নিবারণ বাবু তেমন দর-দস্তর করিতে জানেনা কে তার বাড়ীর মাসকাবারের বাজারটা করে দেয়, দে মহাশয়কে কর্‌তে হবে; ম্যাজ সাহেবের মেমের প্রথম পক্ষের বাবালোকের দুধ খাবার জন্য দুটী গাই কিনতে হবে, রাজু বাবু কো বোলাও; নিতাই সরকারের মামীকে গঙ্গাযাত্রা করা হয়েছে ঘাটে রাত্রি জাগিবার লোক পাওয়া যায় না, নয়টার পর খাওয়া দাওয়া সেরে এক পো চোরবাগানের তামাক হাতে করে দে-মহাশয় না ডাকিতেই হাজির। আবার জিবু পইণ্টস্‌ম্যান একজনের কাছে টাকা পাবে, নালিশ না কল্লে আদায় হয় না, গরীব মানুষের হয়ে

সমন আর সফিনাগুলি রাজুবাবু না মেহেরবাণী কল্লে কে বাহির করে দেয় ? আর বড় বাবুর তো এবাড়ীর ওবাড়ীর সমস্ত কাজ রাজচন্দ্রের উপর বরাত। আফিশের একটু মুরুব্বিগোছ লোকেরা দে- মহাশয়ের নাম দে-গিন্নি রেখে দিলেন।

কিন্তু যেমন পৃথিবীর একদিকে যখন সূর্য্যের আলোক পড়ে অপর দিকে তখন অন্ধকার অত্যাচার করে, তেমনি মানুষের অদৃষ্টচক্রের সম্মুখে যখন কিরণ ক্ষরে পশ্চাতে তখন কালী ধবে। আমরা একদিক চক্‌চকে দেখে চারদিক্ জলজলাট বলি। মানব-শ্যামচাঁদের সামনে দাঁড়িয়ে যখন শুকের দল হাতনেড়ে গান করে,—"আমার কৃষ্ণের বামে চূড়া হেলে" পেছন হতে সারির দল তখনই চোখ ঠেরে সুর ধরে,—"আমার রাধার চরণ পাবে বলে—নইলে হেলবে কেন ?" কোন লোক যখন একদিকে সুখ্যাতি, সুনাম, স্নেহ, ভালবাসা পায়, অন্যদিকে তখন তাহার কুৎসা, কলঙ্ক, হিংসা, দ্বেষ করিবার দল আড়ালে মহলা দিতে থাকে। সুতরাং একবৎসর পরে, যদুবাবু "গুডস্ ক্লার্ক" হয়ে গোয়ালন্দে বদলি হওয়ায় ম্যাজ সাহেব নিজে যখন রাজচন্দ্রকে ৩৫৲ টাকা মাহিনা করে তাঁর কর্ম্মে বসাইয়া দিলেন ; মাপ, ওজন ও চালানের প্রায় সম্পূর্ণ ভার হাতে পড়াতে যখন তার কিছু কিছু উপরি আয় হইতে আরম্ভ হইল তখন ঐ আফিশের মধ্যেই রাজচন্দ্রের গুটিকয়েক শত্রু হইল।

রাজচন্দ্রের উন্নতিতে ইঁহাদের কাহারও কোন বিশেষ ক্ষতি হয় নাই, তথাপি একজন নূতন লোকের,—বাহিরের লোকের, স্বল্পদিবসের মধ্যে এরূপ পদ-বৃদ্ধিতে এত অধিক সম্মানে তাঁহারা আপনা-আপনি অপমানিত ও প্রপীড়িত মনে করিলেন। কল্যকার যোগীর আগুল্ফ-চুম্বিত জটাবর্দ্ধনে অনেকেরই নৈতিক ক্রোধ প্রজ্জলিত হয়। জলের ঘরে, ট্রামগাড়ীতে, মেসের বাসায় মধ্যে মধ্যে মিটিং বসিয়া রাজচন্দ্রের বংশলতিকা, জন্মপত্রিকা, আকৃতি-প্রকৃতি, রীতিনীতি, চাল-চলন,

আহার-ব্যবহার, আয়ের খাতা, মনের কথা ইত্যাদির কঠোর সমালোচনা হইতে লাগিল। হারান চাটুর্য্যে বল্লেন, কেমন আমি নই বলেছিলুম যে অমন চেহারা যার, সে কখন ভাল লোক হয় না। অথচ রাজচন্দ্র ময়ুর থেকে নামিয়াও আসেন নাই, কি দাঁতখামাটীমারা চোরাও না; আফিশের দশ জনের দশ রকম চেহারার মধ্যে তাহারও এক রকম ছিল, মুখ-ভাবে কোন বিভীষিকার লক্ষণও ছিল না অথবা আকৃতিতে বিধাতা কিছু বিশেষ কদর্য্যতার শিলমোহর ছাপিয়াও দেন নাই; তবে লোকে নাকি অনেক সময় মন দিয়া মুখ দেখে, চোখ দিয়া নয়। রাজচন্দ্র যখন পনেরটী টাকায় ভর্ত্তি হয় তখন চাটুর্য্যে ম'শায় তাহার মুখাকৃতি কিরূপ দেখিয়াছিলেন তাহা অবশ্য এক্ষণে স্মরণও নাই এবং এ সম্বন্ধে তিনি তখন কোন মতও ব্যক্ত করেন নাই কিন্তু যখন এক বৎসরের মধ্যে তাহার ৭০।৭৫ টাকা মাসিক আয়ের সম্ভাবনা হইল তখন নিশ্চয় স্থির করিলেন যে, মুখখানা পুরো বদমায়েসী মাখা ছিল, এবং একথা তিনি আপন ইচ্ছায় সুস্থ-শরীরে খোসমেজাজে সাধারণে প্রচারও করিয়াছিলেন। মথুর পাল বল্লেন যে, বাবা! ও আর মুখ দেখা-দেখি কি? দক্ষিণে লোক মাত্রেই বদমায়েস চিরকাল জানা আছে। বস্, এর উপর আর কথা নাই। আগ্রা থেকে আলিপুর পর্য্যন্ত সমস্ত শ্রীঘরে ও আণ্ডামান দ্বীপপুঞ্জে যতগুলি বিশিষ্ট লোক ব্যায়াম চর্চ্চা করিতেছেন, ইঁহাদের সকলেরই নিবাস দক্ষিণ; আর পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর এ তিন দিকে যার পানে চাও সেই তৈলঙ্গ স্বামী, বিশেষতঃ হুগলী জেলা, যেখান হ'তে আমাদের পাল-মহাশয় কষ্ট স্বীকার ক'রে শুভাগমন করিতেছেন। যেমন কাশীতে মরিলে শিব হয়, ব্যাস কাশীতে দেহত্যাগ করিলে গাধা হয়, বিলাতে জন্মিলে "বৃটিশ বরণ্" হয় তেমনি কলিকাতার দক্ষিণে বাস হইলেই লোকে জুয়াচ্চোর বদমায়েস হয়। প্রমাণেরও অভাব নাই,

—দক্ষিণদিক হইতে জাহাজ প্রবেশ করাইয়াই ইংরাজেরা ভারতবর্ষ গ্রহণ করিয়াছেন; ভাগীরথী কলিকাতার দক্ষিণাভিমুখী হইয়াই পবিত্রতা হারাইয়াছেন, মধুর সলিলে লবণ প্রবেশ করিয়াছে; দক্ষিণা বাতাস অঙ্গে লাগিয়া কত কুলবতীর কুল টল্‌মল্ করিয়াছে; ব্রাহ্মণ-ভোজন করাইলে জরিমানা দিতে হয় দক্ষিণা; আর শ্রীযুক্ত চিত্রচন্দ্র দাস গুপ্ত মহাশয়ের দপ্তরখানার মোকাম দক্ষিণ। সুতরাং, অদ্যকার সভায় স্থির হইল যে, দক্ষিণদেশবাসী বিভীষণ বদনধারী রাজচন্দ্র দাস দে (সত্য কায়স্থ কি না এ বিষয়েও অনেক কায়স্থ ব্রাহ্মণ সভ্যের সন্দেহ রহিল) একজন ভয়ানক ভণ্ড ও প্রকৃষ্ট পাষণ্ড। সভাপতি চাটুর্য্যে মহাশয়ের প্রস্তাবে সমবেত সভ্যমণ্ডলী কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইল যে, রাজচন্দ্রের মিষ্টালাপ মিছরির ছুরী; তাহার পরোপকার প্রবঞ্চনা; সে দস্তুরির লোভে নালুর দেরাজ কিনিয়া দিয়াছিল; বিলক্ষণ লাভ আছে, না হ'লে নিবারণের চাল ডাল কি অমনি খামকা কিনিয়া দেয়; পইণ্টস্‌ম্যানের মকদ্দামার তদ্বিরে উকিলের নামে ডবল টাকা আদায় করিয়াছিল; সাহেবের আর বড় বাবুর যে মন যোগায় সে কেবল তাঁহাদের কাণ ভারি করিয়া আফিশের আর পাঁচজনের মাথা খাইবার জন্য; ভৈরব ঘোষ ছুটী লওয়াতে তার হয়ে বস্তায় মার্কা দেগেছিল বটে, কিন্তু নিশ্চয়ই তার কোন সর্ব্বনাশের জোগাড় করে রেখেছে; আর নিতাই সরকারের মামীর গঙ্গাযাত্রার সময় যে কয়দিন রাত্রি জাগিয়াছিল সে নিতাইকে মতলব দিয়ে একখানি জাল উইল প্রস্তুতের জন্য। রাজু দে একজন পাকা জালিয়াত; টেবিলে বসে, হাত খালি থাকিলেই জোচ্চোরটা ব্লটিংয়ের উপর পঁচিশ রকম ছাঁদে দুর্গানাম লিখে, হরবেরকম হরপের হাত তৈয়ার করে; চাটুর্য্যে মহাশয় দীনুকে, জগবন্ধুকে, হালদারকে ভাদুড়ীকে আরও কত লোককে এ কাণ্ড কতদিন দেখাইয়াছেন।

এতদূর অসৎ লোক জানিয়াও চাটুর্য্যে মহাশয়ের দল যে আজও

রাজচন্দ্রকে ফাইফরমাজ করেন, দায়ে অদায়ে ডাকেন বা হাত দিয়া জিনিষটা পত্রটা কিনাইয়া লয়েন সে তাঁহাদের নিজের নিজের প্রাণে কোনরূপ কোরকাপ নাই বলিয়া।

মোদ্দাৎ নিন্দাই করুন আর খুঁতই ধরুন, চক্রান্তই পাকান আর চুল্‌লিই লাগান, যে বলের বেগ ধারণ করিয়া রাজচন্দ্রের অদৃষ্টচক্র উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছিল, তাহার সমস্ত শক্তির ক্ষয় হইবার পূর্ব্বে তাহার গতিরোধ করিতে সম্মুখীন হইলে, রোধকারীর অঙ্গ চক্র-সংঘর্ষণে ক্ষতবিক্ষত বা চক্রতলে নিপতিত হইয়া পিণ্ডীকৃত হইতে হইত। যদি কেহ দূর অন্তরাল হইতে প্রস্তরখণ্ডাদি নিক্ষেপ করিত তবে রাজচন্দ্রের দলদলে-হৃদয়, পায়ে-ধরা-প্রাণ, তাহা আবর্ত্তনের পথে পড়িবার পূর্ব্বেই, রবারের ন্যায় আপন কোমল কোলে লুফিয়া লইত। রাজচন্দ্র জানিত যে কাজ ফাঁকি দিলে আপনি ফাঁকি পড়িতে হয়, আফিশের সঙ্গে তার কাজের সঙ্গে মাত্র সম্বন্ধ, সাহেবেরা বেতন রাজচন্দ্রকে দেয় না তাহার কাজকে দেয়, সে আরও বুঝিত যে মনীব যাহাকে সর্ব্বদা খোঁজে সেই বড় চাকুরে, সুতরাং সে কাজ খুঁজিয়া বেড়াইত; আপনার নাই, পরের নাই; বাঁধাধরা নাই, মাপাযোকা নাই; কাজ যেখানে লোক খুঁজিয়া বেড়াইত, আলস্য-অভিমানশূন্য রাজচন্দ্র সেইখানেই হাজির। অমুকে কর্ম্ম করে না আমি কেন করিব, সবাই ফাঁকি দিয়া বেতন লইবে আর আমিই বুঝি পরিশ্রম করিয়া মরিব, একথা রাজচন্দ্রের মুখে ছিল না। একেতো পরের উপকার করা, অন্যের জন্য পরিশ্রম করা রাজচন্দ্রের প্রকৃতিগত অভ্যাসই ছিল, তাহার উপর সে এইটুকু বুঝিতে পারিত যে, লাভালাভ শুধু টাকায় খতাইতে হয় না, অন্যরূপেও খতান যায়। প্রতিকার্য্যেই যে, কোন-না-কোন রূপ শিক্ষা পাওয়া যায়, অভিজ্ঞতা জন্মে ইহাকে সে একটা লাভ মনে করিত; আর শ্রমপটুতা ও কার্য্যদক্ষতা যে উপরওয়ালার দৃষ্টিতে

পড়িত তাহাও সে বিশেষ লাভ জ্ঞান করিত ; আর সর্ব্বোপরি, কার্য্যকারণে, পরিশ্রম সফল হইলে, যে শরীরে স্ফূর্ত্তি ও মনে মনে একটা আনন্দ হইত তাহাকে সে পরম লাভ জ্ঞান করিত।

সাহেবেরা প্রাতে আফিশে আসিয়া দেখিতেন যে, রাজচন্দ্র আগে আসিয়াই কাজ আরম্ভ করিয়াছে, আবার যখন তাঁহারা অপরাহ্নে গাড়ীতে উঠিতেন তখনও দেখিতেন যে রাজচন্দ্র কাজ করিতেছে। মিছামিছি কাগজ নাড়া নয়, সত্যই কাজ করিত। একবার বাকি পড়িলে ইহজন্মে ছিট মরে না, এক ঘণ্টা আলস্যের সুখ ভোগ করিলে দশ ঘণ্টা খাটিয়া দুঃখ ভোগ করিতে, মাথা বকাইতে হয় এইগুলি বুঝিয়া রাজচন্দ্র হাতে কাজ ফেলিয়া রাখিয়া যাইত না। রাজচন্দ্রের ন্যায় নিশ্চিন্তে নিদ্রার সুখ ভোগ আফিশের অল্প লোকের অদৃষ্টেই ঘটিত। এই সকল কারণে ইংরাজ বাঙালী সকল কর্ত্তৃপক্ষের চক্ষেই রাজচন্দ্র আফিশের মধ্যে একজন বিশেষ আবশ্যকীয় লোক হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল। সকল কাজেই রাজচন্দ্রকে ডাক, সকল সময়েই তার খোঁজ। "ভাগ্যে রাজচন্দ্র ছিল" "সে মহাশয় না থাকলে কি হইত" "এ সময়ে রাজচন্দ্রের হাত খালি থাকিত" এইরূপ কথা তাঁহাদের মুখে সর্ব্বদাই শুনা যাইত। আবার সামান্য অসুখের ছুতা বা প্রয়োজনের নতা করিয়া সে ছুটী লইত না, নিতান্ত অপারক না হইলে কামাই করিব না তাহার প্রতিজ্ঞা ছিল। এই ব্যাধিমন্দির শরীরে কে জানে কবে কি মহা বিকারের দুর্গোৎসব হইতে পারে, সংসারে কোন দিন কোন গুরুতর প্রয়োজন হইবার সম্ভব, এই ভয়ে সে ছুটীর প্রার্থনা ভবিষ্যতের জন্য চাপিয়া রাখিত। গন্ধর্ব্বের হস্ত হইতে উদ্ধার করার পর দুর্য্যোধন যখন অর্জ্জুনকে বর দিতে চান তখন শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ মতে পার্থ সময়ান্তরে বর মাগিয়া লইব বলিয়া বিদায় হয়েন।

মহাভারতে এই বিষয়টী পাঠ করিয়া রাজচন্দ্র প্রয়োজনের জন্য ছুটী

বাঁচাইয়া রাখিতে শিক্ষা করে। রাজচন্দ্রের এরূপ আচরণে আফিশের অনেক বাবুই তাহার উপর বিরক্ত হইত; চাটুর্য্যে মহাশয় বলিতেন, এই দক্ষিণে ব্যাটা সকলকার মাথা খাইতে বসিয়াছে। কিন্তু অনেকে যে আপনার মাথা আপনি খাইয়া বসিত, কেবল রাজচন্দ্র যে তাহাদের হইয়া কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া দিয়া সাহেবদের কোপ দৃষ্টি হইতে মাথা বাঁচাইয়া দিত, প্রতিদিন ইহা চক্ষে দেখিলেও স্থূল চর্ম্ম ভেদ করিয়া চাটুর্য্যে মহাশয়ের হৃদয়ে তাহা প্রবেশ করিত না। ইয়ং বেঙ্গলের দল, কিছুমাত্র স্বাধীনতা নাই বলিয়া রাজচন্দ্রের নিন্দা করিত, তোষামদকারী বলিয়া তাহাকে উপহাস করিত; রাজচন্দ্র হাসিয়া বলিত খোষামদটা কাকে বল দাদা? নোংরা কাজ ত কখন কিছু করিনি, যাতে জাত যায় ধর্ম্মহানি হয়, কি কায়স্থসন্তান বা ভদ্রলোকের পক্ষে লজ্জাস্কর এমন কোন কাজ কত্তে আমাকে কেউ কখনও বলেওনি আমিও করিনি। তবে কথাটা হচ্ছে এই, না হয় আমি কিছু বেশী খাটি, সাধ্যায়ত্ত হলে সময় সময় পরের কাজটা করি, তা এ যদি খোসামদ হয় তা হ'লে আমি নাচার। আর স্বাধীনতার কথা যা ব'লছ তা যখন গোলামি ত্যাগ করিবার অবস্থা হবে তখন স্বাধীন টাধীন হওয়ার চেষ্টা দেখা যাবে, এক সঙ্গে সর্দ্দি, গর্ম্মি আমার ধাতে সহ্য হয় না ভাই।"

এখন আফিশের লোকে, রাজচন্দ্রের উপর যে দোষই চাপাক আর সে নিজে তার যা'ই কৈফিয়ৎ দিক্, কার্য্যতঃ মনের সত্য স্বাধীনতা শিয়ালদহ আফিশের কেরাণীকুলের মধ্যে রাজচন্দ্রের ন্যায় অল্প লোকেরই ছিল। আড়ালে সাহেবকে "ডোণ্ট কেয়ারই" করুণ আর মুখে চাকরীতে "কমিট নো নুইসেন্স,"ই করুন দশটা থেকে পাঁচটা পর্য্যন্ত সকলের প্রাণটাই খুঁত খুঁত করত; আর সাহেব ডাকচে বলে চাপরাশী সাহেব এসে গম্ভীর মুখে দাঁড়ালে অনেকেরই বুকের ভিতরটা ধড়াস ধড়াস করে উঠত। কিন্তু রাজচন্দ্র হাল্কা মনে থর

পায়ে আফিশে আসিত, স্ফূর্ত্তি করে কাজ করিত নিতান্ত আলস্য বোধ হলে আধঘণ্টাকাল চেয়ারে হেলান দিয়া বিশ্রাম করিয়া লইত। তা সাহেবই দেখুন আর যিনিই দেখুন ; আবার ছুটির পর হাস্য মুখে বাসায় যাইত। চাপরাশী সাহেবেরা দে-বাবুর মুখের সামনে বড় বেশী করিয়া দাড়ী নাড়িতে পারিত না, তিনি সামনে এসে পড়লে খাতির করে হুঁকো-টা মুখ থেকে নামিয়ে ধরতো। আর সাহেবের কাছে কাহারও জন্য কোনরূপ উপরোধ অনুরোধ করিতে হইলে রাজচন্দ্রই "স্বাধীন বাবুদের" একমাত্র ভরসা ছিল। রাজচন্দ্রের আভ্যন্তরিক স্বাধীনতা, নৈতিক নির্ভীকতা ও সৎসাহসের সুদৃষ্টান্ত আরো অনেক সময় দেখা গিয়াছে। একবার স্বরস্বতী পূজার সময় কিছু আবশ্যকীয় কার্য্যের ভিড় পড়াতে ম্যাক্স সাহেব তাঁহার ডিপার্টমেণ্টের কয়েকজন বাবুকে পূজার দিনে আফিশে আসিতে বলেন, বাবুরা একটু খুঁৎমুৎ করাতে সাহেব তাঁহাদের বেতন বুঝিয়া কাহারও দুই টাকা কাহারো এক টাকা "এক্সট্রা" মঞ্জুর করেন। ম্যাক্স সাহেব অনেক দিন এদেশে থাকাতে দেশীয় লোকের আচার ব্যবহার অনেকটা বুঝিতেন। ব্রাহ্মণেরা পুরোহিতের জাতি জানিয়া তিনি বৃদ্ধ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে উক্ত দিনে আসিতে বলেন নাই কিন্তু "যাহার খাই তাহার কাজ বজায় রাখিব ইহাতে মা স্বরস্বতী চটেন চটুন" বলিয়া চাটুর্য্যে মহাশয় স্বেচ্ছায় আফিশে আসেন ও ছুটীর দিনে ফাঁকতালে ২৲ টাকা উপার্জ্জন করিয়া লয়েন। রাজচন্দ্র জোড়-হস্তে সাহেবকে নিবেদন করে "যে, হুজুর আমায় কাল ক্ষমা করিতে হইবে, সরস্বতীপূজার দিন হিন্দুর কাগজ কলম স্পর্শ করা নিষেধ, আমি বাল্যকাল হইতে প্রতিবৎসর উক্ত দিবসে উপবাস করিয়া অঞ্জলী দিয়া থাকি, কাল আমি লেখা পড়ার কার্য্য করিতে পারিব না ; বরং দুইটা বাতি অনুমতি করেন তো আজ আমি রাত্রি ১০।১১টা পর্য্যন্ত থাকিয়া যতটা পারি কার্য্য করিয়া যাই। যে রাজচন্দ্র কখনও কোন

অনুমতি উপেক্ষা করে নাই, রবিবারে বা অপর ছুটীর দিনে আসিতে বলিলে আপত্তি করে নাই ; জ্বর গায়ে পাল্কী করিয়া আফিশে আসিয়াছে সে আজ স্পষ্টাক্ষরে তাঁহার মুখের উপর লেখনী স্পর্শ করিতে অস্বীকার করিল দেখিয়া সাহেব কিছু আশ্চর্য্য হইলেন, বুঝিলেন যে সত্যই ধর্ম্মে আঘাত লাগিবে বলিয়া সে এরূপ আপত্তি করিল ; তাহার স্থির প্রতিজ্ঞা শাসন বা প্রলোভনে কিছুতেই টলিবার নহে ; সুতরাং তাহাকে অবকাশ দিলেন। একে জোড়-হস্তে হুজুর সম্বোধন তাহার উপর আবার এক্সট্রা না লওয়া, রাত্রি পর্য্যন্ত কার্য্য করিতে স্বীকার ইহা অপেক্ষা ভীরুতা দাম্ভিকতা কি হইতে পারে ? যাহোক, এক্সট্রা লইয়া কার্য্য করিতে যাঁহারা স্বীকার করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে দুই একজন নব্য বাবু রাজচন্দ্রের নীচাশয়তা দেখিয়া গা টেপা-টিপি করিয়া হাসিতে লাগিলেন। পরবৎসরও সরস্বতী পূজার দিন সকলকে আফিশে আসিতে হইল কিন্তু এবার এক্সট্রার হার অর্দ্ধেক ; রাজচন্দ্রের ছুটী। জল খাবার ঘরে মহা আন্দোলন হইল ; চাটুর্য্যে মহাশয় সেকাল ও একালের সাহেবদের চরিত্র তুলনায় সমালোচনা করিলেন ; ট্যালিক্লার্ক গোপালেন্দ্র মোহন পরামাণিক "ফেয়ারপ্লে" স্বাক্ষর করিয়া মিরারে সাহেবদের গালি দিয়া খুব কড়া এক পত্র লিখিলেন। তৃতীয় বৎসরে এক্সট্রা নগদ আর কিছুই হইল না কেবল "অলরাইট বাবুজ, নথিং লাইক ওয়ার্ক" বলিয়া ম্যাজ সাহেব সকলকে আপ্যায়িত করিলেন। চতুর্থ বৎসর সেপ্টেম্বর মাসেই সারকুলার বাহির হইল যে, সমস্ত হিন্দুপূজাপার্ব্বনেই সকলকে আফিশে আসিতে হইবে কেবল দুর্গোৎ-সবের সময় যাহাদের বাটিতে পূজা তাহারা চারিদিন মাত্র অবকাশ পাইবে, আর রাজচন্দ্রকে তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন পূজার দিনই আফিশে আসিতে হইবে না। হুলুস্থুল বাধিয়া গেল ; মিরার, ষ্টেটস্‌ম্যান্‌, অমৃতবাজার প্রভৃতি সংবাদপত্রে প্রেরিত-পত্রের ছড়াছড়ি

হইল, চাটুর্য্যে মহাশয় দিব্যচক্ষে দেখিলেন যে, ইংরাজ রাজত্বের অবসানের আর বিলম্ব নাই, এবং সকলকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন যে একটু ধৈর্য্য ধরিয়া থাক রুষেরা আসিতেছে, তাহারা বাঙালীকে গবর্ণর-জেনেরল করিবে; অর্থাভাবে যাহাদের পৈত্রিক দুর্গোৎসব বন্ধ হইয়াছে সরকার হইতে খরচ দিয়া তাহাদিগের পূজা নির্ব্বাহ করিয়া দিবে; প্রতিবৎসর দ্বাদশটী ব্রাহ্মণ, বিবাহ করিবার স্কলার্শসিপ পাইবে; রেলওয়ে কেরাণীদের দশবৎসরে পুরা পেন্সন হইবে; সপ্তাহে রবিবারতো আছেই বৃহস্পতিবার ও মুসলমানদের সন্তোষার্থ শুক্রবারেও সমস্ত আফিশ বন্ধ থাকিবে এবং তাহারা খোসামুদে লোকের উপর বড় চটা সুতরাং তাহাদের চাকরী দিবে না, অবশ্য তিনি রাজচন্দ্রকে লক্ষ্য করিয়া একথা বলেন নাই। নালুবাবুর ছোট ভাই মাস দুই হইল একখানি বাঙ্গলা কাগজ বাহির করিয়াছিল তাহাতে বড় বড় অক্ষরে "অত্যাচার-রেল সাহেব-দের" হেডিং দিয়া এক দীর্ঘ আর্টিকেল ছাপাইয়া দিল; গোপালেন্দ্র বাবু নবমীর রাত্রে ভক্তির উচ্ছ্বাসে গরাণহাটার মোড়ে কাদা-মাটী করায় দশমীর দিন তাঁহাকে সংযম করিয়া লালবাজারে থাকিতে হয়, সেদিন মোটেই কাজে আসিতে পারেন নাই, একাদশীর দিন ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট দক্ষিণান্ত করিয়া শান্তিজল গ্রহণের পর বেলা একটা বাজাইয়া আফিশে প্রবেশ করায় সাহেব তাহাকে কর্ম্মচ্যুত করিলেন। তিন মাস চেষ্টার পর নূতন চাকরীর জোগাড় করিতে না পারিয়া অমিততেজা গোপালেন্দ্র পরামাণিক ইংরাজের দাসত্ব আর করিবেন না প্রতিজ্ঞা করিয়া দেশহিতৈষী হইলেন। বড়বাবুকে বলিয়া কহিয়া চাটুর্য্যে মহাশয় তাঁহার দৌহিত্রকে আনিয়া পরামাণিকের পরিত্যক্ত টুলে বসাইয়া দিলেন। যাঁহারা অত্যাচার সহ্য করিয়াও চাকরী করিতে লাগিলেন তাঁহাদের প্রতিবাসী ও বন্ধুগণের মধ্যে যাহাদের শালা শালী-পো প্রভৃতি আত্মীয়গণ বা নিজে বেকার অবস্থায় ছিল তাহারা পরামর্শ

দিলেন যে, তোমাদের যদি একটুও মানুষের চামড়া গায়ে থাকে তবে ধর্ম্মঘট করিয়া সকলে আফিশ ছাড়িয়া দাও। কিন্তু বুদ্ধিমান্ বাবুগণ কর্ম্মত্যাগ না করাতে উক্ত প্রতিবাসী ও বন্ধুগণ নৈরাশ্যের বিরক্তিতে বাবুদের ছোটলোক বলিয়া গালি দিলেন এবং বড় আশায় লিখিত দরখাস্তগুলি ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন। একদিন রাজচন্দ্র ম্যাজ সাহেবকে ভাল মেজাজে পাইয়া তাঁহাকে বাবুদের অসন্তুষ্টির কথা জ্ঞাপন করেন, এবং পূজার ছুটী না দিলে ভাল দেখায় না বলেন। ম্যাজ সাহেব হাসিতে হাসিতে বলিলেন যে, ধর্ম্ম-কর্ম্মে ব্যাঘাত হইতে পারে এই বিবেচনা করিয়াই আমরা আফিশের কার্য্য ক্ষতি করিয়া সকল পূজায় ছুটী দিতাম, কিন্তু যখন দেখা গেল যে অতিরিক্ত টাকা পাইলেই অনেকে ধর্ম্ম-কর্ম্ম ছাড়িয়া আফিশে আসিতে পারেন তখন কি জন্য আমরা তাহাদিগকে আর ছুটী দিব ; কৈ তোমায় তো জোর করিয়া আফিশে আসিতে বলা হয় না ? [ক্রমশঃ]

শ্রীঅমৃতলাল বসু।

সংকল্প।

তরুণ প্রভাতে পশিয়া, জননি,
তোমার ফুলের বনে ;
খেলাধুলা লয়ে কাটাইনু বেলা,
তোমারে পড়েনি মনে।

যেমনি তোমার স্নেহের বচন
শুনেছি, অমনি ভেঙ্গেছে স্বপন,
ছুটিয়া এসেছি ফিরিয়া জননি,
তোমার গৃহের কোণে।
খেলাধুলা লয়ে ভুলেছিনু মাগো
তোমায় পড়েনি মনে !

ডাক আরবার জননি আমায়
অমিয়-মধুর বোলে,
স্নেহ বরষিয়া করুণ নয়নে
তুলিয়া লওগো কোলে।
ধূলি ধূসরিত এদেহ আমার
মুছে দাও মাগো আঁচলে তোমার ;
প্রসাদীকুসুমে গাঁথা মালাখানি
পরাইয়া দাও গলে।
স্নেহ বরষিয়া জননি, আমায়
তুলিয়া লওগো কোলে।

বিজয় মন্ত্র শিখায়ে আমারে,
সাজায়ে নবীন সাজে,
দাও পাঠাইয়া হে জননি, মোরে
বিশ্বসমাজ মাঝে।

প্রেম দিয়া দ্বেষ করি যেন জয়,
সংগ্রামে যেন নাহি পাই ভয়,
সুখে দুখে তব কল্যাণ মোর
হৃদয়ে যেনগো রাজে।
পাঠাইয়া দাও জননি, আমায়
বিশ্ব সমাজ মাঝে।

পরের দুয়ারে নাহি যাই যেন
লইয়া ভিক্ষাঝুলি,
ক্ষুদ্র স্বার্থ যেন মা আমার
চক্ষে না দেয় ধূলি।
তোমার দৈন্য দেখি কোন দিন
ভক্তি যেন গো নাহি হয় ক্ষীণ,
নিজ হীনতায় কভু যেন তব
গৌরব নাহি ভুলি।
পরের দুয়ারে নাহি যাই যেন
লইয়া ভিক্ষা ঝুলি।

দিবা অবসানে একদা যখন
ফিরিয়া আসিব ঘরে,
জানি, মাগো, তুমি পথপানে চাহি
থাকিবে আমার তরে।
নানাদূর দেশে করি বিকি-কিনি
যদি কোন ধন নিয়ে আসি জিনি,
চরণে নমিয়া সঁপিব সকলি
তোমার চরণ পরে ;
দিবা-অবসানে একদা যখন
ফিরিয়া আসিব ঘরে।

শ্রীরমণীমোহন ঘোষ।

বুশিদো।

(জাপানের মর্ম্মস্থান)

অল্পকালের মধ্যে জাপানীদিগের প্রভূত বলবীর্য্য ও উন্নতি দেখিয়া আমরা মনে করি বুঝি উহা য়ুরোপীয় জ্ঞান শিক্ষা ও বাহ্য অনুকরণের ফল, কিন্তু তাহা ঠিক নহে। উহাদের উন্নতি, নৈতিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। বুশিদোই সেই ভিত্তি। সম্প্রতি কোন জাপানী পণ্ডিত, "বুশিদো"—এই নামে একটি অতীব উপাদেয় গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার প্রথমাংশের সার মর্ম্ম নিম্নে দিতেছি—

"বুশিদো" শব্দের অর্থ ক্ষাত্র ধর্ম্ম; অথবা যে সকল নীতি-তত্ত্ব জাপানী যোদ্ধ্‌বর্গের শিক্ষা করিতে হয় ও তদনুসারে স্বকীয় জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হয় তাহাই "বুশিদো"। ইহা নীতি-তত্ত্বের কোন লিপিবদ্ধ সংহিতা নহে;—কোন কোন যোদ্ধা ও জ্ঞানি-জনের মুখ-নিঃসৃত কতকগুলি বীজমন্ত্র অথবা মূলসূত্র মুখপরম্পরায় চলিয়া আসিয়াছে এই মাত্র।

যে সময়ে সামন্ততন্ত্র জাপানে প্রকাশ্যভাবে প্রথম প্রবর্ত্তিত হয় তখন "সামুরাই" (সামরিক ?) অর্থাৎ জাপানী ক্ষত্রিয়বর্গ জাপানী-সমাজে অগ্রগণ্য হইয়া উঠে। উহারা "বুশি" নামেও অভিহিত হইত। যুদ্ধই উহাদের কৌলিক বৃত্তি। উহাদের যেরূপ দায়িত্ব, তদনুসারে কতকগুলি বিশেষ অধিকারও উহারা প্রাপ্ত হইয়াছিল।

যুদ্ধে ন্যায়-পথ অবলম্বন করিবে—ধর্ম্মযুদ্ধ করিবে—এই কথার মধ্যে আদিম কালের সমস্ত নীতি নিহিত। যুদ্ধ-ব্যাপার আসলে অমঙ্গল হইলেও, উহা হইতেও কতকটা মঙ্গল প্রসূত হয় সন্দেহ নাই। সুস্থ সবল প্রকৃতির নিকট "পলাতক", "ভীরু",—এই কথাগুলি যেরূপ

নিন্দার কথা, এরূপ আর কিছুই নহে। নীতির ভিত্তি না থাকিলে, যুদ্ধ একেবারেই পাশবতায় পরিণত হইত। য়ুরোপেও খৃষ্টধর্ম্ম অবতীর্ণ হইয়া, "শিভ্যাল্‌রি"কে কতকটা আধ্যাত্মিক ভাবে অনুপ্রাণিত করে। ল্যামার্টিন বলেন ;—আদর্শ খৃষ্টান-"নাইটের", ধর্ম্ম, যুদ্ধ ও কীর্ত্তি—এই তিনটি মর্ম্মস্থান।

"বুশিদোর" মুল-প্রস্রবণ অনেকগুলি—তন্মধ্যে বৌদ্ধধর্ম্ম অন্যতর।

অদৃষ্টের উপর প্রশান্তভাবে নির্ভর করা, যাহা অনিবার্য্য তাহার হস্তে আত্মসমর্পণ করা, দুর্ঘটনা ও বিপদের মধ্যে অবিচলিত থাকা,—ইহাই বৌদ্ধধর্ম্মের শিক্ষা। একজন তলোয়ার খেলার ওস্তাদ্ ছাত্রদিগকে তলোয়ার শিক্ষা দিতেন, যখন দেখিলেন তাঁহার এক ছাত্র, যতদুর শিখিবার তাহা শিখিয়াছে, তখন তিনি তাহাকে এই কথা বলিলেন :—"আমার নিকট যাহা শিক্ষা পাইবার তাহা পাইয়াছ, এখন যাহা শিখিতে বাকি তাহা "জেনের" নিকট অর্থাৎ ধ্যানের নিকট শিক্ষা কর"। জাপানীরা এই ধ্যানের শিক্ষাও বৌদ্ধধর্ম্ম হইতে প্রাপ্ত হইয়াছে।

যাহা বৌদ্ধধর্ম্ম দিতে পারে নাই, তাহা শিন্তোধর্ম্ম প্রচুর পরিমাণে দিয়াছে। যেরূপ রাজভক্তি, পিতৃমাতৃভক্তি, পিতৃপুরুষদিগের স্মৃতি-পূজা,—শিন্তোধর্ম্ম শিক্ষা দেয় এরূপ শিক্ষা আর কোনও ধর্ম্মে পাওয়া যায় না। এই ধর্ম্ম, সামুরাইদিগের উদ্ধত স্বভাবে একটু নম্রতা বিধান করিয়াছে। শিন্তোধর্ম্ম, খৃষ্টানদিগের ন্যায়, মনুষ্যের "প্রকৃতি-গত পাপ-প্রবণতা" স্বীকার করে না, প্রত্যুত তাহার মত এই যে, মানব-আত্মা স্বরূপতঃ দেবোপম বিশুদ্ধ ;—এই মানব-আত্মা হইতেই দেব-বাণী শ্রুত হয়। বোধ হয়, সকলেই লক্ষ্য করিয়াছেন, শিন্তোধর্ম্মে, পূজার বিগ্রহ কিংবা পূজার উপকরণ কিছুই নাই। মন্দিরের মধ্যে, কেবল একটা সাদা-সিধা আয়না ঝোলানো থাকে। ইহা ছাড়া আর

কোন সাজসজ্জা নাই। তাৎপর্য্য এই :—এই দর্পণই বিশুদ্ধ মানব-হৃদয়ের আদর্শ স্থল; মানবহৃদয় বিশুদ্ধ থাকিলে, ঈশ্বরের প্রতিবিম্বও তাহাতে সহজে পতিত হয়। অতএব, এই স্বচ্ছ দর্পণে, যখন তোমার নিজ ছায়া দেখিতে পাও, তখন উহা তোমাকে এই কথাই বলে :—"আপনাকে অপনি জান"; এই আত্মজ্ঞান নিজ শরীর সম্বন্ধীয় জ্ঞান নহে;—ইহা অন্তর্দৃষ্টি-সম্ভূত জ্ঞান।

গ্রীক্ ও রোমকের মধ্যে তুলনা করিয়া মমসেন বলিয়াছেন;—"যখন গ্রীকেরা পূজা করিত তখন তাহারা উর্দ্ধে স্বর্গের দিকে দৃষ্টিপাত করিত, কেন না, বিশ্বালোচনাই তাহাদের পূজার বিষয় ছিল;—এবং রোমকেরা যখন পূজা করিত তখন তাহারা মস্তক অবগুণ্ঠিত করিত; কেন না, অন্তর্দৃষ্টি ও ধ্যানই তাহাদের পূজার পদ্ধতি ছিল"। কিন্তু জাপানীদিগের মধ্যে, এই প্রকার ধ্যানের দ্বারা, নৈতিক চৈতন্য অপেক্ষা, জাতীয় চৈতন্যই সমধিক জাগ্রত হইয়াছে। শিন্তোধর্ম্মের প্রকৃতি-পূজা হইতেই, জাপানীরা দেশকে অন্তরের অন্তরে ভালবাসিতে শিখিয়াছে; শিন্তোধর্ম্মের পিতৃপুরুষের পূজা হইতেই, বংশ-পরম্পরা অনুসরণ করিয়া অবশেষে উহারা সমস্ত জাতির মূল-প্রস্রবণ—সেই রাজ-পরিবারে উপনীত হইয়াছে। জাপানীর নিকট স্বদেশ—শুধু "ফলবতী বসুমতী" কিংবা "শত খনি রত্নের নিধান" নহে—তাহা হইতেও অধিক;—উহা দেবতাদিগের—পিতৃ-পুরুষদিগের দেহান্তরিত আত্মার পবিত্র নিবাস-ভূমি। উহাদিগের নিকট রাজা শুধু পার্থিব রাজা নহেন—তিনি এই পৃথিবীতেই ঈশ্বরের প্রতিনিধি। তাঁহার শরীরে, শক্তি ও দয়া একাধারে বিদ্যমান।

নিরবচ্ছিন্ন নীতিতত্ত্বগুলি জাপানীরা কংফুচুর উপদেশ হইতে প্রচুর পরিমাণে প্রাপ্ত হইয়াছে। প্রভু-ভৃত্যের মধ্যে, পিতা-পুত্রের মধ্যে, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে, জ্যেষ্ঠ-কনিষ্ঠের মধ্যে, বন্ধুদের মধ্যে পরস্পর যে সম্বন্ধ

কংফুচু বিবৃত করিয়াছেন তাহা জাপানী জাতির স্বাভাবিক সংস্কার ও প্রবৃত্তির অনুকূল বলিয়া, জাপানীরা উহা পূর্ব্বেই গ্রহণ করিয়াছিল। চীন হইতে এই সকল মত জাপানে প্রচারিত হইলে পর, তাহা আরো দৃঢ়ীভূত হয়—এই মাত্র।

কংফুচুর পরেই, সামুরাই-সমাজের উপর মেঞ্চুর অসীম প্রভাব। মেঞ্চুর সাধারণতন্ত্র-পরিপোষক মতগুলি, সহৃদয় ব্যক্তিগণের অতীব হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল; কিন্তু সেই সকল মতের প্রচারে, সামাজিক শৃঙ্খলা বিপর্য্যস্ত হইবার সম্ভাবনা থাকায়, উহা অনেকদিন পর্য্যন্ত নিন্দনীয় ও বর্জ্জনীয় বলিয়া বিবেচিত হইত। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও, উহা সামুরাইর হৃদয়ে স্থায়িভাবে প্রবেশ লাভ করে।

এই কংফুচু ও মেঞ্চুর গ্রন্থাবলি যুবকদিগের মুখ্য পাঠ্য পুস্তক, এবং তর্কবিতর্কের সময়, বৃদ্ধদের নিকট সর্ব্বোচ্চ প্রমাণ-গ্রন্থ বলিয়া গৃহীত হইত। কিন্তু ঐ সকল গ্রন্থে পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করা শ্লাঘার বিষয় ছিল না। এইরূপ গ্রন্থপাণ্ডিত্যের উপহাস-সূচক একটা জনপ্রবাদ জাপানীদের মধ্যে প্রচলিত আছে। যাঁহারা আদর্শ-সামুরাই, তাঁহারা এইরূপ পণ্ডিতকে "গ্রন্থগন্ধী মূর্খ" বলিয়া অভিহিত করেন। কেহ কেহ এইরূপ পাণ্ডিত্যকে সেই দুর্গন্ধ উদ্ভিজ্জের সহিত তুলনা করিয়া থাকেন—যাহা ব্যবহার করিবার পূর্ব্বে পুনঃ পুনঃ ক্বাথিত ও শোধিত করিয়া লইতে হয়। সামুরাইদিগের ধারণা—শুধু জানা, জ্ঞানোপার্জ্জনের উদ্দেশ্য নহে—পরন্তু জ্ঞানী হওয়াই জ্ঞানার্জ্জনের প্রকৃত উদ্দেশ্য। জীবনে প্রয়োগ করিতে না পারিলে, জ্ঞানের সার্থকতা নাই। তাই চীন-দার্শনিক ওয়ান্-ইয়াং-মিং পুনঃ পুনঃ এই কথা বলিয়াছেন:—"জানা ও কাজ করা একই কথা"।

সামুরাই-চরিত্র উক্ত দার্শনিকের উপদেশেও, অনেকটা উপরঞ্জিত। ওয়ান্-য়াং-মিং-এর লেখায়, এই ভাবের অনেক কথা পাওয়া যায়

যথাঃ—"প্রথমে তোমরা ঈশ্বরের রাজ্য ও তাঁহার মঙ্গলভাবের অনুসরণ কর"। মিওয়াশিশাই নামক তাঁহার একজন জাপানী শিষ্য এইরূপ বলেন :—"আমাদের স্বরূপ-সত্তার আধ্যাত্মিক জ্যোতি—বিশুদ্ধ, উহা মনুষ্যের ইচ্ছাবলে বিকৃত হয় না। যাহা ভাল, ও যাহা মন্দ—তাহার জ্ঞান স্বতস্ফূর্ত্ত হইয়া আমাদের মনোমধ্যে উদিত হয় ;—তখন উহাকে আমরা ধর্ম্মবুদ্ধিনামে অভিহিত করি ;—সে জ্যোতি সাক্ষাৎ স্বর্গ হইতে আমাদের অন্তরে অবতীর্ণ হয়"।

বুশিদো-ধর্ম্মের মূল-প্রস্রবণগুলি যাহাই হউক, তাহা হইতে কতকগুলি অতীবসরল নীতি-তত্ত্ব প্রসূত হইয়াছে। সেবিষয় বারান্তরে বিবৃত করা যাইবে।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বিহারে সতী-আস্থান।

খাগোল-দানাপুর রেলওয়ে-ষ্টেশন হইতে যে প্রশস্ত রাজপথ উত্তরমুখী হইয়া দানাপুর ক্যাণ্টোন্মেণ্ট ভেদ করিয়া, শন-গঙ্গা সঙ্গমে গিয়া পড়িয়াছে, তাহার উত্তর প্রান্তে, ভাগীরথী তীরে, এক বিস্তীর্ণ প্রান্তর আছে। বামে দানাপুর-ছাউনী, দক্ষিণে কালীবাড়ী। এই কালীবাড়ীর পশ্চাতে শোন-গঙ্গার সংযোগস্থল। উভয় নদীর মধ্যবর্ত্তী ত্রিকোন ভূমির বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে, এক সুউচ্চ বালুকাবৃত মৃত্তিকাস্তূপের উপর একখণ্ড অর্দ্ধ-প্রোথিত, সিন্দুর-রঞ্জিত প্রস্তরফলক লক্ষিত হয়। ইহাকে সতী-আস্থান বলে। নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহ হইতে সমাগতা স্নানপরায়ণা রমণীগণ, সেই ত্রিবেনীস্নানান্তে, ঐ 'সতী-আস্থানের' প্রস্তরফলকে, দুগ্ধ, সিন্দুর ইত্যাদি দিয়া পূজা করিয়া থাকে।

বৈশাখের প্রখর গ্রীষ্মের দিনে, একদা রাম-অনুগ্রহ-নারায়ণের পিতামহী, সরস্বতী, কলাবতী ও রাম-অনুগ্রহ প্রভৃতিকে লইয়া একখানি বয়েল-বাহিত একাগাড়ী করিয়া, শোন-গঙ্গা-সঙ্গমের ত্রিবেণীতে স্নান করিল; এবং পূর্ব্বকথিত 'সতী-আস্থানে' দুধ, গঙ্গাজল ও সিন্দুর দিয়া পূজা করিয়া, নিকটবর্ত্তী মহুয়া বৃক্ষতলে আশ্রয় গ্রহণ করিল। যতই বেলা হইতে লাগিল, বৈশাখ-শেষের প্রখর সূর্য্য সহস্র কিরণ বিস্তীর্ণ করিয়া যেন চারিদিক দগ্ধ করিতে উদ্যত হইল। স্ত্রীলোকগণ তখনই স্নান করিয়া আসিয়াছে, তথাপি তাহাদের সর্ব্বাঙ্গে দরদরিত ঘর্ম্মধারা পতিত হইতেছে। রাম-অনুগ্রহ পিতামহীর ক্রোড়ে শুইয়া কহিল,

"নানি, বড়ী পিয়াস্!"

বৃদ্ধা লোটা হইতে সুমিষ্ট সরবৎ বাহির করিয়া পৌত্রকে পান করিতে দিল। বৃদ্ধ গাড়োয়ান রামচরণ বলিল, "মাইজী! এই সেই 'সতী-আস্থান'। আপনার কি কিছু মনে পড়ে? সেই সেদিনের কথা—"

কলাবতী আগ্রহ সহকারে বাধা দিয়া বলিল,

"কি, কি, নানি বলনা—বলনা—"

বৃদ্ধা কিছু গর্ব্বমিশ্রিত উচ্চকণ্ঠে বলিল, "কেন, তোরা কি শুনিস্ নাই—আমার পিতামহীর সতীদাহ হইয়াছিল, এইখানে। আমার পিতা পাথর দিয়া এই 'আস্থান' বাঁধাইয়া দিয়াছেন?"

কলাবতী বলিল, "না, তুমি বলিয়াছিলে একদিন বলিব, কিন্তু সেই অবধি আমাদের শুনা হয় নাই।"

বৃদ্ধা বলিল, "সে আজ অনেক দিনের কথা—আমার ভাল মনে হয় না—তখন আমার বয়স ৫।৭ বৎসর মাত্র। সব ধোঁয়া ধোঁয়া যেন স্বপ্নের মত মনে পড়ে। কিন্তু তারপর পিতামাতার মুখে অনেক

বার শুনিয়াছি। রামচরণ গাড়োয়ান তখন কিছু বড় হইয়াছিল,—উহার অনেকটা মনে আছে। কিন্তু সে অনেক কথা, এখন বলিবার সময় নয়—বাড়ী গিয়া সন্ধ্যার পর শুনিস্।"

সেইদিন সন্ধ্যার পর, খগোলের রামরূপের অন্তঃপুরে, এক নাতিবৃহৎ রমণীসভামধ্যে, রাম-অনুগ্রহকে ক্রোড়ে লইয়া, বৃদ্ধা তাহার পিতামহীর সতীদাহকাহিনী বলিতে আরম্ভ করিল। কিরূপে তাহার পিতামহের মৃত্যু হইল, কিরূপে তাহার আত্মীয়-স্বজনেরা নিতান্ত কাতর হইয়া হাহাকার করিতে লাগিল, কিরূপে সকলে, বিষাদমগ্ন হইলেও তাহার পিতামহী হাসিয়া হাসিয়া কথা কহিতে লাগিলেন, নানারূপ বহুমূল্য বেশভূষায় সজ্জিতা হইতে লাগিলেন, সীমন্তদেশ সিন্দুর ও পদদ্বয় অলক্তরাগ রঞ্জিত করিলেন, এবং সধবার লক্ষণ সকল ত্যাগ করা দূরে থাকুক, তাহা অধিকতর দৃঢ়ীভূত করিতে লাগিলেন; কিরূপে তদ্দর্শনে সকলেই বুঝিল যে, তিনি স্বামীসঙ্গে সহমৃতা হইবেন; কিরূপে তাহার আত্মীয়-স্বজন, শিশুপুত্রকন্যা ফেলিয়া তাঁহাকে সহমৃতা হইতে নিষেধ করিল; কিরূপে তিনি সকলের স্নেহ মায়া ও অনুরোধ উপেক্ষা করিয়া স্বামীর সহগামিণী হইতে দৃঢ়সংকল্প হইলেন; এই বৃষোৎসর্গ ব্যাপারের আনুপূর্ব্বিক বিবরণ গল্পনিপুণা বৃদ্ধা বিনাইয়া বিনাইয়া, কখন হাস্য, কখন করুণ, কখন বীভৎস রসের অবতারণা করিয়া, প্রায় দুই ঘণ্টাকাল স্বীয় পূর্ব্বপুরুষের দীর্ঘগৌরবকাহিনী কীর্ত্তন করিল, আমরা তাহা সংক্ষেপে বলিতেছি।

একজন হিন্দু বিধবার সতীদাহ হইবে, এই সংবাদ বিদ্যুদগ্নির ন্যায় নিমেষমধ্যে চারিদিকে প্রচারিত হইয়া পড়িল। দানাপুর, খগোল, ফুলবাড়ী, মিঠাপুর, বাঁকিপুর, বেগমপুর, পাটনা প্রভৃতি স্থান হইতে দলে-দলে স্ত্রীপুরুষ, বালক-বৃদ্ধ যুবক-যুবতী, হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান প্রভৃতি নানা জাতীয় লোক আসিয়া, সতী-আস্থানের সেই

বৃহৎ ক্ষেত্র পরিপূর্ণ করিতে লাগিল। স্ত্রীলোকেরা চিত্র-বিচিত্র বসনভূষণে সজ্জিতা হইয়া, নাসাগ্র হইতে জ্রুললাট কপোল ও কেশ পাশের সীমন্তরেখার সীমান্তভাগ পর্য্যন্ত সিন্দুররঞ্জিত করিয়া, তদুপরি মোমলেপন পূর্ব্বক অভ্রখণ্ড সকল সজ্জিত করিয়া ললাটে স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র প্রভৃতি বিবিধ ধাতুর 'টিকলি' সাঁটিয়া, বিবিধ বর্ণের ও বস্ত্রের কাঁচুলি, চোলি, আঙ্গিয়া, ফতুয়া, কোর্ত্তা আঁটিয়া, জরির কিনারাদার, বুটিতোলা রঙ্গীন ওড়না দ্বারা দেহলতা আবৃত করিয়া, সতী-আস্থানের শোভাবর্দ্ধন করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে লোকারণ্য গভীর হইতে গভীরতর হইতে লাগিল। দানাপুর ক্যানটোনমেণ্ট হইতে অনেকগুলি দেশীয় ও গোরা সৈনিক এবং কয়েকজন উচ্চপদস্থ ইংরাজ-সৈনিক-কর্ম্মচারী ও সাহেব-ডাক্তার ঘোটকারোহণে এবং কয়েকজন ইংরাজমহিলা হস্তীপৃষ্ঠে হাওদায় বসিয়া, সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এইরূপে ইতর ভদ্র, কেহ হাতীতে কেহ ঘোটকা-রোহণে, কেহ উষ্ট্রপৃষ্ঠে, কেহ একা করিয়া, কেহ বয়েল গাড়ীতে, কেহ পালকী করিয়া, আসিয়া উপস্থিত হইল। তদ্ভিন্ন বালিকারা ক্রোড়ে উঠিয়া, বালকেরা স্কন্ধে চড়িয়া, অবশিষ্ট অসংখ্য দর্শকবৃন্দ পদব্রজে আগমন করিয়া, সেই বিস্তৃত শোন-গঙ্গাসঙ্গমের দোয়াব ক্ষেত্র পরিপূর্ণ করিয়া ফেলিল। ভাল করিয়া দেখিবার জন্য অসংখ্য ইতরসাধারণলোক, নিকটবর্ত্তী সুবৃহৎ মহুয়া বৃক্ষে আরোহণ করিয়া বসিল। অদূরে প্রকাণ্ড চন্দনকাষ্ঠরচিত চিতাস্তূপ স্তরে স্তরে সজ্জিত হইয়া, ধূপ, ধূনা, শালশর্জ্জরস, গুগ্‌গুল, হোমাদ প্রভৃতি সুগন্ধি দাহ্যমান পদার্থে পরিপূর্ণ হইয়া, দর্শকবৃন্দের হৃদয়ে, মহাভীতি উৎপাদন করিতে লাগিল। অবাধে বায়ু চলাচলের জন্য চিতার নিম্ন ভাগটা কাষ্ঠনির্ম্মিত সেতুর মত শূন্য রাখা হইল।

ক্রমশঃ লোকারণ্য, হাতী ঘোড়া, দেশীয় বিদেশীয় প্রভৃতির জনতা

এতদূর বৃদ্ধি পাইল যে, সেই সুবিস্তীর্ণ প্রান্তরের যে দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করা যায়, কেবল কৃষ্ণবর্ণ মস্তক ও বিবিধ বর্ণের পাগড়ী, টুপি, মুরেঠার অনন্ত সমুদ্র। জনসঙ্ঘের কলরব, অশ্বগণের হ্রেসাধ্বনি, গজযুথের বৃংহতি, সেই বিস্তৃত গঙ্গাবক্ষকে পরিপূরিত করিয়া, আকাশমার্গে উড্ডীয়মান হইতে লাগিল।

সহসা সেই লোকারণ্য ভেদ করিয়া, 'সতীরমণী' আত্মীয়স্বজন ও পাঁড়েজী (পুরোহিত) প্রভৃতি পরিবৃতা হইয়া, তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন,—সঙ্গে স্বামীর মৃতদেহ। সতীর পরিধানে বহুমূল্য বস্ত্র ও বেশভূষা। বিচিত্র মূল্যবান খট্টার উপর শায়িত শবদেহ, আত্মীয়স্বজন কুটুম্বগণের স্কন্ধোপরি স্থাপিত। সেই শববাহী আগন্তুকগণ ও সতীর সহগামী পরিজনবর্গ, সেই বহুজনাকীর্ণ প্রান্তর ও সেই সুসজ্জিত প্রকাণ্ড চিতা দৃষ্টে মনের আবেগে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল,—"বোলো, রাম নাম সত্য হ্যায়!" তখন শত-সহস্র নরনারীকণ্ঠ, এককালীন একসঙ্গে সেই ধ্বনির প্রতিধ্বনি করিয়া শোন-নদ, গঙ্গা-নদী, আকাশ, প্রান্তর ও বহুজনাকীর্ণ শ্মশানভূমি আকুলিত করিয়া তুলিল।

তখন দর্শকবৃন্দ সতীর মস্তকে ও শবদেহের উপর পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিল। কেহ কুসুমমালা, কেহ পুষ্পস্তবক, কেহ ফুলের গোড়ে নিক্ষেপ করিতে লাগিল।

কলাবতীর পিতামহীর বয়ঃক্রম তখন ৫।৭ বৎসর মাত্র। তিনি জননীর ক্রোড়ে চড়িয়া আসিয়াছিলেন। সেই বিশাল জনসমুদ্র ও সুবৃহৎ চিতাস্তূপ প্রভৃতির কথা সামান্য ক্ষীণ আলোকরেখার ন্যায় তাঁহার অতি অল্পমাত্র মনে ছিল। তিনি ভয়ে, সন্ত্রস্ত মানসে জননীর বক্ষে মুখ লুকাইয়াছিলেন।

সতীর বয়স তখনও চল্লিশ অতিক্রম করে নাই। তিনি গ্রামের

মধ্যে অসাধারণ সুন্দরী ও স্থির-যৌবনা বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। তাঁহার অপরিমিত সৌন্দর্য্য, এবং বহুমূল্য রত্নালঙ্কারভূষিত দেহ-কান্তি দেখিয়া সকলেই তাঁহাকে পূর্ণবয়স্কা যুবতী বলিয়া অনুমান করিতে লাগিল। স্ত্রীলোকেরা, তাঁহার অঞ্চলের অগ্রভাগ স্পর্শ করিবার জন্য নিকটে আসিতে লাগিল। বিহারের সাধারণ লোকের বিশ্বাস এই যে, সেই পুণ্যবতী সতীর বস্ত্রাগ্র স্পর্শ করিলে, তাহাদের পূর্ব্বকৃত পাপ ক্ষয় হইবে, এবং ডাকিনী, যোগিনী, ডাইনী, ভূত, প্রেত প্রভৃতির কু-নজর হইতে তাহাদের সন্তান-সন্ততিগণের কখন কোনরূপ অমঙ্গল সাধিত হইতে পারিবে না। তিনি সকলকেই বিনা আপত্তিতে তাঁহার ওড়নার অগ্রভাগ স্পর্শ করিতে অনুমতি দিলেন।

সেই বিশাল অনন্তজনসমুদ্রের অনবরত গভীর কল্লোল, সেই প্রত্যক্ষ কালের করালকবলতুল্য প্রকাণ্ড চিতারাশি, যাহা মুহূর্ত্তমধ্যে তাঁহাকে তাঁহার মৃতপতির সহিত ভস্মসাৎ করিবার জন্য মুখব্যাদন করিয়া রহিয়াছে, তাঁহার পুত্র কন্যা ও স্বজনগণের অবিরল অশ্রুধারা, দর্শকবৃন্দের আবেগপূর্ণ ভীষণ চীৎকার প্রভৃতি দেখিয়া শুনিয়া সেই সতীর কোমল হৃদয় কিছুমাত্র হেলিল না, দুলিল না, টলিল না।

সেই বিধবার এবম্বিধ নির্ভীকতা দেখিয়া, উপস্থিত ইউরোপীয় দর্শকবৃন্দ সন্দেহ করিলেন যে, ঐ স্ত্রীলোককে অহিফেন বা অন্য কোন মাদকদ্রব্য সেবন করাইয়া, উহার চৈতন্য হরণ করা হইয়া থাকিবে। দানাপুর-ছাউনীর উর্দ্ধতম কর্ম্মচারী কার্ণেল সাহেব, খগোলের গির্জ্জার পাদরী সাহেব, বাঁকিপুরের প্রধান পুলিশ কর্ম্মচারী কাপ্তেন সাহেব,* সিভিল সার্জ্জন, এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন প্রভৃতি গণ্যমান্য ইউরোপীয় ও দেশীয় সরকারী কর্ম্মচারীগণ তখন অগ্রসর হইয়া, সেই বিধবাকে ঘেরিয়া

---

* বিহার ও উত্তর পশ্চিম প্রদেশে পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে কাপ্তেন সাহেব বলিয়া থাকে।

দাড়াইল; এবং ব্রাহ্মণ-পুরোহিত ও বিধবার আত্মীয়গণদ্বারা মাদক সেবনে, বিধবাকে অর্দ্ধাপহৃতচেতন করা হইয়াছে কি না, তাহা জানিবার জন্য দুইজন বহুদর্শী সরকারী ডাক্তারদ্বারা তাঁহাকে পরীক্ষা করান হইল। তাঁহারা উভয়েই একমত হইয়া স্বীকার করিলেন যে, যাহাতে মাদকতা বা অচৈতন্য আনয়ন করে, এরূপ কোন পদার্থের কার্য্য,—তাঁহার দেহমধ্যে লক্ষিত হইতেছে না।

পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট কাপ্তেন সাহেব তখন ভাবিলেন, যে বিধবার অনিচ্ছায় তাহার আত্মীয়স্বজন ও ব্রাহ্মণগণ জোর করিয়া তাহাকে আত্মহত্যা করিতে বাধ্য করিতেছে। তখন তিনি বলিলেন:—

দেখো, আওরং, তুম আপনা খসমকে সাৎ জান্ দেনেকো নেহায়েৎ মোস্তায়েদ হো। ক্যা তুম ইস্ কাম আপনা খুসীসে করতী হো, ইয়, তুম্‌কো ব্রামিন্ লোক, আউর তোম্‌হারা খান্‌দান্ জুলুম্ জবরদস্তিসে করওয়াতা হ্যায়? তুম্ বেশক জানো, কি আগর্ চে তুম্ ইস্ কাম করনেমে জেরাসাভী ইন্‌কার করোগী, তো হাম সরকার কোম্পানি ইংরাজ বাহাদুরকে তরফসে তোমারা জান আউর মাল জাল দাউলৎ বাঁচানেমে জামিন হোতেহেঁ। আউর যো লোক তুমকো ফুসল্যাতা হ্যায়, উন্‌সবকো জেলখানাকা দরওয়াজা দেখলানেমে একরার করতেহেঁ।”

রমণীর উত্তর স্থির, ধীর এবং হিন্দুসতীরমণীজনোচিত। তিনি অচল অটল ভাবে কহিলেন, “আমি স্বেচ্ছায় স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া, স্বামীর জ্বলন্ত চিতায় আরোহণ করিয়া, তাঁহার সহগামিনী হইতেছি। কেহ আমাকে মরিতে বলে নাই—বরং আত্মীয়-স্বজন আমাকে বারংবার নিষেধ করিয়াছিল! স্বামীধনে বঞ্চিতা যে নারী, নারীজন্ম তাহার মিথ্যা—আপনি আমার মৃতপতিকে পুনর্জীবিত করিয়া দিউন—আমি বাঁচিতে ইচ্ছুক আছি।”

তৎশ্রবণে একজন ইংরাজ পাদরীমহিলা অগ্রসর হইয়া 'সতী'কে নানারূপ প্রবোধ বাক্যে বুঝাইতে লাগিলেন। বলিলেন, "ভদ্রে! কেন কুসংস্কারপরবশ হইয়া দুর্লভ জীবন-রত্ন বলিদান দিতেছ?

সতীরমণী, "রাম কহো! রাম কহো!" বলিয়া কর্ণযুগল হস্ত দ্বারা আচ্ছাদিত করিলেন। যেরূপ দার্ঢ্যের সহিত তিনি তাঁহার অপরিবর্ত্তনীয় সংকল্প প্রকাশ করিলেন, তাহাতে সেই ইংরাজমহিলার বীরহৃদয় চকিত ও স্তম্ভিত হইয়া গেল। তিনি বজ্রাহতার ন্যায় নির্ব্বাক নিস্পন্দ হইয়া রহিলেন।

—তিনি দেখিলেন, তাহার পিতা-মাতা, পুত্র-কন্যা, আত্মীয়-স্বজন ও পরিজনবর্গের সামান্য পার্থিব স্নেহবন্ধন ছিন্ন করাত দূরের কথা, জলন্ত চিতায় প্রাণবিসর্জ্জন করিতে, রক্তমাংস জড়িত দেহে যে অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে, তাহাতে পর্য্যন্ত হিন্দুসতীর কিছু-মাত্র ভ্রুক্ষেপ নাই। তাহার আশ্চর্য্য ধর্ম্ম, অটল স্বামী-অনুরাগ অচল ধর্ম্মবিশ্বাস, অমানুষী হিন্দুদেশাচার, দাম্পত্য প্রেমের পরাকাষ্ঠা উপলব্ধি করিয়া শারীরিক যন্ত্রণার স্বাভাবিক অনুভূতিকে বহুদূরে নিক্ষেপ করিয়াছে।

এইসব ব্যাপার হইয়া গেলে, পুরোহিত ও ব্রাহ্মণসমভিব্যাহারে সেই সতীরমণী সজ্জিত চিতার চতুর্দ্দিকে সাতবার প্রদক্ষিণ করিলেন এবং তৎসঙ্গে চাউল ও কড়ি ছড়াইতে লাগিলেন। তাঁহার হস্তস্থিত জলপাত্র হইতে দর্শকবৃন্দের গাত্রে জলবিন্দু নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। এদেশের সাধারণ লোকের এই বিশ্বাস যে, সতীদাহের অব্যবহিত পূর্ব্বে সতীরমণীর হস্তপ্রক্ষিপ্ত শান্তিবারিবিন্দুস্পর্শে পূর্ব্বকৃত পাপক্ষয় ও কঠিন দুরারোগ্য ব্যাধিসমূহের শান্তি বিধান হইয়া থাকে!

তারপর তিনি তাঁহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ হইতে অলঙ্কার সমূহ উন্মোচন করিয়া একে একে আত্মীয়স্বজনকে বিতরণ করিতে লাগিলেন, এবং

মৃদুহাস্যের সহিত, তাহার জন্য শোক বা দুঃখ করিতে নিষেধ করিতে লাগিলেন। তখন পুরোহিত ব্রাহ্মণ, তাঁহার দক্ষিণ হস্তে মন্ত্রপূতঃ প্রজ্জ্বলিত দীপদণ্ড প্রদান করিলে, তিনি চিতাদ্বার দিয়া প্রবেশ করিয়া তন্মধ্যে উপবেশন করিলেন। তৎপরে বহুমূল্য বস্ত্রাবৃত তাঁহার পতির মৃতদেহ, চিতার চতুর্দ্দিকে সাতবার প্রদক্ষিণ করাইয়া, পরিশেষে তাঁহার ক্রোড়ে সংস্থাপিত হইল। তখন, ঘোর তমিস্রাময়ী চতুর্দ্দশী যামিনীতে সাবিত্রী সতী যেরূপ গভীর অরণ্যানীমধ্যে, সত্যবানের মৃতদেহ ক্রোড়ে করিয়া বসিয়াছিলেন, তদ্রূপ দৃশ্য সেই গভীর লোকারণ্যমধ্যে, সজ্জিত চিতাভ্যন্তরে দৃষ্টিগোচর হইল। শুষ্ক তৃণ ও কণ্টক দিয়া চিতার দ্বার বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল।

তদ্দর্শনে, পূর্ব্বকথিত ইংরাজ পুরুষ ও মহিলাগণ আপত্তি করিয়া কহিলেন যে, চিতায় অগ্নিপ্রদত্ত হইলে, সেই অশিক্ষিতা হিন্দুবিধবা ভয়ঙ্কর শারীরিক কষ্ট অনুভব করিয়া, তাঁহাদের স্বেচ্ছাপ্রদত্ত আশ্রয় গ্রহণ করিতে, শেষ মুহূর্ত্তেও সেই অগ্নিময় কারাগার ত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিতে পারে, সুতরাং জোর করিয়া যেন চিতাদ্বারা বন্ধ করিয়া না দেওয়া হয়। তৎক্ষণাৎ তাহাদের আজ্ঞা কার্য্যে পরিণত করা হইল। পরীক্ষাদ্বারা সিদ্ধান্ত হইল যে, কোন শিশুর সামান্য শক্তিহীন হস্তও সেই ক্ষণভঙ্গুর আবরণকে অনায়াসে উদ্‌ঘাটিত করিতে পারে। সেই সতীর অসাধারণ স্থিরতা শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত অচল অটলভাবে সংরক্ষিত হইয়াছিল। তখন সেই বিশাল শোন-গঙ্গা সঙ্গমের বিস্তৃত শ্মশান-ক্ষেত্রে সমাগত শত সহস্র নরনারী একবারে নির্ব্বাক নিস্পন্দ—যেন কাহারও নিশ্বাসটী পর্য্যন্ত পড়িতেছে না। এদিকে, একটি সামান্য দীর্ঘনিশ্বাস পর্য্যন্ত সেই সতীর সুউচ্চ চিতামঞ্চ হইতে শ্রুতিগোচর হইল না। পরিশেষে একটী কুণ্ডলীকৃত ধূমরেখা, সেই চিতাগ্র হইতে পরিদৃশ্যমান হইল। সঙ্গে সঙ্গে একটী সুদীর্ঘ অগ্নিশিখা লোলজিহ্বা

বিস্তার করিয়া, স্বচ্ছ সুনির্ম্মল নীলাকাশে বিদ্যুৎগতিতে উড্ডীয়মান হইল। সেই অলৌকিক দৃশ্য দর্শনে সমাগত লোকারণ্য হইতে শত-সহস্র নরনারীকণ্ঠে চীৎকার শব্দ উঠিল, "বোলো রাজা রামচন্দ্র কি জয়! জয়, জয়, সতী মারী কি জয়!! জয়, জয়, জয়, নরসিংজী কি জয়!!!" সঙ্গে সঙ্গে ঘোররোলে বাদ্য বাজিয়া উঠিল

ইংরাজ দর্শকবৃন্দ চক্ষে রুমাল দিয়া সতীদাহ প্রথার উপর অভি-সম্পাত প্রদান করিতে করিতে হস্তী ও ঘোটকারোহণে নিমেষ মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল।

শ্রীরাজেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

আমাদের ঐতিহাসিক ভাণ্ডার।

রাজসাহীর ভূতপূর্ব্ব ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর মিঃ জে, এস্, কারষ্টেয়ার্স (J. S. Carstairs) মহোদয় ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে ৮৬ নম্বর পত্রযোগে বিভাগীয় কমিশনারের নিকট বাঘার জোম্মা-মস্‌জিদ এবং কুসম্বির-মসজিদের বিবরণ সম্বলিত এক রিপোর্ট প্রেরণ করেন। কারষ্টে-য়ার্স মহোদয় মস্‌জিদ দুইটীর প্রতিকৃতিও প্রস্তুত করাইয়াছিলেন, কিন্তু তাহা এখন স্থানে স্থানে অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে। উক্ত মস্‌জিদ দুইটীর বর্ত্তমান অবস্থাও অতি শোচনীয়। রাজসাহীর ম্যাজিষ্ট্রেটের সেরেস্তাদার মস্‌জিদের প্রতিকৃতি দুইখানি ও রিপোর্টটি অতি সযত্নে মহাফেজখানায় রক্ষা

রাজসাহীর বাঘা-মস্‌জিদ।

করিয়া আসিতেছেন। সেরেস্তাদার মহাশয় নিজেও মোসলমান, কাজেই স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া স্বজাতীয়ের কীর্ত্তিরক্ষায় মনোযোগী হইয়াছেন। ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মৌলবী আবদুল আলী রাজসাহীতে কোনো কার্য্যোপলক্ষে আগমন করিয়াছিলেন, তিনি সেরেস্তাদার মহাশয়ের অনুগ্রহে মহাফেজখানা হইতে ঐ রিপোর্ট ও প্রতিকৃতির নকল করিয়া লইয়া যাইয়া কলিকাতার এসিয়াটিক সোসাইটীর পত্রিকায় প্রকাশ করেন। কিন্তু মস্‌জিদের প্রতিকৃতি দুইটী অতি জরাজীর্ণহেতু অস্পষ্ট হওয়ায় সোসাইটীর সম্পাদক তাহা মুদ্রিত না করিয়া কেবল রিপোর্টটুকু ১৯০৪ সালের দ্বিতীয় সংখ্যার পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছেন। উক্ত রিপোর্ট হইতে মস্‌জিদ সম্বন্ধে অনেক ঐতিহাসিক তত্ত্ব বাহির হইলেও তাহা ভিত্তিশূন্য। কিন্তু আলোচনায় প্রকৃত তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইতে পারে ভাবিয়া আমরা ম্যাজিষ্ট্রেটের রিপোর্টখানি অনূদিত করিলাম।

ম্যাজিষ্ট্রেটের রিপোর্ট এইরূপ:—* * * সর্ব্বপ্রথম বাঘার পুরাতন মস্‌জিদ উল্লেখ যোগ্য। শুনা যায়, ইহা নাকি হিজরী ৯৩৮ সালে নির্ম্মিত হইয়াছে। মস্‌জিদের ছাদের উপর দশটী চূড়া (domes) আছে, তাহা বাহির হইতে পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। মস্‌জিদের অভ্যন্তরে, ঠিক মধ্যস্থলে চারিটী প্রস্তরের থাম আছে তদুপরি খিলান দ্বারা সমগ্র মসজিদের ছাদটী রক্ষিত।

এতৎসংলগ্ন প্রতিকৃতি হইতে খিলান ও থামের স্বরূপ অবগত হওয়া যাইবে।* পশ্চিমের দেওয়ালে মৌলানাগণের উপাসনার নিমিত্ত তিনটী সুচিত্রিত বেদী আছে। মধ্যটি কেবল ইমামের জন্য। মসজিদ ৫৪ ফিট দীর্ঘ, ৪৫ ফিট প্রস্থ; ইষ্টক নির্ম্মিত দেওয়াল ৭ ফিট পুরু

* এই প্রতিকৃতি বিনষ্টপ্রায়, আমার নিকট গত ভূমিকম্পের পূর্ব্বের একটী ফটো আছে, তাহা সময়ান্তরে প্রদর্শন করিবার ইচ্ছা থাকিল।—লেখক।

(thick)। দূর হইতে উহা যেন লোহিত ইষ্টকের বর্ত্তুলাকার গোলা বলিয়া মনে হয়। * * * মসজিদের মধ্য-দ্বারের উপর একটী লিপি খোদিত আছে, তাহার অর্থ এই :—

মহাপুরুষ বলিয়াছেন যে —যে ব্যক্তি পৃথিবীতে পরমেশ্বরের নিমিত্ত একটী স্থান প্রস্তুত করে, সে তাহার পুরস্কারস্বরূপ স্বর্গে ভগবানের নির্ম্মিত স্থান পায়। এই জোম্বা মস্‌জিদের প্রতিষ্ঠাতা একজন প্রতাপান্বিত ও সদাশয় সম্রাট, তিনি আবার এক সম্রাটেরও পুত্র। তিনি সাংসারিক ও পারলৌকিক যাবতীয় কার্য্যে জয়ী হইয়াছিলেন। তাঁহার নাম—আবুল মোজ্জাফর নুজারাৎ শাহ (আবু-ল—মোজ্জাফর নুজারৎ শাহ)।—ভগবান যেন তাঁহার মস্তকে আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করেন। ভগবান যেন তাঁহাকে এবং তাঁহার দেশ ও সাম্রাজ্য চিরকাল নিরাপদে রাখেন। ৯৩০ হিজরী।

বাঘাসম্বন্ধে নিম্নলিখিত জনপ্রবাদ শ্রুতিগোচর হয় :—গৌড়ের এক সম্রাট ঢাকা যাইবার কালে বাঘায় শিবির স্থাপন করেন। পরে একটু আগুণের প্রয়োজন হওয়ায় সম্রাটের ভৃত্যগণ লোকালয়ের অনুসন্ধানে বহির্গত হয়। ধূমরাশি আকাশপথে বিচরণ করিতেছে দেখিয়া তাহারা তদনুসারে অগ্রসর হইয়া এক জঙ্গলের নিকট উপনীত হয়, তথায় তাহারা দেখে যে, একজন ফকীর অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া তৎপার্শ্বে উপবিষ্ট হইয়া প্রশান্তচিত্তে ভগবানের উপাসনা করিতেছেন। ফকীরের চারিপার্শ্বে ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্র জন্তুসমূহ তর্জ্জন গর্জ্জন করিতেছে। সম্রাটের অনুচরগণ তথা হইতে অগ্নি লইয়া শিবিরে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া সম্রাটসকাশে ফকীরের কথা নিবেদন করিল। সম্রাট আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া ফকীরকে দর্শন করিতে আসিয়া দেখিলেন অনুচরগণের কথা সত্য। তৎপরে সম্রাট ফকীরের ধ্যানভঙ্গের আশায় অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। ফকীরের নাম—সাহ মহাম্মদ দুল্লা

(শা মহাম্মদ-দৌল্লা)। সম্রাট বিনীতভাবে ফকীরকে বলিতে লাগিলেন,—"হে মানবেশ্বর! আপনার দাসগণ ঢাকায় যাইবে কি এই স্থানেই অবস্থান করিবে?" ফকীর উত্তর করিলেন,—'তুমি এখানে একদিন অপেক্ষা কর।' তদনুসারে সম্রাট একদিন তথায় অতিবাহিত করিলেন। সেই দিবসেই সন্ধ্যার সময় ঢাকা হইতে সম্রাটের নিকট সংবাদ আসিল,—'যুদ্ধ শেষ হইয়াছে, আপনারই জয় হইয়াছে। সম্রাট অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া ভৃত্যগণকে বলিলেন,—'দেখ, এখানে একজন মহাপুরুষ আছেন।' তৎপর তিনি ফকীরের নিকট যাইয়া প্রচুর পরিমাণ ভূমি লাখেরাজস্বরূপ দান করিবার প্রস্তাব করিলেন; কিন্তু ফকীর কিছুতেই গ্রহণ করিতে সম্মত না হইয়া বলিলেন,—'জাঁহাপনা! আপনার দাস ওসকল কথা আর শুনিবে না। যে ব্যক্তি সংসারের সহিত একবার সম্পর্কশূন্য হইয়াছে, সেকি পুনরায় সে মায়াতে আবদ্ধ হইতে চায়? আপনার এ অনুগ্রহ আপনার দাসের পুত্রের উপর প্রদর্শিত হউক।' তাঁহার পুত্রের নাম—হজরত মৌলানা দানেশ মাণ্ডছিল। সম্রাট তাহাকেই ২২০ খানি মৌজা নিষ্কররূপে দান করিলেন। মৌলানা দানেশ মাণ্ডের পুত্র আবদুল ওহেব। কেহ কেহ বলেন, ইহাঁকেই ১০৩৩ হিজরীতে দিল্লীর সম্রাট শাজাহান, রাজসাহী জেলা দিয়া যাইবার কালে তাঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের জন্য মস্‌জিদের পার্শ্বস্থিত জমি লাখেরাজ দান করেন। শুনা যায়, জমি দানের সম্বন্ধে অন্য কোনো সর্ত্ত নাই, কেবল লিখিত আছে যে, লাখেরাজের আয় হইতে তাঁহার ও তাঁহার বংশধরগণের ভরণপোষণ নির্ব্বাহ হইবে। তাঁহার বংশধরগণ লাখেরাজ বাজেয়াপ্তির ভয়ে নাকি সনন্দের সর্ত্ত পরিবর্ত্তন করিয়া নূতন সর্ত্ত করেন যে, উহার অর্দ্ধেক ধর্ম্ম-কর্ম্মে ব্যয়িত হইবে এবং ঐ সম্পত্তি কেবল ঐ পরিবারের ধার্ম্মিক ও বিদ্বান ব্যক্তি কর্ত্তৃক অধিকৃত থাকিবে। আবদুল ওহেবের পুত্র

মহাম্মদ রফিক প্রথম রইস (বাঘার মাতোয়াল্লীকে রইস বলে) বা মস্‌জিদের সেবাইত হন।

মস্‌জিদের উত্তর প্রান্তে তিনটি সমাধি বিদ্যমান আছে। মস্‌জিদের নির্ম্মাণ-ভার যে দারোগাদিগের উপর অর্পিত হইয়াছিল, উহা নাকি তাহাদেরই সমাধিমন্দির। উহারই সন্নিকটে বাঘাপরিবারের মৃতব্যক্তির সমাধি-ক্ষেত্র। ঐ সকল সমাধিমন্দিরে স্থপতি-কার্য্য-কুশলতার কিছুমাত্র নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায় না।

কারষ্টেয়ার্স সাহেবের রিপোর্টে বাঘা সম্বন্ধে এই পর্য্যন্ত লিখিত হইয়াছে। রাজসাহী জেলার লস্করপুর পরগণায় বাঘার জোম্মা মস্‌জিদ এবং ঐ বৃহৎ পুষ্করিণী অবস্থিত। এই পরগণা বহুপূর্ব্বে পুঠিয়ার ঠাকুর এবং নাটোর ও দিঘাপতিয়ার রাজাদিগের জমিদারীর অন্তর্গত ছিল। আইন-ই-আকবরীতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, উহা সরকার বারবকাবাদের (Barbakabād) শাসনাধীন ছিল। বিলমাড়িয়া (বর্ত্তমান লালপুর) ষ্টেশনের অধীন বাঘা অবস্থিত। নাটোর মহকুমার মোতালক এবং রামপুর বোয়ালিয়ার দক্ষিণ-পূর্ব্বকোণে রাজসাহী জেলার বিলমাড়িয়া ও নাটোর থানার অধীন মুসলমান আমলের বহুতর নিস্কর ও আয়মা আছে। এই সকল আয়মা ও নিস্কর ভূমি মুসলমান নরপতিগণ কর্ত্তৃক স্বজাতীয়ের প্রতিপালন ও স্বধর্ম্মরক্ষার নিমিত্ত প্রদত্ত হইয়াছিল। কালক্রমে প্রথম গৃহীতার বংশ বৃদ্ধি হওয়ায় ঐ সকল ভূমি বহু খণ্ডে বিভক্ত হইয়া পড়ে এবং সর্ব্বশেষে নানারূপ ঋণজালে জড়িত হওয়ায় ঐ সকল ভূমিখণ্ডের অধিকাংশই হিন্দু ভূম্যাধিকারগণের হস্তগত হইয়াছে।

মস্‌জিদে সুন্দর অক্ষরে ২৪½ ইং লম্বা ও ৫½ ইঞ্চি প্রস্থ স্থানের মধ্যে তিন লাইনে একটী লিপি আছে। তাহার ভাবার্থ এই :—

ভগবানের শান্তিকণা ও আশীর্ব্বাদ-ধারা যে মহাপুরুষের উপর

বর্ষিত হইয়াছে, তিনি বলেন,—"যে ব্যক্তি পৃথিবীতে ভগবানের নিমিত্ত মস্‌জিদ্ নির্ম্মাণ করেন, তিনি তদনুরূপ ভগবানের দ্বারা স্বর্গ-রাজ্যে আবাসস্থান প্রাপ্ত হন। এই জোম্বা মস্‌জিদ এক মহাপ্রতাপান্বিত ও সদাশয় সোলতান কর্তৃক নির্ম্মিত হয়, ঐ সোলতান আর এক সোলতানের পুত্র ছিলেন। সোলতান হোসেন শাহ অল-হোসেনির পুত্র সোলতান নসিরুদ্দীন ওয়াজুদ্দিন আবুল মজ্জাফর নুশারৎশাহ। ভগবান তাঁহার রাজ্য ও শাসন জয়যুক্ত করুন। হিজরী ৯৩০ সাল।"

দিল্লার সম্রাট শিকান্দর লোদির সমসাময়িক সোলতান আলাদ্দীন হোসেন শাহ। তাঁহার পুত্র আবুল মোজ্জাফর নসিরুদ্দীন নুসারৎসাহ, ১৫১৮ হইতে ১৫৩২ খৃষ্টাব্দ (৯২৫—৯৩৯ হিজরী) পর্য্যন্ত রাজ্য শাসন করেন। মৌলবী আবদুল আলী লিখিয়াছেন যে, তাঁহার রাজত্বকালে ৯৩০ হিজরীতে (১৫২৩ খৃঃ অঃ) বাঘার মস্‌জিদ নির্ম্মিত ও পুষ্করিণী খনিত হয়। ইহা মস্‌জিদের উৎকীর্ণ লিপি হইতেও প্রমাণিত হইতেছে। বাঘার অনতিদূরে—মকদমপুর গ্রামে তৎকালে অলবক্স বরখারদার লস্করি বাস করিতেন, তাঁহার গৃহের ভগ্নাবশেষ অদ্যাপিও প্রাচীন-কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছে।

বাঘার খোন্দাকার পরিবার বিশেষ সম্মানশালী। লোকে বলিয়া থাকে শাহদৌল্লা, বোগদাদের আব্বাজী খলিফা হারুন-উল-রসিদের বংশাবতংশ। শাহদৌল্লা বোগদাদ হইতে চলিয়া আসিয়া লস্করপুরের জায়গীরদার অনবক্স বরকরদারের কন্যাকে বিবাহ করেন। তাঁহার পরিবারকে 'অর্দ্ধপরিবীর' বলে, যে হেতু তিনি বোগদাদ হইতে একাকী আসিয়াছিলেন। মুসলমানদিগের মধ্যে একটি প্রবাদ আছে যে,—'মনুষ্য স্ত্রীলাভ না করা পর্য্যন্ত অর্দ্ধ-মনুষ্য থাকে। বিবাহ হইলে পূর্ণ-মানব হয়।'

বাঘার সুবৃহৎ আয়মার আয় নানাজনে নানারূপ বলেন। মিঃ আদাম তাঁহার রিপোর্টে লিখিয়াছেন যে, রাজসাহীর কালেক্টরের মতে উহার আয় ত্রিশ হাজার টাকা। মৌলবী আবদুলআলীর মতে বাৎসরিক আঠার হাজারের উপর। এই সম্পত্তি সুচারুরূপে বন্দোবস্ত ও শাসিত হয় না।

১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের প্রবল ভূমিকম্পে জোম্মা মস্‌জিদের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। তিন দিকের দেওয়াল এখনো দাঁড়াইয়া আছে, কিন্তু সম্মুখের বা পূর্ব্বদিকের দেওয়াল এবং ছাদ পড়িয়া গিয়াছে। ১৮৯৭ সালের দুর্ভিক্ষের সময় সরকার হইতে দাতব্য-সূত্রে বাঘার বৃহৎ জলাশয়টীর পুনঃসংস্কার আরম্ভ হয় কিন্তু অল্পদিন কায চলিতেই বৃষ্টি পড়ায় কার্য্য বন্ধ হয় এবং তদবধি তাহাতে আর হস্তক্ষেপ করা হয় নাই। গভীর দুঃখের বিষয় এই যে, মস্‌জেদ রক্ষা ও অন্যান্য ধর্ম্ম-কার্য্যের নিমিত্ত আয়মা দান থাকিলেও মস্‌জিদটি এই ভগ্নাবস্থায় থাকিয়া কালের কঠোর নিয়মের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। রমজান-ইদের সময় বাঘায় একটি মেলা বসে, তথায় প্রচুর পরিমাণে আম্র পাওয়া যায়।

শ্রীব্রজসুন্দর সান্যাল।

খেয়াল খাতা ।

খেয়ালপঞ্চক।

(১)

খেয়ালে চাহে বালক হতে বুড়ার মত বড় ;
জ্যাঠার জামা চসমা জোড়া যদিও পড়-পড়।
তুলিয়ে লাঠি চলিতে ছুটি হুঁচট্ খেয়ে পড়ে,
তবু না-ছোড়! চলিছে, জোর এতই ছোট ধড়ে!

জেতার মত কেতাটি খাসা, কেতাবে হাঁক্ ডাক্।
ঢংটি যেন হংস সম, কে বলে কালো কাক ?
হাঁসেরা খালি হাসিয়ে খুন শুনিয়ে প্যাঁক্ প্যাঁক্ ;
ছুঁইলে টুঁটি ভুললে বুলি করেন ক্যাঁক্ ক্যাঁক্।

(২)

মাতাল কহে বোতল ছুঁড়ি শুঁড়কে দিয়ে গালি :—
"বিধাতা যদি সরিত-হ্রদ ভরিত মদ ঢালি,
"পুষ্ট ভুঁড়ি দুষ্ট শুঁড়ি, থাকিতনাত তোর,
"এসব ঠাট দোকান পাট উঠেত যেত চোর!"

খাইয়ে লাথি ফুলায়ে ছাতি কহেন বীর হেঁকে,
"স্বাধীন যদি করিত বিধি, নিতাম আজি দেখে!
"পরিয়ে জুতো উল্টা গুঁতো লাগালে যাব জেলে,
"নহিলে কিহে আমারে কেহ পারিত যেতে ঠেলে ?"

(৩)

শিকারী কহে ফুকারি,—সবে চমকে শুনি ডাক!
"বনের কাঁটা ফেলিলে কেটে এখনি মারি বাঘ।
"কর্ণ ধরি দন্ত করি করিতে পারি কিক্!"
দেখিয়া গোঁপ, কহিছে লোক, "শিকারী বটে, ঠিক্!"

গৃহিণী কাঁদে, নহিলে বেঁধে রাখিত ঘরে কেটা ?
অস্ত্র নাই আমার ভাই, আর এক ল্যাটা সেটা !
নহিলে কিরে পোষাক পোরে এমনি থাকি বোসে ?
দেখ্‌তে পেতে উঠ্‌ত মেতে যুদ্ধ বাঘে মেষে !

(৪)

খেয়ালে কহে শেয়াল "ওগো, কুকুর হল অরি ;
"নহিলে কিরে সিংহটারে কদাপি আমি ডরি ?
"তুলিয়ে ধূয়া—হোক্কা হুয়া, তাড়ায়ে দিতে পারি ;
চেনাও আছে বনের মাঝে গর্ত্ত সারি সারি।

পাতিয়ে সভা, করিতে "জবা" পারি ত আমি অরি ;
পুলিশগুলি, কুলীশ তুলি আসে যে, হরি হরি !
কণ্ঠ রবে ডঙ্কা মেরে সকলে যদি উঠি,
জাহাজ চড়ি, সিন্ধু তরি শত্রু যাবে ছুটি !

(৫)

কহেন কবি,—"এবারে ভবি ভুলিবে,—নাহি ভুল ;
"জ্যাপের জয়ে মোদের ভয়ে ভাগিবে অরিকুল।
"শিষ্য যদি নস্ত করি করিল রুষ লোপ,
"গুরুরা তবে উড়িয়ে দেবে বাষ্পে ইউরোপ।"

যুদ্ধ বিনা, শুদ্ধ কিনা—মোদের যশ-গন্ধে
ভাগিল ভূত। আর্য্যসুত, ঘুমাও মহানন্দে।
সাঙ্গ হল ইঙ্গলীলা, বঙ্গ হল উচ্চ ;
ধুলাটা ঝেড়ে শয্যা পেড়ে আরামে নাড় পুচ্ছ !

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

চুট্‌কী-সাহিত্য।

সকল দেশের সাহিত্যেই চুট্‌কীর আদর আছে, বিশেষতঃ ফরাসী ভাষায় এই প্রকারের সাহিত্য অতুলনীয়। Rochefoucauld, La Bruyere প্রভৃতি রসিক লেখকগণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গদ্য চুট্‌কী (Maxims) ফরাসী ভাষার অলঙ্কার। দেখা-দেখি ইংরাজী ভাষায়ও এই ধরণের সাহিত্যসৃষ্টির প্রয়াস হইয়াছে। বেকনের মত মহাজ্ঞানীও এই প্রণালীতে কতকগুলি apopthegms লিখিতে কুণ্ঠিত হয়েন নাই। তবে সেগুলিতে ফরাসী-সাহিত্যোচিত সরসতা নাই। "সুইফট"এর রসাল লেখনীও এই ধরণের চুট্‌কীর সৃষ্টি করিতে অগ্রসর হইয়াছিল। সেগুলি, বেকনের রচনা অপেক্ষা সুপাঠ্য হইলেও ফরাসী-ভাষার চুট্‌কীর ন্যায় মোলায়েম হয় নাই। ফরাসী ভাষার ল্যাটিন ভাষার সহিত নৈকট্য সম্বন্ধ থাকার দরুণই হউক, অথবা অন্য কোনও অনির্দ্দেশ্য কারণবশতঃই হউক, ফরাসী সাহিত্যে যেরূপ সরসতা ও কোমলতা দেখা যায়, ইংরাজী সাহিত্যে সেরূপ নাই। ইংরাজী গদ্য কিছু কঠোর, কিছু একঘেয়ে, ইহাতে ফরাসী সাহিত্যের বিচিত্র ভঙ্গী নাই। বোধ হয়, এই জন্যই ফরাসী ভাষায় চুট্‌কী সাহিত্যের এতটা খোল্‌তাই হয়। আমার বিশ্বাস, বাঙ্গালা ভাষার সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে নৈকট্য সম্বন্ধ থাকার দরুণই হউক, অথবা অন্য কোনও অনির্দ্দিষ্ট কারণবশতঃই হউক, বাঙ্গলা ভাষারও ফরাসী ভাষার ন্যায় কোমলতা, সরসতা ও ভাষালালার বিচিত্র ভঙ্গী যথেষ্ট পরিমাণে আছে। আশা হয়, প্রতিভাশালী লেখকের হাতে পড়িলে এ ধরণের সাহিত্য খুলিবে ভাল। অতি অল্প কথায় নরচরিত্রের বা মনুষ্যজীবনের কোনও একটা জটিল তত্ত্ব সরল ভাষায় প্রকাশ করাই এই প্রকারের সাহিত্যের বিশেষত্ব; একটু রসিকতা থাকিবে, কিন্তু তাহা হাল্কা হইবে না,

ভাবটি গভীর হইবে অথচ তাহাতে বিকট গাম্ভীর্য্য থাকিবে না, চাইকি একটু বিদ্রূপের কটাক্ষ থাকিবে অথবা করুণার অন্তঃসলিল প্রবাহ ধীরে বহিয়া যাইবে। এইরূপে উজ্জ্বলে মধুরে মিশিলেই এই প্রকারের সাহিত্য সার্থক হয়। আমাদের কেমন প্রকৃতি আমরা লিখিতে গেলেই লম্বা চওড়া গুরু গম্ভীর প্রবন্ধ, ঐতিহাসিক, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, সাহিত্যিক গবেষণা আসিয়া পড়ে, অথবা কবিতার আবেগের উচ্ছ্বাস দশ যোজন ধরিয়া উদ্গীর্ণ হইয়া পড়ে। চুটকী লেখাটা আমাদের মাথায় আসে না, আমরা skull-capএর আদর বুঝিনা; মস্তকের শোভাসমৃদ্ধি দেখাইতে ৪০ গজ থান দিয়া পাগড়ী বানাই, সমস্ত ইন্দ্রিয়দ্বার বন্ধ করিয়া বিরাট্ বুদ্ধিমান্ 'হবচন্দ্র রায়ের গবচন্দ্র মন্ত্রী, সাজিয়া বসি। চুটকী লিখিতে কেমন মায়া করে, এত বড় প্রতিভাটা তুচ্ছত্রে মাটী করিব। আমরা ভুলিয়া যাই যে, মাধ্যাকর্ষণ শক্তির বলে শূন্যে ভ্রাম্যমাণ সৌরজগৎ সৃষ্টি করিতে বিধাতা যে কৌশলের পরিচয় দিয়াছেন, সুন্দরীর নাসিকার দোদুল্যমান ক্ষুদ্র মুক্তাটির নির্ম্মাণে তাহা অপেক্ষা কম কৌশলের পরিচয় দেন নাই।

শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

শিলাইদহের পদ্মা।

(অপরাহ্ণ)

আবার বৈকালে, ও-পারের চরায় এসে বোট্ লাগালেম। বালীর চরা ধূধূ কর্‌চে। চমৎকার দৃশ্য! ঢেউয়ের রেখার দাগ কে যেন এঁকে রেখেছে;—পাখির ডানায় পালোকগুলি যেমন থাকে-থাকে সাজানো থাকে, এ ঠিক্ সেই রকম। আমি যখন চরায় নাম্‌লেম, তখন সূর্য্য অস্তোন্মুখ;—একটি গোল সোনার থালের মত। আর সে তেজ নেই, সে ঝাঁজ নেই; দেখ্‌তে দেখ্‌তে, ক্রমেই ক্ষীণ হয়ে টুপ্ করে' দিগন্তে ডুবে গেল। সমস্ত আকাশ নীলবর্ণ; কেবল পশ্চিম দিগন্তে, দিনমণি একটু রক্তিম আভা রেখে গেছেন। আমার মাথার উপর গাং-চীলের ঝাঁক্ চক্রাকারে ঘুরে বেড়াচ্চে; আর, "টিউ-টিউ" করে' মহা কলরব কর্‌চে। মনে হয় যেন, উহারাই সৃষ্টির একমাত্র জীব। উহাদের কলরবের মধ্যে, বিজনতার নিস্তব্ধতা আরো যেন বেশি অনুভব করতে লাগ্‌লেম। মাথার উপর দশমীর চাঁদ। দিগন্তে পদ্মা রেখাবৎ দেখা যাচ্চে। এরূপ সুদৃশ্য অনেক দিন উপভোগ করিনি।

(রাত্রি)

কাল্-রাত্রে আবার চরে নেবে বেড়াতে লাগ্‌লেম। একাদশীর চাঁদ, আকাশে বেশ জ্যোৎস্না হয়েছে। গোটা-কতক তারা ছোটো-বড়—আকাশের এদিকে ওদিকে ছিটোনো; নীচে সাদা বালি ধূ ধূ কর্‌চে;—জ্যোৎস্নার আলোয় আরো উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে;—কে যেন ধপ্‌ধপে বিছানা বিছিয়ে রেখেছে। ইচ্ছা হয় এইখানে গড়াগড়ি দি,—শিশুর মত অসঙ্কোচে গড়াগড়ি দি। এইরূপ দৃশ্যের মধ্যেই প্রকৃতির মাতৃভাব উপলব্ধি হয়—প্রকৃতিকে মা বল্‌তে ইচ্ছা করে। আবার সেই গাং-চীলের কলরব;—আর একদিক্ থেকে, মধ্যে মধ্যে মাঝিদের

গ্রাম্য তান শোনা যাচ্চে। বালির উপর ঢেউয়ের রেখা সারি সারি আঁকা;—সমস্তই লহরী-লীলার চিহ্ন। সেই সব তরঙ্গ এখন কোথায়? শুধু তাদের কতকগুলি পদচিহ্ন রয়ে গেছে। সে চিহ্নও আর বেশিক্ষণ থাকবে না। মানব-জীবনেরও খেলা এইরূপ! এই শুভ্র বালু-চরের চারিদিকে পদ্মা-নদীর দূরবর্ত্তী জলরেখা, নীল পাড়ের মত দেখা যাচ্চে;—দূর দিগন্তে, গ্রামের হরিৎ-শ্যামল তরুরাজি ঝালরের মত শোভা পাচ্চে।

(প্রাতঃকাল)

আজ প্রকৃতির কি চমৎকার শোভা! মেঘ, এখনও অনেকটা আকাশ ছেয়ে আছে। সূর্য্যের প্রকাশ নাই—শুধু তার আভা, মেঘ ভেদ করে' এক এক-স্থানে ফুটে বেরিয়েছে। কোথাও মেঘ-মালা নানাবর্ণে রঞ্জিত। ইন্দ্রধনুর কিয়দংশ প্রকাশ হয়েছে—অবশিষ্ট অংশ কালোমেঘের মধ্যে বিলীন। ইন্দ্রধনুর ছায়া পদ্মা-নদীর স্বচ্ছ দর্পণে প্রতিবিম্বিত। নদী নিস্তরঙ্গ প্রশান্ত; যেখানে দিগন্তে মিশেছে, সেখানকার অস্ফুট তট-রেখা মেঘোন্মুক্ত সূর্য্যের আলোকে, উজ্জ্বল রজত-রেখার মত দীপ্তি পাচ্চে। চারিদিক্‌কার ছায়াময়ী আভার সহিত কি সুন্দর বৈসদৃশ্য! তটের উপর একটি নারিকেল-বৃক্ষ স্তব্ধভাবে দণ্ডায়মান;—যেন অবাক্ হয়ে প্রকৃতির শান্ত সৌন্দর্য্য উপভোগ করচে। পাপিয়ার পিউপিউ, কোকিলের কুহুধ্বনি দূর হতে মৃদু মৃদু প্রবাহিত হয়ে এই স্তব্ধতার সৌন্দর্য্যকে দ্বিগুণিত করচে। দূর তটের কোলে, নদীবক্ষে, দুই একখানি ডিঙ্গি বিশ্রাম করচে। ক্রমে আকাশ মেঘে আচ্ছন্ন হয়ে গেল; বায়ুর বেগ বৃদ্ধি হ'ল, বৃষ্টি আরম্ভ হ'ল। প্রাতঃকালে, এরূপ মনোহর বিচিত্র দৃশ্য সচরাচর দেখা যায় না। (দৈনকলিপি)।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

কবি ও কাব্য।

১। শকুন্তলা।

নাটক কাব্যের মাথে খ্যাত লোক মাঝে,
নাটকের মাথা হেঁট শকুন্তলা কাছে ;
শকুন্তলে চতুর্থাঙ্ক হয় নামাঙ্কিত,—
শ্লোক চার শুন তা'র ভুবন প্রথিত।

কাব্যেষু নাটকং রম্যং তত্রাপি চ শকুন্তলা
তত্রাপি চ চতুর্থোঽঙ্ক স্তত্র শ্লোক চতুষ্টয়ং।

শকুন্তলা চতুর্থ অঙ্কের শ্লোক চতুষ্টয় :—

(১) তনয়াবিচ্ছেদ।

আজি যায় শকুন্তলা হৃদয় উতলা হল তাই,
কণ্ঠ স্তব্ধ অশ্রুজলে চিন্তায় নয়নে দৃষ্টি নাই।
আমি ত অরণ্যবাসী স্নেহে মোর হেন বিকলতা
কন্যার বিচ্ছেদকালে না জানি গৃহীর কত ব্যথা!

যাস্যত্যদ্য শকুন্তলেতি হৃদয়ং সংস্পৃষ্টমুৎকণ্ঠয়া
কণ্ঠ স্তম্ভিতবাষ্পবৃত্ত কলুষশ্চিন্তাজড়ং দর্শনং।
বৈক্লব্যং মমতাবদীদৃশমিদং স্নেহাদরণ্যৌকসঃ
পীড্যন্তে গৃহিনঃ কথং ন তনয়া বিশ্লেষ দুঃখৈর্নবৈঃ।

(২) বিদায়।

আগে তোমাদের জল না করিয়া দান,
কখন যে করে নাই নিজে জলপান,
কুসুম ভূষণ সজ্জা বড় সাধ যার

তব পুষ্পাগমে যে গো আনন্দে আকুলা,
পতিগৃহে যায় আজি সেই শকুন্তলা।
ঐ দেখ যায় বাছা, আঁখি জলে ছায়,
দেহ গো দেহ গো ওরে স্নেহের বিদায়।

পাতুং ন প্রথমং ব্যবস্যতি জলং যুষ্মাস্বপীতেষু যা
নাদত্তে প্রিয়মণ্ডণাপি ভবতাং স্নেহেন যা পল্লবং।
আদ্যেবঃ কুসুম-প্রবৃত্তি-সময়ে যস্যা ভবত্যুৎসবঃ
সেয়ং যাতি শকুন্তলা পতিগৃহং সর্ব্বৈরনুজ্ঞায়তাং।

(৩) রাজার প্রতি উপদেশ।

আমরা সংযমী মুনি, উচ্চ কুল তোমার রাজন্—
আত্মজনে না শুধায়ে এ বালা তোমারে দিল মন,
এই বুঝে কোরো এরে অন্য পত্নী সমান যতন—
তার পরে ভাগ্য আছে—কি কহিবে বধূ-বন্ধুজন!

অস্মান্ সাধু বিচিন্ত্য সংযম ধনান্ উচ্চৈঃ কুলং চাত্মনঃ
ত্বয্যস্যাঃ কথমপ্যবান্ধবকৃতাং স্নেহপ্রবৃত্তিং চ তাং।
সামান্য প্রতিপত্তিপূর্ব্বকমিয়ং দারেষু দৃশ্যা ত্বয়া
ভাগ্যায়ত্তমতঃপরং ন খলু তদ্বাচ্যো বধূবন্ধুভিঃ।

(৪) বধূর প্রতি উপদেশ

সেবা কোরো গুরুজনে, সপত্নীরে জেনো সখীসম,
অপরাধী পতি পরে রোষ ভরে হোয়োনা নির্ম্মম!
পরিজনে দয়া রেখো, সৌভাগ্যে হোয়োনা আত্মহারা,
গৃহিণীর এই ধর্ম্ম, কুলনাশী অন্য রূপ যারা।

শুশ্রূষস্ব গুরূণ্ কুরু প্রিয়সখীবৃত্তিং সপত্নীজনে
ভর্ত্তু বিপ্রকৃতাপি রোষণতয়া মাস্ম প্রতীপং গমঃ।
ভূয়িষ্ঠং ভব দক্ষিণা পরিজনে ভাগ্যেষ্বনুৎসেকিনী
যান্ত্যেবং গৃহিণীপদং যুবতয়ো বামাকুলস্যাধয়ঃ।

রেণু।

দীপাবলিতে আমরা দুয়ারে, ছাদে, জানালায় অসংখ্য প্রদীপ জ্বেলে দি, তার পর দিন থেকে সারা বৎসর ঘরের কোণে শুধু একটি প্রদীপ জ্বলে। কোজাগর পূর্ণিমায় আকাশে শুধু একা চন্দ্র দপ দপ করে জ্বলতে থাকে আর লক্ষ লক্ষ তারা সবগুলি একেবারে মিলিয়ে আসে! আমরা যেদিন বহু আড়ম্বরে বাহিরের অজস্র আয়োজনে দেবতার পূজা করি, তার পরে শূন্য হৃদয়ে তার ম্লান স্মৃতি জেগে থাকে—আর নিরায়োজনে দেবতার আবির্ভাবে পরিপূর্ণ হৃদয়ে চিরজীবনের অনন্ত আগ্রহ ও অশেষ আকাঙ্ক্ষা সব একেবারে নির্ব্বাপিত হয়ে যায়।

মহা সমারোহে বরযাত্রী চলেছে। কত বাদ্যভাণ্ড কত প্রদীপ কত আলো কত লোকজন হাঁক ডাক কলরব! সেটি যখন আমাদের সম্মুখ হ'তে চলে গেল, অমনি চারিদিকে গাঢ়তর অন্ধকারে ছেয়ে এল, পথ একেবারে নীরব জনশূন্য বলে বোধ হতে লাগল, যেন শেষাঙ্কের যবনিকা পতন! কিন্তু তখনিতো অভিনয় আরম্ভ হচ্ছে!

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

মশা।

বঙ্গখ্যাত শ্রীল শ্রীযুক্ত কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের আমি প্রশিষ্য। আমিও পরমগুরুর মত অহিফেনসাধন জীবনের সার করিয়াছি। এবং সেইজন্য তাঁহার সিদ্ধি অর্থাৎ আফিঙের খেয়ালটি আমাতেও কিছু বিকশিত হইয়াছে। আফিং কামধেনু, কল্পতরু যেন আজকালকার মাসিকপত্রের লেখক; তাহার নিকট যাহা চাহ তাহাই পাইবে;—বিজ্ঞান, দর্শন, সমাজতত্ত্ব, রাজনীতি, অর্থনীতি, প্রত্নতত্ত্ব মায় কবিতা ও ছোট গল্প প্রভৃতি যাহা যত কিছু আছে, সকলের সমাধান তাহার নিকট নিমেষের মধ্যে পাওয়া যায়। মৌতাত একটু চড়িলে ত' কথাই নাই। এ হেন আফিঙের প্রসাদে দিব্যজ্ঞান আমার চিত্তায়ত্ত। ইতি উপক্রমণিকা।

অথ কথারম্ভ।

এক দিন আফিং খাইয়া বসিয়া আছি, নেশাটা তাপযোগে তাপমান যন্ত্রের পারদের মত একটু একটু করিয়া চড়িতেছিল, দুনিয়া স্বর্গে পরিণত হইতেছিল, এমন সময় একটা মশা কাণের কাছে আসিয়া গান ধরিল 'পুঁ-উঁ-উঁ'! আমি বিরক্ত হইয়া তাড়াইয়া দিলাম; আবার অপর কাণে আসিয়া গাহিল 'পুঁ-উঁ-উঁ-উঁঃ'। এতক্ষণে আমার নেশাটা বেশ পাকিয়া আসিল, আমি দিব্যকর্ণ প্রাপ্ত হইয়া মশার সেই মধুর গীত শ্রবণ করিতে লাগিলাম।

"পুঁ-উঁ-উঁ-উঁঃ"। আবার মশা গাহিল; তাহা আমার কাণে নিপুণ-হস্তের বীণাতন্ত্রীঝঙ্কারবৎ বাজিয়া উঠিল। আমি বুঝিলাম উহা অর্থশূন্য শব্দ নয়; বীণার আওয়াজে গীতকথার সংযোগের মত আমি তাহাতে গূঢ় অর্থ বুঝিতে লাগিলাম; আমি মাশকভাষায় সুপণ্ডিত হইয়া উঠিলাম। পেন্ত্রীতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ যেমন ভূতকালের অদ্ভুত

শিলালিপির পাঠোদ্ধার করেন, আমিও তেমনি মাশকভাষার ভাবোদ্ধার করিতে সমর্থ হইলাম।

আমি পাদ্যঅর্ঘ্যের যোগাড় করিতে না পারিয়া স্বাগত প্রশ্নে জিজ্ঞাসা করিলাম, "হে গায়ক, তুমি কে"? মশক তাহার স্বাভাবিক মধুর স্বরে উত্তর করিল, "হে সর্ব্বজ্ঞ, আপনার অজ্ঞাত কিছু না থাকিলেও, আপনার প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিতেছি, আপনি প্রণিধানপূর্ব্বক শ্রবণ করুন। লোকে চলিত ভাষায় আমাকে 'মশা' কহিয়া থাকে ; এবং পণ্ডিতগণ আমাকে মশক কহেন।"

আমি পুনরায় প্রশ্ন করিলাম, "হে মশে বা মশক, তোমার ঐ নামের অর্থ কি, আমায় বিস্তারিত করিয়া কহ, আমার জানিতে বড় কৌতূহল হইয়াছে।"

ইহা শ্রবণ করিয়া মশক কহিল, "হে অহিফেন বিনাশন, অস্মদ্দেশীয় পণ্ডিতগণ আমার নাম 'মশ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন করিয়াছেন, কারণ আমি শব্দ করিয়া থাকি ; কিন্তু এরূপ ব্যুৎপত্তি যে প্রমাদপূর্ণ তাহা স্পষ্ট বুঝা যায় ; আমা হইতে অধিক শব্দকারী শত শত জীব মশক না হইয়া কেবল আমি মশক হইলাম কেন ? ইঁহাদের যুক্তিতর্কেরও অসদ্ভাব নাই ; কিঞ্চিৎ আভাস দিতেছি শ্রবণ করুন। প্রাচীন নিরুক্তবাদী শাকটায়ন খৃষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দীর লোক ; তিনি বলেন, "নাম একটা অর্থশূন্য চিহ্নমাত্র ; যেমন দেখা যায়, আমরা সম্মান বা ঘৃণা প্রদর্শন করিবার জন্য কোন ব্যক্তিকে সিংহ, ব্যাঘ্র, বা কুক্কুর গর্দ্দভ প্রভৃতি সংজ্ঞা দিয়া থাকি।" তাঁহার মতে কাক ও কুক্কুটের নাম তাহাদের শব্দানুকরণে রক্ষিত। ঔপমন্যব কিন্তু এই মত গ্রাহ্য করেন নাই ; তিনি গুণ হইতে নামকরণ স্বীকার করেন। যাস্ক কিন্তু উভয় মতই গ্রহণ করিয়া বলিয়াছেন "শব্দ এক এক পদার্থের এক এক বিশেষ গুণ লইয়া বিশেষ ভাবে 'স্বভাবতঃ' রচিত হইয়াছে ;

আবার, একবার একটা নামে একটা অর্থ সংযুক্ত হইয়া গেলে তাহার আর 'নড়চড়' হয় না; 'সকৃৎ উচ্চরিতঃ শব্দঃ সকৃদর্থং গময়তি।' গার্গ কিন্তু এ সকল মতের বিরোধী; তিনি আমার মতই যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের টীকাকার দুর্গাদাস, গণ্ডগোল দেখিয়া লিখিয়াছেন "শব্দেন উচ্চার্য্যমানেন যৎ বস্তু প্রতিপাদ্যতে, তস্য শব্দস্য তৎ বস্তু জ্ঞায়তাম্ অর্থ সংজ্ঞয়া ইতি প্রাঞ্চঃ। এবম্ অস্মাৎ শব্দাৎ অয়ম্ অর্থো বোদ্ধব্য ইতি ঈশ্বরেচ্ছাশক্তিঃ ইতি তার্কিকাশ্চ। তৎজ্ঞানন্তু ব্যাকরণাদিভ্যঃ অতএব শক্তিগ্রহং ব্যাকরণোপমান কোষাপ্তবাক্যাৎ ব্যবহারতশ্চ ইতি প্রাঞ্চঃ। ইত্যাদি।" অতএব দেখা যাইতেছে যে, তাঁহারা কোন স্থির মীমাংসায় উপনীত হইতে পারেন নাই। অতএব আমি যাহা বলিব তাহা ভ্রমাত্মক একথা কেহ সাহস করিয়া বলিতে পারিবে না।"

আমি ধৈর্য্যসহকারে মশকের এই দীর্ঘ জ্ঞানগর্ভ গবেষণা বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলাম, 'হে প্রচণ্ড পণ্ডিত, হে সুমধুর শব্দকারিন্ মশক, তবে তোমার ঐ মধুর নাম কি নিরর্থক সংজ্ঞা মাত্র? কল্পতরুবৎ পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণও কি শব্দার্থবোধে অপারক হইয়াছেন?"

মশক কহিল, "হে মিষ্টভাষিন্, শব্দতত্ত্ব লইয়া Adam Smith, Dugald, Stewart, Hamilton, Liebniz, MaxMuller, Sayce প্রভৃতি বহু পণ্ডিত বহু কচকচি করিয়াছেন। আমি তাঁহাদের প্রণালী অনুসরণ করিয়া আমার নামার্থ প্রতিপন্ন করিতেছি শ্রবণ করুন। আমার মতে 'মশা ও মশক' 'মহাশয় ও মোসাহেব' শব্দের অপভ্রংশ শব্দ মাত্র। দেখুন, বঙ্গে 'মহাশয় শব্দ' চলিত কথায় 'মশায়' রূপে ব্যবহৃত হয়; 'মশায়' শব্দের দেহ-সঙ্কোচে 'মশা' হইয়াছে। যখন লোকে বলে 'মশায় বড় উৎপাত করিতেছে,' তখন আমার নামের অপেক্ষাকৃত অভগ্নরূপ দেখা যায়।"

আমি মহাশয় মশাকে বাধা দিয়া বলিলাম, "হে সর্ব্বশাস্ত্রার্থদর্শী, আমি বুঝিতে পারিতেছি না, কেমন করিয়া মহাশয় ব্যক্তি উৎপাত করিতে পারে, আমায় বিশদ করিয়া বুঝাইয়া বল।"

মশা কহিল, 'হে অহিফেনভোজী, আপনি আফিঙের মাত্রা একটু চড়াইলেই একথা জলবৎ হইয়া যাইত; যাহাই হউক কহিতেছি, শ্রবণ করুন। ইংরাজ 'rules India for India's good' নিঃস্বার্থভাবে ভারতহিতের জন্য ভারত শাসন করিতেছেন; অতএব তাঁহারা নিশ্চিতই মহাশয়; ঘরের খাইয়া বনের মহিষ কে তাড়ায়? এই মহাশয় যখন রোগীকে চিকিৎসকের মত ভারতের শাসন ও শোষণ কার্য্যটা ভালরূপেই করেন; যখন দুর্ভিক্ষের দিনে দরবার তামাসায় অজস্র অর্থ ব্যয়িত হয়, যখন প্রভুর লাথি ভারতীয়ের অঙ্গে পড়িলেই ডাক্তার ও জজের বিচার-বিদ্রূপে বেচারার প্লীহা চতুর্গুণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তখন আমরা মহাশয়ের উৎপাত প্রত্যক্ষ করি।"

আমি কহিলাম, "হে মহাশয়, তোমার উদাহরণ আমার ভ্রম নিরসন করিয়াছে, এক্ষণে তুমি তোমার ব্যুৎপত্তি কথা শেষ কর।"

মশক কহিতে লাগিল, "হে পুরুষপুঙ্গব, 'মহাশয়' হইতে 'মশার' উৎপত্তি প্রমাণ করিলাম; এক্ষণে 'মোসাহেব' শব্দ হইতে ইহার উদ্ভব প্রদর্শিত হইতেছে। 'মোসাহেব' শব্দ কর্ত্তিতকলেবর হইলে হয় 'মোসাহে'; তাহা কিছুদিন ব্যবহৃত হইলে যখন লোকে ইহার প্রাচীন আকার বিস্মৃত হইল, তখন পণ্ডিতগণ উহা সম্বোধন পদ স্থির করিয়া 'হে মোসা' রূপেও ব্যবহার করিতে লাগিলেন। পরে অব্যয়ের ব্যয় হইলে জমা খরচ করিয়া দেখা গেল শুধু অবশিষ্ট আছে 'মোসা', কালে তাহা 'মসা' বা 'মশা' হইল, তখন কেহ কেহ আমাকে স্বল্পকায় দেখিয়া 'কন্' প্রত্যয় যোগে করিলেন 'মশাক'। এবং

আরো যখন দেখা গেল আমি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র, তখন আমার 'আকার' নাই বলিয়া আমি হইলাম 'মশক'। আমি ভাষাতত্ত্বের সার কথা বর্ণনা করিলাম, বুঝিলেন কি ?"

আমি কহিলাম, 'হে শব্দতত্ত্ববারিধে, হে তত্ত্বাম্বুধি, সব শুনিলাম, বুঝিলাম, তৃপ্ত হইলাম। কিন্তু একটু কিন্তু আছে। একটা কিম্বদন্তি আছে তোমরা নাকি গুরুব্যবসায়ীদিগের পূর্ব্বপুরুষ বা প্রেতাত্মা বা এইরূপ-একটা-কিছু। একথা প্রকৃত কি ?"

মশা কহিল, "হে মহাত্মন্, ডারুইন-তত্ত্বে এ প্রশ্ন মীমাংসিত হয় নাই; কিন্তু আমরা যে মোসাহেব কুলের পিতৃপুরুষ তাহা ডারুইনের কোন ছাত্র শীঘ্রই জগতে প্রচার করিবেন, এরূপ সংবাদ আমি পাইয়াছি।"

ইহা আকর্ণন করিয়া আমি আনন্দ-রোধিত গদ্গদকণ্ঠে কহিলাম, 'হে মহাশয় মোসাহেব, তোমার জ্ঞানসাগরের লহরীলীলা অবলোকন ও তাহার গুরুগম্ভীর গর্জ্জন শ্রবণ করিয়া আমি স্তম্ভিত হইয়াছি। তোমার বালাই লইয়া আমার মরিতে ইচ্ছা—"

মশক তাড়াতাড়ি বাধা দিয়া কহিল, "হে মদেকাশ্রয়, ক্ষান্ত হউন, ক্ষান্ত হউন; অমন কথা মুখে আনিবেন না। হে অহিফেন্-ধ্বংসকারিন্, আপনার মত স্থিরভাবে আর কেহ আমার দংশন সহ্য করে না, অতএব হে মদাহার, আপনি মরিবেন না, আমার হুলের দিব্য।"

আমি খুব গম্ভীর ভাবে ঘাড় নাড়িয়া কহিলাম, 'হে অনন্যাশ্রয়, আমি তোমার জন্য প্রাণধারণ করিব। দধিচীমুনি পরোপকারের জন্য প্রাণ দিয়াছিলেন, আর আমি পরোপকারের জন্য "যে কোরেই হোক রাখিব এ জীবন"। এক্ষণে বল, তোমার মহাশয় ও মোসাহেব নামদ্বয়ের সার্থকতা কিসে" ?

মশক কহিল, "হে পরোপকারিন্, শ্রবণ করুন"। অনন্তর, বার-কয়েক আমার মস্তক প্রদক্ষিণ করিয়া, তান-লয়-বিশুদ্ধ রাগিনী ভাঁজিয়া, মনীষাবোধক ঘাড় নাড়িয়া বলিতে আরম্ভ করিল। "হে মদীয়াসৃগ্রাহক, আমি মহাশয়, কেননা, আমি শোণিত শোষণ করি। যে শোণিত শোষণ করে সেই মহাশয়। তাহা না হইলে দরিদ্রের শোণিতসম অর্থ শোষণ করিয়া ইংরাজ 'রাজা' কেন, জমিদার 'হুজুর' কেন, বঙ্গের ছোটলাট 'প্রজার মা বাপ কেন'? পুনরায়, আমি মোসাহেব;—কানে দুইটা মিষ্ট কথা শুনাইয়া রুধির শোষণে প্রয়াসী। আমি মোসাহেব, আপনার কর্ণে সুমধুর তোষামোদ অনেকক্ষণ হইতে ঢালিতেছি, ব্যাকরণাভিধান হাঁটকাইয়া বহু দীর্ঘ বিশেষণ সংগ্রহ করিয়া শুনাইয়াছি, আমায় কৃপা করিয়া কিঞ্চিৎ শোণিত পান করিতে অনুমতি করুন। আমি অতি সন্তর্পণে আপনার গাত্রে হুল ফুটাইব, ততক্ষণ আপনি আপনার হস্তে স্বায়ত্ত-শাসন করিবেন। এ স্বায়ত্তশাসন আপনি অবশ্যই করিবেন, কারণ আপনারা ইহা বিদেশীর প্রসাদরূপে পাইবার জন্য কিরূপই না লালায়িত, কিরূপই না লাঞ্ছিত; আপনি বিনা লাঞ্ছনায় প্রদত্ত অধিকার সাহ্লাদে প্রয়োগ করিবেন আশা করিতেছি"। ইহা কহিয়া মশক সুমধুর পু-পাঁ ধ্বনি করিয়া আমার নেত্র সম্মুখে আসিয়া নৃত্য করিতে লাগিল।

আমি তখন তাহাকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলাম, "হে মহাশয় মোসাহেব মশক, হে শ্রবণরঞ্জন গুঞ্জনকারিন্, হে বুভুক্ষু হিতৈষিন্, হে পরোপকারিন্, তোমার উদ্দেশ্য আমি বুঝিতে পারিয়াছি; তুমি আমার দেহ হইতে, কিঞ্চিৎ স্নেহপরবশ হইয়া, শোণিত সংগ্রহ করিবে; কিন্তু হে মশে, আমাকে ক্ষমা কর; আমি একে রক্তহীন বাঙালী, তাহাতে আবার অহিফেনসেবী, আমার রক্ত কোথায়? তুমি আমাকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র চেষ্টা দেখ"।

মশক কহিল, "হে সত্যবাদিন্, আপনার উদ্দেশ্য মহৎ,—কেন না "আত্মানং সততং রক্ষেৎ দারৈরপি ধনৈরপি"। ইহা আপনার দেশের প্রধান নীতিজ্ঞের উক্তি। এই নীতির অনুসারী আপনার স্বদেশীয় ভ্রাতৃগণ চক্ষের সমক্ষে গোরার হাতে স্ত্রীর লাঞ্ছনা, স্বদেশীয়ের অপমান নির্ব্বিকার চিত্তে দেখিয়া থাকেন। যদি কখন চিত্তে বিকার ঘটে তাহা প্রায়ই নিম্নগা নদীর মত শ্রীচরণে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া "স্থানত্যাগেন দুর্জ্জনঃ" নীতির সম্মান রক্ষার জন্য। ইহা হইতে বাস্তবিকই প্রমাণ হয় যে, ভারতের ধমনীতে শোণিত বহে না; যাহা বহে তাহা অতি তরল, অতি শীতল, কিন্তু দেব, আপনাতে যেটুকু শোণিত পাইব, তাহাই আমাকে লইতে হইবে, আপনি নিরীহ-চূড়ামণি। আপনার দেহে আমি ইচ্ছামত হুল ফুটাইব, অথচ আপনি ইচ্ছামত বাধা দিতে পারিবেন না; ভারতের রাজা প্রজার সম্বন্ধের মত এমন সুখ আর দ্বিতীয় কৈ? অতএব হে শান্ত, আপনার কর্ণে আরো তোষামোদ বর্ষণ করিতেছি "পুঁ-উঁ-উঁ-উঁ", অধীন অনন্যগতি মুখাপেক্ষীকে নিরাশ করিবেন না।"

আমি মশার এই দীর্ঘ যুক্তিগর্ভ বক্তৃতায় প্রীত হইয়া বলিলাম, "অহো তোমার বিচারশক্তি! বাহবা তোমার বাগ্বৈদগ্ধ্য! হায় হায়, আমাদের দেশের বাগ্মিতার পশ্চাতে যদি এতটুকুও কর্ম্মের চেষ্টাভাস থাকিত! হে বাগ্মী, তোমার যুক্তি নিঃসন্দেহ অতি সৎ; আমি অলস, সুতরাং অসমর্থ, সুতরাং অকর্ম্মণ্য, সুতরাং নরাধম, সুতরাং মুখসর্ব্বস্ব এবং আমাদের দেশে মুখসর্ব্বস্বের অভাব নাই; তুমি আমায় ছাড়িয়া স্বচ্ছন্দে অন্যত্র যাইতে পার; ভায়াদের সোরগোল দেখিয়া ভীত হইও না; মশা মারিতে অমন কত কামান পাতা হয়, কিন্তু শুধু ফাঁকা আওয়াজ, আমার আফিঙের মত একটা গুলিও ছুটে না। মা ভৈঃ, তুমি ইংরাজের মত সকল সোরগোল, সকল কাতরবাণী অগ্রাহ্য করিয়া জোরে হুল ফুটাইয়া রক্ত চুষিয়ো"।

মশা কহিল, "হে নিগ্রহানুগ্রহসমর্থ প্রভো, আজ কাল আর ফাঁকা আওয়াজ নাই, আওয়াজটা দমে ভারি হইতেছে। ঘুষির বদলে ঘুষি, লাথির বদলে লাঠি, দুর্জ্জয় সার্জ্জনের পৃষ্ঠমার্জ্জন বঙ্গে চলিত হইয়াছে। হুলের বদলে চড় যদি চলিত হইয়া থাকে, তবেইত' প্রভু প্রতুল"।

আমি কহিলাম, "অয়ি ভীরু, ঐ গুলা exception ; exception proves the rule, তুমি স্বচ্ছন্দে অভিযান কর"।

মশা কহিল, "প্রভু, নীতিজ্ঞেরা বলেন,—

"যো ধ্রুবানি পরিত্যজ্য অধ্রুবানি নিষেবতে।
ধ্রুবানি তস্য নশ্যন্তি, অধ্রুবং নষ্টমেব হি"

আমি মশার এই সংস্কৃত ও নীতিচর্চ্চা শুনিয়া পরম পরিতুষ্ট হইয়া হাস্যবিকচবদনে কহিলাম, "সন্তুষ্টোঽস্মি, বরং বৃণু"।

মশা শুনিয়া উৎপক্ষ হইয়া নাচিয়া গাহিয়া কহিল, "আমাকে আপনার শোণিত পান করিতে আজ্ঞা করুন"।

কেশবের সহিত যুদ্ধে বিক্রমপ্রীত মধুকৈটভ নামক অসুরদ্বয় কেশবকে বর প্রার্থনা করিতে বলায়, কেশব যেমন প্রার্থনা করিয়াছিলেন "তোমরা আমার বধ্য হও," এবং অসুরদ্বয় নিজপণে বদ্ধ হইয়া প্রার্থিত প্রদানে বাধ্য হইয়াছিল, তেমনি আমিও বলিলাম "তথাস্তু"।

মশা আহ্লাদে অধীর হইল ; আমার প্রতি ধাবিত হইল ; আমার গণ্ডে আসিয়া হুল বিদ্ধ করিল। আমি বহুক্ষণ সহ্য করিলাম। অবশেষে দেবী-যুদ্ধে মহিষাসুরের মত কাতর হইয়া কহিলাম "হে মশে, ক্ষান্ত হও, ক্ষান্ত হও। তোমার তীক্ষ্ণ হুল সম্বর সম্বর। শোষণ-কার্য্যের এই খানে ইতি কর, মিষ্ট কথায় ভুলাইয়া প্রাণে মারিও না"।

মশক দৃক্‌পাতও করিল না। আমি কাতর হইয়া আমার শ্রীকর-কমল কিঞ্চিৎ বলসহকারে গণ্ডে যোজনা করিলাম। মশক "পুঁক্" করিয়া উড়িয়া গেল! আমারো চপেটাঘাতে চমক হইল। আমি

মশার একমাত্রিক 'পুঁক্' শব্দের অর্থ বুঝিলাম ; পাণিনীয় ব্যাকরণের এতটুকু সূত্রের এতখানি কার্ত্তিকব্যাখ্যার মত তাহার অর্থ বুঝিলাম যে, মশা কহিয়া গেল "রে নির্ব্বোধ, রে হস্তিমূর্খ, আমি তোমার রুধির শোষণ করিবই ; এতক্ষণ যে মিষ্ট কথার ফোয়ারা ছুটাইয়াছিলাম, তাহা আমার পল্বলগোষ্ঠীর ডাঁশ, মাছির নিকট সাধু হইবার জন্য। তুমি যতদিন কাপুরুষতা-অহিফেন না ছাড়িবে, ততদিন আমার কার্য্যে বাধা দিতে আসিলেই 'মশা মারিতে গালে চড়' অনিবার্য্য হইয়া রহিবে" !

শ্রীঅহিফেনানন্দ।

সাময়িক কথা।

বঙ্গবিভেদে বাঙ্গালী-দের মৌখিক আন্দোলন।

ভারতের বর্ত্তমান রাজ-প্রতিনিধির প্ররোচনায় ভারত-সচিব বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ প্রস্তাবে যে সম্মত হইয়াছেন তাহাতে বঙ্গবাসীগণ একেবারে মর্ম্মাহত হইয়াছেন। এবং তাঁহাদের মধ্যে প্রধান প্রধান ব্যক্তি সুবিধা ও সুযোগ পাইলেই এ বিষয়ে আপন আপন হৃদ্গত ভাব প্রকাশ করিয়াছেন। রাজপুত্রের অভ্যর্থনাকল্পে কি করা আবশ্যক স্থির করিবার নিমিত্ত টাউন হলে যে সভা হয় তাহাতে শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী মহাশয় এ বিষয় উল্লেখ করেন, এবং মান্যবর শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ মজুমদার ও মান্যবর শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু বঙ্গীয় সদস্য সভায় বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের বিরুদ্ধে জ্বলন্ত ভাষায় আপন আপন অভিমত জ্ঞাপন করিয়াছেন। ভূপেন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, মোগল কিম্বা পাঠানদিগের রাজত্বকালে এমন ভয়ানক বিপদ এদেশের অদৃষ্টে ঘটে নাই, স্বর্গগতা মহারাণী ভিক্টোরিয়া সিপাহী-বিদ্রোহের পর যে সদয় অনুশাসন প্রচার করিয়াছিলেন, তাহা যদি আজ রহিত করিয়া দেওয়া হয় তাহাও ইহার তুলনায় অতি সামান্য বলিয়া ধারণা হইবে। আজ হইতে নিত্য দুঃখ আমাদের জীবনের সঙ্গী হইল, এবং আমাদের প্রাণপণ শক্তিদ্বারা সম্মুখে যে বিচ্ছেদকারী মহা সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে তাহার প্রতীকার করিতে হইবে। শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ বলেন, অদৃষ্টের একি বিভ্রাট! ঠিক যে সময়ে, রাজপুত্র আসিতেছেন বলিয়া আনন্দ উৎসবের আয়োজন হইতেছে, ঠিক সেই সময়ে তাঁহার প্রজাদিগের একান্ত অসহায় দুর্ব্বলতা স্মরণ করাইয়া এবং তাহাদের মতামত, ইচ্ছা অনিচ্ছা রাজপুরুষদিগের নিকট কত তুচ্ছ এবং মূল্যহীন ইহাই নিতান্ত নিষ্ঠুরতার সহিত প্রমাণ করিয়া এই অভিনব অনুজ্ঞা প্রচার করা হইল। রাজপুত্র ও পুত্রবধূ আসিবেন এবং চলিয়া যাইবেন। তাঁহাদের ভবিষ্যৎ প্রজাবর্গ তাঁহাদের আশীর্ব্বাদ করিবে সত্য কিন্তু তাহাদের মর্ম্মান্তিক দুঃখ এবং কাতর অশ্রুজলে উৎসবের শুভ আলোক ম্লান করিবে তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। অসহায় দুর্ব্বল প্রজার ব্যাকুল চেষ্টার

এতদিনে শেষ হইল—রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে আজ যে অঙ্কের যবনিকা পতন হইল ইহা অপেক্ষা অধিকতর দুঃখের অভিনয় কোন দেশে কোন কালে হয় নাই এবং হইবার সম্ভাবনা নাই। এখন বঙ্গদেশের মানচিত্র বাঁধিয়া তুলিয়া রাখিলে কোন ক্ষতি নাই; কেন না শতাব্দী পরে আর তাহার কোন আবশ্যক হইবে না।" "অসহায় প্রজার চেষ্টার অন্তের" কথা শুনিলে "যে জাতি যে-ব্যবহারের যোগ্য ভগবান তাহার অদৃষ্টে তাহাই ঘটাইয়া দেন" এই প্রবাদ-বাক্যটি স্মরণ হয়। যদি চেষ্টার অন্তের সময়ই আসিয়া থাকে তবে বঙ্গের অদৃষ্টে যাহা ঘটিয়াছে তাহা উচিতই হইয়াছে। চেষ্টার অন্তের কাল না আসিয়া এখনি চেষ্টার আরম্ভের কাল আসিয়াছে ইহাই আমাদের বিশ্বাস! এক সময় শোনা গিয়াছিল, এই বিষয় আন্দোলন করিবার জন্য বঙ্গদেশ হইতে প্রতিনিধিগণ ইংলণ্ডে প্রেরিত হইবেন সে প্রস্তাবের কি হইল? অমৃতবাজার পত্রিকায় একটি সুন্দর প্রশ্ন আছে; পত্রিকা বলেন, রাজপুত্রের অভ্যর্থনায় বিবিধ উৎসবাদির জন্য ৬৮,৭৩৬ টাকা চাঁদা সংগ্রহ হইয়াছে। বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ রহিত করিবার আন্দোলনের জন্য বঙ্গবাসী কত টাকা দিতে প্রস্তুত আছেন? বঙ্গদেশবাসী বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের বিরুদ্ধ আন্দোলনের অপেক্ষা রাজপুত্রের অভ্যর্থনার জন্য যদি অধিকতর উৎসুক থাকেন তবেই এ দুর্দ্দিনে রাজপুত্র রাজধানী কলিকাতা মহা নগরীতে পদার্পণ করিতে ভরসা পাইবেন।

বম্বে-মেয়েদের রাজপুত্রের অভ্যর্থনা।

বম্বে-মেয়েদের রাজপুত্রের অভ্যর্থনা সম্বন্ধে বম্বের "মারহাট্টা" পত্রিকা নিম্নলিখিত তীক্ষ্ণ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন:—

বম্বের দেশীয় ভদ্রমহিলাগণ একত্র হইয়া রাজকুমারকে যে অভিনন্দন পত্র দেওয়া স্থির করিয়াছেন ইহা তাঁহাদের নিতান্ত বুদ্ধিহীনতার পরিচয়, সে বিষয় আমাদের সমালোচনা শ্রুতিকঠোর হইতে পারে তবুও বাধ্য হইয়া আমাদিগকে দু'চার কথা বলিতে হইবে। পার্সী মহিলাগণ সকল বিষয়েই বিশেষতঃ ইউরোপীয়দিগের সহিত মেলামেশায় রাজভক্তির দোহাই দিয়া কিছু করিবার জন্য সর্ব্বদাই উৎসুক ও অগ্রসর হইয়া আছেন; কাজেই তাঁহারা যে একার্য্যে উদ্যোগী হইবেন তাহা আশ্চর্য্য নহে তবে হিন্দু মহিলাগণও ইহাতে যে যোগ দিয়াছেন,—দিতে অগ্রসর হইয়াছেন তাহা কেবল আশ্চর্য্যের নহে অতিশয়

দুঃখের বিষয়। রাজনৈতিক হিসাবে অবশ্য করণীয় যাহা আছে তাহা হতভাগ্য পুরুষদিগের অধিকারে থাকাই ভাল, নারীগণকে সাধ করিয়া আর তাহার মধ্যে লিপ্ত হইবার সার্থকতা দেখা যায় না। সংসারক্ষেত্রে প্রতিদিনের জীবনে এমন অনেক কাজ আছে যাহার ভার তাঁহারা গ্রহণ করিলে স্বামীদিগের পরিশ্রম অনেকাংশে লাঘব হইতে পারে। কোন বুদ্ধিমান হিন্দুস্বামীর পক্ষে, তাঁহার স্ত্রীর বিদেশী পর-পুরুষের সম্মুখে অভিনন্দন পত্র লইয়া উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা কখনই প্রীতিপ্রদ হইতে পারে না। তা সে পুরুষ যতই উচ্চ পদস্থ হউন না কেন। আমাদের দেশীয় শিক্ষিতা নারীগণ, যাঁহারা দেশের উপকার ব্রত গ্রহণ করিয়া নীরবে লোকচক্ষুর অন্তরালে প্রতিদিন জীবনপথে অগ্রসর হইতেছেন তাঁহাদিগকে আমরা আন্তরিক শ্রদ্ধার চক্ষে দেখি কিন্তু আবার যখন দেখি কেহ কেহ নিতান্ত অন্তঃসারশূন্য বাহ্যাড়ম্বরে মত্ত হইয়া সময়ের বৃথা অপব্যয় করিতেছেন তখন স্বতঃই মনে হয়, যে দিন পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুকরণে শিক্ষা দিয়া স্ত্রীস্বাধীনতার সূত্রপাত করা হইয়াছিল সে দিন আমাদের মহা দুর্দ্দিন। এই সকল হুজুগের জন্য পুরুষেরাই অনেকাংশে দায়ী। কারণ অনেক স্থানে দেখা যায়, রাজানুগ্রহের আলোকে অন্ধ হইয়া বাহ্যাড়ম্বরকেই যথার্থ কাজ বলিয়া তাঁহারা ভ্রম করেন এবং রাজনৈতিক ব্যাপার হইতে নারীগণকে কিয়দংশে দূরে রাখাই যে সৎ বিবেচনার কাজ তাহাও ভুলিয়া যান্। এই আমাদেরই কালে সমাজ-সংস্কারের দোহাই দিয়া অনেক অদ্ভূত হাস্যজনক ব্যাপারের অভিনয় হইয়া গিয়াছে ;—তবে এবারকার এই অভিনব প্রস্তাবের নিকট পূর্ব্বের আর সকল ব্যাপার হার মানিয়াছে। এতদিনে দেশীয় স্ত্রীনেতাদিগকে বলা আবশ্যক হইয়াছে যে, অযথা অকাজে সময়ক্ষেপ না করিয়া আপন আপন কর্ত্তব্যে মনোনিবেশ করাই ভাল—ঘরে অনেক কাজ পড়িয়া আছে তাহাই সুসম্পন্ন হউক—রাজভক্তির উচ্ছ্বাসে অভিষিক্ত অভিনন্দন পত্র লইয়া বিদেশী রাজপুত্র ও রাজপুত্রবধূকে স্বাগত অভিবাদন জানাইবার জন্য সবেগে আপলো-বন্দরে দৌড়িবার আবশ্যক নাই।

মাতৃভূমির প্রতি।

অয়ি মাতৃভূমি !
লহ পাদ্য অর্ঘ্য আজ দিতেছি চরণে ;
তোমার কল্যাণী মূর্ত্তি আজি শুভক্ষণে
হেরেছি সকলে ;—
তাই আজ প্রাণপণে তোমার অঙ্গন তলে
আনন্দাশ্রু জলে,
মিলেছে বালক বৃদ্ধ, মিলেছে যুবক প্রৌঢ়জন
জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে গায় দেবি ! তোমার বোধন ;
দরিদ্র সম্পন্ন ধনী এক পুণ্য বেদী ঘিরি'
তব পদ চুমি'
গায় আজি "জাগো মাতৃভূমি !"

হে বঙ্গ জননি !
"ঘনায়ে আসিছে ক্রমে বড়ই দুর্দ্দিন ;
শাণিত বিপদ রাশি উদ্যত স্বাধীন
ঘুরে ভদ্রবেশে।
বিপন্ন হৃদয়গুলি রাজদ্বারে ঘুরি ফিরি'
সর্ব্ব অবশেষে
পাইতেছে জীবনের সনাতন বরেণ্য আশ্রয়,
খুঁজি লইতেছে সবে জননীর অদ্বৈত আলয় ;
আজ দেবি ! খুলে দিলে তব প্রাণ ভূমিতলে
যে তীর্থ শক্তির,
দান তাহা শুধু জননীর।

দারুণ ব্যথায়,
অয়ি মাতঃ, তব নাম শুধু পড়ে মনে ;
তব বরাভয়দীপ্ত কুটির অঙ্গনে
তোমার আশ্বাস
আজ জাগিয়াছে বুকে ;—তোমার কল্যাণী মূর্ত্তি
আজি স্বপ্রকাশ !
অন্ধ প্রেতভূমিসম কুণ্ডলিত রাজপথ ছাড়ি
আজ ফিরিতেছে মাতঃ, তব পানে বঙ্গ নরনারী ;—
সংকল্প করিনু আজ—দিব পূজা সবে মিলি
জননী তোমায়,
সুখে দুঃখে সহস্র ব্যথায়।

আশীষে তোমার
হৃদয়ে যে অগ্নিকণা উঠিয়াছে জ্বলে'
সবে মিলি প্রতিপদে সেই হোমানলে
ঢালি হবনীয়
তাহারে উজ্জ্বল করি রাখিব তোমার গৃহ
করি রমণীয়।
চাই মোরা দৈব সুখ ; হীনতার সর্ব্ব অবসান ;
প্রাণবলে করিব গো জীবনের ব্রত সমাধান !
ছাড়ি ছদ্ম আড়ম্বর জননী মঙ্গলময়ী
চিনিব তোমায়—
ভুলিবনা আর বিমাতায় !

শ্রীগঙ্গাচরণ দাসগুপ্ত।

নির্ব্বাসিত।

(১)

তাহার নাম ছিল বিধুভূষণ, কিন্তু গ্রামস্থ সকলে তাহাকে আদর করিয়া বিস্তাভূষণ বলিয়া ডাকিত। কেননা বিস্তার সহিত বিধুভূষণের এমন একটা অকৈতব প্রেম জন্মিয়াছিল যে বিংশবর্ষ অতিক্রম করিতে বসিয়াও সে গ্রামস্থ ছোট বিস্তাকুটীর অর্থাৎ গুরু-মহাশয় গোলাম হাজরার পাঠশালার মায়া ছাড়িতে সমর্থ হইল না।

প্রতিবাসীরা যখন দেখিল বিধুর পাঠশালা-মায়া আপনা আপনি ছাড়িবার নহে, তখন সকলে মিলিয়া একদিন এই বিস্তালয়গামী নবজাত-শ্মশ্রু যুবকের পথ আগুলিয়া দাঁড়াইল।

সেই দলের ভিতর সপুত্র রামধন চাটুয্যে, সপৌত্র হরিরাম ঘোষাল, ও সশিষ্য পঞ্চানন তর্কনিধি উপস্থিত ছিলেন।

বিধুভূষণ রামধনের পুত্র রামরূপের হাতে খড়ি দিয়াছিল, দিন দুই চারি তাল পত্রে 'ক-খ' শিখাইয়াছিল। সেই রামরূপ বি,এ পাশ করিয়া দুইদিন পূর্ব্বে দেশে ফিরিয়াছে।

হরিরামের পৌত্র নিধিরামেরও ভাগ্যে, দুই একদিনের জন্ম বিধুভূষণের ছাত্রত্ব ঘটিয়াছিল। সে বালকও গত বৎসর মধ্যবাঙ্গলা পরীক্ষায় বৃত্তিলাভ করিয়া এবৎসর প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্ম প্রস্তুত হইতেছে।

সুতরাং বিস্তাভূষণের যশঃসৌরভ তাহার গ্রামের চারিপাশে দশবারো খানা গ্রামমধ্যে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল।

যুবক বিস্তাভূষণের পাঠশালায় যাইতে লজ্জা বোধ হইতনা বলিয়া, পাড়াপড়শীর এ দৃশ্য দেখিতে যে লজ্জা বোধ হইবে না, এরূপত কোন কথা নাই! সকলেইত আর বিস্তাভূষণের মত নির্লজ্জ নহে।

তাঁহারা প্রথমে বিধুর মা বিন্দুবাসিনী দেবী ওরফে বিন্দী বামণীকে

ছেলেকে পাঠশালায় পাঠাইতে নিষেধ করিলেন। বিন্দু তাঁহাদের কথা রাখিল না। পরন্তু পুত্রের দৈনন্দিন উন্নতিতে তাঁহাদের অভদ্রোচিত ঈর্ষা দেখিয়া; সে যত পারিল তাঁহাদের আচরণের উপর তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করিল। বিন্দু বুঝিয়াছিল, তাহার পুত্র যে দিন পাঠশালা হইতে বাহির হইবে, সে দিন সে একটী ছোটখাটো চাণক্য পণ্ডিত হইয়া, এই ইংরাজীপড়া ছোঁড়াদিগের ঈর্ষান্বিত বাপগুলার মুখে কালী লেপিয়া দিবে।

কিন্তু ঈর্ষান্বিত বাপগুলা বিদ্যাভূষণকে চাণক্য হইবার অবকাশ দিল না। তাঁহারা আজ তাহার বিদ্যামন্দির গমনের পথরোধ করিতে বদ্ধপরিকর।

রামধন চাটুয্যে বিধুর বগল হইতে শিশুবোধ-কথামালার পুঁটলীটা বাহির করিয়া লইলেন, হরিরাম কাড়িয়া লইলেন দোয়াতটা, আর তর্কনিধি পশ্চাৎ হইতে বিধুর বাহুমূলদ্বয় ধরিয়া, জোর করিয়া তাহার মুখটা বাটীর দিকে ফিরাইয়া দিলেন। আর বলিলেন—

"আঁটকুড়ীর ছেলে! তোমার জন্য আমরা যে লোকের কাছে মুখ দেখাইতে পারিনা। আর যদি কোনও দিন তুমি পাঠশালার দিকে মুখ ফিরাও তাহা হইলে তোমার ঠ্যাং খোঁড়া করিয়া দিব।"

পুস্তকের পুঁটুলি ও মস্যাধার পথপার্শ্বের নালার কর্দ্দমে নিক্ষিপ্ত হইল।

ব্যাপার দেখিতে বহুলোক সেখানে সমবেত হইয়াছিল। গোবিন্দ-গোলাওয়ালা বলিল—"আমি ঠাকুরকে বহুদিন হইতে নিষেধ করিয়া আসিতেছি। আমার দোকানে একটা মুহুরীগিরি পর্য্যন্ত দিতে স্বীকৃত হইয়াছি।"

চন্দ্র তরফদার বলিল—"আমার নাতী বলে, 'আমি বিদ্যাভূষণ ঠাকুরদাদাকে বোধোদয়ের পড়া বলিয়া দিই।"

পাকড়াশীদের ছেলে কেষ্টাটা অম্‌নি ট্যাঁক করিয়া বলিয়া উঠিল —"সেদিন গুরুমহাশয় বিদ্যাভূষণ কাকাকে 'নীল-ডাউন' করিয়া দিয়াছিলেন।"

কেবল গুরুমহাশয় গোলাম হাজরা সংবাদ পাইয়া বিজ্ঞদিগের এ অন্যায় কার্য্যের প্রতিবাদ করিতে ছুটিয়া আসিল। বিধুভূষণের ছাত্রত্বে তাহার অনেক প্রকারের লাভ ছিল। গুরুভক্ত যুবক তাহার গৃহের অনেক কাজ করিয়া দিত। আর বিন্দুবাসিনীর কাছে, পুত্রের অচিরে চাণক্যত্ব প্রাপ্তির আভাষ দিয়া, তাহার মাঝে মাঝে চালটা, ডালটা, গুড়টা, নারিকেলটা লাভ হইত। কিন্তু প্রতিবাদ করিতে আসিয়া গোলামের ভাগ্যে বিজ্ঞগণের তিরস্কার ঘটিল।

পরদিন প্রভাতে বিন্দুবাসিনীর করুণ রোদনে পাড়ার নরনারী প্রবুদ্ধ হইয়া, কারণ জানিতে গিয়া বুঝিল, বিদ্যাভূষণ মনের দুঃখে গ্রামত্যাগ করিয়াছে।

(২)

বিন্দুবাসিনী রামধন চট্টোপাধ্যায়ের জ্ঞাতিকন্যা। তাহার পিতা তাহাকে এক কুলীনের হাতে সমর্পণ করিয়া কুলমর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছিলেন। স্বামী 'বন্দ্যোপাধ্যায়' মহাশয়ের বিন্দুবাসিনী ছাড়া আরও অনেক স্ত্রী ছিল। যে সকল স্ত্রীর নিকট হইতে তাঁহার অর্থাগমের সম্ভাবনা থাকিত, বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বৎসরের অধিকাংশ সময় তাহাদেরই গৃহে গতিবিধি করিতেন। বিন্দুর পিতার তেমন সঙ্গতি ছিল না। সুতরাং এই স্বামি-বিয়োগ-বিধুরার ভাগ্যে কদাচিৎ স্বামি-সন্দর্শন সুখ ঘটিত।

কিঞ্চিদধিক ঊনবিংশবর্ষ পূর্ব্বে এই বহুবল্লভ ঠাকুরটী জায়ারূপিণী বিন্দুবাসিনীকে একটী আত্মজ রত্ন দান করিয়া একেবারে নিরুদ্দেশ হইয়াছেন। বিধুভূষণের আর পিতৃপরিচয়-ভাগ্যটা ঘটিয়া উঠে নাই।

বিন্দুবাসিনী বারোবৎসর পর্য্যন্ত স্বামীর আগমন প্রতীক্ষা করিয়া, যুগশেষে হাতের লোহা ফেলিয়া, সিঁথের সিন্দুর মুছিয়া বিধবার বেশ ধারণ করিয়াছে।

বিন্দুর সংসারে এখন তাহার প্রিয়পুত্র বিধু ভিন্ন আর কেহ ছিল না। তাহার পিতার যৎকিঞ্চিৎ ভূসম্পত্তি ছিল, তাহাতেই মাতা ও পুত্রের কোনও প্রকারে দিনযাপন হইত। এই পুত্রই বিন্দুর একমাত্র অবলম্বন, একমাত্র আশা। সেই পুত্র পাড়ার বিজ্ঞজনকর্ত্তৃক অপমানিত হইয়া দেশত্যাগ করিল, সুতরাং অভাগিনীর মনোবেদনার আর সীমা রহিল না। সে প্রভাতে উঠিয়াই আত্মীয়গণের নাম লইয়া রোদন করিতে লাগিল।

তর্কনিধির স্ত্রী স্বামীকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন—"বুড়ো মিন্‌সে! তুমি দলের সঙ্গে যোগ দিতে গেলে কেন?"

তর্কনিধি মহাশয় সে সময় একটী হুঁকায় মাঝে মাঝে টান দিতে দিতে আকাশের কোন অরুণতরঙ্গাকুলিত দৃশ্যের দর্শনলাভাশায় ঊর্দ্ধনেত্রে তন্ময়ত্ব অবলম্বন করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণীর প্রশ্নের যে কি উত্তর দিয়াছিলেন, বিন্দুবাসিনীর আর্ত্তরবপূরিত আমাদের বধির কর্ণে তাহা প্রবেশলাভের সুবিধা পায় নাই।

(৩)

বিধুভূষণের বুদ্ধি যাহাই হউক, কিন্তু সে শান্তপ্রকৃতির বালক বলিয়া গ্রামের ভিতরে তাহার একটা বিশেষ সুখ্যাতি ছিল। শুধু তাই নয়, বিধু পরকে আপনার জ্ঞান করিয়া সর্ব্বদাই তাহাদের সেবা-তৎপর ছিল। গ্রামবাসীদের মধ্যে কেহ কখন বিপদে পড়িলে বিধু ভিন্ন সে বিপন্মুক্তির উপায় ছিলনা। রাত্রে কাহারও ডাক্তার ডাকিবার প্রয়োজন হইয়াছে, পল্লীগ্রামের গুল্মবহুল বন্যমধ্যস্থ সরীসৃপ-সঙ্কুল পথে সেই অন্ধকারময় রাত্রে গ্রামান্তরে কে যাইবে? যাইবে

বিদ্যাভূষণ। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে, বিধবার ক্ষুদ্র বালক খেলা করিতে বাহির হইয়াছে, তখনও পর্য্যন্ত ঘরে ফিরে নাই—কে তাহাকে খুঁজিতে যাইবে? যাইবে বিদ্যাভূষণ। কোন গৃহস্থকন্যার আজ হাটে যাইবার লোক নাই, বিদ্যাভূষণ তাহার জন্য জিনিষ আনিতে হাটে চলিল। কেহ সদ্যপ্রসূতা গাভীটীর সন্ধান পাইতেছে না, বিদ্যাভূষণ তাহাকে খুঁজিয়া আনিল।

বই কাড়িয়া লইবার জন্য বিধু যে দেশত্যাগ করিবে এটা কেহই বুঝিতে পারে নাই। সুতরাং বিধুর অদর্শনে দুই একজনের আমোদ হইবার সম্ভাবনা থাকিলেও, গ্রামস্থলোকের অধিকাংশই দুঃখিত হইল। স্বয়ং তর্কনিধি মহাশয় ত অপ্রতিভ। মধ্যে মধ্যে গৃহিণীর তিরস্কার শুনিয়াও তাঁহাকে চুপ করিয়া থাকিতে হইত।

বিধুভূষণ গ্রামের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কুলীন। এইজন্য তর্কনিধি মহাশয় তাহাকে একমাত্র কন্যা ক্ষমাসুন্দরীকে দান করিবার অভিলাষ করিয়াছিলেন। মেয়েটী তাঁহার শেষ জীবনের এবং আদরের;— বিবাহ দিয়া তাহাকে চোখের অন্তরাল না করিতে হয়, এইটীই তাঁহার ইচ্ছা। অবশ্য ক্ষমাসুন্দরীর দানের কথা তিনি মনে মনেই রাখিয়াছিলেন। একদিন প্রসঙ্গক্রমে তিনি গৃহিণীর কাছে কথাটা পড়িয়াছিলেন মাত্র। সেই অবধি তর্কনিধিগৃহিণী অন্নদা দেবী বিধুভূষণকে কতকটা স্নেহের চক্ষে দেখিতেন এক এক দিন স্বামীর টোলে পড়িতে আসিয়া, যখন বিধু পাঠ ফেলিয়া, ক্ষমাসুন্দরীর খেলার ঘর রচনায় নিযুক্ত হইত, তখন ব্রাহ্মণকন্যার আনন্দের আর সীমা থাকিত না। তিনি কন্যা ও ভাবী জামাতার জন্মান্তরের দাম্পত্য জীবনের একটী ছবি দেখিতে পাইতেন। বিধুর নির্ব্বাসনে তিনি মর্ম্মাহত হইয়া, নিত্য সময়ে অসময়ে স্বামীকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন।

কিন্তু তর্কনিধি মহাশয়ের বিধুর উপর ক্রোধ হইবার যথেষ্ট কারণ

ছিল। তিনি বিধুকে মানুষ করিবার জন্য ভিতরে ভিতরে যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন। দিন কয়েক, তিনি তাহাকে পাঠশালা হইতে আনাইয়া নিজের টোলের ছাত্রবৃন্দের ভিতর বসাইয়া দিয়াছিলেন। মুগ্ধবোধের দুই একটা সূত্র তাহার কণ্ঠাধঃকৃত করিবার চেষ্টাও হইয়াছিল। কিন্তু তর্কনিধির শত চেষ্টায়ও বিধুর কোমল রসনা দিব্যকাঠিন্যযুক্ত—'সহর্ণের্ঘঃ' 'আদিগোচোর্গুব্রীঃ' 'দ্রোদ্রার্ঘশ্চান্নু,' প্রভৃতি বোপদেব বাক্যের রস গ্রহণে সমর্থ হইল না। দরিদ্র রসনা বার দুই তিন দন্তাহত ও রক্তাক্ত হইয়া, তিনদিন নিরীহ যুবকের আহারের ব্যাঘাত উৎপাদন করিল। সন্তানবৎসলা বিন্দুবাসিনী আবার তাহাকে গুরুমহাশয়ের আশ্রয়ে পাঠাইয়া দিল। তর্কনিধিও নিশ্চিন্ত হইয়া, তাহার পাঠশালা হইতে শুভ নিষ্কৃতিলাভ দিবসের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

কিন্তু প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকিতে তাঁহার ক্ষমার এগার বৎসর পার হইয়া গেল, গ্রামে তাহার সঙ্গিনীদের মধ্যে কেহই আর অবিবাহিত রহিল না। ইতিমধ্যে রামধনের পুত্র তিনটা ইংরাজী পাশ করিয়া ফেলিল, হরিরামের পৌত্রও ইংরাজীতে লায়েক হইতে চলিল; তথাপি আঁটকুড়ীর নন্দন বিধুভূষণ পাঠশালা হইতে বাহির হইল না। তর্কনিধি ক্রোধে বিধুর বিদ্যার্জ্জনের পথরোধ করিতে রামধনের সঙ্গে যোগদান করিয়াছিলেন।

(৪)

বিধুর নির্ব্বাসনে রামধন চট্টোপাধ্যায়ের একটু স্বার্থ ছিল। তর্কনিধি-গৃহিণী কথাপ্রসঙ্গে একদিন চট্টোপাধ্যায়-গৃহিণীর কাছে, ক্ষমার বিবাহ সম্বন্ধে স্বামীর অভিপ্রায়টা প্রকাশ করিয়াছিলেন। চট্টোপাধ্যায়-পত্নী, ক্ষমার মা'র নিষেধ সত্ত্বেও স্বামীকে সে কথাটা বলিয়া উদরাধ্মানের ও অগ্নিমান্দ্যের দায় হইতে অব্যাহতি লাভ করেন। শুনিয়া চট্টোপাধ্যায়ের মনে ঈর্ষা জন্মিল।

তাহার কারণ তর্কনিধি মহাশয়ের বেশ দু'পয়সা সঙ্গতি ছিল। সেই সম্পত্তির অধিকারিণী ওই একমাত্র কন্যা। ক্ষমা দেখিতে যদিও ততটা সুন্দরী ছিলনা, কিন্তু হইলে কি হয়, তাহার স্মরণ মাত্রেই তর্কনিধির লোহার সিন্ধুক ভেদ করিয়া আর একটা যে অপরূপ সৌন্দর্য্য মেয়েটার সর্ব্বাঙ্গে ঢাকাই মসলিনের মত জড়াইয়া তাহাকে আরব্যোপন্যাসের পরী করিয়া তুলিয়াছিল, চাটুয্যে মহাশয় অনেক ভাবিয়াও স্থির করিতে পারিলেন না, তাহার চেয়ে অপ্সরার রূপ কত বেশি। ফলে চিন্তা করিতে করিতে, ত্রিদিবকামিনীদিগের হরিচন্দনপুষ্পরেণুসম্পৃক্তা শ্রী ক্ষমার রূপের কাছে মলিন হইয়া গেল। এমন সর্ব্বলাবণ্যময়ী কন্যা, তাঁহার কন্দর্পকান্তি সর্ব্বগুণালঙ্কৃত রামরূপ বাবাজীবন বর্ত্তমান থাকিতে কিনা শ্রীহীন গণ্ডমূর্খ বিধুভূষণের হাতে পড়িবে !

ক্ষমার দুঃখে তাঁহার প্রাণটা যেন গলিয়া গেল। আর অদূর ভবিষ্যতের এই পিতৃমাতৃহীনা বালিকার পিতৃপিতামহসঞ্চিত অর্থের অযথা ব্যয় তাঁহার কল্পনাচক্ষে জাগিয়া হৃদয়টাকে বড়ই প্রপীড়িত করিতে লাগিল।

কিন্তু তিনি কেমন করিয়া তর্কনিধির কাছে কথাটা পাড়েন ! একে তিনি কুলীন, তাহার উপর ছেলের রূপগুণের কথা শুনিয়া কত দিগ্‌দেশ হইতে কত 'হট্টমালার' সম্বন্ধ কথা লইয়া কত ঘটক নিত্য তাঁহার কাছে যাতায়াত করিতেছে। সবার উপর কথাটা নিজে পাড়িলে বিবাহের পণ প্রাপ্তি সম্বন্ধে তাঁহার ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা। নিরুপায়ে চট্টোপাধ্যায় প্রিয়বন্ধু হরিরামের সাহায্যার্থী হইলেন।

তখন রামরূপ বি, এ পরীক্ষা দিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে, আর বোকা বিধুভূষণ তর্কনিধির টোলে বসিয়া, 'টুভিষ্টস্যাদাস্তটোঃ' বাক্যটা রসালবীজবৎ মুদিতনয়নে চর্ব্বন করিতেছে। এমন সময় হরিরাম

রামরূপের দূরদেশ যাত্রার শুভদিন দেখাইবার ছলে তর্কনিধির কাছে উপস্থিত হইল।

(৫)

তর্কনিধি তখন 'দাস্তটোঃ'-রূপ আঁটিটী বিদ্যাভূষণের সূক্ষ্ম গলছিদ্র মধ্যে প্রবিষ্ট করাইতে অসমর্থ হইয়া, ক্ষমার ভবিষ্যৎ ভাবিতে ভাবিতে অসার খলুসংসারের উপর চটিয়াছেন, এবং তাহাকে ধূম্রাচ্ছাদিত করিয়া লোকলোচনের অন্তরালে ফেলিবার জন্য হুঁকা হাতে করিয়াছেন।

দু'টা একথা সেকথা—'তিথ্যমৃতযোগ' 'উত্তরে যোগিনী'—বারবেলা, কালবেলার পর, হরিরাম রামরূপের কথা পাড়িলেন। বলিলেন—"রামরূপ বি, এ পাশ দিতে কলিকাতায় যাইবে, তাই তার বাপ আপনার কাছে যাত্রার দিনটা দেখাইতে পাঠাইয়াছেন।"

তর্কনিধি বাম হাতে হুঁকা ধরিয়া, দক্ষিণ হাতে পাঁজি লইলেন। হরিরাম কথাটা শুনাইয়াও তর্কনিধির মুখে কোন ভাবপরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিলেন না। তর্কনিধি পাঁজির পাতা উল্‌টাইতে লাগিলেন। কিন্তু যাত্রার শুভদিন বাহির করা দূরে থাকুক, সমস্ত পাঁজির ভিতরে তিনি একটা দিন পর্য্যন্ত খুঁজিয়া পাইতেছিলেন না। তিনি রামরূপ ও বিদ্যাভূষণের পার্থক্য উপলব্ধি করিতে অসমর্থ হইয়া একমেবাদ্বিতীয়ং হইতে বিনির্গত এক বিরাট মায়া পাঁজির পাতে পাতে অঙ্কিত দেখিতেছিলেন।

তামাক টানিতে টানিতে হরিরাম বলিলেন—"আহা! রামরূপটী কেমন ছেলে!"

কোনও উত্তর পাইলেন না। দিন দেখায় তর্কনিধি ব্যস্ত ভাবিয়া কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষার পর হরিরাম আবার বলিলেন—"আহা কেমন ছেলে!"

তর্কনিধি বলিলেন—"বাঁদর।"

হরিরামের চক্ষু কপালে উঠিবার আয়োজন করিল। "সেকি তর্কনিধি! অমন সোণার ছেলে বাঁদর!"

যাহাকে ভালবাসি তার সহস্রদোষ থাকিলেও, যদি কেহ তাহার এক-আধটা কাল্পনিক গুণও সময় বুঝিয়া শুনাইয়া দেয়, তাকে বুঝি সব দিতে ইচ্ছা হয়। বিধুকে তর্কনিধি একটু আন্তরিক ভালবাসিতেন। তাই হরিরামের কথাটা বিধুর সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইয়াছে মনে করিয়া তাহার হাতে হুঁকাটা দিয়া বলিলেন—

"তোমরা সবাই বল সোণার ছেলে, কিন্তু আমি হতভাগ্যের জন্য হাড়ে-নাড়ে জ্বলিয়া মরিলাম। সাতদিনে একটা সূত্র উচ্চারণ করাইতে পারিলাম না।"

হরিরামের ধড়ে প্রাণ আসিল। হুঁকার একটা টানে আপাদ-মস্তক ধূমপূর্ণ করিয়া, তর্কনিধিকে সেটা ফিরাইয়া দিয়া, ধূম্রমিশ্রিত অর্দ্ধোচ্চারিত বাক্যে তিনি বলিতে লাগিলেন—"আমি বিদ্যাভূষণের কথা বলিতেছিনা, রামরূপের কথা বলিতেছি।" তর্কনিধি তখন নিজের ভ্রম বুঝিলেন। তাঁহার অপ্রতিভ হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু অশাস্ত্রীয় ক্রোধ হৃদয়ে পুনঃ সঞ্চিত করিয়া বলিলেন—"ও দুইই সমান।"

হরি। কেমন করিয়া?

তর্ক। বিদ্যালাভ না হইলে, বাঁদর না হইয়া কি হইবে?

হরি। সেকি তর্কনিধি মহাশয়! বালক এই বয়সে যে তিনটা পাশ করিয়া ফেলিল।

তর্ক। করিয়া ভূত হইল। সে আমাকে শিখাইতে আসে। আমি একদিন ছাত্রদের জ্যোতিষ-শাস্ত্রের উপদেশ দিতেছি—সূর্য্য নিত্য কেমন করিয়া ঘুরে বুঝাইতেছি—এমন সময় জ্যাঠা ছেলেটা কোথা হইতে আসিয়া আমাকে বলিল, পৃথিবী ঘুরিতেছে। কালকের ছেলে,

সে তর্ক করিয়া আমাকে বুঝাইতে চায়। আরে মুর্খ! পৃথিবী যদি ঘুরিত, তাহা হইলে, এতদিনে তোর বাবার তেএঁটে মাথার সঙ্গে তোর কচি মাথার ঠোকর লেগে ঘী বাহির হইয়া পড়িত।

হরিরাম স্বকীয় ঘটকালীর বিফলতা রামধনকে জ্ঞাত করিলেন।

(৬)

রামরূপের বি, এ পাশের খবর আসিয়াছে। বিদ্যাভূষণের, টোল ছাড়িয়া পাঠশালায় আবার "প্রমোসন" হইয়াছে।

হরিরাম আবার তর্কনিধির কাছে যাতায়াত করিতেছেন, আর মাঝে মাঝে রামরূপ সম্বন্ধে একটা আধটা সুবিধামত কথা বলিতেছেন। একদিন তিনি বলিলেন, রামরূপকে জেলার বড় সাহেব ডাকিয়া পাঠাইয়াছিলেন।

তর্ক। বেশ।

হরি। তিনি বলেন, তোমাকে আমার এখানে একটা চাকরী দিতে ইচ্ছা করি।

তর্ক। খুব সদিচ্ছা।

হরি। কিন্তু রামরূপ চাকরী করিতে রাজী হইতেছে না।

তর্ক। কেন?

হরি। সে বলে, আমি একেবারে হাকিম হইব।

তর্ক। বটে!

হরি। কাজে-কাজেই সাহেব সেকহ্যাণ্ড করিয়া তাহাকে বিদায় দিয়াছেন।

সেকহ্যাণ্ডের অর্থ বুঝিয়া তর্কনিধি বলিলেন—"তাহাকে গঙ্গাজলে হাত ধুইতে বলিয়ো। কেননা সাহেবেরা অখাদ্য খায়।"

সুতরাং সেবারেও হরিরাম বড় সুবিধা করিতে পারিলেন না। আর একদিনের কথা—

হরি। পাঁইতাড়ার রাজার মেয়ের সঙ্গে রামরূপের বিবাহের সম্বন্ধ হইতেছে।

তর্ক। শুনিয়া সুখী হইলাম।

হরি। মেয়ের বাপ্ একটা জমীদারী দিবে বলিয়াছে।

তর্ক। আহা বাঁচিয়া ভোগ করুক!

হরি। কিন্তু তাহার বাপ রাজী হইতেছে না।

তর্ক। তার দুর্ব্বুদ্ধি।

হরি। মেয়েটী কালো।

তর্ক। রূপ লইয়া কি ধুইয়া খাইবে! তুমি তাহাকে রাজী হইতে বল।

হরি। বলিয়া দেখিয়াছি।

তর্ক। কথা শুনেনা।

হরি। বলে, ছেলে কালো মেয়ে বে করিতে চায় না।

তর্ক। ও! আজকালিকার ছেলে, বাপের পছন্দে তার পছন্দ হয় না। সাধে কি আর দেশে এত আফিনের দর চড়িয়াছে!"

আফিনের সঙ্গে মেয়ে-পছন্দের কি সম্পর্ক বুঝিতে না পারিয়া, হরিরাম বলিল—"আপনার ক্ষমাটী দিব্য মেয়ে।" তর্কনিধি আনন্দের আবেগে হাস্য করিলেন।

হরি। যথার্থ কথা বলিতে গেলে, অমন সুলক্ষণযুক্ত মেয়ে আর দেখিতে পাওয়া যায় না।

তর্ক। তবু কয়দিন মা আমার রোগা হইয়া গিয়াছে।

হরি। কেন—কোন অসুখ করিয়াছে কি?

তর্ক। তাতো বুঝিতে পারিতেছি না।

হরি। বিবাহযোগ্য হইল—বিবাহ দিতেছেন না কেন?

এমনি সময়ে ক্ষমা একটী সুন্দর খাঁচা হাতে সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল।

তর্কনিধি জিজ্ঞাসা করিলেন—"খাঁচা কে দিল রে?"

ক্ষমা বলিল—"বিধুদাদা তইরি করিয়া দিয়াছে।"

তর্কনিধি অমনি বলিয়া উঠিলেন—"হতভাগাটার অশেষ গুণ। ক্ষমার পুতুলের জন্য এমন সুন্দর ঘর করিয়া দিয়াছে, এমন থয়েরের বাগান রচিয়াছে যে, দেখিলে বিশ্বকর্ম্মার শিল্প বলিয়া ভ্রম হয়। কিন্তু মা সরস্বতী কেন যে ছোঁড়াটার উপর বিরূপ তা' বুঝিতে পারিলাম না।" হরিরাম বলিলেন—"বোধ হয় ছোকরা আরজন্মে রাজমজুর ছিল।"

বিদ্যাভূষণ আরজন্মে যাই থাকুক সেদিনও হরিরাম কোন সুবিধা করিতে পারিলেন না। তখন হতাশ হইয়া, তিনি রামধনের দৌত্য কার্য্যে ইস্তফা দিলেন।

রামধনের জেদ বাড়িল। তিনি মনে মনে স্থির করিলেন, তর্কনিধির কাছে কিছুও যদি না পাই, তথাপি তাহার কন্যার সঙ্গে পুত্রের বিবাহ দিব।

তিনি নিজে যাইয়া তর্কনিধির কাছে প্রস্তাব করিলেন। প্রথম দুই চারিদিন কোনও উত্তর পাইলেন না। একদিন তর্কনিধি বলিলেন—'ভাবিয়া দেখি,' অপর একদিন বলিলেন—"আমি বেশী কিছু দিতে পারিব না।"

রামধন বলিলেন—"আপনি হরিতকী দক্ষিণা দিয়া কন্যা দান করিলে, তাই আমার যথেষ্ট হইবে।"

বাস্তবিক তর্কনিধি একদিন নিজচক্ষে দেখিলেন, রামধন পাঁচ হাজার টাকা পণ ও সেই সঙ্গে সুন্দরী কন্যাদানের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিতেছেন।

ব্রাহ্মণ এইবারে ফাঁপরে পড়িলেন। এবং মনের আবেগে বিদ্যাভূষণকে মনে মনে অজস্র গালি দিলেন। তারপর গৃহিণীর কাছে আসিয়া বলিলেন—"রামরূপের সহিত ক্ষমাসুন্দরীর বিবাহ দিব।"

মেয়ে দেখিতে দেখিতে ডাগর হইয়া উঠিতেছে; সুতরাং অন্নদাসুন্দরী বিদ্যাভূষণের সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ দুঃখ প্রকাশ করিলেন এইমাত্র,—বিবাহে 'না' বলিতে পারিলেন না।

বিদ্যাভূষণের নির্ব্বাসনের একমাস পরে, একটা সুতাহিবুক যোগে ক্ষমাসুন্দরীর সঙ্গে রামরূপের বিবাহ হইয়া গেল। বিধুভূষণের জননীর সেদিনকার সান্ধ্য রোদন, রামধনের গৃহিণীর শঙ্খধ্বনিতে নিমজ্জিত হইয়া গেল।

(৭)

ইহার পর পাঁচ বৎসর। এই পাঁচ বৎসরে রামরূপ এম, এ ও আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। আর ক্ষমাসুন্দরী শ্বশুরগৃহ হইতে পিতৃগৃহে বার পঞ্চাশ যাতায়াত করিয়াছেন। তাহার কারণ, তর্কনিধির নিকট হইতে শুদ্ধমাত্র একটী হরিতকী দক্ষিণা লইয়া, চট্টোপাধ্যায় তাঁহার কন্যাটীকে পুত্রবধূত্বে গ্রহণ করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। কিন্তু হরিতকীটী কোন অবস্থাপন্ন হইবে, সেটা পাকা-দেখার সময় স্থির হয় নাই। সেইজন্য বিবাহের অব্যবহিত পূর্ব্বে তিনি গৃহিণীর অনুরোধে একটী পক্ক হরিতকীর দাবী করিয়া বসিলেন। কন্যাদায়গ্রস্ত ব্রাহ্মণ জাতিকুল বজায় রাখিতে, বিদ্যাভূষণের অপমানের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ যৎকিঞ্চিৎ কাঞ্চনমূল্য পঞ্চসহস্র রজতখণ্ড বৈবাহিককে দান করিয়াও পাঁচবৎসর মধ্যে পক্ক হরিতকীর ঋণমুক্ত হইতে পারিলেন না।

মধ্যে মধ্যে চট্টোপাধ্যায়-গৃহিণীর, পুত্রবধূটীর উপর তাগাদা পড়িত। আজ বৎস রামরূপ গাউন পরিয়া কলিকাতায় বড়লাট সাহেবের নিকট হইতে ডিপ্লোমা আনিতে যাইবে। তর্কনিধির পূর্ব্বজন্মার্জিত ভাগ্যে

জামাতার সে শোভা দেখিবার যদি সাধ থাকে, ত এখনি একশত টাকা দান করুক। আর যদি না থাকে, তাহা হইলে তাহার কন্যাকে ঘরে লইয়া যা'ক্। আমি আবার পুত্রের জন্ম অন্য ভাগ্যবতীর অনুসন্ধান করি। আজ পুত্রকে হাকিম করিবার জন্য স্বয়ং রাজরাজেশ্বরীর নিকট হইতে সনন্দ আসিতেছে। সেই সনন্দ আনিতে হইলে, বাছাকে চতুর্দ্দোলায় চাপিয়া বড়লাটের বাড়ী যাইতে হইবে, তাহাতে তর্কনিধির কন্যারই ভবিষ্যতের বাঁধা সুখ। সুতরাং এই অমূল্য পদমর্য্যাদার সুখটী লাভ করিতে, পাথেয়স্বরূপ যে কতকগুলি অকিঞ্চিৎকর রৌপ্যমুদ্রার প্রয়োজন হইবে. তাহা তর্কনিধি ভিন্ন অন্যে দিতে যাইবে কেন?

কাজেই মাঝে মাঝে ক্ষমাকে অর্থের প্রত্যাশায় পিতৃগৃহে যাইতে হইত।

বারম্বারের তাগাদায় তর্কনিধির প্রাণ কণ্ঠাগত হইল। অথচ বিচারদণ্ড হাতে করিলে, বাছার কচি হাতের কবজীতে ব্যাথা লাগিবে বলিয়া, রামরূপের হাকিম হওয়া হইল না। আর জেলা-কোর্টে ওকালতী করিতে গিয়া, তাহার গলায় সর্দ্দি বসিয়া গেল বলিয়া তাহার ওকালতীতেও সুবিধা হইল না। জজ সাহেব একদিন তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন—"তুমি ইস্কুল-মাষ্টারীর চেষ্টা কর। একটা তুচ্ছ অর্থহীন ফাঁকা কথা লইয়া মেয়েলী ঝগড়া করা তোমার ন্যায় বীর পুরুষের কার্য্য নয়।"

সাহেবের আদেশ অমান্য করা ভদ্রতার সীমা বহির্ভূত বলিয়া, রামরূপ মাষ্টারী করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া ঘরে ফিরিল।

চট্টোপাধ্যায়-গৃহিণী বুঝিলেন, স্বামী না বুঝিয়া একটা অলক্ষণা কন্যা গৃহে আনিয়াছেন। সুতরাং এরূপ কন্যার বাপ ও মা—দুইজনেই যখন তাহার লক্ষণহীনতার জন্য দায়ী, তখন হয় তারা পুত্রের কোন

একটা চাকরীর ব্যবস্থা করুক, না হয় 'বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী' শাস্ত্র বাক্যটার সত্যতা প্রতিপাদনের জন্য, রামরূপকে কতকগুলি টাকা দিয়া যে কোন একটা কারবারে নিযুক্ত করুক।

তর্কনিধি বৈবাহিকার এই সৎপ্রস্তাবে আপনাকে অনুগৃহীত বিবেচনা করিলেন। এবং বৎস রামরূপকে একদিন নিকটে পাইয়া বলিলেন, "বৎস! এখন তোমার জ্ঞানমাহাত্মের পরিচয় পাইতেছি। এখন বুঝিতেছি, পৃথিবীই অহর্নিশি ঘুরিতেছে।"

(৮)

রামরূপ কিন্তু এ সত্য বাক্যের সার গ্রহণে অসমর্থ হইল, এবং শ্বশুরের প্রতি কুপিত হইয়া, মায়ের কাছে সকল কথা প্রকাশ করিল, বলিল—"ও টুলো বামুনের সঙ্গে যদি আর সম্পর্ক রাখ, তাহা হইলে আমি দেশত্যাগী হইব।" চট্টোপাধ্যায়-গৃহিণী তাঁহার স্বামীকে বলিলেন—"যদি বাছার আমার আবার বিবাহ না দাও, তাহা হইলে গলায় দড়ী দিয়া মরিব।"

রামধন মনে মনে বুঝিলেন—"এ বড় মন্দ কথা নয়। অর্থোপার্জ্জনের এমন সুগম পন্থা এতকাল বিস্মৃত হইয়াছিলাম কেন?

দেশের দুর্ভাগ্য, কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা, কন্যাকে পাত্রস্থা করিবার অবসর পাইলে অনেক সময়ে দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া যায়। পুত্রের পুনর্ব্বিবাহের কথা রামধনের মনে জাগিতে না জাগিতে, পাত্রীর সন্ধান মিলিয়া গেল। সন্ধানদাতা হরিরাম ঘোষাল। রামরূপের প্রথম বিবাহের দৌত্যকার্য্যে বিফলমনোরথ হইয়া, তর্কনিধির উপর তাঁহার ক্রোধ হইয়াছিল। সেই ক্রোধের ফলে, তিনি ক্ষমাসুন্দরীর সর্ব্বনাশে প্রবৃত্ত হইলেন। পাত্রীর পিতার অবস্থা ভাল নয়। এইজন্য কন্যাটীকে বয়স্থা করিয়া, তিনি কোন বিপত্নীকের অপেক্ষা করিতেছিলেন। এখন এই সর্ব্বগুণাধার সপত্নীকের সন্ধান পাইয়া, তিনি

অনিশ্চিত বিপত্নীকের আশা পরিত্যাগ করিলেন এবং হরিরামের সঙ্গে মিশিয়া অভাগিনী ক্ষমার সর্ব্বনাশে অগ্রসর হইলেন।

এ কথা তর্কনিধি ও অন্নদাসুন্দরীর কাণে উঠিতে বাকী রহিল না। কন্যার দুঃখে মর্ম্মপীড়িত হইয়া চট্টোপাধ্যায়ের কাছে ব্রাহ্মণ-দম্পতী ছুটিয়া আসিলেন! কিন্তু ফল হইল না। কন্যা ক্ষমার এত বয়স পর্য্যন্ত পুত্রহীনতার দোহাই দিয়া, তিনি কুলধর্ম্ম রক্ষায় সচেষ্ট,—তর্কনিধির মিনতিতে কর্ণপাত করিলেন না। তর্কনিধি, কন্যাকে গৃহে লইয়া আসিলেন।

ক্ষমা এতকাল দেবতারও কাছে মনোভাব প্রকাশ করে নাই। বিদ্যাভূষণের নির্ব্বাসনের পর হইতে এই এতকাল পর্য্যন্ত সে সুখী কি দুঃখী, অন্যের জানা দূরে থাক্, তাহার পিতা মাতা পর্য্যন্তও জানিতে সমর্থ হন নাই। রামরূপের বিবাহের পর হইতে তর্কনিধির সংসারে এই যে এত ঝড় চলিয়া গিয়াছে, সে সকল ঝড়ের প্রকোপ কেবল ব্রাহ্মণ আর ব্রাহ্মণী সহ্য করিয়াছেন। অপমানে, শ্বশুর শাশুড়ীর তিরস্কারে, অর্থের জন্য নিত্য পীড়নে—এমন কি দাম্ভিক স্বামীর হৃদয়-হীনতায়—কিছুতেই তাহার ভ্রূক্ষেপ ছিল না। সমমর্ম্মী প্রতিবাসী-প্রতিবাসিনীরা তাহাকে বোকা মেয়ে বলিত।

একদিন ক্ষমাসুন্দরী অন্যমনে অন্তরের কথা প্রকাশ করিয়া ফেলিল। অন্নদাসুন্দরী স্বামীকে বলিতেছিলেন—"জামাইকে ব্যবসায় করিতে টাকা দিলেই যদি বিবাহটা বন্ধ হয়, ত কিছু টাকাই দাওনা কেন?"

ক্ষমা অন্তরাল হইতে কথা শুনিতেছিল। মায়ের কথা শুনিয়া, বাহিরে আসিয়া বলিল—"সর্ব্বস্ব দিলেও তাহাদের মন পাইবে না, আমার যা হইবার তা হইয়াছে। তোমরা কেন বৃদ্ধ বয়সে ভিখারী হইবে।"

তর্কনিধি মর্ম্মবেদনায় গালে হাত দিয়া নীরবে অশ্রুবর্ষণ করিতে-

ছিলেন। ক্ষমা বলিল—"কাঁদেন কেন বাবা! মূর্খের হাতে পড়িলে দুঃখে দিন যাইবে বলিয়া, আপনি পণ্ডিতের হাতে আমাকে দিয়াছিলেন। আমার অদৃষ্ট, তাহাতেও আমার দুঃখ ঘুচিল না।"

তর্কনিধি বলিলেন—"মা! নিরপরাধ ব্রাহ্মণসন্তানকে অপমানিত করিয়া দেশ হইতে তাড়াইয়াছি। এ আমার সেই মহাপাপের ফল।"

ক্ষমা বলিল—"আমারও বোধ হয় তাই। ইহাদের টাকা দেওয়া অপেক্ষা, আপনি তাহার দরিদ্রা জননীকে টাকা দিয়া প্রায়শ্চিত্ত করুন।"

অন্নদাসুন্দরী বলিলেন—"ঠিক কথা। ব্রাহ্মণের অভিশাপ লাগিয়াছে।"

ক্ষমা। সে ব্রাহ্মণ অভিশাপ দিবে না জানি। কিন্তু তার মায়ের দীর্ঘনিঃশ্বাসে আমার সর্ব্বনাশ হইতেছে।

বিস্মিতনেত্রে ব্রাহ্মণ, কন্যার মুখের পানে চাহিলেন। "মা! আমার সঙ্গে কাশীবাস করিতে পারিবি?"

ক্ষমা। সেত আমার সৌভাগ্য। অরণ্যে বাস করেন ত, আমি সঙ্গে যাইতে প্রস্তুত আছি।

(৯)

পরদিন প্রাতঃকালে তর্কনিধি, অর্থদানে ও ক্ষমাপ্রার্থনায় বিধুর নির্ব্বাসনের প্রায়শ্চিত্ত করিতে গিয়া দেখেন, বিন্দু দ্বার বন্ধ করিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে। তাহার পাড়ার লোকে কেহই তার খবর দিতে পারিল না। দুই এক দিন তাহার অপেক্ষা করিয়া, যখন দেখিলেন বিন্দু আসিল না, তখন কন্যা ও স্ত্রীকে লইয়া ব্রাহ্মণ কাশী যাত্রা করিলেন।

তার পরদিন বৎস রামরূপের দ্বিতীয়বার বিবাহের সম্বন্ধের শঙ্খধ্বনি হইল। স্থির হইল, একপক্ষ পরে বিবাহ হইবে। চট্টোপাধ্যায়ের

যথেষ্ট প্রাপ্তি না হইলেও, নানা জাতীয় হিসাবে কন্যার পিতার নিকট হইতে, প্রায় দেড়হাজার টাকার দ্রব্য পাইবার সম্ভাবনা রহিল।

তৎপর দিন অন্যমনস্কে ষ্টেট্‌সম্যানের বিজ্ঞাপন-স্তম্ভটা পরীক্ষা করিতে গিয়া রামরূপ দেখিল, রাণীগঞ্জের নিকটবর্ত্তী এক গ্রামে এক নবপ্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের পদের জন্য একজন এম,এর প্রয়োজন। বেতন একশত টাকা।

অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া রামরূপ উক্ত গ্রামের উদ্দেশে এক খানা দরখাস্ত নিক্ষেপ করিল।

সপ্তাহমধ্যে টেলিগ্রামে প্রত্যুত্তর আসিল—"আবেদন গ্রাহ্য হইল, পত্রপাঠ রওনা হউন।"

বিদ্যুৎগতিতে এ শুভসংবাদ চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ী হইতে পাড়ায় পাড়ায় রাষ্ট্র হইল। সকলে বলিল—"কন্যা কি সুলক্ষণা।"

বাধ্য হইয়া চট্টোপাধ্যায়কে ভাবী বৈবাহিককে জানাইতে হইল,—"দিন কয়েকের জন্য বিবাহ স্থগিত থাকুক। কেননা তাহার সুলক্ষণা কন্যার গুণে রামরূপ বাবাজীবনের হাকিমীর মত একটা চাকরী জুটিয়াছে। সেই পদ হইতেই বাবাজীবনের দুই দিন পরে জজ হইবার সম্ভাবনা।"

(১০)

কর্ম্মস্থানে যাইয়া অবধি রামরূপের সুখে দিন কাটিয়া যাইতেছে। উত্তম আহার, সুন্দর বাসস্থান,—চাকরে নিত্য পরিচর্য্যা করিতেছে—অথচ এক পয়সা খরচ নাই। ইস্কুলের সেক্রেটারী প্রতিদিন তত্ত্বাধান করিতেছেন।

রামরূপ পিতাকে লিখিলেন—"বড়ই সুখে আছি।"

পিতা লিখিলেন—"তাতো আছ; কিন্তু বিবাহের কি? কন্যার পতা আসিয়া নিত্য তাগাদা করিতেছে।"

রামরূপ উত্তর দিলেন—"বিদ্যালয়ের মালিকের সঙ্গে দেখা না করিয়া কিছু লিখিতে পারিতেছিনা।"

"তবে দেখা কর।"

"তিনি এখন কাশীতে—শীঘ্রই এখানে আসিবেন।"

পাঠক মনে রাখিবেন, এ উত্তর প্রত্যুত্তর চিঠিতে চলিতেছে।

দিন কয়েক পরে, পিতা পত্র পাইলেন—"মালিক কাশী হইতে আসিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার সহিত আমার সাক্ষাৎ হয় নাই। তবে পত্রে তাঁহার মনোভাব জানিয়া বুঝিয়াছি যে, ইস্কুলটী নূতন স্থাপিত হইয়াছে বলিয়া, তিনি এখন আমাকে ছাড়িয়া দিতে পারেন না। তবে একান্তই যদি আমাকে বিবাহ করিতে হয়, তাহা হইলে তিনি এই স্থানেই বিবাহের বন্দোবস্ত করিতে প্রস্তুত আছেন। এখানে আপনাদের সামান্যমাত্রও অসুবিধা হইবে না। আমার মনীব যেমন ধনবান, তেমনি সদাশয়। গ্রামের লোকও অতি ভদ্র।"

(১১)

আজ সন্ধ্যার পর রামরূপের সহিত মালিকের সাক্ষাৎ হইবার কথা। কাল ভাবীশ্বশুর, কন্যাকে লইয়া সেই গ্রামে উপস্থিত হইবেন, সঙ্গে তাহার পিতা ও উভয়পক্ষীয় দশ পনেরো জন লোক আসিবে। রামরূপ উত্তম বেশভূষা করিয়া, মনীব প্রেরিত লোকের প্রতীক্ষায় বসিয়া আছে, এমন সময় গোলাম হাজরা গুরুমহাশয় গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইল।

রাম। একি, গুরুমহাশয়! আপনি এখানে?

গো। আমি তোমাকে তোমার মনীবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করাইতে লইতে আসিয়াছি।

রাম। আপনি এখানে কি সূত্রে আসিয়াছেন?

গো। নিকটেই আমার একটী ছাত্র আছে, আমি তাহার কাছে

আসিয়াছিলাম, আসিয়া শুনিলাম, এখানে তোমার বিবাহ হইতেছে। আমারি সমস্ত ছাত্রের মধ্যে তুমিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত—আমার গর্ব্বের সামগ্রী। তোমার বিবাহ আমি দেখিতে আসিব না?

রাম। আমার মনীবের সহিত আপনার আলাপ কিসে হইল?

গো। তাঁর স্বামী আমার ছাত্র.

রাম। আমার মনীব কি স্ত্রীলোক?

গো। স্ত্রীলোক।

রাম। তাঁহার সঙ্গে কেমন করিয়া দেখা করিব?

গো। তাঁহার স্বামী নিকটে থাকিবেন।

গুরুমহাশয়ের সঙ্গে রামরূপ মনীব-দর্শনে চলিল।

(১২)

রামরূপের বাসা হইতে মনীবের বাড়ী পর্য্যন্ত সমস্ত পথটা—যে রামরূপকে দেখিল, সেই তাহাকে সম্যক অভিবাদন করিল। মনীবের বাড়ীর সম্মুখে সুন্দর বাগান। সেই বাগানের মধ্য দিয়া অট্টালিকা প্রবেশের পথ। পথের দুই ধারে সারি সারি প্রস্তরমূর্ত্তি। মূর্ত্তিব পরেই রেলিং। রেলিংএর পরে পথের উভয় পার্শ্বে শিল্পকার্য্যময় তৃণগালিচার মধ্যে মধ্যে নানা জাতীয় আলেখ্যলিখিতবৎ পুষ্পবৃক্ষ। দৃশ্য দেখিয়া রামরূপ মুগ্ধ হইল। ফটকের উভয়পার্শ্বে, পথের মধ্যে স্থানে স্থানে এবং বহির্দ্বার হইতে আরম্ভ করিয়া দ্বিতলে যাইবার সমস্ত সোপান পথে সুন্দর বেশ পরিয়া, আশাসোঁটা হাতে অনেক ভৃত্য দাঁড়াইয়াছিল। রামরূপ যেমন অগ্রসর হইতে লাগিল, অমনি সকলে সসম্ভ্রমে সেলাম করিতে লাগিল।

ব্যাপার দেখিয়া রামরূপ বিস্ময়ে যদি আত্মাহারা না হইত, তাহা হইলে মুহূর্ত্তের জন্য তাহার মনে হইতে পারিত,—"আমিই এ অট্টালিকার মালিক।"

হাজরা-মহাশয় তাহাকে একটী সুন্দর গৃহের মধ্যে প্রবেশ করাইল, এই খানেই তাহার মনীবের সহিত সাক্ষাৎ।

মনীবকে দেখিয়াই বিস্মিত যুবকের মাথা ঘুরিয়া গেল। একি আশ্চর্য্য ব্যাপার! "ক্ষমা! তুমি এখানে?"

ক্ষমা। পতি-পরিত্যক্তা এরূপ স্থানে আসিবার যোগ্য না হইলেও ভাগ্যবশে এখানে আসিয়াছি।

রাম। আমি যাঁহার অধীনে চাকুরী করিতেছি, তিনি কই?

এবারে গুরুমহাশয় ক্ষমার হইয়া কথা কহিলেন। "তিনি তোমার ওই সম্মুখে।"

ক্ষমা ধীরে ধীরে স্বামীর কাছে অগ্রসর হইয়া, তাহার হাতে একতাড়া কাগজ দিল। দিয়া বলিল—"এই সমস্ত দলিলে লিখিত সম্পত্তি আমার ভাবী-সপত্নীকে যৌতুক দিয়ো।"

রামরূপ দলীলে দৃষ্টিমাত্র নিক্ষেপ না করিয়াই, ক্ষমার পায়ে ধরিতে অগ্রসর হইল। ক্ষমা বুঝিয়া সরিয়া দাঁড়াইল।

রামরূপ বাস্পগদ্গদ কণ্ঠে বলিল—ক্ষমা, এ নরাধম স্বামীকে ক্ষমা করিয়া নামের স্বার্থকতা রক্ষা কর।

"তুমি ক্ষমার গুরু, তোমার উপর ক্রোধ করিবার ক্ষমার অধিকার কি?"

রামরূপ পশ্চাতে চাহিয়া দেখিল—"কে আপনি?"

"আমি নির্ব্বাসিত।"

এখন যদি তর্কনিধি আসিয়া রামরূপকে বলিতেন যে—"বৎস রামরূপ পৃথিবীই ঘুরিতেছে," তাহা হইলে বৎস রামরূপ বোধ হয় আর শ্বশুরের উপর ক্রোধ করিত না। পৃথিবী ঘোরার কথা রামরূপ কেতাবেই পড়িয়া বিশ্বাস করিয়াছিল; কিন্তু আজ সে গতিশীলা

ধরার বিদ্যুৎবেগে আত্মপরিক্রমণ প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিয়া, চেয়ারে বসিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিল।

হাজরা বলিল—"বৎস রামরূপ! বিদ্যাভূষণ তোমার বয়ঃজ্যেষ্ঠ। চেয়ার হইতে উঠিয়া তাহার পদধূলি গ্রহণ কর।"

ক্ষমা বলিল—"বিধুদাদা, তোমাকে একদিনে অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী করিয়াছেন।"

(১৩)

এখন এই বিদ্যাভূষণের ঐশ্বর্য্যপ্রাপ্তির ইতিহাসটা না বলিলে গল্পটা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়।

বিদ্যাভূষণ বাটী হইতে বাহির হইয়া, এক এক্সিকিউটিব ইনজিনীয়র বাবুর পাচক কার্য্যে নিযুক্ত হয়। ইনজিনীয়র বাবু সে সময় এসেন-সোলের কাছে দামোদরের উপর এক পুল তৈয়ার করিতেছিলেন। বিধুর পড়াশুনাটা সুবিধামত না হইলেও, বাল্যকাল হইতেই স্থাপত্য-কার্য্যে তাহার একটা স্বাভাবিক দক্ষতা ছিল।

একদিন তাহার প্রভু এক সহকারী সাহেবের সঙ্গে মিলিয়া, পুল নির্ম্মাণ কার্য্যের একটা বিষম সমস্যায় পড়িয়াছিলেন। বিধু সেই সমস্যাটা পূরণ করিয়া দিয়াছিল। সাহেবজাতি গুণগ্রাহী। তদ্দণ্ডেই তিনি বিধুকে আপনার অধীনে একটা কনট্রাক্টারী কাজ দিলেন। আর একদিন সাহেবের অনুরোধে বিধু একটী ঘরের প্ল্যান করিয়া সাহেবকে নিজশক্তির পরিচয় দিবার অবকাশ পায়। এই সদাশয় সাহেবের অনুগ্রহে বিধুভূষণ অল্পদিনের মধ্যেই একজন বড় কনট্রাক্টর হইয়া পড়িল।

বিধু এইস্থানে কিছু জমী সংগ্রহ করে। ভাগ্যবশে তাহার ভিতরে পাথুরে কয়লার খনি বাহির হইল। অর্থাৎ ভাগ্য বছর পাঁচেকের ভিতরেই বিধুকে লক্ষটাকা আয়ের সম্পত্তি করিয়া দিল।

এতদ্ভিন্ন বিধুর দুই দুইটা কয়লার খনিতে নিত্য প্রায় পাঁচশত টাকার কয়লা উঠিতেছে।

বাটী হইতে বাহির হইয়া বিধু নাম গোপন করিয়াছিল। পাছে গ্রামের লোক জানিতে পারে, এইজন্য সে মাকে পর্য্যন্ত নিজের সন্ধান দেয় নাই। অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া বিধু অতি অল্পদিন হইল মাকে আনাইয়াছে।

ক্ষমাকে বিধু দশহাজার টাকা আয়ের সম্পত্তি দান করিল। আর গোলাম হাজরা গুরুমহাশয়, পুত্রপৌত্রাদি লইয়া পায়ের উপর পা দিয়া বসিয়া খাইবার সম্পত্তি প্রাপ্ত হইল।

বলা বাহুল্য, ক্ষমাসুন্দরী, রামরূপ, গোলাম হাজরা, বিন্দুবাসিনী প্রভৃতি বহু আত্মীয়ের অনুরোধে, কন্যার বিপন্ন পিতার মর্য্যাদা ও কুলরক্ষার্থ, করুণার্দ্র বিধু নবাগত বালিকাকে আপনার পঞ্চবৎসরের উপার্জ্জিত ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী করিয়া লইল।

শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ।

তুকারামের আত্মকাহিনী।

তুকারাম, দুঃখ দুর্দ্দশায় পড়িয়া, নিজ অদৃষ্টকে ধিক্কার করা দূরে থাকুক, তাহাই তিনি সৌভাগ্যের সোপান বলিয়া বিবেচনা করিতেন। একটি অভঙ্গে, তৎসম্বন্ধে তাঁহার মনোভাব এইরূপ ব্যক্ত করিয়াছেন :—

ভালই হইল, দেব !—হ'নু দেউলিয়া,
ভালই—পাইনু কষ্ট দুর্ভিক্ষে পড়িয়া ;
সেই কষ্টে পড়ি' করি তোমায় চিন্তন,
সংসার হইল মোর অস্পৃশ্য বমন।
ভালই—আমার স্ত্রী বড়ই কর্কশা,
ভালই—আমার হ'ল এহেন দুর্দ্দশা।
ভালই—সমাজে মোর হ'ল অপমান,
ভাল হ'ল—সব গেল—ধন, ধেনু, ধান।
ভালই—করিনি আমি লোক-লাজ-ভয়,
ভালই—লইনু দেব—ও পদ্দ-আশ্রয়।
ভালই—করিয়াছিনু দেবালয়ে বাস,
স্ত্রীপুত্রের 'পরে করি' উপেক্ষা প্রকাশ।
তুকা বলে—ভালই—করিনু একাদশী,
ভজনে কাটানু রাত হইয়া উপোসী ॥

তুকারামের স্ত্রী, তুকারামের আচরণে কোপাবিষ্ট হইয়া, তাঁহার সম্বন্ধে যে সকল কথা বলিতেন তাহা নিম্নলিখিত অভঙ্গগুলিতে বর্ণিত হইয়াছে।

(১)

আমার সম্বন্ধে শুধু হ'ল সে সন্ন্যাসী,
ছাড়িল কি কিছুমাত্র অন্য ভোগ-রাশি ?

সহজে আসিয়া জোটে সর্ব্বসুখ তার,
অপমান দূর শুধু হ'ল না আমার।
কার্ পত্নী হয়ে এবে সংসার করিয়া
আপদ-বিপদ আমি রহিব সহিয়া ?
ছেলেদের দিব কিবা ?—খাবে যে আমারে ;
হ'ত ভাল যদি যে'ত সবগুলো মরে'।
ধুয়ে-পুঁছে নিল, কিছু না রাখিল ঘরে,
গরুটি নাই যে মেজে নিকোই গোবরে।
তুকা বলে ;—হতভাগি ! নাহি দেখ ভেবে
স্বেচ্ছায় বহিয়া বোঝা কেন কাঁদো এবে ॥

(২)

পূর্ব্ব জন্মে ছিল শত্রু হেন হয় বোধ,
—এ জন্মে স্বামী হয়ে লয় তাই শোধ।
এই দুঃখ কত আর রহিব সহিয়া,
হাঁ-করি অন্যের পানে থাকিব চাহিয়া ?
দূর হ' * বিঠ্‌ঠল তুই—কি করিলি বল্ ?
—তো-হতে মোদের-সব কি হ'ল মঙ্গল ?
তুকা বলে :—পত্নী মোর কোপের আবেশে
কাঁদে কভু গুমরিয়া—কভু ওঠে হেসে ॥

(৩)

এক বস্তা শস্য যদি ঘরে এল হায়,
ছেলেদের তবু কিছু খেতে নাহি দেয় ;

---

* তুকারামের ইষ্টদেবতা।

পরের পেটরা ভরে—সেই সে অপ্পেয়ে গৃহ-চোর ;
তুকা বলে :—দিতে গেলে—মুচড়িয়া ধরে হস্ত মোর।
হতভাগি ! পাপ তোর আছে যা' সঞ্চিত
—তা-হতেই এই সব দুর্ব্বুদ্ধি নিশ্চিত ॥

(৪)

কি খাবি এখন তুই বল্ বাছা মোরে,
বাপ তোর করে বাস মন্দির-ভিতরে।
মস্তক ভূষিত করে, কণ্ঠে পরে মালা,
নিজ ব্যবসায় ছাড়ি' থাকয়ে নিরালা।
ভরায় আপন পেট—নাহি চাহে আমাদের পানে,
হস্তে করতাল লয়ে হাঁ-করিয়া গায় দেব-স্থানে।
কি করি আমরা এবে ?—সে যে বনে করেছে প্রবেশ ;
তুকা বলে, ধৈর্য্য ধর—এখনো হয়নি সব শেষ ॥

(৫)

গেছে সে হয়েছে ভাল—মিলিয়াছে আর সমুদায় ;
পেট ভরে' খাব এবে—হোক্ শুষ্ক রুটি—কিবা তায়।
আমি হতভাগী তারে বকিয়াছি কত কটুভাষে ;
তুকা বলে ! কটু বটে—কিন্তু তবু মোরে ভালবাসে ॥

(৬)

নাহি চাহে কোন কিছু ব্যবসা করিতে
বিনাশ্রমে পেট ভরি' চায় যে খাইতে।
শয্যা হতে উঠিয়াই ধরিয়া কর্ত্তাল
সর্ব্ব-সাথে মিলি' করে শব্দ বিট্‌কাল।

জীবন্তে মরিয়া আছে—নাহি কোন লাজ,
সংসার দেখে না কিছু—মাটি হয় কাজ।
তাদের পত্নীরা পেয়ে ঘোর মনস্তাপ,
মাথা খুঁড়ে মরে, আর দেয় অভিশাপ।
তুকা বলে :—সব ঠিক্—এ-ত সমুচিত,
মাথা পাতি' লও যাহা ললাটে লিখিত।
"এই সব লোক কেন আইসে হেথায় ?
নাহি কিগো উহাদের কোনো ব্যবসায় ?"
দেবের সম্বন্ধে বিশ্ব আমার সোদর,
কিবা ব্যয় দিতে মিষ্ট কথায় উত্তর ?
বহু মিনতিতে যারে নাহি আনা যায়
সেও আসে প্রীতি-ভরে আমার হেথায়।
তুকা বলে :—হতভাগী না চিনে ভূষণে,
শূনী-সম তেড়ে যায় সবার পিছনে॥

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

তিব্বতদেশের বজ্র ভৈরব।

গত তিব্বত-যুদ্ধের সময়ে তিব্বত হইতে যে সকল আশ্চর্য্য বস্তু আনীত হইয়াছে তন্মধ্যে বজ্র ভৈরবের চিত্রফলক অন্যতম। গ্যাংচির সন্নিহিত কোন বৌদ্ধ বিহারে ইহা সংরক্ষিত ছিল। গ্যাংচি বিধ্বস্ত হইবার পর উহা ইংরেজ সৈন্যগণের হস্তগত হয়। এসিয়াটিক সোসাইটীর আগষ্ট মাসের অধিবেশনে আমি ঐ ফলকখানি প্রদর্শন করি। ইহার দৈর্ঘ্য ৩⅛ হস্ত এবং বিস্তার ১⅛ হস্ত। উহা চীন দেশীয় শিল্পের রীতি অনুসারে সুরক্ষিত ও সুচিত্রিত। ফলকের সম্মুখভাগে ক্রোধশীল বজ্র ভৈরবের মূর্ত্তি অঙ্কিত এবং পশ্চাদ্‌ভাগে তাঁহার সাধনের মন্ত্র তিব্বতীয় ভাষায় লিপিবদ্ধ।

চিত্রফলকখানি তিব্বতের কারগুপা সম্প্রদায়ের সম্পত্তি। অধুনা উহা বারাকপুরের সিবিল সার্জন পার্শিব্যাল লোপেজের অধিকারে বিদ্যমান আছে।

শিব বা রুদ্রের অন্য নাম ভৈরব। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের ৪১ ও ৬১ অধ্যায়ে অষ্ট ভৈরবের উল্লেখ আছে। উহাতে বজ্র ভৈরবের নাম দৃষ্ট হয় না বটে কিন্তু সংহার ভৈরবের উল্লেখ আছে। হিন্দুগণের সংহার ভৈরব ও বৌদ্ধগণের বজ্র ভৈরব বোধ হয় একই দেবতা। অতএব হিন্দুমতে বজ্র ভৈরব রুদ্রের নামান্তর বা রূপান্তর। কিন্তু তিব্বতবাসীগণ তাঁহাকে পরমকারুণিক অবলোকিতেশ্বরের মূর্ত্ত্যন্তর বলিয়া বর্ণন করিয়া থাকেন। তিনি বৌদ্ধধর্ম্মের শত্রুগণকে পদদ্বারা বিমর্দ্দিত করিয়া হস্তে অসি ধারণ পূর্ব্বক দণ্ডায়মান আছেন। তাঁহার মস্তক প্রকাণ্ড, উদর স্ফীত এবং পদ হ্রস্ব। তাঁহার চক্ষুঃ তিনটী, উহা রক্তবর্ণ; কুকুরের ন্যায় দন্ত; লোলায়মান জিহ্বা; কূর্চ্চ এবং নেত্রলোম পীতবর্ণ। তাঁহার সমস্ত শরীর সর্পদ্বারা পরিবেষ্টিত এবং

শরীরের চতুর্দ্দিকে দেদীপ্যমান অগ্নিশিখা বিরাজমান। নরমুণ্ড তাঁহার শিরোভূষণ এবং গলদেশ মুণ্ডমালা দ্বারা পরিশোভিত। যখন বৌদ্ধধর্ম্মের ধ্বংস আরম্ভ হয় তখন বুদ্ধদেব স্বপ্রচারিত ধর্ম্ম শত্রুগণের হস্ত হইতে রক্ষা করিতে অসমর্থ হইয়া বজ্র ভৈরবকে উহার রক্ষক নিযুক্ত করেন। এই সময়ে প্রকৃত বৌদ্ধধর্ম্ম লুপ্ত হইয়া তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম্ম আরম্ভ হয়।

বজ্র ভৈরবের বামপার্শ্বে তাঁহার শক্তি বিরাজিত। ইহাঁর নাম কালী। ইহাঁর গলদেশে নরমুণ্ডমালা ও হস্তে অসি।

কালীর নিম্নেই তাল বেতাল। উহাদের দেহে কঙ্কাল আছে কিন্তু চর্ম্ম নাই। উহারা নরমুণ্ড ভক্ষণ করে ও অস্থি লইয়া পরস্পর যুদ্ধ করে।

ফলকের উপরিভাগে আদি বুদ্ধ বজ্রধরের মূর্ত্তি। তিনি যোগাসনে আসীন। তাঁহার নিম্নে মহাযোগী তিলোপা উপবিষ্ট। তিনি বজ্রধরের সাক্ষাৎ শিষ্য। তিলোপার পার্শ্বে তদীয় শিষ্য নরোপা এবং তাঁহার পার্শ্বে তদীয় শিষ্য শ্রীজ্ঞান অতীশ। তিলোপা নরোপা ও অতীশ ইহাঁরা তিনজনেই ভারতবর্ষের লোক। অতীশের জন্মভূমি বঙ্গদেশের অন্তর্গত বিক্রমপুর। ১০৪২ খৃষ্টাব্দে তিনি তিব্বতদেশে গমন করিয়া বৌদ্ধধর্ম্মের অনেক সংস্কার সাধন করেন। তাঁহার মস্তকে রক্তবর্ণ উষ্ণীষ। বজ্রধরের বাম পার্শ্বে কারগ্যুপা সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা সুপ্রসিদ্ধ মার্পা ও তাঁহার পার্শ্বে তদীয় শিষ্য সুবিখ্যাত মিলরেপা। মার্পা ও মিলরেপা তিব্বতদেশের লোক হইলেও ইহাঁরা ভারতীয় রীতিতে পরিচ্ছদ পরিধান করিয়াছেন।

ফলকের পশ্চাদ্‌ভাগে ওঁ আং হূং এই বীজমন্ত্র ১৬ বার লিখিত। এই মন্ত্রের প্রভাবে দশবিধ দৈহিক মল অমৃতে পরিণত হয়। এতদ্ভিন্ন এই পার্শ্বে বজ্রভৈরব সাধনের মন্ত্র তিব্বতীয় ভাষায় লিপিবদ্ধ আছে।

মন্ত্রের সার মর্ম্ম এই :—"হে কালান্তক বজ্রভৈরব আমার এই উপহার গ্রহণ কর। আমার শত্রু বিনষ্ট হউক, বিঘ্ন দূরে যাউক, তুমি আমাকে ক্ষমা কর, আমার মঙ্গল কর। হে ভূত, প্রেত, পিশাচ, ডাকিনি, তোমরা এখানে আগমন কর, এখানে উপবেশন কর, আমাকে রক্ষা কর, এই উপহার গ্রহণ কর। হে বজ্রভৈরব তুমি পুরাকালে বুদ্ধের সমক্ষে বলিয়াছিলে তুমি তাঁহার ধর্ম্ম রক্ষা করিবে। অতএব তোমার পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞা অনুসারে তুমি বুদ্ধের ধর্ম্ম রক্ষা কর, এবং ধর্ম্মের শত্রুগণকে ধ্বংস কর। বৌদ্ধ ভিক্ষুমণ্ডলীকে রক্ষা কর। জীবগণের প্রতি করুণা বর্ষণ কর এবং যোগ সিদ্ধি লাভ করুক।"

বজ্রভৈরব অতি ভীষণ দেবতা। ইনি সন্তুষ্ট হইলে ইহকালে সুখ ও সম্পদ লাভ হয় এবং পরকালে নির্ব্বাণ সাক্ষাৎকার ঘটে তিনি ক্রুদ্ধ হইলে সর্ব্বনাশ হয়। এই হেতু লামাগণ সর্ব্বদা বজ্রভৈরব ও তাঁহার সহচর ভূতপ্রেতগণের ভয়ে কম্পিত কলেবর। ঐ ভূতপ্রেতকে সুপ্রসন্ন করার জন্য তাঁহারা সর্ব্বদা মন্ত্র তন্ত্রাদির আবৃত্তি করিয়া থাকেন।

কথিত আছে, গত তিব্বত যুদ্ধের সময়ে লামাগণ বজ্রভৈরব সাধন করিয়া ইংরেজ সৈন্যের উপর উহাঁর ক্রোধ আকর্ষণ করিয়াছিলেন। গ্যাংচিতে এই ব্যাপার অনুষ্ঠিত হয়। জেনারেল বেথুন প্রভৃতি এইখানে নিহত হন।

বজ্র ভৈরবের ফলকে নররুধিররঞ্জিত অঙ্গুলিচিহ্ন দৃষ্ট হয়।

শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ।

সুখ।

হে রাজন, এ সংসারে সুখ যারে বলে
তাহা তুমি দাওনি আমারে, দৃপ্তবলে
কাড়িয়া লয়েছ তার সর্ব্ব আয়োজন
মুহূর্ত্তের মাঝে, তবুতো আমার মন
পার নাই অসুখী করিতে, আপনি সে
তোমার অসীম কান্ত নীলাম্বরে মিশে,
তব চন্দ্র সূর্য্যালোক বসন্ত পবন
তব ছায়াপথ প্রান্তে গ্রহ অগণন
সুন্দর ভুবন তব অপার সাগর
নিত্য অভিনব ধাতু ভূধর নির্ঝর
অন্তহীন সৌন্দর্য্যের সমুদ্র মন্থিয়া
আনন্দ সঞ্চয় করি এসেছে ফিরিয়া!
বহুদূর তীর্থযাত্রী ভক্তের মতন
ফিরিল নির্ম্মাল্য বহি, পরিপূর্ণ মন।

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

অমঙ্গল।

এস অমঙ্গল, তোমাকে বরণ করিয়া গৃহে লইব। এতদিন তোমায় চিনি নাই, তাই তোমা হইতে দূরে রহিয়াছি,—রহিতে চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু তুমি দূরে থাকিতে দাও নাই।

আসমুদ্রহিমাচল ভারতে আজি তোমার অবিসম্বাদী প্রভুত্ব। মঙ্গল এদেশ পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে। গৃহে গৃহে আজি তোমার ধ্বজা উড়িতেছে; গৃহে গৃহে করুণ আর্ত্তনাদ আজি তোমায় অভিবাদন করিতেছে। রুগ্নদেহ, শীর্ণকায়, হৃতসর্ব্বস্ব লক্ষ নরনারী হৃদয়ের অস্থিমজ্জা দিয়া তোমার অর্চ্চনা করিতেছে। পুত্রগতপ্রাণা একমাত্র পুত্র তোমার চরণে বলি দিয়াছে। পতিব্রতা পত্নী হৃদয়সর্ব্বস্ব স্বামী-ধনে তোমার পূজা করিয়া অশ্রুজলে নিয়ত তোমার চরণ অভিষিক্ত করিতেছে; অন্নহীন কঙ্কালসার কোটী কোটী মানব ভিক্ষাখর্পরে তোমায় তর্পণ করিতেছে; ব্যধিপ্রপীড়িত অসংখ্য লোক মৃত্যুদ্বারে দাঁড়াইয়া তোমারই জয়ধ্বনি গাহিতেছে। বহুদিন হইতে আমরা তোমার অভ্যর্থনার জন্য প্রস্তুত হইয়া আসিতেছি। তোমার অপ্রিয় যাহা কিছু আমাদের ছিল, সমস্তই পরিত্যাগ করিয়াছি। শতশত বৎসর হইল এ ভারতে যদ্দ্বারা মঙ্গলের অর্চ্চনা হইত, সমস্তই আমরা ত্যাগ করিয়াছি। সংযম,—যাহা এই ভারতেরই বিশেষত্ব ছিল, অনেক দিন তাহা ভারত ছাড়িয়া পলায়ন করিয়াছে। স্বার্থত্যাগ,—যাহাতে আমাদের পারিবারিক জীবন মধুময় ছিল বহুদিন আমরা তাহা ভুলিয়া গিয়াছি। প্রীতি,—যাহা প্রতি গৃহস্থের গৃহ পূর্ণ করিয়া অপরিচিত অভ্যাগতকে গৃহে আহ্বান করিয়া লইত, এবং ইতর জীবে পর্য্যন্ত অজস্র প্রবাহিত হইত তাহা আমরা বিসর্জ্জন দিয়াছি। সন্তোষ

—যাহা আমাদিগের পিতামহগণকে শাকান্নে তৃপ্ত করিয়া মহত্তর বিষয়ে মনঃসংযোগ করাইত, আমরা জন্মের মতন তাহা হারাইয়াছি। এই সমস্তেরই ফলস্বরূপ যে অনিন্দনীয় স্বাস্থ্য আমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের প্রতি গৃহ প্রতি পল্লী অলঙ্কৃত করিত, সে আমাদিগকে অভিসম্পাত দান করিয়া ছাড়িয়া গিয়াছে। আমরা উচ্ছৃঙ্খল জীবন অশান্ত স্বার্থপর মন, রুগ্ন দেহ ও ছিন্ন কন্থা লইয়া তোমায় অভিবাদন করিতেছি, তুমি প্রসন্ন হও।

তুমি অনন্ত ক্ষমতাশালী ও বহুরূপী। ব্যাধি, জরা, মৃত্যু ও দারিদ্র্যরূপেই তুমি এতদিন পরিচিত ছিলে; অধুনা পাশ্চাত্য সভ্যতা রূপ এক নূতন মূর্ত্তি ধরিয়া তুমি ভারতে বিরাজ করিতেছ। তুমি ছদ্মবেশী; মঙ্গলের মূর্ত্তি ধরিয়া ভারতসন্তানকে প্রলুব্ধ করিতেছ, আমরা দলে দলে তোমার পশ্চাৎ ছুটিয়াছি; বিলাসস্রোতে গা ঢালিয়া দিয়াছি; তুমি কোথায় লইয়া যাইবে, কে জানে?

আমাদিগের সর্ব্বস্ব হরণ করিয়া, তুমি দেশের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত এক নিবিড় কুহেলিকায় আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছ। শান্তিনিকেতন পল্লীগ্রামগুলি সুখস্বাচ্ছন্দ্যে পরিপূর্ণ ছিল, আজি সেখানেও তুমি পাশ্চাত্য সভ্যতারূপে প্রবেশ করিয়া নিবিড় বিষাদ-কালিমা ঢালিয়া দিয়াছ। আজি আর তথায় দরিদ্র ব্রাহ্মণসন্তান পাকান্ন ভোজন করিয়া,—শুভ্র উত্তরীয় গায়ে, চন্দন চর্চ্চিত ললাটে রাজধানীর ভোগবিলাস তুচ্ছ করে না। বিলাসলালসা, অর্থ-পিপাসা আজি পল্লীগ্রামের অন্তরতম প্রদেশে প্রবেশলাভ করিয়াছে। আজি দলে দলে লোক রাজধানীর অভিমুখে অর্থলোভে ধাবিত হইতেছে আর নিয়তির কঠোর নিষ্পেষণে পীড়িত হইয়া বিধাতাকে অভিসম্পাত করিতেছে। অত্যন্ত অনাবশ্যক নিত্য নূতন অভাব সৃষ্টি করিয়া, তাহারই পরিপূরণার্থ আমরা অমূল্য জীবন অতিবাহিত

করিতেছি, আর অকৃতকার্য্য হইয়া মনস্তাপে জীবন বিষময় করিয়া তুলিতেছি। আজি সে চিত্তের বল নাই, মহদ্বিষয়ে মনঃসংযোগের প্রচার নাই; যাহার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই তাহাই না পাইয়া আমরা কাঁদিয়া মরিতেছি—আর যাহা অতীব প্রয়োজনীয়, তাহাই অবহেলা করিতেছি।

আজি আর ব্রাহ্মণকণ্ঠনিঃসৃত বেদগান সায়াহ্ন ও প্রত্যূষ গগনে উত্থিত হইয়া বিধাতার চরণপ্রান্তে মিলাইয়া যায় না। আজি আর ব্রাহ্মণ ব্রহ্মাণ্ডের ঐশ্বর্য্যকে তুচ্ছ করিয়া ভিক্ষাভাণ্ডকরে তপোবন আশ্রয় করে না। জীবনমধ্যাহ্ন অতিবাহিত হইলে গৃহস্থগণ আজি আর বিধাতার চরণে বাণপ্রস্থাশ্রমে আত্মজীবন উৎসর্গ করেনা। জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, শূদ্র সকলেরই আজি এক চিন্তা,—অর্থ। বিধাতা আজি সিংহাসনচ্যুত, অর্থ তাঁহার স্থানে প্রতিষ্ঠিত। সেই চিত্তোন্মাদকর, বিলাসসহচর অর্থের অনুগ্রহলাভেও আমরা বঞ্চিত। তাই রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতাহীন বলিয়া করুণ বিলাপে আমরা নভস্তল পরিপূরিত করিতেছি। সে বিলাপ বিধাতার চরণে পৌঁছায় না। সে বিলাপে আন্তরিকতা নাই—আত্মবিস্মৃতি নাই; জননীস্বরূপা জন্মভূমির দুঃখে আমরা কাঁদিতে জানি না; স্বদেশ-ভক্তি কাহাকে বলে, আমরা ভুলিয়া গিয়াছি। আমরা ভুলিয়া গিয়াছি, স্বদেশপ্রেমিকশিরোমণি প্রতাপসিংহ যখন জননীর দুঃখে বিগলিতহৃদয়ে পর্ব্বত হইতে পর্ব্বতান্তরে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছিলেন—তখন তিনি সর্ব্বত্যাগী ভিখারী। বড় সাধের চিতোর শত্রুকরতল হইতে উদ্ধার করিতে পারেন নাই বলিয়া, যুদ্ধের পর যুদ্ধে মোগলকে পরাস্ত করিয়াও তিনি পর্ণকুটীরবাসী। ভুলিয়া গিয়াছি, শিবজী যখন জননীর নামে সমগ্র মহারাষ্ট্র এক করিয়া সমস্ত ভারতের একীকরণের জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার

পতাকা ছিল সন্ন্যাসীর গৈরিক বসন। গুরু গোবিন্দসিংহ যখন মহাপ্রাণ শিখজাতি গঠন করিয়া তুলিতেছিলেন—তখন তিনি ছিলেন মহা বৈরাগী। যখন ভারতের সুখের দিন ছিল—বহু বৎসর পূর্ব্বে মহারাজ অশোক যখন এক পতাকাতলে সমস্ত ভারতবর্ষ সমবেত করিয়াছিলেন—তখনও তিনি ছিলেন ভোগসুখ বিতৃষ্ণ রাজর্ষি। মহারাজ শিলাদিত্য সর্ব্বস্ব দান করিয়া নিঃসম্বল হইয়া রাজ্যশাসন করিতেন। আর সেই লোকাতীত মহাপুরুষ—বত্রিশ বৎসরে যিনি জীবনব্রত উদ্‌যাপন করিয়াছিলেন, প্রান্ত হইতে প্রান্তান্তর পর্য্যন্ত আজিও যাঁহার নাম অচলাভক্তির সহিত উচ্চারিত হয়, যিনি প্রকৃতই স্বদেশের দুর্গতি দর্শনে কাঁদিয়াছিলেন, এবং বহুমতবাদে বহুধা বিচ্ছিন্ন আর্য্যজাতিকে পুনরায় অদ্বৈতবাদমূলক বৈদিক ধর্ম্মের উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়া অবিনশ্বর একতার ভিত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছিলেন, সেই যোগিসত্তম শঙ্করাচার্য্য নবম বৎসর বয়সে সংসারের ভোগ সুখ পরিত্যাগ করিয়া জননীর সেবায় আপনাকে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। আজি সেই প্রতাপ, শিবজী, গোবিন্দের জন্মদেশে, সেই অশোক শিলাদিত্যের কর্ম্মভূমিতে, সেই শঙ্করপূজিত ধর্ম্মক্ষেত্রে দণ্ডায়মান হইয়া আমরা বক্তৃতার পৈশাচিক অভিনয় করিয়া মাতৃভক্তির বীভৎস অনুকরণ করিতেছি। দেশদেশান্তরানীত বহুমূল্য পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া আমরা জননীর নামে আত্মগৌরব বর্দ্ধনের চেষ্টা করিতেছি—আসুরিক আচরণে জননীর লজ্জা বর্দ্ধন করিতেছি।

তাই অমঙ্গল, জননীর লজ্জাবনত মর্ম্মদাহক্লিষ্ট মুখমণ্ডলে চাহিয়া তোমাকে সাদরে আহ্বান করিতেছি। আমাদের সম্মুখে তোমার ভীষণ মূর্ত্তি প্রকটিত করিয়া আমাদের আত্মাভিমান ও সুখলিপ্সা বিদূরিত করিয়া দাও। আমাদের প্রীতিধারাকে প্রকৃত পথে প্রধাবিত করিয়া আমাদের অতি ক্ষুদ্র, অতি নীচ প্রবৃত্তিগুলিকে বিনষ্ট কর।

যুগযুগান্তর ধরিয়া আমরা যাহা ভালবাসিয়া আসিতেছি তাহা সব কাড়িয়া লও। আমাদিগকে বুঝাইয়া দাও, তুমি মূর্ত্তিমান্ বিধাতার অভিশাপ, আমাদের দুর্নীতি ও স্বার্থপরতার দণ্ডবিধানের উদ্দেশ্যে স্বীয় গদা উত্তোলন করিয়াছ। আমাদিগকে কল্যাণময়ী তপস্বিনী জননীর উপযুক্ত সন্তান করিয়া দাও। আমাদিগকে শিখাও বিলাসোপকরণে ভিখারিণী জননীর পূজা হয় না। তোমার কঠোর তাড়নে যদি আমরা বাহ্যজগতের অধীনতাপাশ মোচন করিতে সমর্থ হই, জননীকে প্রকৃত ভক্তি করিতে শিখি, তাহা হইলে পার্থিব যাবতীয় কল্যাণ আমাদের অধিগত হইতে বিলম্ব হইবেনা।

জীবন অভিনয়।

(১)

মলিনার জন্মদিনে তাহার আত্মীয় স্বজন সকলেই তাহার জন্য এক একটী উপহার লইয়া আসিয়াছেন; জনার্দ্দনও একটী উপহার আনিয়াছে। জনার্দ্দন সম্পর্কে মলিনার কেহ হয় না। সে তাহার পিতার বন্ধুপুত্র মাত্র, তবে বাল্যকাল হইতে এখানে যাতায়াত করে, তাই নিঃসম্পর্ক হইলেও মলিনার পিতা মাতা তাহাকে পুত্রতুল্য আত্মীয় বলিয়া মনে করেন। বলা বাহুল্য, সে মলিনাকে ভালবাসে। মলিনার পিতা মাতা ইহাতে অসন্তুষ্ট নহেন; জনার্দ্দন যদিও ধনীপুত্র নহে, কিন্তু বংশে সম্ভ্রান্ত এবং বুদ্ধিমান; বি-এ দিয়া বি-এল পড়িতেছে, তাহাকে ইংলণ্ডে পাঠাইলে ভবিষ্যতে সে যে একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি হইয়া দাঁড়াইবে এরূপ তাঁহারা আশা করেন।

মলিনার কিন্তু জনার্দ্দনকে ভাল লাগে না। জনার্দ্দন সদা সর্ব্বদা তাহার ভালবাসা দিয়া মলিনাকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিতে চায় ইহাতে তাহার অতিশয় বিরক্ত বোধ হয়। মলিনা বাগানে ফুল তুলিতেছে, হঠাৎ জনার্দ্দন আসিয়া তাহাকে একটি সুন্দর ফুল আনিয়া দিল। মলিনা বাজনা বাজাইতেছে, হঠাৎ চাহিয়া দেখিল, জনার্দ্দন গৃহকোণে চুপ করিয়া বসিয়া মলিনার বাজনা শুনিতেছে; মলিনা পাঠ মুখস্থ করিতে করিতে কোন স্থানে কোন কথার একটা অর্থ বুঝিতে পারিতেছেনা—অভিধানখানা খুলিতেও কষ্ট বোধ হইতেছে, হঠাৎ ঠিক সময়ে জনার্দ্দন আসিয়া হাজির। আবশ্যক হইলে মলিনা জনার্দ্দনের নিকট হইতে সাহায্য লইতে কুণ্ঠিত হয় না, তবে এজন্য জনার্দ্দন তাহার কৃতজ্ঞতাভাজন নহে। সেবা করা দাসের ধর্ম্ম; কিন্তু সেবা গ্রহণ করিয়া কোন্ প্রভু কবে কৃতজ্ঞ হইয়া থাকেন!

যাহা হউক, জনার্দ্দনের এরূপ শত অপরাধও মলিনা মার্জ্জনা করিতে পারিত, যদি হতভাগ্য যুবক জনার্দ্দন না হইয়া ললিত, মোহন বা এইরূপ কোন শ্রুতি-মধুর নাম ধারণ করিত। যখন মলিনা ভাবে লোকে তাহাকে মিশেস জনার্দ্দন বলিবে—তখনি এমন বেতর বেসুরা সুরে কথাটা খট করিয়া তাহার প্রাণে লাগে, যে তাহার বাজনার সমস্ত সুরগুলা একসঙ্গে বেসুরা বাজিলেও তাহার কাণে তাহা তত কঠোর লাগে না। তাহাদের বাগানের মালীর নাম জনার্দ্দন; ভদ্রলোকের এ নাম তাহার বিবেচনায় অসহ্য।

সেক্সপিয়ার বলিয়াছেন, নামে কি আসে যায়। কিন্তু দেখা যাইতেছে, কবিও ভুল করিয়াছেন, শব্দেরও মাহাত্ম্য আছে বইকি! হায়! জনার্দ্দনের পিতা মাতা যদি ভবিষ্যদ্দর্শক হইতেন!

জনার্দ্দন, মলিনার জন্মদিনে, নিরতিশয় আগ্রহপূর্ণ হৃদয়ে একটী মুক্তার ব্রোচ আনিয়া টেবিলের অন্যান্য উপহার দ্রব্যের নিকট রাখিল।

মলিনার মাতা ব্রোচটি হস্তে তুলিয়া লইয়া, দেখিয়া বলিলেন, বাঃ বেশত! বলিয়া তৎক্ষণাৎ তাহা দিয়া মলিনার স্কন্ধবস্ত্রে তাহার অঞ্চল আবদ্ধ করিয়া দিলেন।—সেই হইতে মলিনা প্রতিদিনই সেই ব্রোচটি পরিত। আর এই উপহারে প্রতিদিন মলিনাকে সজ্জিত হইতে দেখিয়া জনার্দ্দন যে কিরূপ আনন্দলাভ করিত তাহা সে ভিন্ন অন্যে কেহ বুঝিত না।

(২)

মলিনা এণ্ট্রেন্স দিবার পর পিতার সহিত পশ্চিমে বেড়াইতে গিয়াছিল। অদ্য প্রাতঃকালে বাড়ী ফিরিল। মলিনার পিতা কোন কার্য্যোপলক্ষে কিছুক্ষণের জন্য তাহার একটি বন্ধুর বাড়ী নামিলেন, গাড়ী মলিনাকে লইয়া তাহাদের বাটী অভিমুখে চলিল।

বসন্ত কাল, সুন্দর বাতাস বহিতেছে—রাস্তার দুই ধারের বড় বড় ফুল গাছগুলি ফুলে ফুলে ভরা, পাখীর কূজনে চারিদিক গীতিময়—এই সুদৃশ্য সুন্দর প্রভাতের ন্যায় মলিনার নব উন্মেষিত হৃদয়েও সুখের উচ্ছ্বাস বহিয়া যাইতেছিল। পশ্চিমে গিয়া এবার শিশিরকুমারের সহিত মলিনার নূতন আলাপ হইয়াছে, মুগ্ধপ্রাণে তাহার কথা ভাবিতে ভাবিতে সে বাটী প্রবেশ করিল। বাড়ীর গেটের মধ্যে ঢুকিবা মাত্র মলিনা মুখ বাড়াইয়া দেখিল, জনার্দ্দন সিঁড়ির কাছে দাঁড়াইয়া আছে। তাহার সুখস্বপ্ন সহসা ভাঙ্গিয়া গেল। চিরদিন কি জনার্দ্দনই তাহার নয়নপথ এইরূপে অন্ধকার করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিবে!

গাড়ী সিঁড়ির পাশে লাগিল; মলিনা নামিতে না নামিতে জনার্দ্দন প্রফুল্ল হাস্যমুখে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল—"মলিনা কেমন আছ?" মলিনা গাড়ী হইতে নামিয়া সিঁড়িতে উঠিতে উঠিতে শুষ্কমুখে উত্তর করিল—"ভাল।" ইত্যবসরে জনার্দ্দন তাহাকে উত্তমরূপে নিরীক্ষণ করিয়া—তাহার অঙ্গবস্ত্রে সেই ব্রোচটি না দেখিয়া বলিল "মলিনা সে

ব্রোচটি যে পর নাই ?” মলিনা চলিতে চলিতে উত্তর করিল্— “হারাইয়া ফেলিয়াছি,” বলিতে বলিতে উপরে উঠিয়া গেল। সম্বৎসর ধরিয়া বহুকষ্টে অর্থসঞ্চয় করিয়া তবে জনার্দ্দন একশত টাকার এই ব্রোচটি কিনিয়াছিল ; তাহার ত্যাগস্বীকার কিছুমাত্র উপলব্ধি না করিয়া মলিনা কিরূপ তাচ্ছিল্যভাবে সেই হৃত দ্রব্যের উল্লেখ করিল ! সে কথায় জনার্দ্দনের একখানি বক্ষপঞ্জর যেন শতচূর্ণ হইয়া ভাঙ্গিয়া গেল। মলিনা উপরে চলিয়া গেল, জনার্দ্দন তাহার নয়নের অনলাশ্রু-রাশি অঙ্গুলিদ্বারা সজোরে ভূমিনিক্ষিপ্ত করিয়া কিয়ৎকাল নিস্তব্ধে সেই খানেই দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার পর ? সেকি মনে মনে মলিনার নিকট চিরবিদায় লইয়া জন্মের মত সগর্ব্বে সে বাটী ত্যাগ করিয়া গেল? হায় ! তাহা নহে। মুহূর্ত্তপূর্ব্বে হৃদয়মধ্যে যে প্রফুল্লতারাশি বহন করিয়া সে মলিনাকে অভ্যর্থনা করিতে আসিয়াছিল সেই প্রফুল্লতা মাত্র বিসর্জ্জন দিয়া বিষণ্ণ মুখে ধীরে ধীরে সে আবার মলিনার নিকটেই আসিয়া দাঁড়াইল।

এইত জীবন অভিনয়।

কেহ কাঁদে কেহ হাসে　　দাঁড়াইয়া পাশে পাশে
তবুও কাহারো কেহ নয় !

শ্রীস্বর্ণকুমারী দেবী।

মহানাটক।

চতুর্থ অঙ্ক।

রাম। কি বাহিরে কি ভিতরে কোথাও কিছু না হেরি
পদচিহ্নাবলী ;
নাহি কি হেতায় সীতা ? অন্য পর্ণশালে তবে
গেছেন কি চলি' ?
আমি নহি সেই আমি ; —আমি যদি হইতাম
সত্যই রাঘব,
সীতার বিয়োগ-দুঃখ ক্ষণমাত্র সহ্য করা
হত অসম্ভব।
যে মোর হাতের যষ্টি পরণশালায়,
ভূতলে যে সমুদিত চন্দ্রলেখা-প্রায়,
যে ছিল এ জীবনের অবলম্ব-শাখা
—সীতা, সীতা, কোথা তুমি দেও মোরে দেখা।
আমারে-যে কইকেয়ী পাঠালেন বনে
করিলেন ঠিক্ কাজ— এবে ভাবি মনে।
"আছে মৃগ হিরণ্ময়"— হেন বুদ্ধি যার
বনেতেই বাস করা উচিত তাহার।
হৃদয় বিদীর্ণ শোকে, ভূ-রজে রঞ্জিত যবে রাম,
বনিতা-বিয়োগানলে অতিশয় সন্তাপিত-প্রাণ,
নিজ-কান্তা সম পৃথ্বী তাঁহারে অচিরে
আলিঙ্গন করে যেন আপন পতিরে।

(এই সময়ে মুনিগণের বাক্য।)

রাজ্যনাশ, বনে বাস, সীতার হরণ, আর
পিতার বিয়োগ,

হেম-মৃগ অসম্ভব　　　তবু মৃগে লুব্ধ হ'ল রাম ;
আসন্ন বিপত্তি-কালে　　　পুরুষের বুদ্ধি হয় ম্লান ॥
কর্ম্মের অধীন বুদ্ধি,　　　কর্ম্ম নহে বুদ্ধির অধীন ;
সুবুদ্ধি যে রাম সেও　　　অনুসরে' সুবর্ণ হরিণ ॥
রাজ্যচ্যুত করাইয়া　　　বনবাস ঘটাইয়া,
বিসম্বাদ করাইয়া
রাক্ষসাদি সনে,
বুদ্ধিরে ছলনা করি'　　　মায়ামৃগ রূপ ধরি,'
দারা-হারা করাইয়া,
ঘুরাইয়া বনে,
অতি দুষ্ট শঠ বিধি　　　—রাম যে গুণের নিধি
—তাঁহারেও ঘোর দুঃখে
ফেলিল কেমনে !

রাম।—(ভূমি হইতে উত্থান করিয়া।)

প্রিয়ার অধর-সুধা　　　আস্বাদন করিনু না মুখে ;
শিরীষ-কোমল তনু　　　প্রেমভরে না ধরিনু বুকে ;
ওরে রে লজ্জার বাধা !　　　কণ্ঠ ছাড়ি যারে তুই চলি ;
দে তুই কাঁদিতে মোরে　　　—"জানকি-জানকি" শুধু বলি ॥
হা ! প্রাণ-বল্লভা মম !　　　হা ! জনক-কুলের পতাকা !
মম-নেত্র-চকোরের　　　কমনীয় নব-ইন্দু-লেখা !
এইরূপ রামচন্দ্র　　　করিয়া বিলাপ নানামত
কুটীরের চারিধারে　　　ভ্রমিতে লাগিলা অবিরত ॥
হেথা আমি আলিঙ্গন　　　করেছিনু—হেথায় চুম্বন ;
—হেথায় করিনু গণ্ডে　　　কস্তুরীর পত্র-বিরচন ;
নেহারিয়া এই সব　　　নেত্রানন্দ বিহারের স্থান
প্রেয়সীর বিরহে কি　　　শতধা হয় না এই প্রাণ ?

(পুনর্ব্বার পর্ণশালা অবলোকন করিয়া।)

কমল-কোরক-আঁখি　　　প্রিয়ারে যেথায় আমি
আলিঙ্গিনু সেই এই স্থান,

সেই চন্দ্র-বদনের মধুর অধর-সুধা
হেথা আমি করেছিনু পান ;
এই সব পুষ্প হ'ত রঙ্গ-রসে বিমর্দ্দিত ;
—কোথা প্রিয়ে করিলে প্রস্থান ?
সুরম্য-সলিলে ওগো গোদাবরি ! দেখেছ কি
তুমি জানকিরে ?
কমল তুলিতে কিম্বা বিনোদন-তরে তিনি
গেলেন কি নীরে ?
এইরূপ প্রতি বৃক্ষে, প্রতি পথে, প্রতি নদে
প্রতি গিরি, মৃগ ও ময়ুরে
জিজ্ঞাসা করিয়া সবে —কোথা মৈথিলী বলি'
শ্রীরাম বেড়ান ঘুরে ঘুরে ॥
পর্ব্বতস্থ তরুগণ !— বহুল কুসুম-যুত
বায়ুভরে সদা ঘূর্ণমান—
জিজ্ঞাসিছে তোমাদের —ব্যাকুলাত্মা শোকদগ্ধ
দশরথ-পুত্র এই রামঃ—
বিম্ব-ওষ্ঠী চারুনেত্রা গজ-গতি দীর্ঘকেশী
মমহৃদি-স্থিতা সেই
সুমধ্যা সীতায়
হৃদয় হইতে মোর কোথায় কে লয়ে গেল
তোমরা কি দেখিয়াছ
বলগো আমায় ॥
শোনো বলি হে ভুজঙ্গ ! —তরু-পল্লবের প্রায়
যাহার সে চঞ্চল-রশনা,
বন্ধুক-কুসুম-সম শোভে যার নেত্র দুটি,
বায়ুভোজী ওহে তুঙ্গ-ফণা !
—দেখনি কি সম্প্রতি পথমধ্যে স্থিতা
সেই মোর চন্দ্রমুখী প্রিয়তমা সীতা ?

সেই এ নর্ম্মদা নদী ;　　সেই এ নিকুঞ্জস্থলী ;
সেই এই বন ;
সেই এই মহীধর ;　　সেই এই মলয়জ
সুমন্দ পবন ;
সেই সব সরোবর ;　　কিন্তু নাহি হেরি হেথা
প্রাণ-প্রিয়তমা
সেই মোর জানকীরে　—পয়োধর-ভারে যে গো
মন্থর-গমনা ॥
একে তুমি কৃশোদরী　　তাহে কুচভার-নম্র,
সহ্য নাহি হয় তব
বহুল ভ্রমণ।
দোলা-আরোহণেতেও　　হইতে যে শ্রান্তকায়,
কেমনে করিলে তুমি
এবে অতিক্রম
এ সব অজ্ঞাত দেশ ;—　　কানন, নির্ঝর, গিরি,
বিবর,—শ্বাপদ, মৃগ
যেথা অগণন ॥

তন্ন তন্ন অন্বেষিয়া কন্দরে কাননে,
দেখিয়া দেখিয়া যত নগবল্লীগণে,
স্মরি স্মরি' নিজকান্তা ও তাঁর ভূষণ
পর্ব্বতে পর্ব্বতে রাম করি' বিচরণ,
কান্তা-তরে সকাতরে করেন ক্রন্দন ॥

(সীতাকে না পাইয়া রাম)

সিংহ তব—কটিদেশ,　　হাসিটি—কুসুমাবলী,
কুরঙ্গী—নয়ন তব,　　কান্তিটি—চম্পক-কলি,
পিক তব—কণ্ঠস্বর　　মাধুর্য্য—অরণ্য-লতা,
গজরাজ—গতি তব　　নিল তোমা-হ'তে সীতা !
এরা সবে, লীলাপটু,　　বিভাগ করিয়া
সমস্ত সৌন্দর্য্য তব　　নিল কি হরিয়া ?

(সীতার নূপুর প্রাপ্ত হইয়া)

নেত্র মোর তৃপ্ত হল সীতা-সম হেরি' এই
সুশোভন নূপুর সীতার।
শোন বলি হে লক্ষণ! খুঁজিয়া বাহির কর
এইরূপ অন্য অলঙ্কার॥

লক্ষ্মণ। জানি না কেয়ূর আমি নাহি জানি কোন্‌টি বা
তাঁহার কঙ্কণ;
নূপুরটি শুধু চিনি —নিত্য আমি করি তাঁর
চরণ বন্দন॥

(কিয়দ্দূর যাইয়া সীতার পতিত উত্তরীয় দেখিয়া রাম)

রাম। যে, দ্যূত-ক্রীড়ায় পণ, প্রণয়-কৌতুকে যারে
করি কণ্ঠ-ডোর;
ব্যজন—সুরত-অন্তে, নিশীথ কলহ-কালে
যেই শয্যা মোর,
—মৃগনয়নীর সেই উত্তরীয় খানি
বিধিবশে এই দেখ পাইলাম আমি॥

(চন্দ্র দেখিয়া রাম লক্ষণের উক্তি-প্রত্যুক্তি।)

রাম। লক্ষ্মণ, আশ্রয় কর তরুতল, ওই দেখ
উদিল তপন।
লক্ষ্মণ। নিশাকালে সূর্য্যোদয়? না না, রঘুপতি—চন্দ্র
উদিছে এখন।
রাম। এ কথা কেমনে ভাই জানিলে লক্ষ্মণ?
লক্ষ্মণ। ওই দেখ কুরঙ্গরে করেছে ধারণ।
রাম। হা প্রেয়সি কোথা তুমি কুরঙ্গনয়নে!
হা! জানকি! হা! জানকি! অই চন্দ্রাননে!

(চন্দ্রের প্রতি রাম।)

শীতরশ্মি চন্দ্র তুমি,　　—কেন তবে করিতেছ
মোরে দগ্ধ, বরষিয়া
অনল কিরণ ?
শরে তোমা খণ্ড খণ্ড　　করিতাম, যদি তুমি
না হইতে জানকীর
মুখের মতন ?

(স্মৃতিভ্রংশে রাম লক্ষ্মণের উক্তি প্রত্যুক্তি ।)

রাম। কে গো তুমি ?
লক্ষ্মণ।　　ওগো নাথ রঘুনাথ ! আমি তব
কিঙ্কর লক্ষ্মণ।

রাম। আমি কেবা শীঘ্র বল ;
লক্ষ্মণ।　　দাদা তুমি মহাবীর
রঘুর নন্দন।

রাম। কেন এ বিজন বনে ?
লক্ষ্মণ।　　দেবীকে গো ইতস্ততঃ
করিতেছি মোরা অন্বেষণ।

রাম। কোন্ দেবী ? কেবা তিনি ?　　জনক-নন্দিনী সীতা ?
তারে তুমি খুঁজিছ এখন ?

হা প্রেয়সি ! হা জানকি !　　বিচ্ছেদের ভয়ে, নাহি
পরিতাম কণ্ঠদেশে হার ;
এখন মোদের মাঝে　　হইয়াছে ব্যবধান
—নদ, নদী, পর্ব্বত, পাথার॥
সহিলাম অনায়াসে　　রাজলক্ষ্মী ও পিতার
বিয়োগ দুঃসহ ;
সহিনু বিপিন-বাস,　　কিন্তু না সহিতে পারি
সীতার বিরহ।

ইনি লক্ষ্মী গৃহে মোর নয়নের অমৃত-অঞ্জন,
ও অঙ্গ-পরশে গাত্রে মাখা হয় স্নিগ্ধ চন্দন,
ওই বাহু কণ্ঠে মোর মুক্তাহার মসৃণ-শীতল
প্রিয়ার যা' সবই প্রিয় অসহ্য সে বিরহ কেবল।
বহ' বায়ু যেথা প্রিয়া; —পরশি' কান্তায় মোর,
আমারেও কর পরশন।
তুমি বিনা কেবা আর রক্ষিবে আমায় বল'
—এতে তবু পাইব জীবন।
প্রিয়ার বিরহ হতে চিন্তার বিপুল শিখা
এবে সমুত্থিত;
দিবারাত্রি তনু মোর দহিতেছে, প্রেমানল
হয়ে প্রজ্বলিত॥
দক্ষিণে মলয় বহে, সম্মুখেতে প্রসারিত
সুবিপুল বন;
বামদিকে ভৃঙ্গধ্বনি, পশ্চাতে সে সুদুঃসহ
চকার ক্রন্দন;
অন্তরে বিরহানল; —পঞ্চাগ্নি মাঝে থাকি'
ধ্যানেতে মগন
অতিদীর্ঘ রাত্রিগুলি কোনরূপে করিতেছি
আমি যে যাপন॥
চন্দ্র সে প্রচণ্ড এবে, মৃদুগতি সমীরণ
বজ্রের সমান;
মালাতে সূচির জ্বালা, চন্দন স্ফুলিঙ্গ সম
হয় অনুমান;
আলোক আঁধার-সম, পরাণো বিধির বশে
হল গুরুভার।
প্রমদা-বিয়োগ-কাল প্রলয়কালের মত

দুর্জ্জয় নির্দ্দয় স্মর !　　প্রফুল্ল-পঙ্কজ-বাণ
কর সম্বরণ ;
ত্যজ ধনু, আমা প্রতি　　পৌরুষ প্রকাশ করি'
কিবা প্রয়োজন ?
প্রেয়সী-বিয়োগ-জাত　　হুতাশনে দগ্ধ মোর
শরীর এখন।
মৃতকে প্রহার করা　　বলীর নহেক ধর্ম্ম
কহে বুধগণ।
তোমার ও-পঞ্চবাণ　　আপুঙ্খ হয়েছে মগ্ন
এ মোর হৃদয়ে ;
বিরহ-অনল-দগ্ধ　　তনু-সাথে তাহারাও
গেছে ভস্ম হয়ে।
তাই বলি, হে মদন !　　নিরস্ত্র এখন তুমি
না পারিবে আমারে জিনিতে ;
তব শরাঘাতে দুঃখী　　আমিই হইনু বটে
—অন্যে কিন্তু হল সুখী ইথে॥

(বিকসিত অশোক-তরুতলে বিশ্রাম করিয়া)

নব পল্লবেতে তুমি　　হয়েছ আরক্ত,
আমিও প্রিয়ার গুণে　　দেখ অনুরক্ত।
তোমার নিকটে আসি'　　জুটিতেছে শিলীমুখগণ,
স্মর-মুক্ত-শিলীমুখ　　আমাতেও হতেছে পতন।
কান্তা-পদাঘাতে তুমি　　হও প্রস্ফুটিত,
আমিও সে পদাঘাতে　　হই প্রফুল্লিত।
সকল বিষয়ে তুমি　　তুল্য হে অশোক,
কেবল আমারে বিধি　　করিল সশোক॥

(এমন সময়ে দৈবাৎ মার্ত্তণ্ডমণ্ডল অস্তগত হইলে শ্রীরামচন্দ্র, প্রচণ্ড
মার্ত্তণ্ড-রশ্মির ন্যায় পূর্ব্বদিকে উদয়স্থ অচণ্ড-রশ্মিমণ্ডল চন্দ্র-
মণ্ডলকে অবলোকন করিয়া লক্ষ্মণের প্রতি)

রাম। দেখ দেখ হে লক্ষ্মণ! তরুশিরে জ্বলে দাবানল,
নিবারণ কর উহা ঢালি দিয়া নির্ঝরের জল।

লক্ষ্মণ। কোথা দাবানল আর্য্য? উদয়-অচলে শশী
উঠিছে এখন।

রাম। বল দেখি তুমি তবে —ধূম কেন পুরোভাগে
করেছে ধারণ?

লক্ষ্মণ। নহে উহা ধূম আর্য্য, ধরণীর ছায়া মাত্র
হয়েছে পতন।

রাম। হায় হায়! কোথা তুমি ধরণি-দুহিতা,
হা জানকি!—হা জানকি! মইথিলি!—সীতা।
সীতা অন্বেষণে রাম নাহি যান যেই যেই স্থান
মনে হয় তাঁর, বুঝি সেখানেই সীতা বিদ্যমান।
যে যে গৃহে ভিক্ষু নাহি করয়ে গমন
—অন্নে পরিপূর্ণ দেখে সেই সে ভবন॥

(এইরূপ দৈববশে সীতা-গত-প্রাণ রামচন্দ্র গো-গবয়-গজ-শার্দ্দূল-সিংহাদি
ভীষণ জন্তু-সমাকীর্ণ বিশাল-তাল-তমাল-পরিপূর্ণ বনস্থলীতে
সীতার অন্বেষণ করিতে লাগিলেন)

সীতা অন্বেষণে গিয়া দেখিলেন রাম
পক্ষিরাজ জটায়ুর ওষ্ঠাগত প্রাণ।
"জানকীরে হরিয়াছে রাক্ষস রাবণ"
—এই বলি'তখনি সে ত্যজিল জীবন॥
দশরথ-মিত্র আর শত্রু-নিসূদন
সেই জটায়ুরে চিনি' শ্রীরাম তখন
এই কথাগুলি মাত্র কহিলেন তাঁয়;
—"হা তাত! হা তাত!—একি—একি হল হায়!"

(পারলৌকিক কৃত্য সমাধা করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে জটায়ুর প্রতি)

নিজ তেজে তাত ! তব স্বর্গে হ'ল গতি ;
যাও তুমি ! স্বস্তি হোক্ ! কিন্তু গিয়া তথি,
সীতা-হরণের বার্ত্তা বোলো না পিতায়।
আমি যদি রাম হই —কহিনু তোমায়—
স্বল্পদিনে, দশানন —বন্ধুগণ সাথে—
নিজেই বলিবে তাঁরে লজ্জানত মাথে॥

(কিয়দ্দূর গিয়া রাবণের ভগ্ন রথ দেখিয়া)

কিরূপে ভাঙিল তাত রক্ষোরাজ রাবণের রথ ?
তীক্ষ্ণ চঞ্চু-নখাঘাতে বন্ধন হইল বুঝি শ্লথ ?
হা জনকরাজপুত্রি ! দশানন-করীর মাথায়
জটায়ু-সিংহেরে তুমি দেখিয়াছ—ধন্য তুমি তায়।

(সীতা হৃতা হইয়াছে—জটায়ুর বচনে নিশ্চয় করিয়া আপনাকে তিরস্কার)

রাজ্য নাশ, বনে বাস, হৃতা সীতা, মৃত পিতা, হায়।
—ইহার একটি দুঃখে মহাসিন্ধু শুখাইয়া যায়।
সিন্ধু-সম এক-দুঃখ না হইতে-হইতে গো পার
অন্য এক দুঃখ আসি' উপস্থিত হইল আমার।
এখন বুঝেছি আমি— কিছুমাত্র নাহি ইথে ভুল
—একটি অনর্থ সেও রন্ধ্র পেলে হয় গো বহুল !
কৈকেয়ী করিলেন ভরতেরে রাজ্যে অভিষেক
—ঠিক্-ই করিলেন তিনি, নাহি ইথে অন্যায় তিলেক।
যে জন রক্ষিতে নারে আপন ঘরণী
—কেমনে করিবে রক্ষা সমগ্র ধরণী ?
উচিত করিলা পিতা বনে মোরে করিয়া প্রেরণ ;
এবুদ্ধিও নাহি মোর— কোথা মৃগ, কোথা বা কাঞ্চন॥
সাগর-কীরতি হ'ল সগর হইতে,
গঙ্গা-কীর্ত্তি ভগীরথ করিলা অর্জ্জন।
ভাল কীর্ত্তি রাখিনু-গো আমি অবনীতে
—এক ভার্য্যা না পারিনু করিতে রক্ষণ॥

যাহার প্রাপ্তব্য যাহা মনুষ্য তা পায়,
দেবতাও নাহি পারে নিবারিতে তায়।
তাই ত করি না শোক, হই না বিস্মিত,
না হয় ললাট-লিপি কভু অপনীত॥

(পান্থের প্রতি)

পরিণয়-কাল হতে আমারি লালিত যেই
—রঘুবংশ-উদ্ভবা সেই তন্বী সুতরুণী,
স্পর্শ-সুখাবহা, গৌরী, —কে হরিল তারে পান্থ ?
—সে যে গুণবতী, নিত্য-হৃদয় হারিণী॥

পান্থ। হে ভিক্ষুক সে কি তব পরিণীতা আপন কামিনী ?
রাম। তা হ'তে অধিক মোর —প্রাণপ্রিয়া, যষ্টি-স্বরূপিনী॥

সীতা মোর অর্দ্ধ-হৃদি করেন দহন ;
অপরার্দ্ধ করে দগ্ধ রাজা দশানন।
প্রবল মদনানল এক অর্দ্ধে জ্বলে ;
অপরার্দ্ধ কবলিত দীপ্ত রোষানলে।
দুয়েরি প্রভাব তুল্য—অনুরূপ গুণ ;
—একটি তুষের, অন্য ঘুঁটের আগুন॥

খুঁজিতেছি চন্দ্রাননে —বিমুখ সে নিদারুণ বিধি ;
তবে কি ভুলিব তারে ? —সুগভীর প্রেম যে বিরোধী।
ভক্ষিব গরল তবে ? —কুলের কলঙ্ক হবে তায় ;
শান্তিরে ভজিব কি গো ? —কুটিল ধনু যে অন্তরায়॥
প্রিয়া দূরে—দুঃখ নাই, দুঃখ নাই—প্রিয়া মোর হৃতা ;
এই দুঃখ শুধু মোর —রয়েছে এ ধনু এবে বৃথা।
কৃশত্ব-জনিত মাংস গেল চলি ক্ষিতির সকাশ ;
কান্তার হরণে, তেজ গেল চলি, বায়ুতে—নিঃশ্বাস।
আকাশে মিশিল তনু বিরহে হইয়া তন্ময় ;
বজ্রপ্রাণ রামচন্দ্র তাই সে এখনো বাঁচি রয়॥

(শ্রীরামচন্দ্র সেখান হইতে অন্যত্র গমন করিয়া অগৌরবচন্দন
কর্পূর মৃগমদ-কুঙ্কুম চম্পকাদি কুসুম-বহুল-গন্ধোত্থিত
বায়ুভোজী-ভুজঙ্গ-ফণা-মণির উপর, কামিনী-লোচন-
গঞ্জন খঞ্জনকে দেখিয়া)

বামদিকে বসি' কাক　　　সূচে মোর মরণ বিপদ ;
দক্ষিণে ভুজঙ্গ-শিরে　　　খঞ্জন সে—রাজত্ব-সম্পদ।
জানকী-হরণ চেয়ে　　　কি বিপদ আছে বল' আর ?
খঞ্জন দর্শনে ব্যক্ত　　　রাজ্য-লাভ এদিকে আবার।
রাজ্য ও মরণ-মাঝে　　　শ্রেয় সে মরণ
মরণই শরণ মোর　　　মরণই শরণ॥

("কবন্ধ" দর্শন করিয়া)

"কে গো এই জন ?　　　—যোজন-বিস্তৃত বাহুদ্বয়ে
আক্রমিয়া বন-মার্গ　　　কবলিত করে জীব-চয়ে।"
লক্ষ্মণ কহিলে ইহা　　　—রামচন্দ্র অমনি তখন
গর্ভ-কদলীর মত　　　কণ্ঠ তার করিলা ছেদন॥
রাম-শরে গতপ্রাণ　　　"কবন্ধ" পবিত্র হয়ে
দিব্য দেহ তখনি সে করিল ধারণ।
পরে, তার কথা-মত　　　শ্রমণ-আশ্রম-দেশে
হনু-সনে শ্রীরামের হইল মিলন।
সীতার উদ্ধার-কাজে,　　　সুগ্রীব সবলে তাঁর
করিবেন সহায়তা—করে অঙ্গীকার।
শ্রীরামো বালীর বধে　　　হইলে স্বীকৃত, পরে
কপীন্দ্র সুগ্রীব-সনে হল সখ্য তাঁর॥
ঋষ্যমূক-পরবতে　　　নিঃসহায় করিয়া ভ্রমণ,
সমদুঃখী সুগ্রীবের　　　সখ্য রাম করিলা অর্জ্জন॥
চরণ-অঙ্গুষ্ঠ-দিয়া　　　সুদূরে নিঃক্ষেপ করি'

ক্রত-হস্ত রামচন্দ্র এক বাণে, ঘোর শব্দে
সর্ব্ব-জনে বধিরিয়া,
করিলেন ভেদ সপ্ততাল ;
ইথে বালীবধ আশা হইলা বর্দ্ধন
কপি-রাজ সুগ্রীবের মনে বিলক্ষণ ॥

(তাল-বেধ-সময়ে শ্রীরাম বাণের প্রতি)

বিশ্বামিত্র-পদে যদি থাকে মোর সতত ভকতি,
যদি বিপ্রজন- রাব কিছু নাহি থাকে মোর প্রতি,
আর, যদি নাহি থাকে মন মোর অন্য নারী'পরে,
সপ্ততাল ভেদি,' শর ! পশ'গিয়া পাতাল-ভিতরে ॥
রামচন্দ্র সপ্ততালে নিহত করিল বিনা-দোষে
—শুনিয়া একথা বালী প্রজ্বলিত হয়ে ঘোর রোষে,
গিরি-গহ্বর-হতে হইয়া নিঃসৃত,
সমর-অঙ্গনে আসি' হল উপস্থিত ॥
তারা ত্যজি কণ্ঠ-হার —খলিত-কবরী-ভার—
রহে গিরি-শিখরের পরে।
বালীর মরণ রণে ইচ্ছা করে মনে-মনে
—বিয়াকুল মদনের শরে।
বালী বড় বিসম্বাদী, সম্ভোগের প্রতিবাদী,
মরিলেই ঘুচে যে বালাই ;
রামের নারাচ-বাণ লউক বালীর প্রাণ
—মনে মনে তারা যাচে তাই ॥

লক্ষ্মণ। সসাগরা পৃথ্বীমাঝে বালী-সম বলী কেহ
নাহি ত্রিভুবনে।

রাম। (হাসিয়া)

লক্ষ্মণ ! কোরনা ভয়　　ধনুর্ধারী রামচন্দ্র
আমি বিদ্যমানে।
সাধুরে ত্যজিয়া, ভয়　　আশ্রয় কররে গিয়া
অসাধুর স্থানে ॥

বালী। রঘুরাজ-পুত্র ওগো　　বাণ তুমি করহ গ্রহণ,
তব বজ্ররূপে আমি　　অবতীর্ণ ইন্দ্রের নন্দন।
দুন্দুভি-দানবে আমি　　করেছি নিধন
পাঠাইব তোমারেও　　যমের সদন ॥

(উভয়ের যুদ্ধ)

লক্ষ্মণ। (সুগ্রীবের প্রতি)

আর্য্য-বাণে হয়ে বিদ্ধ　　বালী এবে লুণ্ঠিত ধরায় ;
দেবেরা বরষে' পুষ্প　　দেখ এবে আর্য্যের মাথায় ॥

বালী। সুগ্রীব করিতে পারে　　যে কার্য্য তোমার
আমি কি করিতে নারি　　সে কার্য্য উদ্ধার ?
বিনা দোষে কেন মোরে　　করিলে সংহার ?
মুক্তাফলতরে গজ—　　মাংস-তরে মৃগ,—লোকে
করয়ে নিধন ;
বাহুবল পরাক্রম　　জানাবার তরে সিংহে
করয়ে হনন ;
কিন্তু বল দেখি মোরে,　　জরাগ্রস্ত শাখামৃগ-প্রতি
বাণ বিমোচন করা　　—একি নীতি তব রঘুপতি ?

রাম। স্বেচ্ছাচারি রে বানর !　　এই দণ্ড দিনু তোমা
—করিয়াছ ধরম লঙ্ঘন ;
নিজ ভ্রাতৃ-ভার্য্যা—"তারা"　　সুগ্রীব কপির দারা
তারে তুমি করিলে হরণ ॥
পাপীরে না করি ক্ষমা　　—ক্ষত্র আমি,—মহাবংশধর,

বালী। আপনি রঘুবংশাবতংস শ্রীমান রামচন্দ্র, আপনার প্রসাদে আমি মহাবীরোচিত গতি লাভ করলেম।—এই বৎস অঙ্গদ তোমারি দাস।

(স্বর্গারোহণ)

সদ্য বিদ্ধ করি' বাণে বালীরে শ্রীরামচন্দ্র
সাক্ষাৎ সমরে,
সভার্য্যা কিষ্কিন্ধ্যারাজ্য সমর্পণ করিলেন
সুগ্রীবের করে॥

জলদের ঘোর রবে বিদলিত দিক্-চক্রবাল
উদ্দাম মুরতি ধরে ;— যাপিবারে এই বর্ষাকাল
মাল্যবান পর্ব্বতের শিখরস্থ বনে
শ্রীরাম করেন বাস লক্ষ্মণের সনে॥

ইতি বালী-বধ নামক চতুর্থ অঙ্ক।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ঘরের কথা ।

নবম পরিচ্ছেদ ।*

"অতি-ছোট হয়োনা ছাগলে মুড়াবে। অতি বাড় বেড় না ঝড়েতে উড়াবে॥" গ্রাম্য কবি বৃক্ষের হেঁয়ালিতে মনুষ্যকে এই উপদেশটি দিয়া গিয়াছেন। কিন্তু মধ্যমাকৃতি বৃক্ষেরই বা নিস্কৃতি কই ? লোকে নিকট দিয়া যাইলেই অধিকাংশ সময়ে বিনা প্রয়োজনেও তাহার ডালটা ভাঙ্গিয়া বা পাতাটা ছিঁড়িয়া চলিয়া যায়। রাজচন্দ্র রাজপদও পায় নাই ধনকুবেরও হয় নাই, দারিদ্র্যের ধূলি-শয্যা হইতে একটু মাথাঝাড়া দিয়া উঠিয়াছিল মাত্র; ইহাতেই জ্ঞাতি কুটুম্ব, কর্ম্মসঙ্গী, প্রতিবেশী প্রভৃতি অনেকেই তাহার শান্তি-গুল্মের শাখা ভঙ্গ ও পত্র ছিন্ন করিয়া আপনাদিগের অনিষ্টসাধক প্রবৃত্তির সাধন করিতে লাগিলেন।

আপনারাও অনেক রাজচন্দ্র দেখিয়াছেন, অনেকে রাজচন্দ্রের অবস্থায় পতিতও হইয়াছেন ; অম্বিকা-খুড়ো, চাটুর্য্যে, রায়-গিন্নিরাও আপনাদের যে নিতান্ত অপরিচিত তাহাও সম্ভব বলিয়া বোধ হয় না ; তথাপি যে ইহাদের কথা লইয়া এতগুলি পৃষ্ঠা পূরণ করিলাম তাহার কারণ, সম্মুখে উপবিষ্ট জীবিত ব্যক্তির চিত্রপটও লোকে আগ্রহের সহিত আমোদ করিয়া দেখে ; এবং নিত্য সঙ্গীর অবয়বেরও অনেক অলক্ষিত দোষগুণ আমরা অনেক সময়ে প্রথমে পটের সঙ্কুচিত পরিসরে প্রতিফলিত দেখিয়া চমকিত হই। ইহা ভিন্ন লিপিবিস্তারের আরও একটী কারণ আছে, সেটি "পণ্ডিতে পণ্ডিতে কথা সমস্যা

---

* গত জ্যৈষ্ঠের সংখ্যায় চতুর্থ হইতে অষ্টম পরিচ্ছেদ "স্বায়গৃহিণী" নামে প্রকাশিত হইয়াছিল।

পুরিয়া। অন্তে নাহি বুঝে, থাকে ছল ছল চাহিয়া॥” সে গূঢ়তত্ত্ব আপনারা বুঝিতে পারিবেন না, কর্ত্তাভজার ইশারার ন্যায় আমরা পরস্পর বুঝিয়া মুখ-টিপিয়া হাসিয়া লইলাম।

এদিকে যেই যা বলুক আর যেই যা করুক রাজচন্দ্রের দিন, চলিতে লাগিল। ভালই চলিতে লাগিল। সংসারে অনাটন নাই, পরিবারের গায়ে বিশ-ত্রিশ ভরি সোণা উঠিয়াছে, দেশের রাস্তার উপর দুই চারিটী কোঠা হইয়াছে। গ্রামের একটী পুরাতন পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার, ঘাট মেরামতও রাজচন্দ্রের নিজব্যয়ে সম্পাদিত হইয়াছিল। কেহ বা আবার ক্লেশ করিয়া যথার্থ বন্ধুভাবে কলিকাতায় একখানি ছোট-খাট বাটী করিতে পরামর্শও দিয়াছিল, কিন্তু তাহা হইলে দেশের পৈতৃকবাস একেবারে উঠিয়া যাইবে; “আমিও যদি টেনেটুনে সম্পর্কটা রাখি ছেলেপুলেরা আমার অবর্ত্তমানে আর সে পাড়াগাঁ মুখও হবেনা” মনে ভাবিয়া রাজচন্দ্র মাসে মাসে ভাড়া গনিয়াও কালকাতায় অবস্থিতি করিতে লাগিল। আহার ব্যবহার লোক-লৌকিকতা রক্ষা ব্যতিত আর একটী বিষয়ে রাজচন্দ্রের প্রায় প্রতি মাসেই কিছু না কিছু ব্যয় হইত। সৌখিন ফলমুলাদি বিক্রেতা বা মনোহারী প্রভৃতি ফেরিওয়ালাগণ প্রায়ই রাজচন্দ্রের বাটী হইতে নিরাশ হইয়া ফিরিত না। হিতৈষী সুহৃদগণ অপব্যয়ের উল্লেখ করিয়া অনুযোগ করিলে রাজচন্দ্র উত্তর করিত যে, যেমন ভিক্ষুককে রিক্তহস্তে ফিরাইতে নাই তেমনি উহাদিগকেও বিমুখ করিতে নাই; উদরান্নের জন্যইতো গরিবেরা মাথায় মোট লইয়া দ্বারে দ্বারে ফিরে, বিক্রীত দ্রব্যের লভ্যই উহাদের ভিক্ষা, অন্ন-মুষ্টির একমাত্র উপায়; সৌখিন-দ্রব্য না ক্রয় করিলে আমার সংসার চলিতে পারে বটে কিন্তু, সকলেই যদি ঐ কথা বলে তাহা হইলে উহাদের সংসার চলিবে কেমন করিয়া। শিল্পীও নিরন্ন হইবে। অল্প বিস্তর সকলেই সাধ্যমত নির্দ্দোষ বিলাসের

সাহায্য করায় বিশেষ হানি নাই। অর্থ-শাস্ত্রের নীতিতে এই যুক্তি কতদূর সঙ্গত তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু হৃদয়-শাস্ত্রের সুবর্ণময় পৃষ্ঠায় এ সূত্রটি যে মুকুতাখচিত অক্ষরমালায় রচিত সে বিষয়ে অনুমাত্র সন্দেহ নাই।

স্বামীর কাজ কর্ম্মের সুবিধা হইলে ভবসুন্দরী যখন প্রথম কলিকাতায় আসেন তখন তাঁর একমাত্র পাঁচ বৎসরের মেয়ে হরিদাসী কোলে। সকলেই মনে করিয়াছিল যে ঐ একটী হইয়াই দাসীর মার বিয়ান বুঝি বন্ধ হইল। কিন্তু শরীরের সুখেই হউক, মনের স্ফূর্ত্তিতেই হউক অথবা অর্থাগমের সঙ্গে সঙ্গে দম্পতির মনে বিষয়াধিকারী লাভের বলবতী বাসনা হওয়ায় তাহার আকর্ষণেই হউক, কলিকাতায় আসিবার দেড়বৎসর পরেই রাজচন্দ্রের সহধর্ম্মিণী স্বামীকে একটী নবকুমার উপহার দেন। মেয়েটির ন্যায় ছেলেটিও হরির-লুট মানিয়া হওয়ায় নাম হইল লুটবিহারী। আমাদের গল্পের নায়কের অংশ অনেকটা এই লুটবিহারীর দ্বারা অভিনীত হইবে।

দ্বাদশ বৎসর বয়সে হরিদাসীর বিবাহ হয়; জামাইটি দোজপক্ষে, নিতান্ত বৃদ্ধ নয়, তবে লোকে যাকে "যেমনি বর তেমনি কনে" বলে তেমন সাজন্ত-গোছ হয় নাই। রাজচন্দ্র গহনাগাটি বরাভরণ ইত্যাদি গৃহস্থ-ভদ্রলোকের দেয় সমস্তই যথাসাধ্য বরকন্যাকে দিয়াছিল, তবে বরপক্ষ হইতে কোনরূপ নগদ অর্থের দাবী হয় নাই। জামাইটীর নাম কেশব, বয়স ত্রিশের কিছু উপর, পশ্চিমে একজন হিন্দুস্থানী রেলওয়ে কণ্ট্রাক্টরের অধীনে কর্ম্ম করিত। সংসারের মধ্যে পূর্ব্বপক্ষের একটী শিশুপুত্র, পুনঃপরিগৃহিতা এই দ্বাদশীদারা আর অভিভাবিকা-স্বরূপ এক সপুত্র বিধবা মাতুলানী। বেতনের আয়ে এক রকম কায়-ক্লেশে সংসার চলিয়া যাইত, ঋণ করিতে হইতনা, সঞ্চয়ও ছিলনা। যা'হোক প্রজাপতির কৃপায় হরিদাসীর স্বচ্ছন্দে স্থিতির একটা ব্যবস্থা

হয়ে গেল। এদিকে লুটবিহারী ক্রমে নিমফল কোমরপাটা ছাড়াইয়া কাপড়ের কসি আঁটিতে শিখিল। ভবসুন্দরীর অনুরোধে রাজচন্দ্র লুটুর জন্য চাঁদনি থেকে পিনাফোর কিনিয়া দিয়াছিল; আবার ভবসুন্দরী ছয়বৎসরের সোণারচাঁদকে স্বামীর সম্মুখে দাঁড় করাইয়া, সিঁথির ঘোমটা সরিয়া যাইতে দিয়া সেই অর্থনাশী বিমল হাসি হাসিলেন। রাজচন্দ্রকে ব্রাউন-হলাণ্ডের নিকার-বোকার কিনিতে হইল।

দশম পরিচ্ছেদ।

রাজপ্রাসাদে ফ্যাসানের ছাঁচ প্রস্তুত হয়, সঙ্গতি বুঝিয়া কেহবা তাহা হইতে সোণা ঢালিয়া কেহবা কাদা চাপিয়া ছাপ তুলিয়া লয়। সাহেবি চাল অবলম্বন করিতে বিলাতযাত্রার অপেক্ষা করেনা, কিম্বা ইংরাজী মেজাজ ধাতে বসাইতে কলেজি শিক্ষার বিশেষ প্রয়োজন নাই। ধরাতলে নরপতি জনসাধারণের পূজ্য; শরীর ও সম্পত্তির উপর আধিপত্য করিতে করিতে রাজদণ্ড মন, হৃদয় ও আত্মার উপরও প্রভূত প্রভুত্বলাভ করিয়া বসে। যে চরণ দর্শনে মস্তক অবনত হইয়া পড়ে, সেই গৌরবময় চরণের মহামহিম অধিকারীকে আদর্শ-স্থানীয় করিতে লোকের স্বতঃই প্রবৃত্তি হয় ও যাঁহার কৃপাকণার প্রত্যাশায় মুগ্ধ হইয়া মানব দেবকৃপাকেও অবহেলা করে, তাঁহার পথের পথিক হইতে কাহার না লালসা হয়? "ধর্ম্ম অবতারের" ধর্ম্ম প্রজামাত্রকেই আকর্ষণ করে। সমগ্র হিন্দুজাতি যে একদিন ইস্লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া যায় নাই, বা আজও যে তাহারা খৃষ্টের কল্যাণে কৃষ্ণকে বিসর্জ্জন দেয় নাই ইহাই সনাতন ধর্ম্মের অখণ্ড সত্য ও অদ্ভুত শক্তির পরিচায়ক। কিন্তু দেবোপাসনা ব্যতিত মানবের অন্য ধর্ম্ম আছে। শারীরিক, মানসিক, লৌকিক, পারত্রিক প্রত্যেক ক্রিয়াই এক একটী ধর্ম্ম। গুণ অপেক্ষা দোষের ভাগ সহজেই অনুকরণসাধ্য।

বৈরাগ্য অপেক্ষা বিলাস শীঘ্র অভ্যস্ত হয়, রাজার বাহ্য সম্পদই প্রজার চক্ষু ঝলসাইয়া দেয়। রাজানুচর, উচ্চপ্রতিষ্ঠিত সম্ভ্রান্তসম্প্রদায়ই প্রথমে ভূপতির বেশভূষা, ভাবভাষা, আচারব্যবহার প্রভৃতির অনুকরণ করিতে আরম্ভ করেন। মধ্যবিত্ত গৃহস্থগণ ঐ রাজপ্রসাদ উহাঁদিগের নিকট হইতে কর্জ্জ লয়েন। তদুচ্ছিষ্ট ইতরসাধারণে বাঁটিয়া লইয়া আপ্যায়িত হয়। রাজসেবাকারী সামান্য ভৃত্যগণও নিতান্ত স্বল্পসম্প্রদায়ের আদর্শ-স্থানীয় হয়না।

মিরজাই পরিহিত প্রবীন, আজ কেন কামিজধারী নবীনের নিন্দা করেন? এক্ষণে যেমন কতক বাবুকে দেখিলে ফেরঙ্গ-কুল-ভূষণ "প্যারেয়া-রোজ্যারিও" "ব্যাসেধ ব্যারেগা" বলিয়া ভ্রম হয়, তেমনি অনেক বনিয়াদি বড়মানুষের বৈঠকখানায় প্রবেশ করিয়া প্রাচীরলম্বিত তৈলপট গুলির প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে স্বর্গীয় কর্ত্তাদিগকে মিরজারহমৎ, মৌলবীফজল, খাজেআবদার, প্রভৃতি বলিয়া বিভ্রম ঘটিবার সম্ভাবনা। এখনকার শিক্ষিত লোকে যেমন দশটা বাঙ্গলা কথা কহিতে ছয়টা ইংরাজীর বুকনী দিয়া থাকেন, পূর্ব্বেকার ভদ্রলোকেরাও তেমনি কথাবার্ত্তায় লিখনপঠনে এত অধিক যাবনিক ভাষা ব্যবহার করিতেন যে, ব্যবহারবলে বিস্তর পার্শী, উর্দ্দূ কথা এক্ষণে বঙ্গীয় আভিধানিক শব্দমধ্যে পরিগণিত হইয়া গিয়াছে। অন্দরমধ্যে, রন্ধনশালায়, শয়ন-কক্ষেও অনেক রসুন-রস-সিক্ত কথা আজ পর্য্যন্ত আধিপত্য করিতেছে। আর ভাষার ছটায় বাঙ্গলা দলিলাদি যে অপূর্ব্ব মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে তাহার তো কথাই নাই। এখনও যদি কেহ "জয়ালদে" "জেওজে" আদি বাদ দিয়া বিশুদ্ধ বাঙ্গলায় কোন লেখাপড়ার মুসবিদা করেন তাহা হইলে সেকেলের বিষয়কর্ম্মী লোকের নিকট তাহা বাতিল বা নামঞ্জুর হয়। স্বর্গীয় কর্ত্তারা পোলোয়া, কালিয়া, কোরমা, কোপ্তার বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন; আমরা তাহার সহিত হাঁসের

ডিমের আমলেট, চিংড়িমাছের কাটলেট এবং নিতান্ত পক্ষে কাদা-চিংড়ির পোটেটো-চপ্‌ যোগ করিয়া দিয়া এক প্রকার তিলকাঞ্চনে কার্য্য সারিয়া লইতেছি। তবে সেকালের লোকে যবন-জন-প্রিয়-ভোজ্য হিন্দুর প্রচলিত উপকরণে হিন্দুপাচকের দ্বারা প্রস্তুত করাইয়া লইতেন, বাবুর্চির প্রসাদ বা নিষিদ্ধ মাংসাদির ভক্ষণের কথা বড় বেশী শুনিতে পাওয়া যায় না, এক্ষণে সেটার কিছু বাড়াবাড়ি হইয়াছে।

ইহার কারণ, বোধ হয়, মুসলমান নৃপতিগণ নিজ ধর্ম্মে সমধিক উৎসাহ প্রকাশ করিয়া হিন্দুস্থানে ঐ ধর্ম্ম প্রবর্ত্তনের জন্য বিশেষ প্রয়াস পাইতেন এবং ঐ কার্য্যের জন্য অনেকে হিন্দুদিগের প্রতি বল-প্রয়োগ ও অত্যাচারাদিও করিতেন। কিন্তু বলের আঘাত বল উৎপাদন করে, আঘাতী বলঘাত পদার্থে কতকটা আপনার শক্তি ঢালিয়া দেয়, এবং অত্যাচারীর অগ্নিও পীড়িতকে খানিকটা উত্তেজিত করে, সেইজন্য হিন্দুরাও মুসলমানের ধর্ম্মের ধমকে একটু বিশেষ জিদের সহিত স্বধর্ম্ম রক্ষা করিতে প্রয়াস পাইতেন। পরস্পরের অনুকরণের মধ্যেও বিপরীত আচরণ তাহার সাক্ষ্য। এক্ষণে, ইংরাজ কাহারও ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিবেন না বলিয়া ভারতে প্রবেশ করেন, ইংরাজের নিকট আমরা চিরকৃতজ্ঞ। কিন্তু বোধ হয়, বিজ্ঞানবিদ্‌ চতুর ইংরাজ জানিতেন যে, বলপ্রয়োগ অপেক্ষা এই ঔদাসিন্য হিন্দুর ধর্ম্মভিত্তি আল্গা করিয়া দিবে। একদিকে ধর্ম্মরক্ষক হিন্দুরাজা প্রদত্ত ইন্ধন নাই, অপর দিকে বিধর্ম্মী শক্তির ফুৎকার নাই, সুতরাং ধর্ম্মনাশের আতঙ্ক হইতে নিস্কৃতি পাইয়া হিন্দু যেমন অতর্কিত অবসরে আরাম করিবে অমনি তাহার আধ্যাত্মিক অগ্নিটুকুর উপর আপনা-আপনি ছাই পড়িয়া যাইবে? আবার তাহার উপর ইংরাজী সাহিত্যের জলন্ত মোহিনীমায়া হৃদয় অধিকার করিয়া বসিল; বিলাতবাসিনী উত্তপ্ত সুরা মস্তিষ্কে প্রবেশ করিল, বিলাতী পাদরীগণ অবসর বুঝিয়া নেপথ্য হইতে বুকে পেটে হাত বুলাইতে

লাগিলেন, সুরম্য সাজে বিলাতী ভোজ্য সুলভে সুপ্রাপ্য হইল, আর এই চারিপোয়ায় পুষ্করা প্রাপ্ত হইয়া আমরা প্রেতত্ব লাভ করিলাম"। এই রাজানুকরণের তরঙ্গে ভাসিয়া পড়িলে কাহারও বিশেষ ক্ষুব্ধ বা অপ্রতিভ হইবার প্রয়োজন নাই। জোয়ার ভাটায় পার আছে, কিন্তু বন্যার হাত হইতে নিস্কৃতি পাওয়া দুষ্কর। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যে অপর কোন জাতি হইলে যে সব বড় বড় মহা তুফান আসিয়াছিল কোন কালে ভাসিয়া যাইত এখন তাহার চিহ্ন দেখিতে পাইতাম না। তবে হিন্দুজাতির ন্যাক বনিয়াদ বড়ই মজবুত খুব গভীরখাতে পাকা মসলার গাঁথুনি তাই আজিও আসল ইমারত টলে নাই; চুড়াটা কার্ণিসটা বাঁরাণ্ডাটা ভাঙিয়া পড়িয়াছে মাত্র। যদি জাতির স্বতন্ত্রতা রক্ষা রিবার ইচ্ছা থাকে, পরগাছা পরিচয়ে যদি লজ্জা হয়, বনিয়াদি ংশ বলিয়া যদি বুক ফুলাইবার গর্ব্ব থাকে, তাহা হইলে এস ভাই, ইঁট-পাটকেল কুড়াইয়া ভাঙ্গা বাড়ী মেরামত করিয়া লই। কাজ কি পরের এগার ইঞ্চি পকমিলে? নয়ইঞ্চি গাঁথুনীর জোরটাতো একবার দেখিতে পাইতেছ! নাই বা মিলিল হাল-ফ্যাসানি; সেকেলে রকমে বারাণ্ডা বাহির কর। যে দেখিবে সেই তোমার নিজ বাড়ী বলিয়া চিনিতে পারিবে। এই ঘোর বিপজ্জয়ের মধ্যে স্বাতন্ত্র রক্ষাই বাহাদুর; মহাপ্লাবনের মাঝখানে অচল অটল দাঁড়িয়ে থাকাই বীরত্ব। অনুকরণের স্রোতে ভাসিয়া যাওয়া উন্নতি নয়—দৌর্ব্বল্য; পুরাতন পাকা ইমারতের কোন্‌ ভাঙিয়া নূতন সরঞ্জামে সংস্কার করিতে যাইওনা, মিলও খাইবেনা মজবুৎও হইবে না! আর যদি বনিয়াদ শুদ্ধ তুলিয়া ফেলিয়া হালফ্যাসানে নূতন করিয়া গাঁথ তাহা হইলে রঙচঙে চক্‌চকে একটা কোটা খাড়া হইতে পারে বটে, কিন্তু উহা তোমার বলিয়া কেহই চিনিবে না; আর একটা ভাদ্দুরে কোটালের অপে টিকিবে কিনা সন্দেহ।

ইংরাজী চাল হ্যাট্‌কোটও নয়, চেয়ার টেবিলও নয়। অন্তঃসারশূন্য বাহিরের চাকচিক্যই ইংরাজী চালের মুখ্য সার। ভিতর ভুয়া, বাহিরে

লম্বা চাল। আর কিছু হউক-না-হউক লেফাপাখানি দুরস্ত মাফিক চাই। আমার বোধ হয়, ইংরাজচরিত্র অধ্যয়ন করিতে অধিক দূর যাইবার প্রয়োজন হয় না, একবার মাত্র উহাঁদের ওয়েষ্টকোটের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই অনেকটা বোঝা যায়। যত বড় সাহেবই হ'ন না কেন, সম্মুখ-ভাগের কাপড় অপেক্ষা ওয়েষ্টকোটের পশ্চাৎ ভাগের কাপড় নিকৃষ্ট হইবেই হইবে। কামিজের কলার কফেও এ গূঢ় রহস্য আছে। অবশ্য ইংরাজচরিত্রে অনেক মহৎ গুণ আছে, আমি এক্ষণে সে বিষয়ে কিছু বলিতেছি না। আমরা যাহার অনুকরণ করিতে ব্যস্ত, সংক্রামতা-দোষে যাহা দেশের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িতেছে, ইংরাজের সেই সামাজিক বা সাধারণ নৈতিক চরিত্র অনেকটা তাঁহাদিগের হৃদয়বিরাজী ওয়েষ্ট কোটের ন্যায়। এবং এই চরিত্রলক্ষণ অনুকৃত তদনুকৃত অনুকরণানুকৃত হইয়া ক্রমে দেশের জলবায়ুর মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। তা আজ আমরা দেখিতে পাই যে, এই বঙ্গের নিভৃত কোণে অতিদূর পল্লীগ্রামের চাষা, যে কখনও ইংরাজি শুনে নাই, সাহেবের 'সা' দেখে নাই, হয়তো কামিজ-পরা বাবুজীকেও প্রত্যক্ষ করে নাই, সেও দানাপুরের জুতা পায়ে দিয়া ধান কাটিতেছে। তাহার প্রতিবাসী শিউলী রঙ্গীন-রেপার গায়ে দিয়া খেজুর গাছে চড়িতেছে। তাই দেখিতে পাই, ময়রার দোকানের বালক গঙ্গাস্নান করিয়া বাড়ী ফিরিতেছে, পরিধানে গামছা, স্কন্ধে তৈলমলিন আর্দ্র বস্ত্র, কিন্তু ঘাড়ের চুল সাহেবিধরণে স্কোয়ারভাবে কাটা, আর ললাটে আলবার্ট ওল্টাইয়া পড়িয়াছে। তাই শুনিতে পাই যে, কাঙালীকলুর ছেলে পরিচয় দিতেছে যে, তাহার নাম ক্ষীতীন্দ্রভূষণ স্যাণ্ডর্থা, আর কেওরা-বৌ সন্ধ্যাবেলা সপ্তমে চিৎকার করিয়া জটাফেলা অর্দ্ধবাসা লম্বোদরী কন্যাকে ডাকিতেছে,—অম্বালীকে—ও—ও—ও—ও—ভাতারখাকী—অম্বালীকে—এ—এ—এ।

২য়

এখন রাজচন্দ্র আর ভবসুন্দরী এঁদের দুজনেরই চালচলন খুব সাদাসিদে, বেশ পুরাণো হিন্দুয়ানী ধাঁচের। তবে লুটবিহারি যে গলায়

বুটীকাটা দোলাই বেঁধে ধামী করে জলপান খাবে এটা মায়ের প্রাণে সহ্য হবার নয়। পাড়াগাঁয়ে হ'লে যা-হতো তা-হতো, কিন্তু কলিকাতা সহরে, ছেলেকে এমন অবস্থায় রাখ্‌লে লোকে দেখে বল্‌বে কি! ঐ বোসেদের ছেলেগুলি কেমন কোটপেন্টুলেন পরে স্কুলে যায়, মাথার টুপিগুলি পর্য্যন্ত ঠিক সাহেবের মত। ঐই ভট্‌চার্য্যিদের মেজ-বৌএর মেয়েটীকে ঘাঘরা টুপি-টুপি পরিয়ে যখন ঠেলাগাড়ী করে ঝি বেড়াতে নিয়ে যায় তখন কি সুন্দরই মানায়। কে বলবে যে ভট্‌চার্য্যি-বামুনের ঘরে অমন মেয়ে জন্মেছে? ঠিক্ যেন মেমের মেয়ে। আর কত গেরস্ত-ঘরের বৌ-ঝি যে এখন দিনরাত মেমেদের মত সেজেগুজে থাকে! সেদিন ডাক্তারগিন্নি নাতির আইবুড়ো-ভাতের নেমতন্ন কত্তে এসেছিলেন, একটা তাকিয়ার খোলের মত কি ভেতরে পোরে তার ওপর বোম্বাইশাড়ী ঘাঘরার মতন করে ঘুরিয়ে পরেছেন, গায়ে জরির কাজ-করা মখমলের বডি, কাণে পান্নার ইয়ারিং; আবার আমাদের গঙ্গাজল-তোলা উড়ে ভারী মিন্‌সের যেমন আছে তেমনি কপালের ওপরকার চুলগুলি ছোট করে ছাঁটা, আর রগে এঁড়ো সিঁথে। দেখ, এখন এসব হয়েছে, তা আমি নিজের জন্যেতো কিছু বলি না, আমার ওসব সখও নেই সাধও নেই, মেয়েটাকে ছেলেবেলাও তেমন সাজাতে-গোজাতে পারি নাই, এই গুঁড়োটুকো যাহোক্ এদ্দিনের পর ভগবান দিয়েছেন। আর তুমি এখন দিলেও দিতে পার তাই বলি। আর লটুরও বড় হলে দুঃখ থাকবে যে ছেলেবেলায় সাজতে-গুজতে পায়নি। এই রকম ন্যায়শাস্ত্রের সূত্র দৃষ্টান্তাদি দ্বারা ভবসুন্দরী স্বামীর নিকট হইতে ছেলের জন্য ইংরাজী পোষাক, প্যারাম্বুলেটারগাড়ী ধর্ম্মতলার বিস্কুট প্রভৃতি আদায় করিতেন।   [ক্রমশঃ]

শ্রীঅমৃতলাল বসু।

ফিরিঙ্গি বণিকের অত্যাচার।

ভারতের পণ্যসম্ভারপূর্ণ তরণী লইয়া ফিরিঙ্গি বণিক ভাস্কো-ডা-গামা যে বৎসর লিস্‌বনে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন তাহার পর বৎসর পর্ত্তুগাল-অধিপতি ইমানুয়েল এইরূপ ঘোষণা প্রচার করেন,—'ঈশ্বরের অনুগ্রহে ভারতীয় বাণিজ্যের আমরাই আবিষ্কর্ত্তা,—ভারতের সহিত বাণিজ্য করিবার সম্পূর্ণ অধিকার আমাদের। কিন্তু পর্ত্তুগালের প্রত্যেক অধিবাসী এবং আমাদের নিদেশ পত্র লইয়া পর্ত্তুগালস্থ বৈদেশিকগণ সকলেই এক ভাবে ভারতবর্ষের সহিত বাণিজ্য-সম্বন্ধ সংস্থাপন করিতে পারিবে।'

সৌভাগ্যবান বৈদেশিক বণিকদিগের উপর কৃপাপরবশ হইয়া যে এমন ঘোষণা প্রচারিত হইয়াছিল তাহা বোধ হয় নহে; কারণ বাণিজ্যের মরসুমে তাহাদের লাভের এক চতুর্থাংশ পর্ত্তুগালের রাজ-কোষাগারে প্রদান করিতে হইবে ইহা নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। ইহার জন্য আক্ষেপের বিশেষ কারণ ছিল না; তখন ভারতবর্ষ অশেষ রত্নের আকরস্বরূপ বলিয়া পরিচিত ছিল—তখন সাগরাম্বরা ভারতের এক মুষ্টি ধূলিও অর্থলুব্ধ বৈদেশিক বণিকসম্প্রদায়ের চক্ষে মহামূল্য বলিয়া মনে হইত। ভাস্কো-ডা-গামার ভারতাভিযানে প্রমাণিত হইয়াছিল যে, একবার ভারতবর্ষে গমনাগমনে যে ব্যয় হয়, লাভের অংশ তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক,—প্রায় ষাট গুণ। সুতরাং এই অবস্থায় বাণিজ্য-লব্ধ ধনরত্নের এক চতুর্থাংশ রাজ-কোষাগারে প্রদান করিয়া সিংহাসনকে তুষ্ট রাখিতে কাহার অনিচ্ছা ছিল?

এতদিন পর্য্যন্ত ইমানুয়েল তাঁহার কল্পনামুখর নয়নে সমৃদ্ধি-শালিনী ভারতবর্ষের শুধু মোহিনী আলেখ্য অবলোকন করিয়া বিস্ময়ে ও হর্ষে

দিনযাপন করিতেছিলেন ; তখন পর্য্যন্তও তিনি এ চিন্তা মনে স্থান দিতে সাহস করেন নাই যে এক দিন সেই ভারতবর্ষ পর্ত্তুগালের সিংহাসনতলে মস্তক অবনত করিবে! কিন্তু ভাস্কো-ডা-গামা স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার পরই ইমানুয়েল প্রতিজ্ঞা করিলেন—'আর নহে, এইবার ভারতবিজয়ের আয়োজন করিতে হইবে—এইবার কল্পনাকে অতল সাগরসলিলে নিমজ্জিত করিয়া সত্যের সুবর্ণ মন্দিরদ্বার সগৌরবে উদ্ঘাটিত করিয়া সমগ্র বিশ্বকে সগর্ব্বে দেখাইতে হইবে—ভারতবর্ষ আমার।'

ইমানুয়েল আর কালবিলম্ব করিলেন না ; যথাসম্ভব সত্বর ১৩খানি বাণিজ্যপোত সজ্জিত হইল—পর্ত্তুগালের সাহসী কুশলী নাবিকগণ সেই সকল পোতের অধ্যক্ষ হইয়া কামান, গোলা, বারুদ প্রভৃতি লইয়া সুদক্ষ পথপ্রদর্শকের ইঙ্গিতে ভারতবর্ষাভিমুখে যাত্রা করিল। বিধর্ম্মী "নেটিভ"দিগকে চিরঅন্ধকার হইতে আলোকে আনিবার জন্য ১৬ জন ধর্ম্মযাজক দয়াপরবশ হইয়া ভারতযাত্রায় যোগ দিলেন! এই পোত-বহরের কাপ্তান পিদ্রু অল্‌ভারেজ যখন কালিকাটে আসিয়া উপনীত হইলেন তখন জামোরিণ পুলকিত চিত্তে তাঁহাকে বরণ করিয়া লইলেন। হায় রে বাণিজ্য-শুল্কের মোহিণী মায়া!

পিদ্রু অল্‌ভারেজ সমুদ্রতীরে একটী কুঠী সংস্থাপন করিয়া সহর্ষে বাণিজ্য করিতে আরম্ভ করিলেন। আরব বণিকগণ পূর্ব্ব হইতেই সন্দিগ্ধচিত্ত ছিল—প্রথম দর্শনেই ফিরিঙ্গিকুলের উপর আস্থা স্থাপন করিতে পারে নাই ; এখন তাহারা সবিস্ময়ে দেখিল ফিরিঙ্গি পিদ্রু সমুদ্রমধ্যে একখানি আরব-জাহাজ ধৃত করিয়া জামোরিণের নিকট উপঢৌকন প্রেরণ করিলেন এবং কালিকাটের বন্দরেই একখানি মুসলমান-বাণিজ্যতরণী লুণ্ঠন করিয়া পণ্যসংগ্রহে সত্বর হইলেন! আরব বণিকসম্প্রদায় বুঝিল যে এক হস্তে শাণিত কৃপাণ ও অপর হস্তে

ক্রুশ লইয়া যে ফিরিঙ্গিকুল ভারতবর্ষে বাণিজ্য করিতে আসিয়াছে তাহারা সহজ লোক নহে! আরবদিগের সহিত ফিরিঙ্গিগণের জীবন-মরণ-কলহ উপস্থিত হইল।

মহাশক্তি মহম্মদও রিক্তহস্তে ধর্ম্মপ্রচার করেন নাই—তাঁহার শিষ্যগণ কৃপাণ এবং কোরাণের আমরণ সম্বন্ধ ভালরূপেই বুঝিয়াছিল; তাই বিক্ষুব্ধ, বিধ্বস্ত, প্রতিহিংসাব্যাকুল কতকগুলি আরব একদিন পর্ত্তুগালের কালিকাটে প্রতিষ্ঠিত কুঠী আক্রমণ করিয়া প্রধান কুঠিয়াল এবং ৫৩ জন অনুচরকে হত্যা করিল। ফিরিঙ্গিবণিকের লোহিততপ্ত শোণিত সেই দিনই প্রথম ভারতবর্ষের পাদমূল রঞ্জিত করিয়া ফিরিঙ্গির ভবিষ্যৎ প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করিয়া দিল! পিড্রু এ অপমান বিস্মৃত হইলেন না—দ্বাদশখানি আরব-জাহাজ ধ্বংশ করিয়া কোচিন অভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

অন্তর্বিবাদ ভারতের ইতিহাসে চিরপরিচিত। সেই সেকালেও কোচিন এবং কালিকাটে সৌখ্য-সম্বন্ধ ছিল না। কোচিন-রাজ দেখিলেন বিধাতা যদি সুযোগ মিলাইয়াছেন কেন তাহা হেলায় পরিত্যাগ করিব। তিনি পিড্রুর সহিত মৈত্রী করিলেন; পিড্রু কল্পতরু হইয়া বর দিলেন 'একদিন অবশ্যই তোমাকে জামোরিণের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিব—আমরা থাকিতে ভয় কি? ভাবনাই বা কিসের?' কোচিন-রাজ কালিকাট-রাজসিংহাসনের সুখস্বপ্নে মুগ্ধ হইয়া অতিশয় সুবিধা-দামে পিড্রুর নিকট নানাবিধ দ্রব্য বিক্রয় করিলেন; বিনা বিবেচনায় তাঁহার প্রার্থনা গ্রাহ্য করিলেন—কোচিনতটে ফিরিঙ্গি বণিকের কুঠী সগৌরবে মস্তক উত্তোলন করিয়া ভারতমহাসাগরের তরঙ্গভঙ্গ নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।

পিড্রুর মনোবাসনা পূর্ণ হইল। কুইলন, কানানোর প্রভৃতির অধিপতিগণও পিড্রুকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ হইলেন; পিড্রু

অলভারেজ মহাবিস্ময়ের সহিত দেখিলেন, মালাবারতীর ছাড়াও ভারতবর্ষে বহুতর বাণিজ্যোপযোগী বন্দর আছে! পিদ্রু মনে মনে ভাবিলেন, এ সকল বন্দর একদিন পর্ত্তুগালেরই হইবে! মূল্যবান পণ্য সংগ্রহ করিয়া পর্ত্তুগালে প্রত্যাবর্ত্তনকালে পিদ্রু অলভারেজ দুর্ভাগ্যবশতঃ (?) এবং ভ্রমক্রমে (?) কোচিনের একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে সঙ্গে লইয়া গেলেন—এ ভ্রম সঙ্গতই হইয়াছিল, কারণ তখন কোচিনের কুঠীতে কয়েকজন ফিরিঙ্গি বণিক কুঠিয়ালস্বরূপ অবস্থান করিতেছিল?

ইমানুয়েল নিশ্চেষ্ট ছিলেন না; পিদ্রু স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার পূর্ব্বেই জোয়াও-ডা-নোভা [João da Nova] চারি খানি জাহাজ লইয়া মালাবার তীরে পিদ্রুর পদাঙ্কানুসরণে ব্যস্ত হইলেন। কালিকাটের লুণ্ঠিত বিদগ্ধ বাণিজ্যতরণীসমূহ হইতে কুণ্ডলীকৃত ধূমরাশি উত্থিত হইয়া মালাবারতীরে ফিরিঙ্গি পরাক্রম বিঘোষিত করিতে লাগিল! নরপতি ইমানুয়েল দেখিলেন তাঁহার সম্মুখে দুইটী পথ প্রশস্ত রহিয়াছে—শান্তি কিম্বা সমর! হয় মালাবার তীরের বন্দরগুলির সহিত বাণিজ্যসম্বন্ধে আবদ্ধ হওয়া, নয় কালিকাটের ধ্বংশসাধনপূর্ব্বক আরব বণিককুলকে ভারত হইতে উৎখাত করিয়া ভারতে একচ্ছত্র বাণিজ্যের বিস্তার করা। খ্রীষ্টান ইমানুয়েল চিন্তান্বিত হইলেন, কি গ্রহণ করিবেন—অলিভশাখা না, সুশাণিত রক্তপিপাসু কৃপাণ? বাণিজ্য-বিস্তারকালে শান্তির সুশীতল ছায়াতলে দাঁড়াইয়া কে কবে সমৃদ্ধিশালী হইয়াছে? ইমানুয়েল কৃপাণ তুলিয়া লইয়া কৃতার্থ হইলেন; তাই ভারত-মহাসমুদ্রের সেনাপতি ভাস্কো-ডা-গামা পুনরায় কুড়ি খানি জাহাজ লইয়া ভারতে পর্ত্তুগালপতাকা প্রতিষ্ঠামানসে যাত্রা করিলেন।

অধিক দিন নহে, পঞ্চবর্ষপূর্ব্বে যখন তিনি চারি খানি জাহাজ লইয়া টেগাস্‌তীর হইতে ভারতযাত্রা করিয়াছিলেন তখন সমগ্র

পর্ত্তুগাল নিরাশায় ক্ষিপ্ত হইয়া ইমানুয়েলের কার্য্যের ভীষণ প্রতিবাদ করিয়াছিল—সেই জীবনান্তকারী অভিযান হইতে ডা-গামাকে প্রতিনিবৃত্ত করিবার জন্য পর্ত্তুগালের অধিবাসীগণ ঊর্দ্ধবাহু হইয়া কত না চেষ্টাই করিয়াছিল! কিন্তু এখন আর তাহা হইল না; ডা-গামা পর্ত্তুগালের আশীর্ব্বাদ শিরে ধারণ করিয়া গর্ব্বিত চিত্তে প্রসন্ন হৃদয়ে ভারতযাত্রা করিলেন; বেলেম-মন্দিরে বিজয়ঘণ্টা নিনাদিত হইয়া ভাস্কো-ডা-গামার অভিনন্দন করিল। ডা-গামা প্রথমে ভারতে আসিয়াছিলেন শুধু আবিষ্কার করিতে, এবার যাত্রা করিলেন সেই সুনীলসাগরজলবিধৌত ভারতের তীরে ক্রুশ এবং কৃপাণের সাহায্যে আবিষ্কার ভিত্তি দৃঢ় করিতে, কমলার পূর্ণভাণ্ডার লুণ্ঠন করিয়া পর্ত্তুগালের রাজকোষ পূর্ণ করিতে—তাই সেবার, দেশের অর্থনাশ আশঙ্কা করিয়া পর্ত্তুগালবাসীগণ দুঃখে ক্ষোভে ডা-গামাকে যেমন অভিশাপ দিয়াছিল, এবার তেমনি প্রাণ ভরিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিল। সেদিনে আর এদিনে কত প্রভেদ!

পর্ত্তুগালের কর্ম্মপথ এতদিনে অরুণ-কিরণ-সমুজ্জ্বল হইয়া সাধারণ-জনগণকে কর্ত্তব্যপালনে প্রবুদ্ধ করিতে লাগিল—পর্ত্তুগীজগণ অক্লান্ত অধ্যবসায় এবং অসীম উৎসাহসহকারে সেই পথে অগ্রসর হইতে লাগিল। এক বাহু বাণিজ্যের এবং অপর বাহু শোণিতরঞ্জিত রণদেবীর স্কন্ধে স্থাপন করিয়া পর্ত্তুগালের কর্ম্মব্যাকুলতা, উন্নতিমার্গে ধাবিত হইল—সে অপ্রতিহত বেগের সম্মুখে দুরতিক্রম্য বাধা-ব্যতিক্রম দরীমুখোচ্ছ্বসিত বারিপ্রবাহে তৃণখণ্ডের ন্যায় নিমেষে ভাসিয়া গেল। সম্মুখে কর্ম্মের অনন্ত যশোবিমণ্ডিত সুবর্ণপথ, পশ্চাতে মূর্ত্তিমান উৎসাহ-স্বরূপ নরপতি ইমানুয়েল—কর্ম্মে এবং বাক্যে, কৌশলে এবং বিচক্ষণতায়, দার্ঢ্যে এবং ধৈর্য্যে সর্ব্বদা পর্ত্তুগালকে প্রোৎসাহিত করিতে-
... বীর্য্য, কৌশল এবং উৎসাহ সমস্তই

নিষ্ফল হইত, যদি কর্ম্মের প্রকৃত ক্ষেত্রে দণ্ডায়মান হইয়া জীবনপণে বিজয়লাভ করিবার উপযুক্ত কর্ম্মচারী না থাকিত। কিন্তু ইমানুয়েলের শিক্ষিত চক্ষু, লোক নির্ব্বাচনে সুদক্ষ ছিল, আই ডা-গামার প্রথম অভিযানের পর চব্বিশ বৎসর মধ্যেই মালাক্কা পর্য্যন্ত পর্ত্তুগালের বিজয় পতাকা উড্ডীন হইয়াছিল।

তখন মালাক্কার ন্যায় সমৃদ্ধিশালী বন্দর আর ছিলনা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এসিয়ার পূর্ব্ব এবং পশ্চিমভাগের মধ্যস্থলে অবস্থিত বলিয়া তখন মালাক্কা এসিয়ার বাণিজ্যের কেন্দ্রস্বরূপ হইয়াছিল। মালাক্কায় তখন চীন, জাপান প্রভৃতি এসিয়ার সকল রাজ্যের বাণিজ্য তরণী দেখা যাইত—এদিকে আবার মালাবার, সিংহল, করোম্যাণ্ডল এমন কি বঙ্গদেশের বণিকসম্প্রদায় পর্য্যন্ত বাণিজ্যব্যপদেশে মালাক্কায় যাতায়াত করিত। অধিক দিন নহে, চব্বিশ বৎসরের মধ্যেই পর্ত্তুগাল, সেই মালাক্কায় সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল ; শুধু ইহাই নহে, গোয়া এবং ডিউ নগরে উপনিবেশ স্থাপনপূর্ব্বক মালাবারতীরে একাধিপত্য করিতেছিল এবং লোহিত-সাগরের পথে মিসর ও ভারতের বাণিজ্যের বিষম বাধা ঘটাইয়া পর্ত্তুগালের সুখসমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিয়াছিল।

সেই পরম উৎসাহী ইমানুয়েল কর্ত্তৃক দ্বিতীয়বার প্রেরিত হইয়া ভাস্কো-ডা-গামা ১৫০২ খৃঃ অব্দে পুনরায় কালিকাটে আসিয়া উপনীত হইলেন। আরবদিগের পূর্ব্ব শত্রুতা ডা-গামার হৃদয়ে সর্ব্বদা জাগরূক ছিল। তিনি জামোরিণের বন্ধুতা ও অনুগ্রহ বিস্মৃত হইয়া,—যে কালিকাট একদিন তাঁহাকে সাদরে অভিনন্দন করিয়াছিল, রাজার অধিক সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিল—সেই কালিকাটের উপর অনলবর্ষণ করিতে লাগিলেন ! আরবদিগের বাণিজ্যতরণী যাহা তীরে ছিল, সে সমুদয় ধ্বংশ করিয়া ফেলিলেন ! ডা-গামা যে উদ্দেশ্যে দ্বিতীয়বার ভারতে আসিয়াছিলেন তাহা কতকাংশে সফল হইয়াছিল বটে,

কিন্তু তাঁহার নামের সহিত নৃশংস অত্যাচারকাহিনী এমনি সংযুক্ত হইয়াছিল যে ফিরিঙ্গি বণিকের নামে লোকে নিদারুণ শঙ্কিত হইত—তাহাদিগকে রাক্ষস বলিয়া জ্ঞান করিত। ইংরাজবর্ণিত নৃশংস হায়দার আলিও ভাস্কো-ডা-গামার ন্যায় অত্যাচার করিতে পারেন নাই—অথচ হায়দারের ইতিহাস রচনাকালে ইংরাজ ঐতিহাসিকগণ ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত করিয়াছেন!

ডা-গামা বিপুল বিক্রমে কালিকাটে উপনীত হইয়া কালিকাটের পোতবহর ধৃত করিলেন—সঙ্গে সঙ্গে আটশত নাবিক বন্দীকৃত হইল। ডা-গামা মনুষ্যত্ব পর্য্যন্ত সাগরসলিলে বিসর্জ্জন দিয়া তাহাদিগের প্রত্যেকের বাহুযুগল, কর্ণদ্বয় এবং নাসিকা অবলীলাক্রমে ছেদন করিলেন! যদি তিনি এই খানেই ক্ষান্ত হইতেন তাহা হইলেও বুঝিতাম তাঁহার পাষাণকঠিন অ-মানুষিক হৃদয়েও মনুষ্যত্বের অতি ক্ষীণ চিহ্নও বর্ত্তমান ছিল; কিন্তু তিনি সেই সকল ছিন্ন বাহু, রক্ত-সিক্ত নাসাকর্ণ একত্র করিয়া বৃক্ষের রাশিকৃত শুষ্ক পত্রসহ জামোরিণের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন! কেন? রাজপদে উপঢৌকনস্বরূপ;—জামোরিণ ব্যঞ্জন রন্ধন করিয়া আহার করিবেন বলিয়া*! এ কাহিনী শুনিলে বিশ্বাস করিতে সাহস হয় না—হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। কিন্তু নিরপেক্ষ ইতিহাস ধর্ম্মের সাক্ষীস্বরূপ অনন্তকাল এই ভীষণ অত্যাচার-কাহিনীর সত্যতা সপ্রমাণ করিবে। চিরকাল কহিবে, এই পৈশাচিক কাণ্ড ফিরিঙ্গি বণিকেরই যোগ্য—অন্য কাহারও নহে।

যখন এই পৈশাচিক ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছিল তখন বোধ হয় ডা-গামা বিস্মৃত হইয়াছিলেন যে, একদিন জামোরিণ রাজপ্রাসাদে উপাদেয় ফল-মূলে তাঁহাদিগের জলযোগের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন—কালিকাটের কোন কোন সম্ভ্রান্ত গৃহস্থের এবং ধনাঢ্যের গৃহে একদিন ডা-গামা

* Sir W. W. Hunter's History of British India.

ক্ষুধায় আহার পাইয়াছিলেন, পিপাসায় বারি পাইয়াছিলেন—বিশ্রামের জন্য শয্যা এবং আশ্রয় পাইয়াছিলেন! তাহারই উপযুক্ত পুরস্কার-স্বরূপ ফিরিঙ্গি বণিকসম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠ সর্দ্দার কালিকাটের ধ্বংশসাধনে উদ্যত হইয়া নিরপরাধ নাবিকদিগের রক্তসিক্ত ছিন্ন বাহু, ছিন্ন কর্ণ, ছিন্ন নাসা ব্যঞ্জন রন্ধনের জন্য রাজপ্রাসাদে প্রেরণ করিয়া ধরাতলে যশস্বী হইয়াছিলেন* !

হতভাগ্য "নেটিভ"দিগের মধ্যে আর যাহারা বন্দী হইয়া বিচারের জন্য ডা-গামার নিকট আনীত হইয়াছিল, কঠিন কাষ্ঠ বা প্রস্তরখণ্ড দ্বারা তাহাদিগের দশন-পংক্তিগুলি ভাঙ্গিয়া, সেই ভগ্নদশনখণ্ডগুলি তাহাদের উদরমধ্যে প্রবিষ্ট করাইয়া দেওয়া হইয়াছিল! অত্যাচারের উচ্চ সিংহাসনে উপবিষ্ট থাকিলেও এরূপ অত্যাচারপ্রক্রিয়া কল্পনা করিতে পারা যায় কি না সন্দেহ।

সংবাদবাহী একজন হতভাগ্য ব্রাহ্মণ দুরদৃষ্টক্রমে ফিরিঙ্গি সর্দ্দারের কবলে নিপতিত হইয়া অর্দ্ধদগ্ধ অবস্থায় প্রাণটুকু রক্ষার জন্য স্বীকার করিতে বাধ্য হয় যে, সে সন্দেশবহ নহে—গুপ্তচর! হতভাগ্যের আর উপায়ান্তর ছিল না। কিন্তু তাহার এইখানেই যন্ত্রণার শেষ হয় নাই; ফিরিঙ্গিসর্দ্দার পৈশাচিকতায় উন্মত্ত পিশাচকেও পরাজিত করিয়া ব্রাহ্মণের ওষ্ঠ এবং কর্ণদ্বয় কর্ত্তন করিয়াছিলেন। তাহার পর একটী কুক্কুরের সদ্য কর্ত্তিত কর্ণ সেই হতভাগ্যের ছিন্ন কর্ণস্থানে লাগাইয়া দিয়া ডা-গামা তাহাকে জামোরিণের সভায় প্রেরণ করিয়াছিলেন !! হায় ব্রাহ্মণ! তালি প্যাগোডায় পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে তোমরাই না একদিন এই রাক্ষসতুল্য, হিংস্রস্বভাব ফিরিঙ্গিসর্দ্দারকে কত সম্মান প্রদর্শন করিয়া গৌরীর মন্দিরে চন্দন উপহার দিয়াছিলে—

---

* Sir W. W. Hunter's History of British India.

রাজপ্রাসাদের প্রবেশ-মুখে তোমরাই না একদিন এই নরপিশাচের জন্য সসম্ভ্রমে অপেক্ষা করিয়াছিলে ?

যেমন সর্দ্দার তাহার অনুচরগুলিও তেমনি উপযুক্ত ছিল। একদিন ভিন্‌সেন্টি সোদ্রি নামক এক ফিরিঙ্গি একজন শ্রেষ্ঠ মাননীয় আরব বণিককে নিতান্ত অকারণে অথবা কল্পিত কারণে নিদারুণ বেত্রাঘাত করিতে করিতে অচৈতন্য করিয়াছিল ; তাহাতেও তৃপ্তি না হওয়ায় সেই চৈতন্যহীন হতভাগ্যের বদনবিবরে আবর্জ্জনারাশি প্রবিষ্ট করাইয়া তদুপরি একখণ্ড শূকরমাংস স্থাপনপূর্ব্বক মুখ বাঁধিয়া দিয়াছিল* ! শুনিতে পাওয়া যায়, সেই মন্দভাগ্য আরব বণিক নাকি একদিন মহামান্য (!) ভিন্‌সেন্টি সোদ্রিকে অপমানসূচক কথা বলিয়াছিল বলিয়া সেই ফিরিঙ্গিপুঙ্গবের সন্দেহ হয় ! কেহ কেহ বলেন, অপমানজনক বাক্যপ্রয়োগের এই কাহিনী আত্মাভিমানী সোদ্রীর সম্পূর্ণ রটা কথা—ইহার মূলে কোন সত্য নাই ! ঐতিহাসিক হণ্টার তাই বলিয়াছেন—

"*The Portuguse cruelties were deliberate rather than vindictive.*"

প্রতিহিংসাপরায়ণ হইয়া মানুষ যখন অত্যাচার করে তখন তাহার ক্ষমা বা একটা কৈফিয়ৎ আছে, কিন্তু যে ব্যক্তি বিনা কারণে, শুধু অত্যাচার করিব বলিয়া অত্যাচার করে তাহার কখনই ক্ষমা নাই—সে ব্যক্তি মানব-বিচারের আমলে আসিবারও যোগ্য নহে।

অমানুষিক অত্যাচারের স্রোতে সমগ্র মালাবারকে বিপর্য্যস্ত করিয়া ভা-গামা বিজয়োল্লাসে পর্ত্তুগালে ফিরিয়া গেলেন। এতদিনে হিন্দু জামোরিণ বুঝিতে পারিলেন, ফিরিঙ্গিগণ তাঁহার বন্ধুতার সম্মান কতদূর রক্ষা করিয়াছে—কেমন করিয়াই বা রক্ষা করিয়াছে ! এতদিনে তিনি বুঝিতে পারিলেন বাণিজ্য-শুল্কলাভের প্রত্যাশায় কি বিষম আপদই বরণ করিয়া লইয়াছেন। এখন তাঁহার মনে হইল যে, পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে যখন মুসলমান বণিকগণ ফিরিঙ্গিদিগের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিয়াছিল—মালাবার-তীর হইতে তাহাদিগকে বিদূরিত করিয়া দিবার

---

* Sir W. W. Hunter's History of British India.

জন্য তাঁহার নিকট কত না সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিয়াছিল,—তখন তাহাদিগের কাতর প্রার্থনায় কর্ণপাত না করিয়া কি বিষম ভ্রমই করিয়াছেন!

আরব বণিক্‌সম্প্রদায় পূর্ব্বাপরই ফিরিঙ্গিবিদ্বেষী ছিল—তাহারা এই সকল ভীষণ অত্যাচারের প্রতিশোধ লইবার জন্য উন্মত্ত হইয়া উঠিল। অত্যাচার-নিহত আরবদিগের প্রতি শোণিতবিন্দু কাঁদিয়া কাঁদিয়া প্রতিশোধ ভিক্ষা করিতে লাগিল—মহম্মদের সুশাণিত খড়্গ কম্পিত হইয়া উঠিল। রোষোন্মত্ত, ক্ষুব্ধ, আরবগণ ফিরিঙ্গির বন্ধু কোচিন-রাজের রাজ্য আক্রমণ করিয়া পর্ত্তুগীজ কুঠিয়ালদিগকে কাড়িয়া লইতে চাহিল। কোচিনরাজ শরণাগত ফিরিঙ্গিদিগকে রক্ষা করিতে লাগিলেন—যুদ্ধ কলহ, বিপদ প্রভৃতি গ্রাহ্য করিলেন না।

এদিকে ডা-গামা ভারত পরিত্যাগের পূর্ব্বে মালাবারে অনাথরোদন সমুত্থিত করিয়া কোচিন, কানানোর, কুইলন এবং কাটিকালায় বাণিজ্যের সুদৃঢ় বন্দোবস্ত করিয়া দুইটী নূতন কুঠী নির্ম্মাণ করিলেন; রাজার আদেশক্রমে কানানোরের কুঠীতে বৃহৎ কামান, বারুদ গোলা প্রভৃতি যুদ্ধোপকরণসমূহ সংগৃহীত করিয়া ভূমিতলে প্রোথিত করিয়া রাখিলেন; পাছে গোলা-গুলি দেখিয়া কানানোরের সুপ্ত অধিবাসীবৃন্দ অকস্মাৎ জাগরিত হইয়া উঠে। কোচিনরাজ কালিকাটের দুর্দ্দশার কথা শুনিয়াও শুনিলেন না—ফিরিঙ্গিবণিকের পৈশাচিক অত্যাচারকাহিনী শুনিয়াও সতর্ক হইলেন না—জামোরিণের সিংহাসন তখন কোচিনরাজকে মোহমুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। নিয়তি বক্র হইলে কে কি করিবে?

মালাবারের এবং আরবদিগের প্রদীপ্ত অভিসম্পাত মস্তকে লইয়া ফিরিঙ্গি ডা-গামা লিসবনে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার পরিবর্ত্তে যিনি ফিরিঙ্গির কর্ত্তা হইয়া ভারতে আসিলেন তিনিও ডা-গামার পদাঙ্কানুসরণ করিতে বিরত হইলেন না—সে কাহিনী পরে বর্ণিত হইবে।

শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য।

"বয়কট" এবং "স্বদেশীয়তা"।

গত ৭ই আগষ্ট টাউনহলে আমাদের সমাজের নেতারা সভা করে প্রতিশ্রুত হয়েছেন যে, যতদিন না গভর্ণমেণ্ট বঙ্গ-বিভাগের প্রস্তাব ত্যাগ করেন ততদিন বাঙ্গালী বৃটিশ মাল বয়কট (boycott) কর্‌বে। তার পরে, অনেক সভাসমিতিতে বক্তাদের মুখে এমন কথাও শোনা যাচ্ছে যে, বঙ্গদেশ আস্ত থাকুক্ কিম্বা কাটা পড়ুক আমরা কেবল মাত্র স্বদেশী বস্তু ব্যবহার কর্‌বার পণ ছাড়ব না। একদলের মতে বয়কট-ব্যাপারটা শুধু একটা রাজনীতির চাল, উদ্দেশ্য, প্রজার অধিকার বাজায় রাখা। অপর দলের মতে—"স্বদেশীয়তা" শুধু একটা অর্থ-নীতির চাল, উদ্দেশ্য,—প্রজার দারিদ্র্য মোচন। নেতা এবং বক্তার দল বাদ দিলে বাদবাকী আমাদের সকলের নিকট বয়কট এবং স্বদেশীয়তা দুয়ে মিলে একটা ব্যাপার হ'য়ে উঠেছে। বয়কটই বল আর স্বদেশীয়তাই বল,—সাধারণের কাছে নামের পার্থক্য ছাড়া অন্য কোনও বিশেষ প্রভেদ নেই। আসল জিনিষটা কি চাই, কি করতে হবে এবং কেন করতে হবে সে বিষয় সকলেরই একটা মোটামুটি ধারণা জন্মে গেছে। কিন্তু প্রচারকের দল পরস্পরের সঙ্গে মিল কি আছে সে বিষয়ে বড় নজর দেন না, কোথায় গরমিল আছে তাই নিয়েই চিৎকার কর্‌তে ভালবাসেন। এমন লোকও পৃথিবীতে দুর্লভ নয় যাঁর মনোভাব এই যে, তাঁর মনের আঁস্তাকুড় হতে উদ্ধৃত কানাকড়িটি যদি না চালাতে পারেন তা হ'লেই সমাজ উচ্ছন্নে যাবে, অন্ততঃ যাওয়া উচিৎ। অবস্থা যখন এই রকম, তখন বয়কট এবং স্বদেশীয়তা এ দুই একই জিনিষ, কিম্বা বাস্তবিকই দুয়ের ভিতর কিছু পার্থক্য আছে, আর যদি পার্থক্য থাকে ত সে পার্থক্য কোথায় সেটা আমাদের বুঝে দেখা কর্ত্তব্য।

প্রথমতঃ আমি "স্বদেশীয়তা" সম্বন্ধে ছুটি চারটি কথা বলতে চাই। স্বদেশীয় বস্তু প্রচারের কথাটা ভারতবর্ষে অনেক দিন হ'ল উত্থাপিত হয়েছে। নিত্য ব্যবহার্য্য সকল জিনিষ বিদেশ থেকে আনাতে হলে আমাদের ধনক্ষয় হয় এইরূপ একটা ধারণা অনেকেরই অনেক দিন থেকে আছে। কৃষি এবং বাণিজ্যের মত শিল্পও যে দেশের শ্রীবৃদ্ধির একটা বিশিষ্ট উপায় এ কথাটা বুঝতে বেশি বুদ্ধির আবশ্যক করে না। আমাদের দেশের শিল্পলোপ যে বর্ত্তমান দারিদ্র্যের একটা প্রধান কারণ সেত স্পষ্ট। সুতরাং শুধু প্রাণের দায়ে আমাদের দেশীয় শিল্পের উন্নতি এবং বৃদ্ধি সম্বন্ধে আমাদের যে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া কর্ত্তব্য এ কথাও কেউ অস্বীকার করবেন না। এ সব জেনেশুনেও ছ'চারজন ছাড়া বড় কেউ, কি করে দেশীয় শিল্পের উন্নতি হতে পারে, তার জন্য কিছুমাত্র যত্ন করেননি; আমরা শিক্ষিতের দল, মনে করতুম যে কল-কারখানার বিরুদ্ধে শুধু হাতের কাজের লড়াই চলে না। সুতরাং নানা কারণে যখন কল-কারখানা আমরা এদেশে চালাতে অপারগ তখন মিছি মিছি economical laws এর সঙ্গে বিবাদ করে বাঁচবার প্রয়াস ছেড়ে দেওয়াই ভাল। আর যারা অশিক্ষিত, কি কারণে কি ফল হয় যাদের জানাও নেই এবং বোঝবারও ক্ষমতা নেই, তারা নিজেদের অদৃষ্ট দুরবস্থার কারণ বলে স্বীকার করে নেয়। দুর্ভিক্ষ, প্লেগ সকলেরই ভিতর তারা ভগবানের হাত দেখে। তাদের নিজের চেষ্টায় যে তাদের অবস্থার উন্নতি হতে পারে; তাদের দুর্দ্দশার কারণ যে মানুষের চেষ্টায় দূর হতে পারে এ ধারণা তাদের ছিল না এবং আমরা শিক্ষিত লোকেরাও অনুগ্রহ করে সে ধারণা তাহাদের মাথায় প্রবেশ করিয়ে দিই নি। আমাদেরও তাতে বিশেষ দোষ ছিল না। শুধু বক্তৃতায় কারো পেট ভরে না। এবং আমাদের কোটি-কোটি ইতরসাধারণের পক্ষে দেশের কথা প্রধাণতঃ পেটের কথা। তাদের ক্ষুধা নিবৃত্তির

উপায় যদি না করে দিতে পারি তাহলে আমাদের দূরে থাকাই ভাল। যারা পেটের জ্বালায় জ্বলছে তাদের উপরন্তু কথার জ্বালায় জ্বালাবার কোন দরকার নাই। শিল্পীর উন্নতি, ইংরেজিতে যাকে বলে supply, তার উপর নির্ভর করে। নিজের দেশের গড়া জিনিষ চাওয়াটার চাইতে পাওয়াটাই হচ্ছে বিশেষ দরকার। আমরা সব পুঁথি-পড়া লোক demand এর সৃষ্টি করতে পারি কিন্তু supply এর সৃষ্টি কর্‌তে পারিনে। মনের ভাবকে আমরা বদলে দিতে পারি কিন্তু বস্তুজগৎকে আমরা কায়দা কর্‌তে পারিনে। পিপাসা বাড়ালেই যে জলের পরিমাণ অমনি বেড়ে যাবে এমন কোন জাগতিক নিয়ম আমার জানা নেই। এই সব কারণে এতদিন আমাদের দ্বারা দেশীয় শিল্পের উন্নতির বিশেষ কোন সাহায্য হয় নি। শিল্পজাত দ্রব্য কাজে লাগে বলে আমাদের আবশ্যকীয় এবং সুন্দর হ'লে আমাদের আদরের সামগ্রী। কলের হাত, পা আছে, পেট আছে কিন্তু চোখ নেই, সেই জন্য কলেগড়া জিনিষ আমাদের কাযে লাগে, কিন্তু আমাদের সৌন্দর্য্যজ্ঞানকে পরিতৃপ্ত কর্‌তে পারে না। কিন্তু হাতে গড়া জিনিষে অনেক সময় উভয়গুণই বর্ত্তমান থাকে। সুতরাং আমাদের মধ্যে যারা খালি কাযের লোক নয়, এমন দু'চারজন,—দেশীয় শিল্পজাত দ্রব্যের আদর কর্‌তে শিখছিলুম; Economy ছেড়ে aesthetics ধরে যতটুকু হয় স্বদেশী শিল্পের মর্য্যাদা রক্ষা কর্‌তে চেষ্টা কচ্ছিলুম। অরুচি রোগটা সৌখিন লোকদের মধ্যেই হয়ে থাকে, সাধারণের মধ্যে সেটা চারিয়ে দেওয়া যায় না; এবং দেওয়াটাও ইচ্ছনীয় নয়। দু'মাস আগে আমাদের "স্বদেশীয়তা" এই অবস্থায় ছিল।

এখন বয়কটে আসা যাক্‌। বয়কটের অর্থ হচ্ছে, তোমার জিনিষ ছোঁব না। তুমি সস্তাতেই দাও আর ভাল জিনিষই দাও আমি তোমার জিনিষ কিন্‌ব না। কি রকম জিনিষ যদি বেশি দামে

কিন্‌তে হয় তবুও তোমার ছাড়া আর সকলের জিনিষ কিন্‌ব। ভাল, তুমি ছাড়া যদি আর কারও কাছে জিনিষ না পাওয়া যায় তাহলে কিছু কিনবই না। আমার লোকসান হয় তাও স্বীকার, আমাকে নানারকম স্বার্থত্যাগ কর্‌তে হয় সেও স্বীকার। এ রকম মনোভাব বহুলোকের মধ্যে মনে একটা বিশেষ কোন আঘাত না লাগ্‌লে জন্মায় না। অধিকাংশ লোকের পক্ষে শুধু জীবনযাত্রাটা এতই কঠিন ব্যাপার যে, তারা নিজের বর্ত্তমান স্বার্থ ছাড়া আর কিছু দেখতে পায় না। বক্তার পক্ষে স্বার্থত্যাগ করো বলাটা যত সহজ শ্রোতার পক্ষে স্বার্থত্যাগ করাটা ঠিক ততটা সহজ নয়। কোন্ দূর ভবিষ্যতে তাঁতি, ছুতোর, কুমোর, কামারের অবস্থা একটু ভাল কর্‌বার জন্য বর্ত্তমানে নীজে দুরবস্থায় পড়্‌তে খুব কম লোকই রাজি। বয়কটের ভিতর লোকসান আছে, স্বার্থত্যাগ আছে অথচ আজকের দিনে ধনী, দরিদ্র আবালবৃদ্ধবনিতা বাঙ্গালীমাত্রেই বৃটিশ মাল বয়কট কর্‌ব এ কঠিন পণ কেন করে বসেছে? কারণ এই, বঙ্গবিভাগে সকলের মনে এতটা আঘাত লেগেছে যে তারা দুদিনের জন্যও নিজের স্বার্থ ভুলে নিজেদের জাতীয় জীবন অক্ষুণ্ণ রাখবার চেষ্টা কর্‌ছে। কেবল Economicsএর দোহাই দিয়ে মানুষের মনে এ ভাব এ দৃঢ়তা আনা যায় না। যে সকল বক্তারা পার্টিসানের সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে বয়কটকে জিইয়ে রাখবার চেষ্টা কর্‌ছেন তাঁরা আমার মতে গোড়া কেটে আগায় জল ঢালছেন। দ্বিতীয় কথা, বয়কট, আমরা রাজার অবিচারের প্রতিকারের উপায়স্বরূপ মনে করি। ইংরাজজাতের পকেটে টান পড়্‌লে, চাই-কি বাঙ্গালীর [illegible]ও তাঁদের নজর পড়্‌তে পারে, এই বিশ্বাসে এই আশায় বয়কটের জ[illegible] আমরা আর যত প্রকার রাজনৈতিক আন্দোলন করি সে সব [illegible]জের কাছে আমাদের শেখা। বয়কট হচ্ছে খাঁটি দেশী চিজ—

সেইজন্য দেশশুদ্ধ লোক এতে যোগদান করেছে। আমাদের দেশে ধর্ম্মঘট করা দোকান-পাট বন্ধ করা প্রভৃতি, রাজার অন্যায় কার্য্যের প্রতিবাদ করবার সনাতন প্রথা। এই ধর্ম্মঘট, প্রবলের বিরুদ্ধে দুর্ব্বলের হাতে একমাত্র অস্ত্র। সকল দেশে সকল সময়ে বয়কট করবার উদ্দেশ্য হচ্ছে রাজনৈতিক। ধর্ম্মঘটও চিরকাল রাখা যায় না, বয়কটও চির-কাল রাখা যায় না। দেশের শিল্পের উন্নতির প্রধাণ উপায় দেশে জিনিষ প্রস্তুত করা। পরের কিনব না বলায় কোনই লাভ নেই, যদি-না নিজের মাল বাজারে ফেলতে পারি। সুতরাং স্বদেশী বস্তু ব্যবহার, স্বদেশী বস্তু প্রচার করা নয়, প্রস্তুত করবার উপর নির্ভর করছে। শিল্পের উন্নতি ধীরে-সুস্থে হয়। স্বদেশীয়তার ভিত্তি লাভের উপর। বয়কটের প্রাণ ক্ষতিস্বীকারের উপর। কেবল অর্থলাভের উপর স্বদেশীয়তা দাঁড়াতে পারে। কিন্তু বয়কটের পিছনে অনেকটা স্বজাতিবৎসলতা থাকা চাই। স্বদেশীয়তা ধীরে-সুস্থে চর্চ্চা করবার বিষয়। বয়কট আসন্ন বিপদ হ'তে উদ্ধার হবার সময়োপযোগী উপায়। যে উদ্দেশ্যে একায করা তার যতদিন পুরোপুরি নিষ্পত্তি না হয়ে যায় ততদিন যতই অসুবিধা হোক সকলেরই কর্ত্তব্য প্রাণপণে নিজের প্রতিজ্ঞা বজায় রাখা। যদি আমরা বয়কটে কৃতকার্য্য হই, যদি ইংলণ্ডের লোকের পকেটে সত্য-সত্যই টান পড়ে, তবেই বোঝা যাবে যে আমাদের দুর্ব্বলের উপায় সফল হল কি না? আমাদের উপায় আমরা পুরোপুরি প্রয়োগ না করতে পারলে, সে উপায় বাস্তবিকই ঠিক, কি মিছে, তা'বলবার আমাদের অধিকার জন্মাবে না। শেষকথা এই যে, বয়কটের মুখ্য উদ্দেশ্য লাভ করি আর নাই করি এর গৌণফল অতি শুভ। এই ঝোঁকে আমাদের "স্বদেশীয়তা" প্রাণলাভ করেছে। ঝোঁক আমরা কিছুদিন রাখতে পারলেই আমাদের স্বদেশী শি[illegible]র উন্নতি অবশ্যম্ভাবী। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে যে কার্য্য আর[illegible]রা

গেছে অর্থ-নৈতিক হিসাবে তার আসল ফল লাভ করবো।
যা বললুম তার সারমর্ম্ম এই ;—যাঁরা বলেন, বয়কট, রাজনীতির কথা তাঁদের কথাও ঠিক ; যাঁরা বলেন, "স্বদেশীয়তা" অর্থনীতির কথা তাঁদের কথাও ঠিক। আর আমরা অপামরসাধারণ যারা মনে করি ও দুইই একদেহের পৃথক অঙ্গ এবং আমাদের রাজনৈতিক উন্নতির ইচ্ছাই হচ্ছে সে দেহের প্রাণ ; আমাদের মতই সকলের চাইতে বেশি ঠিক।

শ্রীপ্রমথনাথ চৌধুরী।

অভয়বাণী।

হে ভ্রাতৃগণ, তোমরা নির্ভয় হও, আমরা তোমাদিগের উৎসাহে বাধা দিব না, তোমাদিগের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিব না। তোমাদিগের যিনি জননী, তিনি আমাদিগেরও জননী ; মাতার মঙ্গল উদ্দেশ্যে তোমরা যে সঙ্কল্প ধারণ করিয়াছ তাহা আমরাও ধারণ করিলাম ; তাঁহার সেবার জন্য তোমরা যে ব্রত গ্রহণ করিয়াছ তাহা আমরাও গ্রহণ করিলাম।

বঙ্গরমণী কবে কোন্ কঠোর ব্রতপালনে পরাঙ্মুখ হইয়াছে ? পর দুঃখ নিবারণ অভিপ্রায়ে, পিতাভ্রাতাপতিপুত্রের মঙ্গলকামনায় ইহকাল, পরকালের হিতার্থে চিরদিন তাহারা কঠোর ত্যাগস্বীকারে শরীর পতন করিয়া আসিতেছে। আর আজ জন্মভূমির পূজায় কষ্ট স্বীকারের ভয়ে তোমাদিগের সহিত যোগদানে তাহারা কুণ্ঠিত হইবে ?

তোমরা নির্ভয় হও, আজ আমাদের পরমানন্দের দিন, আজ আমাদের মহোৎসব। আজ পিতামাতা, পুত্রকন্যা, ভ্রাতাভগিনী,

.। সকলে মিলিয়া আমরা মহাব্রত ধারণ করিতেছি ; এত পুণ্য, এত আনন্দ আমাদের স্বপ্নের অগোচর, কল্পনার অতীত। এই পুণ্য, এই আনন্দলাভের জন্য কোনও কঠোরতা স্বীকার করিতেই বঙ্গরমণী কষ্ট বোধ করিবে না।

কিন্তু এ ব্রত অভূতপূর্ব্ব ব্রত। ইহাতে উপবাস নাই, শরীর পতন নাই, কোন কষ্টই নাই, ইহা নিরবচ্ছিন্ন সুখেরই ব্রত! তবে তোমরা কিজন্য মনে করিতেছ এ ব্রত পালনে আমরা অসমর্থ হইব? বিলাতী চুড়ি ফেলিয়া দিয়া আমরা যদি দেশের শাঁখারুলি পরি, বিলাতি সাবান, বিলাতি সুগন্ধীদ্রব্য ব্যবহার না করিয়া যদি আমরা দেশী সাবান ও চিরপ্রচলিত আতর গোলাপ ব্যবহার করি, যদি ফিতায় চুল না বাঁধিয়া আগের মত চুলের দড়ি ও জরী দিয়া চুল বাঁধি, যদি জ্যাকেটে বিলাতি লেশ না দিয়া দেশী চিকণ লাগাইয়া পরি, সূক্ষ্ম বিলাতি মজলিন ও পায়নাপল প্রভৃতির বদলে, দেশের চেলি বারাণসীতেই সুসজ্জিত হই আর বিলাতি সুলভ শাড়ির বদলে, সামান্য বেশিদরের শাড়িই ব্যবহার করি, তাহা কি ত্যাগস্বীকার? না কোন কষ্টনামবাচ্য? অবশ্য গরীবলোকের পক্ষে সুলভ বিলাতি বস্ত্রের বদলে সামান্য চড়াদরের দেশী বস্ত্র কেনাও কষ্টকর। কিন্তু আজ ধনী মধ্যবিত্তের এক উদ্দেশ্য, এক ব্রত। একের অর্থ অন্যের পরিশ্রম মিলিত করিয়া তাঁহারা দেশের কল-কারখানা বৃদ্ধির চেষ্টা করিতেছেন। এই চেষ্টা সফল হইলে ধনী দরিদ্র নির্ব্বিভেদে সকলেই দেশীবস্ত্র ব্যবহারে সক্ষম হইবেন। এসময় আমরা ধনী ও মধ্যবিত্ত ঘরণীগণ, যদি বিলাতি তেল, বিলাতী সুগন্ধী, বিলাতি জ্যাকেট, এবং অন্যান্য নানাবিধ সৌখিন বিলাতি দ্রব্য ব্যবহার পরিত্যাগ করি, তবে কত অপব্যয় নিবারণ করিতে পারি এবং এইরূপে সঞ্চিত অর্থ দেশের উন্নতিতে প্রদত্ত হইলে তাঁহাদিগের উদ্দেশ্যসাধনে আমরা কতদূর সহায়তা করিতে পারি? দেশের কার্য্য করিবার, স্বামীভ্রাতা

পিতাপুত্রের সহায়তা করিবার এই সুযোগ, এই অবসর কোন বঙ্গ রমণী না হাস্য মুখে গ্রহণ করিবেন।

আশ্বিন মাসে মা আসিতেছেন, এসময়ে নূতন বস্ত্র পরিধান আমাদের চিরন্তন প্রথা, কিন্তু তোমরা যদি দেশীবস্ত্র যোগাইতে না পার তাহা হইলে এসময়েও আমরা নূতন বস্ত্র পরিব না। আমাদের বংশানুক্রমে রক্ষিত পুরাতন চেলি বারাণসী পরিয়া, এমন কি অভাবপক্ষে আমরা পুরাতন ধৌত বস্ত্র পরিয়াই দেবীকে প্রণাম করিব, গুরুজনদিগকে প্রণাম করিব, তথাপি এসময়েও আমরা বিলাতি বস্ত্র পরিব না। আমরা বুঝিয়াছি ইহাতেই দেবী ভগবতী অধিক সমাদৃতা হইবেন; তাঁহার পূজার যথার্থ ফল হইবে। অতএব হে বঙ্গসন্তানগণ, আমি তোমাদিগের মাতৃস্থান গ্রহণ করিয়া, সমস্ত বঙ্গরমণীর পক্ষ হইতে এই অভয়বাণী প্রচার করিতেছি যে তোমাদিগের সঙ্কল্পই আমাদিগের সঙ্কল্প, তোমাদিগের ব্রত আমাদিগেরও ব্রত। তোমরা নির্ভয় হও, তোমাদের প্রতিজ্ঞা অটল রহুক্, তোমাদিগের ব্রত অবাধে উদ্যাপিত হউক।

ব্রতধারিণীদিগের পক্ষে নিবেদিকা

কোন ব্রতধারিণী।

গান।

বড় হংস সারং—ঝাঁপতাল।

শতকণ্ঠে কর গান, জননীর পূতনাম
অক্ষত রাখিব মান, লয়েছি এ মহাব্রত।
আর না করিব ভিক্ষা, স্বনির্ভর এই শিক্ষা
এই মন্ত্র, এই দীক্ষা, এই জপ অবিরত,
সাক্ষী তুমি মহাশূন্য, না লব বিদেশী পণ্য
ঘুচাব মায়ের দৈন্য, করিনু এই শপথ।
পরি ছিন্ন দেশী সাজ, মানি ধন্য ধন্য আজ
মায়ের দীনতা লাজ, হবে দূর পরাহত।
এই আমাদের ধর্ম্ম, এই জীবনের কর্ম্ম
এই অস্ত্র এই বর্ম্ম, আমাদের মুক্তি পন্থ।
নমোনম বঙ্গভূমি, মোদের জননী তুমি
তোমার চরণে নমি, নরনারী মোরা যত।

খেয়াল খাতা।

কণিকা।

আশা ও নিরাশা।

রবির প্রথম আলো জাগে গিরিশিরে,
শেষ রশ্মি মিশে যায় সাগরের নীরে,
নবজীবনের আশা অতি উচ্চে জ্বলে,
নিরাশার অবসান অকূল অতলে !

স্মৃতি।

বর্ষাদিনে পথ আর ভাল নাহি লাগে
ভাল লাগে নিভৃত ভবন
দুর্দ্দিনে স্বপন তুলে নব-অনুরাগে
স্মৃতি লয়ে কাটাই জীবন !

বাঙ্গালীর পরীক্ষা।

১। ভাবের ঠেলা।

এক একটা ভাবের ঠেলায় অনেকটা কাজ অগ্রসর হইয়া যায়। এইবার বঙ্গাঙ্গভঙ্গব্যাপারে বাঙ্গালী, ভাবের সম্বন্ধে কাজের মাঝ-গাঙ্গে গিয়া পৌছিয়াছে। বিদেশী বস্তু বর্জ্জন করিয়া স্বদেশী দ্রব্যজাত ব্যবহার করার সংকল্প আজ কয়েক বৎসর যাবৎ কতিপয় খেয়ালী লোকেরই মধ্যে আবদ্ধ ছিল। এইবার বিজাতীয় অঙ্কুশের পীড়নে দেশের আবালবৃদ্ধবণিতা সকলেরই মাথার টনক নড়িয়াছে। রাজ-ধানী হইতে আরম্ভ করিয়া বাঙ্গলার সমস্ত প্রধান নগরে-নগরে গ্রামে-গ্রামে যে তুমুল উৎসাহের তরঙ্গ উঠিয়াছে, তাহাতে মনে হয়, এ ভাব যদি স্থায়ী হয় তবে বাঙ্গলার ললাটলিপিতে জর্জ্জ নাথানিয়েল কার্জ্জন তাহার মহা মিত্র বলিয়া লিখিত ছিলেন।

২। চরিত্রগঠন।

Sow an act, reap a habit;
Sow a habit, reap a character;
Sow a character, reap a destiny.

আমরা হিন্দুরা এ কথা বিশেষরূপে মানি। একবার কৃতকর্ম্ম সংস্কাররূপে পরিণত হইয়া বারম্বার তাহার আবৃত্তির আকাঙ্ক্ষা রাখে। এইরূপেই অভ্যাসে চরিত্র গঠন হয়। ব্যক্তিগত কর্ম্মের ন্যায় জাতীয় কর্ম্ম, অর্থাৎ বহুজনে সমষ্টিতে কৃতকর্ম্ম আমাদের জাতীয় চারিত্র্যের, জাতীয় দৃঢ়তা, সাহস ও অটল প্রতিজ্ঞতার বীজ বপন করিবে। কর্ম্ম যত তীব্রতার সহিত কৃত হয়, তাহার ফলও তত তীব্র ও শীঘ্র প্রকটিত হয়। তাই বাঙ্গালীর এবারকার ভাবের তীব্রতায় জনিত যে কর্ম্ম তাহা বাঙ্গালীচরিত্রে তীক্ষ্ণ ও গাঢ় রেখা অঙ্কিত করিবে, এবং সেই সংস্কার আশু ও স্থায়ী ফলপ্রদ হইবে আশা করা যায়।

এবার আমরা বস্তুতঃ কতদূর অগ্রসর হইয়াছি, জাতীয়-সমৃদ্ধি বিষয়ে কোন্ কোন্ বস্তু লাভ করিয়াছি তাহা একবার ঠাহরাইয়া দেখি:—

১। বিদেশীয় জিনিষ বর্জ্জনের প্রতিজ্ঞা। এ প্রতিজ্ঞা পালন-চেষ্টায় আত্মসংযমরূপ মহাশক্তিমান্ বীজ হইতে চরিত্রবলরূপ মহা-ফললাভ নির্দ্ধারিত রহিয়াছে। ইহার ভিতর সত্যনিষ্ঠা, দৃঢ়তা ও আত্মশ্রদ্ধা গূঢ়নিবিষ্ট রহিয়াছে।

"জিতং জগৎ কেন?
—মনো হি যেন।"

আমরা যদি য়ুরোপের নানামোহিনীমূর্ত্তিধারিণী, নানা হাব-ভাব বিলাসিনী, নানাকৌশলজালবিস্তারিণী শিল্প-মায়াবিনীর কুহকে বিচলিত-ধৈর্য্য না হই, যদি আত্মজয়ী হই, যদি প্রতিজ্ঞায় অটল থাকি তবে পৃথিবী জয় আমাদের করায়ত্ত। এই তপস্যাপ্রভাবে নিখিল ঐশ্বর্য্য আমরা লাভ করিতে পারিব। তাহার সামান্য প্রত্যক্ষ প্রমাণ সঙ্গে সঙ্গেই উপলব্ধ হইতেছে।

২। স্বদেশীয় জিনিষ ব্যবহার। ইহাতে দেশের শিল্প ও শিল্পীর উন্নতিপূর্ব্বক দেশের ধনলাভ ও দেশের অর্থ দেশেই স্থিতির মহাসূচনা রহিয়াছে।

৩। যৌথকারবার খুলিয়া কাপড়ের কলস্থাপনা। ইহাতেও ধনলাভ ও ঐক্যবললাভ!

৪। কতিপয় নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের কারখানার জন্য কতিপয় ধনীর স্বতন্ত্রভাবে মূলধন নিয়োগ। ইহাতেও ফল ধনলাভ ও সদ্দৃষ্টান্ত।

৫। অকুতোভয়তা। এই ব্যাপারে রাজা মহারাজা হইতে আরম্ভ করিয়া চাষাপ্রজা সকলেরই প্রকাশ্য ভাবে যোগদান দেওয়ায় ও বদ্ধপরিকরতায় যে সাহস ও অকুতোভয়তার পরদা খুলিয়া গিয়াছে তাহা আর একটি মহা নৈতিক লাভ, এবং তাহার ফল বহুবিস্তৃত।

৩। মিত্রের শঙ্কা।

কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্বে বঙ্গের মারহাট্টা পত্রিকা নিম্নলিখিতরূপ শঙ্কা প্রকাশ করিয়াছিলেন—"যত কিছু বলা-কওয়ার ছিল, সব ত বলা কওয়া হইল; তার পরেও এই একটি গুরুতর প্রশ্ন অবশিষ্ট রহিয়া গেল যে, আমাদের বাঙ্গালী ভায়ারা টাউনহলের মিটিংয়ের চতুর্থ প্রস্তাবের দ্বারা যে ঘোরতর আন্দোলন অঙ্গীকার করিয়াছেন, সেই আন্দোলন কি প্রকারের হইবে? তাঁহারা চতুর্থ প্রস্তাবে বলিয়াছেন, আইনী পথে আন্দোলনের দ্বারা যতদূর করা সম্ভব, বঙ্গবাসী সাধ্যানুসারে তাহা করিতে কখনই পরাঙ্মুখ হইবেন না। অর্থাৎ আইনসঙ্গত যতপ্রকার আন্দোলন হইতে পারে বাঙ্গালীজাতি সে সমুদায়ের আশ্রয় লইতে এবং তাহার শেষ পর্য্যন্ত যাইতে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিয়াছেন। এই প্রতিজ্ঞাটা আমাদের মনে কেমন একটু উদ্বেগ জন্মাইতেছে। কারণ, এই অঙ্গীকারে বাঙ্গালীজাতি বিষম পরীক্ষাস্থলে উপস্থিত হইয়াছেন। তাঁহাদের প্রতি যাঁহাদের সহানুভূতি নাই, তাঁহারা বাঙ্গালীজাতির আন্দোলনের প্রগাঢ়তা এমন কি, এই আন্দোলনের ফলাফলের পরিমাপে বঙ্গবিভাগ ব্যাপারের দোষগুণের বিচার করিবেন। একরকমে বলিতে গেলে বঙ্গবিভাগ সম্বন্ধীয় মতামতটা এখন আড়ালে পড়িয়া গেল, এখন হইতে সমস্ত ভারতবাসীর চক্ষু কেবল বাঙ্গালীজাতির কার্য্যের দিকেই নিবদ্ধ থাকিবে। দর্শকস্থানীয়েরা এইরূপ বিচার করিবে:—ইহা স্বীকৃত যে, বঙ্গদেশে বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদপ্রস্তাবের অপেক্ষা গুরুতর বিপদ কখনও ঘটে নাই; এই বিপদ হইতে আত্মরক্ষার নিমিত্ত বাঙ্গালী যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ; এরূপ অবস্থায় আইনী পথের স্বাভাবিক সঙ্কোচের ঊর্দ্ধে তাহাদের সাফল্যের সঙ্কোচ হইতে পারে না। সুতরাং যদি বাঙ্গালীজাতি এবার সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিতে না পারেন তবে যে শুধু আইনী আন্দোলনে ফললাভের আশা অতঃপর ভারতবর্ষের পক্ষে ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন হইবে তাহাই নহে, পরন্তু সকলেই বলিবে বাঙ্গালীজাতি অবশেষে নিজের অঙ্গীকারে নিজের যে দুঃখ ডাকিয়া আনিল তাহা নির্দ্দয় গভর্ণমেণ্টের প্রদত্ত দুঃখ হইতেও গুরুতর।"

৪। শঙ্কা নিবারণ।

আজ "মারহাট্টা" স্বীকার করিতেছেন—"বাঙ্গালীজাতি শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে আশ্চর্য্য তেজ ও সমবেতশক্তির পরিচয় দিতেছেন।"

জাপানীরা প্রথমেই যখন দুই একটা মহাযুদ্ধে রুসিয়ার অক্ষৌহিণীকে পরাজিত করিলেন, যখন চারিদিকে জয়জয়কার পড়িয়া গেল, তখন স্বজাতির আন্তরিক কল্যানদর্শী জাপানী সচিবগণ কিন্তু জাপানীদের সতর্ক করিয়া দিয়াছিলেন, বলিয়াছিলেন—"এখনও তোমাদের পরীক্ষা শেষ হয় নাই, গর্ব্বমদে মত্ত হইও না, অপ্রমত্তভাবে কর্ত্তব্যসাধন করিয়া যাও।"

বাঙ্গালীর পরীক্ষাও এখনও শেষ হয় নাই, সবে আরম্ভ হইয়াছে; তবে জগতের চক্ষে এবার তাহার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার লক্ষণ উদ্ভাসিত হইতেছে। জগৎ যেন প্রতারিত না হয়, আমরা নিজেরা যেন নিজেকে বঞ্চনা না করি,—এ দৃঢ়তা, এ কার্য্যকারিতা, এ কুতোভয়তা যেন আমরা শেষ পর্য্যন্ত রক্ষা করিতে পারি।

তাই বলি মন জেগে থাক্
পাছে আছেরে শ্বেত চোর!
কালী নামের অসি ধর্, তারা নামের ঢাল,
ওরে সাধ্য কি ব্রিটনে তোরে কর্‌তে পারে জোর॥

শ্রীসরলা দেবী।

খেয়াল।

"পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বাঙ্গালী জ্যাঠা হইয়া গিয়াছে। জ্যাঠা বাঙ্গা সোজা চক্ষে কাহারও প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিবে না। সরলভাবে, উদারভাবে কোন একটা জিনিবের সমালোচনা করিতে পারিবে না। তাহার কারণ হইতেছে, জ্যাঠা হইলে বুড়া হয়, বুড়া হইলেই দূরদৃষ্টি (Long-sight) হয়, কাছের সামগ্রীটা তাহারা চক্ষে দেখিবে না—এইটে আমাদিগের দাদার কথা।

দাদা আসিয়া বলিলেন—ভাই! তোমাদের আমি প্রাণের অধিক ভালবাসি। জ্যাঠা উত্তর দিল—কোঁকর কোঁ,—আমাদিগের মৌলভি-দাদা আসিয়াছেন। জ্যাঠা একটা গাহিয়া উঠিল,—"নাথ! তোমার যে ভালবাসা, মৌলভি দাদার—পোষা।"

দাদা বলিলেন—মিথ্যার জন্ম প্রাচ্যজাতি চিরপ্রসিদ্ধ। জ্যাঠার চক্ষু প্রাচ্য ছাড়িয়া পাশ্চাত্যে চলিয়া গেল—কেন না নিকটেত দেখিতে পাইবে না—দেখিল, পাশ্চাত্য-নীতিরূপ তক্রসমুদ্রে সত্য-মৎস্য খাবি খাইয়া বেড়াইতেছে, আর লণ্ডনের ইষ্ট-এণ্ড হইতে ওয়েষ্ট মিনিষ্টরের চুড়া পর্য্যন্ত সর্ব্বস্থানে বসিয়া সত্যবানগণ সেই মৎস্যটীকে ধরিয়া তাহার মস্তক উদরস্থ করিবার চেষ্টা করিতেছেন।

দাদা বলিলেন,—তোমাদের কলিকাতার উন্নতি না করিয়া আমার প্রাণ স্থির হইতেছে না। কলিকাতাকে প্রাচ্য-জগতের রাণী যদি করিতে পারি তবেই আমার জীবন স্বার্থক! জ্যাঠা মস্তকে হস্তার্পণ করিয়া বসিয়া পড়িল। ভ্রাতুষ্পুত্র জিজ্ঞাসা করিলেন, জ্যেষ্ঠতাত! বসিয়া পড়িলে কেন?

জ্যাঠা—পাতকোর উন্নতি কি প্রকারে হয় আগে আমাকে বুঝাইয়া দাও।

দাদা—যতই খঁড়িতে থাকিবে ততই পাতকোর উন্নতি হইবে।

জ্যাঠা—আমি কলিকাতার উত্তরাংশের একটী সুনির্ম্মিত পথের সেইরূপ উন্নতির মধ্যে প্রবেশ করিয়াছি।

দাদা—বুঝিয়াছি, ওঠ।

জ্যাঠা—আমার কটীদেশ পর্য্যন্ত ধরণীগর্ভে, তুমি এক গাছি তৃণ-জাতীয় মানদণ্ড লইয়া আইস।

দাদা বলিলেন—জ্যেষ্ঠতাত! তোমাদের ভাষাটা বড় বেশি মিষ্ট। জ্যেষ্ঠতাত বুঝিলেন, ইহাতে কটুতিক্তকষায়রস প্রবেশ করাইবার চেষ্টা হইতেছে; দূরদর্শনে দেখিলেন, সাধের বাঙ্গলা ম্যাকমিলন, লংম্যান্‌, ব্ল্যাকি প্রভৃতি ইংরাজী-ছাঁকুনির সাহায্যে ছাঁকিয়া মিছরির দানাগুলি জলীয় ভাগ হইতে পৃথক করা হইতেছে—ইত্যাদি ইত্যাদি।

আসল কথা, জ্যাঠা ভ্রাতুষ্পুত্রের ভালবাসাআলিঙ্গনটী একদিনও সুবিধার চক্ষে দেখিতে পাইলেন না। নিরুপায়ে দাদার ভালবাসা অতিরিক্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই ভালবাসাভ্রমরতাড়িত দাদা সাগর-তীর হইতে হিমালয়ের প্রান্তদেশ পর্য্যন্ত নৃত্য করিতে করিতে প্রেম-বিহ্বলচিত্তে বলিতেছেন—আহা জ্যেষ্ঠতাত! আমার ঠাকরুণদিদির কি সুকোমল সুশ্যামল অঙ্গ! জ্যাঠা হরিস্মরণ করিতে করিতে চক্ষু কপালে তুলিলেন আর গাহিলেন,—

নটবর বেশে বৃন্দাবনে এসে
কালী হলি মা রাসবিহারী।
নিজ তনু আধা গুনবতী রাধা
আপনি পুরুষ আপনি নারী॥
ছিল বিবসন কটী এবে পীত ধটী
এলোচুল চূড়া বংশীধারী।
আগে সমর তরঙ্গে নেচেছিলি শ্যামা
এবে প্রিয় তব যমুনাবারি॥

জ্যাঠা।

বঙ্গচ্ছেদে লক্ষ্মী-বিষ্ণু সংবাদ।

মাথার উপর বঙ্গ-সাগররূপ টানাপাখার তরঙ্গ দুলিতেছে, শয্যা অতি সুশীতল অনন্তদেহ, লক্ষ্মী তাঁহার সুকোমল পদ্ম-হস্তখানি গায়ে বুলাইতেছেন; কাজেই বিষ্ণু মহাসুখে ঘোর নিদ্রায় অভিভূত। সহসা চঞ্চলার মন চঞ্চল হইয়া উঠিল। ইতি প্রস্তাবনা।

লক্ষ্মী—(বিষ্ণুর গায়ে ধাক্কা দিয়া) ওগো, ওঠাকুর, ঠাকুর, ঠাকুর—(বিষ্ণুর গম্ভীর নাসিকা গর্জ্জন)। ওঠ ঠাকুর, স্তোত্র পাঠ কচ্চি ওঠ। মধুমুরনরকবিনাশন—নাঃ, হুঁস্‌ই নেই! রমানাথ! লক্ষ্মী-পতি! একি বেজায় ঘুম! একটু পায়ে সুড়সুড়ি দিয়ে দেখি—ও ঠাকুর ওঠ সুধাপান কর।

বিষ্ণু—আঃ, বড্ড জ্বালচ্ছে; দুশ বছরও পুরো নয়, এরি মধ্যে কাঁচা ঘুমটা ভাঙিয়ে দিলে! দাও, চোখবুঁজেই একটুখানি সুধা খেয়েনি। (তথাকরণ)

লক্ষ্মী—দুশ বছর ছেড়ে তুমি দু-হাজার বছর ধরে ঘুমোও; কিন্তু ঠাকুর বড় বিপদ, একবার ওঠ।

বিষ্ণু—মেয়ে মানুষের ওই দোষ; কেবল ভূমিকা। চট্‌করে বলে ফেল না, কি হয়েছে।

লক্ষ্মী—একবার চোখ মেলে চেয়ে দেখ—

বিষ্ণু—বলি, আগেত কানপেতে শুনি।

লক্ষ্মী—শুন্‌লে হবে না—দেখ্‌তে হবে!

বিষ্ণু—ঘুম ভাঙাবার ফিকির দেখ! আমি তাকিয়ে তোমার রূপ দেখ্‌লেই হয়েছে আর কি! লক্ষ্মীটি, বলে ফেল, শুনছি।

(সহসা দূরে চড়্ চড়্ শব্দ)

পর্য্যন্ত অতি প্রখর তাপের প্রকোপে ইহার উপরিভাগ দগ্ধ হইতে থাকে। শুভ্র অগ্নিপূর্ণ সঙ্গীহীন চন্দ্রগ্রহের এক বায়বীয় আবরণ কল্পনা করা হয় কারণ তদ্ভিন্ন, ল্যাঙ্গলী প্রমান করিয়াছেন যে, অতি প্রখর জ্বলন্ত সূর্য্য কিরণেও ইহার তাপ ৫০ ডিগ্রীর নীচে থাকে। প্রকৃটর বলেন আমরা নিশ্চিতরূপে বিশ্বাস করিতে পারি যে চন্দ্রলোকে পরিবর্ত্তনের চিহ্ন লক্ষিত হয়; তবে আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে জ্যোতির্ব্বিদগণ তাহা আবিষ্কার করিতে এত বিলম্ব করিয়া থাকেন।

উচিত কথা।

আমেরিকান রিভিউ অব্ রিভিউ নামক মাসিক পত্রিকায় শ্রীযুক্ত আর, এন জনষ্টন ব্রিটিশ কনসল লিখিত মরক্কো এবং ফ্রান্সের অধিকার (অবস্থিতি) সম্বন্ধে একটি কৌতুকাবহ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। সেখানকার সকল রাজনৈতিক ব্যাপারই মুসলমান পুরোহিতদিগের হস্তে তাঁহারাই সর্ব্বে সর্ব্বা, হর্ত্তাকর্ত্তা বিধাতা, সম্প্রতি তাঁহাদের মধ্যে একজন এই ভাবে আপন অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন —হে খৃষ্টানের দল তোমরা আমাদের নিকট কি চাও? আমরা কি তোমাদের টাকা ধারি? আমরা কি তোমাদের দেশ আক্রমণ করিয়াছি? আমাদের দেশে উপনিবেশ স্থাপন করিবার জন্য আমরা কি তোমাদের পায়ে ধরিয়া সাধিয়াছিলাম? আমরা কি বারম্বার সে কার্য্যে বাধা দি'নাই? তোমরা বলিতেছ আমাদের দেশে শান্তি নাই, আমাদের দেশে সুশাসনের অভাব, আমাদের রাজা দুর্ব্বল—তাহাই যদি হয় তাহাতে তোমাদের এত মাথাব্যথা কেন? সে ভাবনাতো আমাদেরি অধিক! যে বাষ্পীয় পোতগুলি তোমাদের এখানে বহন করিয়া আনিয়াছে তাহারাও অনায়াসে আবার তোমাদের স্বদেশে ফিরিয়া লইয়া যাইতে পারে। তোমরা আমাদের এমন কি উপকার করিয়াছ যাহার জন্য তোমাদের ভাল না বাসিলে আমাদের ঘুম হইবে না? আমরা কখনো জল ভিন্ন অন্য পাণীয় ব্যবহার করিতে জানিতাম না সেই আমাদের অনেককে তোমরা মদ খাইতে শিখাইয়াছ—লুকাইয়া শতকরা শত টাকা লাভে আমাদের বিদ্রোহীদিগের মধ্যে বন্দুক বিক্রয় করিয়া যে অশান্তির কথা লইয়া এতখানি করিতেছ তাহা তোমরাই সৃষ্টি করিয়াছ। প্রথমে আমাদের সম্রাটকে প্রলোভনে

যুদ্ধ করিয়া পরে বিশ্বাসঘাতকা করিয়াছ—এখন কিনা বলিতেছ রাজ্যশাসনে তোমরা আমাদের সহায়তা করিতে ইচ্ছুক? হে হিতৈষীগণ আমরা তোমাদের সে শুভ ইচ্ছা প্রত্যাখ্যান করিতেছি। ধর্ম্মপুস্তকে আল্লা আমাদের প্রতি অনুশাসন প্রচার করিয়াছেন "হে সুধার্ম্মিকগণ তোমরা কখনো য়িহুদী কিম্বা খৃষ্টানদিগের বন্ধুতা স্বীকার করিওনা—হে বিশ্বাসীগণ তোমরা কখনো বিধর্ম্মীদিগের আশ্রয় গ্রহণ করিওনা।" তোমরা বিদ্রোহদমনে আমাদের সম্রাটকে সহায়তা করিতে প্রস্তুত আছ—তোমরা মনে করিয়াছ তোমাদের হাত দিয়া আমাদের পথভ্রষ্ট স্বজাতীয় ধর্ম্মভ্রাতাদিগকে বধ করাইব? কখনই নহে! আমরাতো তোমাদের শান্তির এবং বন্ধুত্বের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিলাম এখন কি করিবে? বলপ্রয়োগ—তবে তাহাই হোক! আমরাও আমাদের দেশে আমাদের আত্মীয় বন্ধু আমাদের মৃত সাধু-মাহাত্মা এবং আমাদের জীবন্ত ধর্ম্মের জন্য যুদ্ধ করিতে জানি তবে তোমাদের ও আমাদের এই প্রভেদ, আমরা ঈশ্বরে বিশ্বাস করি তোমরা তাহা করনা।